কালকূট
কালকূট
রচনা
রচনা
সমগ্র
সমগ্র

কালকূট রচনা সমগ্র

[পঞ্চম খণ্ড]

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

সূচীপত্র

[চতুর্থ খণ্ডের পর]

বেলা এগারোটায় সুবন্ধু টেলিফোন করে জানালো, ও কানপুর যাচ্ছে, আজ আর দেখা হচ্ছে না। ভালো কথা, জিজ্ঞেস করলাম, আর কাকে ও আমার অবস্থান এবং ঠিকানা জানিয়েছে। শুনে আকাশ থেকে পড়লো। নানারকম দিব্যি গেলে বললো, ও আর কারোকে কিছু বলে নি। চশমা পরা মহিলার বর্ণনা শুনে কিছুই মনে করতে পারলো না। ঠাট্টা করে বললো, বেশি মহিলার আগমন হতে থাকলে, ব্যালান্স করবার জন্য ওকে আবার কিছু পুরুষ নিয়ে আসতে হবে। আরো বললো, অনীতা সিনহা কী না। তা যেন হল, চশমাধারিণী কে হতে পারে। অনীতা হয়তো এখনো চশমা নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ও দিল্লীতে থাকে না। আমার কথা ওর জানবার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া, অনীতা সিনহা কালো নয়, রীতিমতো ফরসা।

সারাটা দিন এক ধরনের অস্বস্তিতেই কাটলো। কিন্তু কেউ এল না। ছটা নাগাদ হেনার টেলিফোন এল, ওর মায়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে। ও বেরোতে পারছে না। আমাকে ওদের বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধ করলো, গাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইলো। এক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে, জানিয়েছি, যাবার অসুবিধা আছে। হয়তো আহত হয়েছে। আমার ইচ্ছা হল না। কাল না এলে টেলিফোন করবে।

সন্ধ্যা গেল, রাত্রি নামলো। আলো জ্বললো। আজ সেই ময়দানবের ধাতব ঠং ঠং শব্দটা এখনো বাজছে। ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে কনট্ প্লেসের দিকে না গিয়ে, অপেক্ষাকৃত নির্জন পথে পথে খনিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। কলকাতার কথা বারে বারে মনে পড়তে লাগলো। আর আমার স্বেচ্ছা-নির্বাসনের কারণগুলো। এক জায়গায় দেখলাম, ফুটপাতের ধারে, কিছু হিপি হিপিনী বসে আছে। নিয়নের আলোতে গাছের ছায়া পড়েছে, সেই ছায়ান্ধকারে হাতে হাতে গাঁজার কলকে ফিরছে। দু'একজন ভারতীয় হিপিও আছে। একটি মেয়ে একটা রাস্তার কুকুরের গলায় দড়ি বেঁধে সেটা হাতে ধরে রেখেছে।

এ কিসের বৈরাগ্য, কী সাধনা বুঝতে পারি না। ভোগের অবসাদ, না অবিশ্বাসের অন্ধকার। অর্থহীনতার শিকার না তো? রঞ্জিতা রিজ্‌ভির কথা মনে পড়ে গেল। জীবন অর্থহীন। একথা কোনোদিন বিশ্বাস করতে পারি না। জীবনে কী পাওয়া গেল না গেল, সে হিসাব আলাদা। কিন্তু জীবন যে নানা রূপে অর্থময়, তা অস্বীকার করতে পারি না। যদি তা-ই না হবে, রঞ্জিতাকে দুঃখী বলতে গিয়ে, সুবন্ধুর মতো ছেলের মুখ কেন গম্ভীর হয়ে ওঠে। রঞ্জিতা নিজেই বা রাজপথে দাঁড়িয়ে অন্তর্বাস পুড়িয়েছিল কেন। যদি ব্যাপারটার মধ্যে সত্য কিছু থেকে থাকে, তবে তা কি অর্থহীন। নাকি ব্যাপক একটা অর্থেরই ইঙ্গিত।

ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে বসবার আগেই, টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যালো।'

জবাবে দুবার সম্বোধন ভেসে এল, 'হ্যালো হ্যালো।' নারীকণ্ঠ। কিন্তু চিনে উঠতে পারলাম না। স্বর যেন একটু ঝংকৃত, টলটলানো। ভুরু কুঁচকে ভাবলাম, মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। অথবা গত রাত্রের চশমাধারিণী? আবার একইভাবে, দ্রুত দুবার জিজ্ঞাসু স্বরে ভেসে এল, 'হ্যালো হ্যালো।'

ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলছেন?'

জবাবও ইংরেজিতেই এল, 'কী দুঃখ, আমার গলার স্বর চিনতে পারছেন না?'

প্রশ্নের সঙ্গে একটু হাসির ঝংকার। এই মুহূর্তেই চিনতে পারলাম, কার গলা। উচ্চারণ আর ভঙ্গিতে চিনতে পারলাম। একি কোনো অলৌকিক ব্যাপার নাকি। ঘরে ফেরবার আগেই যেহেতু অর্থময় আর অর্থহীনতার কথা ভাবছিলাম, সেইজন্যই এই কণ্ঠস্বর ভেসে এল? তা হলে আস্তানার ঠিকানা চাপা থাকেনি। কে জানে হয়তো সুবন্ধুই বলে দিয়েছে। দিক বা না দিক, ওর সেই চোখ দুটো, হাসি মুখটা আমার মনে পড়লো। বললাম, 'চিনতে পারছি। ঠিকানা জানলেন কি করে?'

হাসি মেশানো সুর ভরা গলা শোনা গেল, 'খুব কঠিন নাকি?'

'কঠিন না। আপনি জানতেন না তো, তাই বলছি।'

'কেন, পরশু দিন রাত্রে যে-রাস্তায় আপনাকে পৌঁছে দিতে গেছলাম, শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম, সেই রাস্তাই আপনার ঠিকানা জানিয়ে দিল। ও রাস্তায় থাকবার তো একটাই হোটেল আছে। আপনি যেখানে আছেন। ঘরের নম্বরটা অবিশ্যি আপনার হোটেলের লোকেরাই দিয়েছে। যাই হোক, খুব বিরক্ত করছি নাকি?'

বিরক্ত হইনি, বিব্রত বোধ করছি। বললাম, 'না।'

'জানতে পারি, আর কে আছে আপনার ঘরে?'

'কেউ না।'

'সুবন্ধু সুজাতা, কেউ না?'

'না।'

এক মুহূর্তের নীরবতা, তারপরে, 'যাবো?'

এর পরে আর জিজ্ঞেস করা যায় না, কোথায়। কিন্তু জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখে এল না। আবার শোনা গেল, 'এখন মাত্র সাড়ে আটটা।'

বললাম, 'আসুন। কোথা থেকে বলছেন?'

'বলতে পারেন, দুশো গজ দূর থেকে। এর আগেও একবার ফোন করেছি, নো রেসপন্স হয়েছে। বেরিয়েছিলেন বোধ হয়।'

'হ্যাঁ।'

'যাচ্ছি। আমার সঙ্গে একজন থাকবেন, আপত্তি নেই তো?'

আপত্তি? এর পরে আর সে ভাষাটা আমার জানা নেই। শুধু বললাম, 'চলে আসুন।'

কে একজন থাকতে পারে? অ্যাণ্টনি হতে পারে। অ্যাণ্টনির ছাঁটা গোঁফ-দাড়িওয়ালা বড় মুখটা চোখের সামনে ভাসছে। তাই সেই বড় বড় আরক্তিম চোখ, যেন এক বিশেষ দৃষ্টিতে রঞ্জিতাকে দেখছিল। অ্যাণ্টনির কথাগুলো মনে পড়ছে, রঞ্জিতা সম্পর্কে যেসব কথা বলেছিল। তাছাড়া সেইসব কথা, সে রঞ্জিতার পিছু পিছু ঘোরে বা রঞ্জিতাকে দেখলেই তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। কথাগুলো নিতান্তই হাসি-ঠাট্টার কী? অ্যাণ্টনির চোখে যেন অন্য কিছু দেখেছিলাম। হোক সে কেরালার রাজনীতি করা ছেলে, বুকে আগুন সকলেরই জ্বলে। অ্যাণ্টনির বুকে হয়তো আগুন লেগেছে। রঞ্জিতা রিজ্‌ভি অগ্নিশ্বরী, অনেক বুকেই সে অগ্নিকাণ্ড করতে পারে।

কিন্তু—আয়নার দিকে ফিরে তাকালাম, এখানে তো ছাই ছাড়া আর কিছু নেই। পুড়ে গিয়েছি অনেক আগেই। এখানে আর অগ্নিকাণ্ড ঘটবে না। ছাই না, বিষ। কালকূট। এখন পিপাসা শুধু অমৃতের। অমৃতের শান্তি। নিজের দিকে চেয়ে হেসে একটা নিশ্বাস ফেললাম। ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে খেলাম। সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই, দরজায় শব্দ বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে খুলেও গেল, স্বর শোনা গেল, 'আসছি।'

ফিরে তাকালাম। দরজা পেরিয়ে, আলমারির পাশে রঞ্জিতা রিজ্‌ভি। পাশে

পিছনে কেউ নেই কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত বেশভূষা। এক পলকের জন্য যেন চিনে উঠতেও অসুবিধা হল। দেখলাম, হালকা গোলাপী রঙ জমিতে লাল পাড় শাড়ি, হালকা গোলাপী জামা। কপালে টকটকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথেয় সিঁদুর আঁকা। ঠোঁটে হালকা লালের স্পর্শ, চোখে কাজল। চুল সেদিনের মতোই খোলা। কিন্তু টেনে দু'পাশে আঁচড়ানো। হাতে সেদিনের সেই ব্যাগটি। তাতে কি অগ্নিশ্বরীর রূপের উগ্রতা কিছু কমেছে। মনে হয় না। তবু অভ্যস্ত চোখে যেন একটা চেনা ছবির মতো লাগছে। এ পোশাকে ওকে দেখবো, ঠিক ভাবিনি। দিল্লীওয়ালী রিজ্‌ভি বিবির এও কি একটা বিদ্রোহ। বললাম, 'আসুন।'

রঞ্জিতা পিছন ফিরে, ঘাড় নেড়ে কায়োকে ডাকলো। এগিয়ে এল ঘরের মধ্যে। ওর পিছনে দেখলাম, ওরই বয়সী আর একটি মেয়ে। রঙটা একটু কালো। টানা টানা চোখ, চোখে চশমা। চুলে বিনুনি, পরণে চুস্তের ওপরে কোমরে বেল্ট লাগানো অর্ধেক হাতা জ্যাকেট। বুকের কাছে দুটি বোতাম খোলা। হাতে ঘড়ি। রঞ্জিতা পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু, মিস লীলা ভোরা। গতকাল রাত্রে ও এসেছিল আমার খোঁজ করতে, আপনি ঘরে আছেন কী না। আমিই অবিশ্যি পাঠিয়েছিলাম।'

এবার রহস্য উদ্ঘাটন হল। জানা গেল, গত রাত্রে কোন্ মহিলা আমাকে খুঁজতে এসেছিলেন। বললাম, 'আপনারা বসুন।'

রঞ্জিতা লীলাকে চেয়ারে বসতে বলে, নিজে খাটে বসলো। লীলাকে বললো, 'ওঁর কথা তোমাকে আগেই বলেছি।'

লীলা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনার কথা কাল শুনেছি, কালই আপনার বইও রঞ্জিতার কাছে থেকে নিয়ে গিয়েছি, পড়তে আরম্ভ করেছি।'

লজ্জিত হেসে বললাম, 'এমন কিছু একটা ব্যাপার না।'

রঞ্জিতা বললো, 'লেখক কি বসবেন না?'

কথা একটু বাঁকানো। তার সঙ্গে ঘাড় এবং চোখও। বললাম, 'বসবো, তার আগে জানতে চাইছি, আপনাদের জন্য কী বলবো, চা, কফি অথবা কোনো ঠাণ্ডা পানীয়?'

রঞ্জিতা বললো, 'দু' মিনিট ভেবে বলতে চাই। ততক্ষণ আপনি বসুন।'

আমি খাটের এক প্রান্তে বসলাম। অস্বীকার করা যাবে না, রঞ্জিতা এ ঘরের নিয়নের আলোকে ম্লান করেছে। কপালের ফোঁটাটা লাল না হলে বলতাম, দুপুরের আকাশে সূর্য জ্বলছে। ওর চোখের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে,

সুরার ঝলক নেই। গন্ধও পাচ্ছি না। তার বদলে, হালকা সুগন্ধ, মিশ্রিত গন্ধ। রঞ্জিতা তাকিয়েছিল, জিজ্ঞেস করলো, 'বিরক্ত করলাম এসে?'

বললাম, 'বিরক্ত করবেন কেন?'

'আপনি তো নিজের থেকে কখনো আসতে বলেননি। সুবন্ধু বলেছিল, আপনি কারোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে চান না। হয়তো সেদিন রাত্রে, আপনাকে আমি পৌঁছে দিলে, আপনার আস্তানাটা আমি জেনে যেতে পারি, সেইজন্যই আমাকেই আপনি বারে বারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন।'

বললাম, 'তা কেন। আপনাকে পৌঁছে না দিলে, আমার অস্বস্তি হত।'

এক মুহূর্ত, আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'হয়তো। কিন্তু সেদিন এ রাস্তায় ঢুকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কোথায় আপনি আছেন। আমি এসেছি জানলে, সুবন্ধু হয়তো রাগ করবে।'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'মনে হয় না।'

'হয়তো খুশিই হবে।' রঞ্জিতা হেসে উঠল। আবার বললো, 'ও আমার ভীষণ বন্ধু। ওর কাগজের বন্ধুরা, বা যে-কোনো বন্ধুরাই, আমাকে দু' চোখে দেখতে পারে না। ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখলে, সামনে থেকে সরে যায়।'

বলতে বলতে আবার হাসলো, ঠোঁট বেঁকে গেল। বললো, 'আমি তাদের চিনি। নিতান্ত করুণার পাত্র।'

বলে হেসে, নিজের কোলের এবং পায়ের দিকে তাকালো। লীলা ভোরা হাসি হাসি মুখে রঞ্জিতার কথা শুনছে। ওকে শস্তে মনে হচ্ছে। এমন একটি রূপসী বন্ধুর সঙ্গ কি লীলার ভালো লাগে। লাগে বলেই হয়তো সঙ্গে এনেছে। বিশেষ করে, বন্ধুর হয়ে, কাল রাত্রে আমাকে খোঁজ করতে এসেছিল। রঞ্জিতা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি বিরক্ত করছি না তো?'

হেসে বললাম, 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

রঞ্জিতা খুব দ্রুত দু'বার ঘাড় নেড়ে বললো, 'তা থাকবো না। কারণ, চিনি তো, চিনতে পেরেছি।'

ও লীলার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি একটু অবাক অস্বস্তি ভরা চোখে দু'জনের দিকেই দেখলাম। লীলা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। রঞ্জিতা বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে আমার দিকে দেখিয়ে বললো, 'আপনাকে।'

বললাম, 'চিনতে না পারার মতো কিছু নেই।'

রঞ্জিতা পিছন দিকে ঘাড় হেলিয়ে বললো, 'অনেক কিছু আছে। জানি,

আমাকে নিশ্চিত থাকতে বলেও, আপনি অনায়াসে হাসি মুখে বিরক্তি পুষে রাখবেন। এ রকম হাসি মাখানো ধৈর্যের নিষ্ঠুরতা আপনার আছে।'

'নিষ্ঠুরতা?'

'আমি তা-ই বলি। নির্বিকার বলতে পারতাম, সেটাও এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। কেননা, আপনি বেশ ভালোই জানেন, এসব আপদকে এভাবেই বিদায় করতে হয়।'

রঞ্জিতা রিজ্‌ভি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে বলে এসেছে নাকি। অবাক হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপদ?'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে, রঞ্জিতা এক পলকের জন্য, চোখ বুজলো। আবার চোখে চেয়ে বললো, 'তবু না এসে পারলাম না।'

দেখলাম, লীলা তার বান্ধবীকে দেখছে। বললাম, 'মিসেস রিজ্‌ভি, এ রকম বলবেন না।'

রঞ্জিতা হাত উল্টে গালের কাছে ঠেকিয়ে বললো, 'দয়া করে আমাকে রঞ্জিতা বলবেন। আমি সৌভাগ্য মনে করবো।' আঙুলের ভঙ্গি করে ভুরু তির্যক করে বললো, 'একটু অসুবিধে করেই।'

. কোনো যুক্তিই দাঁড় করাতে দিতে চায় না। হেসে বললাম, 'চেষ্টা করবো।'

রঞ্জিতা ভুরু তুলে, চোখের কোণে তাকিয়ে বললো, 'আমিও চেষ্টা করতে পারি, অনুমতি পেলে।'

কতটা কি উচিত হবে, রঞ্জিতা আমাকে নাম ধরে ডাকবে? আমার অস্বস্তি হবে। কিন্তু কথাটা বলা যায় কেমন করে। রঞ্জিতা হেসে উঠলো, আঁচল পিছলে পড়লো গা থেকে। আঁচল তুলে নিয়ে বললো, 'ভয় পাবেন না, আমি জানি, আপনি একজন সম্মানিত লেখক। কিন্তু আমি মনে মনে অনেকটা এগিয়ে আছি কী না। তার থেকে আপনাকে আর একটা নাম দিই, সেই নামে ডাকবো। মিস্টার আর পদবী ধরে ডাকতে আমার ভালো লাগবে না— আপনাকে বিশেষ করে।'

অবাক হেসে বললাম, 'নাম দেবেন?'

মনে পড়লো, এর আগের দিন বলেছিল, মনে মনে নাকি আমার একটা নাম ঠিক করে রেখেছে।

'হ্যাঁ। আপনাকে আমি শ্যাম বলে ডাকবো।'

এমন একটি নাম, কোন অর্থে? বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকালাম। যেটা ওর একটা অভ্যাস বলে মনে হয়। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে, আমাকে দেখিয়ে বললো, 'আপনি শ্যামবর্ণ তাই।'

শ্যাম নই, আমি কালো। কিন্তু তাতেই যদি রঞ্জিতার শ্যাম বলে ডাকতে ইচ্ছা করে, ডাকুক। আর ক'দিন ডাকবে। বললাম, 'বেশ, আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাই ডাকবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ।' বলে ও লীলার দিকে চেয়ে হাসলো। তারপরে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনিভাবে বললো, 'ওহ্, দুঃখিত, আমার এই বন্ধুর কোনো পরিচয়ই আপনাকে দিইনি। শুধু নামটাই বলেছি। ও একটা কলেজে পড়ায়। সাহিত্যের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে। আমরা সবাই একসঙ্গে সাপরু ভবনে পড়াশোনা করি।'

লীলা ভোরা একটু লজ্জা পেয়ে বললো, 'এ আবার বলার কী আছে।'

রঞ্জিতা বললো, 'তাহলে লীলা, কী করা যায়?'

দু'জনেই চোখে চোখে তাকিয়ে, কেমন যেন একটা ইশারা করার ভঙ্গিতে হাসলো। লীলা হেসে, দু'হাত মেলে বললো, 'আমি কী বলতে পারি?'

বলে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। রঞ্জিতাও আমার দিকে তাকালো। বললো, 'চা কফি ঠাণ্ডা পানীয়, কিছুই চাই না। আমি হার্ড ড্রিংক পছন্দ করি, তাই ড্রিংক করতে চাই। আপত্তি আছে?'

অর্থাৎ সুরা। আমার আপত্তির কী থাকতে পারে। সেদিন তো দেখেছি, রঞ্জিতার ওটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'দাঁড়ান, দেখছি, গত রাত্রে সুবন্ধু একটা বোতল এনেছিল, তাতে এখনো কিছু আছে।'

রঞ্জিতা বলে উঠলো, 'না না, তার কোনো দরকার নেই। বোতল একটা আমিই সঙ্গে করে এনেছি। আমার ব্যাগের মধ্যেই আছে।' বলতে বলতে ও ব্যাগ থেকে একটি রাম-এর বোতল বের করলো। বললো, 'আপনার অসুবিধে না হলে কয়েক বোতল কোকাকোলা আনিয়ে দিন।'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'দিচ্ছি।' দরজার বাইরে দেখলাম, সিঁড়ির কাছে বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ডেকে কোকাকোলা আর গেলাস আনতে বললাম। ঘরে ঢুকে, আলমারি খুলে, সুবন্ধুর বোতল বের করে টেবিলে রেখে বললাম, 'তবু এটাও আপনাদের সামনে রাখলাম, যদি ইচ্ছা করেন।'

রঞ্জিতা ওর রক্তিম ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'হুইস্কি? আমি পছন্দ করি না। রাম বা জিন আমার পছন্দ। কিন্তু এত বড় বোতল, এইটুকু রয়েছে। কে কে খেয়েছে?'

আমি হৃদয়নাথের নাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিতা শব্দ করে উঠলো,

'ওহ্!' তারপরেই দুই বান্ধবীতে চোখাচোখি করে, খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। এতটা হেসে ওঠার কী আছে, বুঝতে পারলাম না। ওদের হাসি শেষ হলে, রঞ্জিতা বললো, 'সেই গ্রেটম্যানটিও কাল এসেছিলেন? একজন নিঁখুত বাঙালী ব্রাহ্ম।'

'উনি ব্রাহ্ম নাকি?'

'সুবন্ধু আপনাকে বলেনি? উনি ভীষণ ব্রাহ্ম। কিন্তু খুব ভালো লোক, যাকে বলে অমায়িক ভদ্রলোক। তবে আমাকে সইতে পারেন না।'

না জানার ভাব করে বললাম, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এক সময়ে আমাকে একটু স্নেহ করতেন, তারপরে অনেকের মতো, ওঁরও মনে হয়েছে, আমি একটা বাজে মেয়ে। যেটা হয়তো আপনার ইতিমধ্যেই মনে হচ্ছে।'

জিজ্ঞাসা না করেও একটা জিজ্ঞাসা জেগে রইলো ওর চোখে। তাকালো আমার দিকে, ঘাড় কাত করে। বললাম, 'না, আমার সেরকম কিছুই মনে হচ্ছে না।'

আবার সেইরকম দ্রুত ঘাড় নেড়ে, ভুরু তুলে বলে উঠলো, 'আপনি তো মিথ্যা কথা বলেন না।'

'বলি, কিন্তু এখন বলছি না।'

রঞ্জিতা কয়েক পলক আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে ঠোঁট নাড়লো। কী বললো, বুঝতে পারলাম না। মুখ নামিয়ে নিল। একটা নিশ্বাস পড়তে দেখলাম। তারপর একটি অত্যন্ত চেনা গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠলো, 'তুমি মোর পাও নাই পাও নাই পরিচয়/তুমি যারে জানো, সে যে কেহ নয়।'

এই দুটি কলি গুনগুনিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। আমার দিকে চোখ তুলে দেখে হাসলো। বেয়ারা এল কোকাকোলা আর গেলাস নিয়ে। বেয়ারা রঞ্জিতাকে দেখে যেন হঠাৎ একটু অবাক হল, কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করলো। আমার অন্য কোনো অতিথির বেলায় এরকম ঘটতে দেখিনি। রঞ্জিতা হেসে ঘাড় নাড়লো। বেয়ারা বোধহয় 'মেমসাহেবকে' আগে থেকেই চেনে। কিন্তু সে যাই হোক, এই একটা জায়গায় এসে আমি যেন কেমন ঠেক খেয়ে যাই, যখন শুনি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত গুনগুনিয়ে ওঠে। এ সময়ে ওর ঈষৎ পিঙ্গল সিন্ধু চোখের দিকে আমার চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। সেটা কি নিতান্ত আমি বাঙালী বলে। মনে করি না। রঞ্জিতা যে স্রোতে বহে, গানের সময় হঠাৎ-ই যেন ও আমাকে উজান টানে টেনে নিয়ে যায়। এই গুনগুনিয়ে ওঠা, এমন একটি

রবীন্দ্র সঙ্গীত যে ও জানে, যেন বিশ্বাস করতে পারি না। ইচ্ছে করে গাইতে বলি, সাহস পাই না। কেন এই দুটি কলি ও গুনগুন করে, হঠাৎ চোখের দিকে চেয়ে হাসে, তা যেমন বুঝতে পারি না, তেমনি ওর কথাকেও ভয় পাই।

এই তো, এখন আবার দেখছি, হাল্কা গোলাপী জমিতে লাল পাড় শাড়ি পরা, সিঁথিতে সিঁদুর আঁকা, কপালে টিপ মেয়েটি, হাতে তুলে নিয়েছে সুরার বোতল। ছিপি খুলে ঢালছে গেলাসে গেলাসে। তৃতীয় গেলাসে ঢালবার সময় ও আমার দিকে তাকালো। আগের দুটো গেলাসে, যে পরিমাণ ঢালা হয়েছে, তাকে কী মাপ বলে জানি না। পাতিয়ালা পেগ বলে একটা কথা শোনা ছিল। এ তো তাকেও যেন ছাড়িয়ে গিয়েছে। একে কি সিদ্ধি পেগ বলে। বললাম, 'থাক না।'

রঞ্জিতা ঘাড় নেড়ে বাঙলায় বললো, 'সেটা হয় না মোশাই। সুবন্ধু লিখ্ পানী দিল, এটা কোক পানী, দো দিস্ ইজ অলসো ম্যাচিয়োরড, অ্যাণ্ড এ ওম্যান অফারস য়ু।'

কথা বাড়াতে সাহস পাচ্ছি না, বললাম, 'অল্প করে দিন।'

জানি, 'আপনি বেশিতে নেই।' বলে ভুরু কাঁপিয়ে চোখে ঝিলিক হানলো। কিন্তু এই স্বর্ণমণ্ডিত হাত বোধহয় সুরা পরিবেশনে কৃপণতা জানে না। নিজের হাতেই কোকাকোলার বোতল খুলে গেলাসে গেলাসে ঢেলে দিল। গেলাস তুলে দিল আগে লীলার হাতে। তারপরে আমাকে। রঞ্জিতা নিজের গেলাস তুলে বললো, 'চিয়ার্স।'

তারপরে চোখ বুজে বললো, 'ঈশ্বর, আমাকে পাপবোধ ফিরিয়ে দাও।'

বলে, একবার চকিত কটাক্ষপাতে লীলাকে দেখলো। আমার দিকে তাকালো। বিম্বোষ্ঠ নেমে এল গাঢ় বর্ণ পানীয় পাত্রে। তৃষ্ণার্তের চুমুক, এক চুমুকেই পাত্রের অর্ধেক শূন্য। গেলাস নামিয়ে রেখে, রুমাল ন্যাপকিনের দরকার নেই, হাতের পিঠ দিয়েই ঠোঁট চেপে দিল। লীলা তখন বলে উঠলো, 'অ্যাণ্ড আই ড্রিংক দা হেলথ অব এ মিনিংফুল রাইটার।'

রঞ্জিতা ছোট করে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, 'ওহ্, তোফা লীলা, তোফা। তুমি একটা কথার মতো কথা বলেছ। এ কথাটা আমার মনে আসেনি।'

লীলা গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'তুমি নিজের ভাবনাতে মগ্ন ছিলে।'

রঞ্জিতা তাকিয়ে রইলো টেবিলের দিকে। লীলা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। মিনিংফুল রাইটার, কথাটা কি আমাকে বিদ্রূপ করে নাকি?

প্রতিবাদ আমি মোটেই করবো না। বোঝা গেল, লীলার সঙ্গে অনেক

কথা হয়ে গিয়েছে। আমার ভয়টাও সেখানেই। অর্থময় লেখক হিসাবে আমার কোনো দাবি নেই। কিন্তু এখন এ বিষয়ে আমি কোনো আলোচনায় বা বিতর্কে যেতে চাই না। জিজ্ঞেস করলাম, 'মিঃ রিজ্‌ভি কী জন্য বিদেশে গিয়েছেন!'

রঞ্জিতা ঠোঁট টিপে একটু চুপ করে রইলো, তারপরে বললো, 'স্বদেশ আর বিদেশের সরকারের আজকাল অনেক স্নেহভাজন আছেন, যাঁরা বছরে কয়েকবার নানা দেশে আমন্ত্রিত হন। রিজ্‌ভিও সেইরকম আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন।'

জবাবের আগে ভূমিকা শুনে মনে হল, কোথায় একটু বেসুর আছে। রঞ্জিতা একটু সময়ের মধ্যে গেলাস প্রায় শূন্য করে নিয়ে এল। আজ সুবন্ধু নেই, অ্যান্টনিও নেই। লীলা অবিশ্যি আছে। ভরসা কতোখানি, জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'মিঃ অ্যান্টনির কী খবর?'

রঞ্জিতা হেসে উঠে, লীলার দিকে চেয়ে বলে উঠলো, 'ওহ্ মাই ওথেলো, মাই গ্রেট লাভার।'

লীলাও রঞ্জিতার সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠলো। রঞ্জিতা আমার দিকে চেয়ে বললো, 'অ্যান্টনির এখন গভীর অসুখ। অবিশ্যি শরীরে না, মনে।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকালাম। ও ভুরু টান করে, ঘাড় নাড়িয়ে বললো, 'যে প্রেমে পড়ে, তারই অসুখ করে। আপনি কী বলেন?'

আমি হেসে জবাব দিলাম, 'প্রেম যে অসুখ, আমি ঠিক তা মনে করি না।'

রঞ্জিতা আর লীলা একবার চোখাচোখি করে হাসলো। রঞ্জিতা বললো, 'আপনি বোধহয় ওটাকে বেদনা বলেন। যাই হোক, শ্যাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'বলুন।'

'মিঃ রিজ্‌ভি এবং তারপরে মিঃ অ্যান্টনির কথা জিজ্ঞেস করার মধ্যে কি কোনো সূত্র আছে?'

আমাকে একটু থমকে যেতে হলো। শুনলে হয়তো, তাই মনে হয়। কিন্তু আমি সেরকম কিছু ভেবে বলি নি। রঞ্জিতার চোখের তারা আমার প্রতি অপলক বিদ্ধ হয়ে আছে। বললাম, 'না, কোনো সূত্র নেই। মনে এল, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

রঞ্জিতা ওর শূন্য গেলাস পূর্ণ করলো। লীলাও কিছু কম যায় না। শূন্য পাত্র বান্ধবীর দিকে এগিয়ে দিয়ে টানা চোখ ঢুলু ঢুলু করে, উর্দুতে কিছু বলে উঠলো। বুঝি না, মনে করেও রাখতে পারি না। রঞ্জিতা পাত্র পূর্ণ করতে করতে আমাকে বললো, 'বুঝতে পারলেন?'

বললাম, 'না।'

রঞ্জিতা বললো, লীলা একটা গজল গানের কলি বললো। অন্তর যখন কোনো কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, তখন বিষের পাত্র মুখে তুলে নিই।'

এই পানীয়কে তা হলে ওরা বিষ মনে করে। বিষ মনে করেই পান করে? কিন্তু এত অতৃপ্তি কিসের। তবে অতৃপ্ত সন্দেহ নেই। এই বিচিত্রবেশিনী গুজরাতি যুবতী মেয়ে আর সিন্ধুবালাকে বাইরের থেকে যাই দেখাক, শিক্ষা দীক্ষা সমাজ পরিবেশ, সব কিছু ছাড়িয়ে ওরা যে বিষের পাত্র তুলে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে, সেটা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। দুই বান্ধবী পাত্রে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমুক দিল। লীলা হঠাৎ হেসে উঠলো। তাকালাম, রঞ্জিতাও তাকালো। লীলা ওর মোটা বিনুনিটা টেনে বুকের কাছে নিয়ে বললো, 'কিছু না, এমনি একটা কথা মনে পড়ে গেল।'

তা মনে পড়ুক, কিন্তু মাতাল হলে এই আবাসে আমার হাল কী হবে। রঞ্জিতা কিছু বললো না। আবার গেলাসে চুমুক দিল। এত তৃষ্ণা কেন। ইতিমধ্যে অগ্নিশ্বরীর গালে রক্তের ছটা ফুটে উঠেছে। হঠাৎ-ই আমার মনে হল, একেবারে খাদ্যবিহীন পান চলাটা ঠিক হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি উঠে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। কী খাবেন বলুন, বেয়ারাকে আনতে বলি।'

রঞ্জিতা হাত তুলে আমাকে নিরস্ত করে বললো, 'আমাদের কোনো দরকার নেই। আপনার দরকার আছে?'

'আমার জন্য ভাববেন না—।'

'তা হলে আমাদের জন্যও ভাববেন না, কালকূট আপনি বসুন।'

নামটা বলার সময়, ওর চোখে যেন একটু ঝিলিক দিল। গেলাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি সত্যি কালকূট?'

বললাম, 'ওটা একটা নামের পরিচয় মাত্র।'

'এমন নাম কেন? নিজের জীবনের সঙ্গে বিশেষ কোনো অর্থ আছে?'

'কোনো অর্থ?'

রঞ্জিতার ঘাড় ভুরু চোখ, সবই বেঁকে উঠেছে। ওর 'এনি মিনিং' কথার ওপরে জোর দেওয়া শুনেই বুঝতে পারছি, ও ওর নিজের স্রোতে কথা টেনে নিচ্ছে। বললাম, 'ধরে নিন, হয়তো কোনো অর্থ আছে।'

ও ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'থাকতেই হবে, থাকতেই হবে। আপনি বিষ কোনো সন্দেহ নেই, মৃত্যু আপনাকে ঘিরে।'

'অপবাদ দিচ্ছেন ?'

'সত্যি কথা বলছি। যে মরেছে, সেই জানে।'

ও গেলাস ঠোঁটে ছুঁইয়ে, আমার দিকে সোজা তাকালো। এক মুহূর্তের জন্য ওর মুখ থেকে হাসি চলে গেল। চোখের তারায় নিবিড় আবেগ। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। নদী সমুদ্রগামী অবিরত। রঞ্জিতা আপন স্রোতে বহে। কিন্তু যে ভাসতে জানে না, টান লাগে তার শিকড়ে। সেটা ঠিক না। লীলার দিকে ফিরে দেখলাম, সে মুখ নিচু করে, টেবিলে আঙুল ঘষছে। রঞ্জিতা এক চুমুকে পাত্র শূন্য করলো। আবার ঢাললো, কোকাকোলা মেশালো। আবার চুমুক দিল। তারপরে গান গেয়ে উঠলো, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা,

মম শূন্যগগনবিহারী

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে

তোমারে করেছি রচনা—

তুমি আমারি, তুমি আমারি,

মম অসীম গগনবিহারী।

ও চোখ বুজে গাইছে। গানের সঙ্গে, শরীর একটু দুলছে, মুখটা একটু উঁচুতে তোলা, গ্রীবা মাঝে মাঝে সুরের উঁচু নিচুর সঙ্গে নড়ছে। সমস্ত মুখে একটা গভীর আবেশ। ওকে এখন একেবারে অন্যরকম লাগছে। যেন নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। ও কি এগানের ভাষা বোঝে ? না বুঝলে, এ আবেশ অভিব্যক্তি ফোটে কেমন করে। অস্বীকার করবো না, আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। উচ্চারণ স্পষ্ট, আমার জানত সুর নির্ভুল, নির্ভেজাল গায়কী। এ কি শুধু শুনে শেখা, না চর্চার দ্বারা আয়ত্ত। হৃদয়নাথ কি কোনোদিন ওর এরকম গান শুনেছেন, অথবা হেনা। এখন ওকে আমার চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা এমনিতেও করে, চোখ সব সময়ে সইতে পারে না যেন। এখন পারছি। লীলা রঞ্জিতাকেই দেখছে, আর গেলাসে চুমুক দিচ্ছে।

গানটা শেষ করে, রঞ্জিতা কোনো দিকে তাকালো না, মুখ নিচু করে রাখলো। কেবল অল্প মাথা নেড়ে বললো, 'শ্যাম, মাপ করে দেবেন।'

'কেন ?'

'আমার গানের জন্য।'

বললাম, 'আমি মুগ্ধ।'

রঞ্জিতা চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। যেন লজ্জা পেয়ে হাসলো।

ওকে আবার সেদিনের মতো ব্রীড়াময়ী দেখাচ্ছে। ঠোঁট টিপে হেসে, নিজের মনেই মাথা নাড়লে, তারপরে গেলাস তুলে চুমুক দিল। লীলা ওর গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'দাও।'

রঞ্জিতা লীলার গেলাস পূর্ণ করার আগেই, লীলা দুহাতে মুখ ঢাকলো। তারপরে হঠাৎ তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। ফুলে ফুলে উঠতো লাগলো। পরমুহূর্তেই ওর ফোঁপানোর অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। আমি উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে রঞ্জিতার দিকে তাকালাম। রঞ্জিতা লীলার গেলাস টেবিলে রেখে, তার পাশে উঠে এল। লীলার মাথায় হাত রেখে ডাকল, 'লীলা।'

কিন্তু লীলার কান্না তাতে প্রশমিত হলো না। আরো যেন বেড়ে উঠলো। রঞ্জিতাকে উদ্বিগ্ন দেখলাম না, ওর ঝিলিক হানা চোখের দৃষ্টি কোমল আর করুণ। ও লীলার মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে, আমার দিকে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে শান্ত থাকতে বললো। মুখে বললো, 'এক গেলাস জল দেবেন?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে, ফ্লাস্ক থেকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিলাম। রঞ্জিতা গেলাসে হাত ডুবিয়ে লীলার ঘাড়ের কাছে বুলিয়ে দিল। তাকে দু'হাতে টেনে তুলে বললো, 'একটু শুয়ে থাকবে চলো।'

লীলা উঠলো, খাটের ওপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে, তেমনি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। আমি নিরুদ্বিগ্ন হতে পারলাম না। রঞ্জিতা লীলার পাশে বসে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বারে বারে বলতে লাগলো, 'কাম বী কোআয়েট প্লিজ লীলা—প্লিজ!'...

হায় রে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত, অপরূপ তোমার নির্বাসন। এখন তোমার ঘরে, অগ্নিশ্বরীর গান শুনে তুমি মুগ্ধ। সুরার ঘোরে যুবতী শুয়ে উথালি পাথালি কাঁদে তোমার বিছানায় পড়ে। কিসের খেয়ারি ভাঙছে, জানি না। মনে মনে বলি, কোথায় সুবন্ধু, রক্ষা করো এসে। প্রায় মিনিট দশেক পরে, লীলা শান্ত হলো। কিন্তু উপুড় হয়ে শুয়ে রইলো। রঞ্জিতা ওর জায়গায় সরে বসে, গেলাসে চুমুক দিল। আমার দিকে ফিরে একটু শুকনো হেসে নিজের বুকে তর্জনী দেখিয়ে, নিচু স্বরে বললো, 'জলছে।'

বলে ওর ঠোঁট বেঁকে উঠলো, যেন হাসিতেই ঘাড় দুলে উঠলো। আবার বললো, 'আপনি বোধহয় বিরক্ত বোধ করছেন।'

বললাম, 'না, উদ্বেগ বোধ করছি। ওঁর শরীর ঠিক আছে তো?'

'বিলকুল। অসুখ গভীর, মনে। বিষের পাত্র মুখে তুলে নিয়েছে কী না। ওকে আর একটু সময় দেওয়া যাক, তারপরে চলুন ওঠা যাক।'

একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকেও উঠতে হবে নাকি ?'

'আজ আমাকে পৌঁছে দেবেন না ?'

আবার ওর চোখের তারায় ঝিলিক। আমি একবার শায়িত লীলার দিকে দেখলাম। রঞ্জিতার কথাটা অযৌক্তিক না। বিশেষ করে, এরকম একজন বান্ধবী যখন সঙ্গে রয়েছে। বললাম, 'কেন দেব না।'

রঞ্জিতা ওর পাত্র শূন্য করলো। আবার ঢাললো। এখন ওর কাজল-টানা ঈষৎ পিঙ্গল চোখের ক্ষেত্রে রক্তিম। সমস্ত মুখখানিই রক্তাভ। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু বলছেন ?'

বললাম, 'আপনি ঠিক আছেন তো ?'

গেলাস উঁচুতে তুলে বললো, 'এ ব্যাপারে ঠিক আছি। আবার ঠিক নেই অনেক কিছুতে।'

বলে চোখ বুজে চুমুক দিল। ঠোঁঠ থেকে গেলাস নামিয়ে আবার বললো, 'শ্যাম, আপনাকে কি সে কথা আর কেউ বলেছে ?'

'কোন্ কথা ?'

'পাপবোধ ভেসে যাওয়ার কথা।'

সেই কথা, যে কথাতে আমি যেতে চাইনি। মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

রঞ্জিতার রক্তিম চোখ নিষ্পলক। ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, 'কথাটা শুনে কী মনে করেন আপনি ?'

'বুঝি না।'

রঞ্জিতা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললো, 'আপনি কেন বুঝবেন। যার ভেসে যায়, সে বোঝে। আসবার সময়ে ভেবেছিলাম, আজ আমার তা হবে না। কিন্তু দেখছি, আমি ভেসে যাচ্ছি।'

বললাম, 'যাতে দুঃখ বাড়ে, এমন অনুভূতিকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।'

রঞ্জিতা নিঃশব্দে হেসে উঠলো, বললো, 'দুঃখ বাড়ে ! দুঃখ বাড়ে ! না না, এ আমার দুঃখ থেকে মুক্তির বোধ।'

বলেই এক নিঃশ্বাসে, দীর্ঘ চুমুকে গেলাস শূন্য করে দিল। গেলাসটা ঠক করে নামিয়ে দিল টেবিলের ওপরে। আমি ডেকে উঠলাম, 'রঞ্জিতা, আর না।'

রঞ্জিতার মুখ নিচু। চুল কপালে গালে এলিয়ে পড়লো। মাথা নেড়ে বললো, 'না, আর না। চলুন এবার যাই।'

লীলার দিকে ফিরে, হাত বাড়িয়ে গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলো, 'লীলা, চলো উঠি—'

একবার ডাকতেই লীলা উঠলো। বাথরুমে গেল। একটু পরেই বেরিয়ে এল, চোখে মুখে জল দিয়ে। চশমা পরে জামা ঠিক করে, বললো, 'চলো।'

এখন আমি রঞ্জিতাকেই দেখছি। ওর কি নেশা হয়ে গিয়েছে। এখনো মুখ তুলছে না। লীলার ডাক শুনে উঠে দাঁড়ালো। ব্যাগ নিল। দেখলাম, টলছে না। বললাম, 'আপনার বোতলটা?'

রঞ্জিতা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখ তুলে বললো, 'থাক, ওটা নিয়ে যাবো না, আরো খেতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু—কিন্তু আপনি সত্যি বোঝেন না?'

সেই কথা! রঞ্জিতা আমার মুখের দিকে চেয়ে। ওর তপ্ত নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগছে। ওর নাসারন্ধ্র যেন কাঁপছে। আমি কোনো কথা বলতে পারছি না। রঞ্জিতার চোখ নেমে, নিবদ্ধ হল আমার বুকের দিকে। আমার মুখের দিকে। অস্ফুটে বললো, 'চলুন'।

ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এখন আর বোতল গেলাস সরাবার সময় নেই। ঘরের আলো নিভিয়ে, দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম। লীলা রঞ্জিতার হাত ধরে করিডর ধরে হাঁটছে। লিফটে নিচে নেমে এসে, বাইরে দাঁড়াতে কৃপাণধারী দরোয়ান সর্দারজী বাঁশি বাজিয়ে দিল। কোথা থেকে ছুটে এসে দাঁড়ালো ট্যাক্সি। কলকাতায় যেটা স্বপ্ন। রঞ্জিতা আমাকে আগে উঠতে বললো। তারপরে ও মাঝখানে বসে, লীলাকে এক ধারে নিল। পথের মধ্যে কোনো কথাই হল না। আলোকিত কয়েকটি রাস্তা পার হয়ে, গাড়ি এসে দাঁড়াল একটি ইনস্টিটিউটের সামনে, মেয়ে হস্টেলের গেটে। লীলা নামবার আগে, আমাকে বললো, 'যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না যেন।'

বললাম, 'কিছুই না। আপনার শরীর ভালো তো?'

'ভালো। আশা করি আবার দেখা হবে, শুভরাত্রি—দুজনকেই।'

লীলা নেমে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল। রঞ্জিতা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন?'

'আপনাকে পৌঁছাতে।'

'না, আমাকে পৌঁছুবার আগে, খেতে যেতে হবে। ওবেরয় ইণ্টারকন্টি-নেণ্টাল?'

খেতে যাবার কথাটা নতুন শুনছি। কিন্তু ওরকম একটা জায়গায় খেতে যেতে আমার ইচ্ছা নেই। বললাম,, 'আমার হোটেলে খাবার পাওয়া যাবে।'

রঞ্জিতা বললো, 'না ওখানে যাবো না। অশোকা?'

দুটো নামই দিল্লীর বড় উচ্চ মার্গের। এ সব জায়গার নাম করছে কেন? বললাম' 'অন্য কোথাও গেলে হয় না?'

রঞ্জিতা বললো, 'চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, না? আচ্ছা তাহলে চলুন, জনপথের চায়নিজ রুম ম্যাণ্ডারিনে যাই।'

মুহূর্তের মধ্যেই আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো! এখন দিল্লীর যেখানে যেখানে সুরা পাওয়া যায়—রঞ্জিতা সেই সব জায়গার নাম করছে। দিল্লীতে কোনো পাবলিক বার নেই। যেসব জায়গাতে আছে সেসব জায়গাতেও নানান বিধিনিষেধ। সম্ভবত সেসব বিধিনিষেধকে তুক করার মন্ত্র ওর জানা আছে। আমি ওকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বললাম, 'অন্য কোথাও যাওয়া যায় না?'

রঞ্জিতা কয়েক পলক আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে, নিঃশব্দে হাসলো। হঠাৎ ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'ওসব জায়গায় আমি খুব বাধ্য না হলে যাই না। এবার আর কিছু বলবো না। চলুন, আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। কিন্তু কাবাব খেয়ে পেট ভরাতে পারবেন তো। দারুণ কাবাব।'

রঞ্জিতাকে এখন একটু ছেলেমানুষ লাগছে। পেট ভরাবার প্রশ্ন না, এক রাত্রি না হয় কাবাব খেয়েই কাটবে। বিশেষত সে কাবাব যখন দারুণ! ড্রাইভার এতক্ষণ কিছু না বলেই, আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। রঞ্জিতা বললো, 'জাম্মা মসজিদ চল্‌না সর্দারজী।'

যার নাম জুমা মসজিদ? হাতের ঘড়িটা উল্টে দেখার চেষ্টা করলাম। রঞ্জিতা বললো, 'রাত্রি এখন দশটা।'

'এখন কি সেখানে সব খোলা?'

'সেখানে সারারাত্রি খোলা। দিল্লী ওখানেই আছে, ওখানেই জাগে।'

রাত্রি দশটার সময় জুমা মসজিদে কাবাব খেতে কোনদিন যাইনি। দেখা যাক। গাড়ি চলেছে পুরনো দিল্লীর দিকে, রঞ্জিতা কী একটা গান গুনগুন করছে, সুর শুনে মনে হয়, গজল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি গানের চর্চা করেন?'

রঞ্জিতা গুনগুনানি থামিয়ে মাথা নাড়লো, 'না। যা শুনি, ভালো লাগলে, তা-ই তুলে নেবার চেষ্টা করি। টেগোরের গান আমি ভালোবাসি। কলকাতায় থাকতে আমি এক ডজনের ওপর গান শিখেছিলাম।'

'আপনি কি বাঙলা ভাষা বোঝেন?'

'অনেকটা। পড়তে বা লিখতে পারি না। বুঝতে পারি। শ্যাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি কি সুখী মানুষ দেখেন নি?'

কথার প্রসঙ্গ অত্যন্ত দ্রুত বদলে চলেছে। যেন খেই ধরতে পারি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন বলুন তো? যাদের দেখেছি তাদের সম্পর্কে আমার কোনো কৌতূহল নেই।'

ও আমার অনেক কাছে বসেছিল। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে, আমার বুকে স্পর্শ করে বললো, 'এখানে কেবল দুঃখী মানুষের মিছিল?'

বললাম, 'না, আমি প্রসন্ন শান্ত দেবতুল্য মানুষও দেখেছি।'

'তারা কারা?'

'আমাদের এই দেশের পথেঘাটে তাদের দেখা পাওয়া যায়, গাছতলায়, কুটিরে, মেলায়, মাঠে।'

রঞ্জিতা একমুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। আমার পাঞ্জাবীর বোতামের ঘরে ওর তর্জনীটা আটকানো। যেন কিছু ভাবছে। বাতাসে চুল উড়ছে। হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ পাচ্ছি। বললো, 'তবু একটা কথা, আপনারা দুঃখী মানুষেরা এক এক সময় বড় রঙীন, বড় উজ্জ্বল, কেন? তাদের দুঃখকে এক এক সময় যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।'

সহসা কোনো জবাব দিতে পারলাম না। ওর মুখের দিকে দেখলাম; তাকিয়ে আছে। মনে হল, ওর কথার মধ্যে, একটি বিশেষ মনের ছায়া আছে। এটা ওর চিন্তার কথা। মনে পড়ে গেল, অ্যাকোরিয়ামের কথা, রঙীন মাছের জার। যার পিছনে ও আমাকে হাসিমুখে লুকিয়ে যেতে দেখেছে। কথাটা অভিযোগের মত শোনায়। কিন্তু কেন বলেছে, আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কী মনে হয় বলুন তো?'

ও বললো, 'এক এক সময় মনে হয়, তারা অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে থেকেও মুক্ত, দুঃখটা সত্য আর নির্মম হয়ে ফুটে ওঠে না।'

রঞ্জিতা আমাকে ভাবিয়ে তুলতে চাইছে। আমার বোতাম-ঘরে ওর তর্জনী নড়ছে। তাকিয়ে আছে মুখের দিকে।

বললাম, 'কথাটা আমার মনে থাকবে।'

বোতাম-ঘরে তর্জনী দিয়ে, জোরে একবার টেনে, প্রায় ওর দিকে আমাকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে বললো, 'কেবল কথা?'

তারপরেই তর্জনী সরিয়ে নিয়ে, ও নিজেই আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে বললো, 'শ্যাম, আপনি আমার মত একটি সুখী মেয়ের জীবন নিয়ে কিছু লিখুন।'

ওর চোখের কটাক্ষে ঝিলিক, রক্তিম অধরের হাসিতে আগুন। একথা বলে কাকে বিদ্রূপ করছে রঞ্জিতা ?

বললাম, 'সুখী ?'

'নয় ?' বলে ওর নিজের শরীরটাকে যেন মেলে দেখাতে চাইল। দু'হাত ছড়িয়ে, শরীর সামনের দিকে এগিয়ে বললো, 'এর চেয়ে সুখী মেয়ে আপনি আর কোথায় পাবেন ? আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, যা খুশি করবার স্বাধীনতা আছে, স্বামীর টাকা আছে, নিজেও কিছু রোজগার করি, আমি সুখী নই ?'

সুবন্ধুর কথা আমার মনে পড়ছে। আর এই মুহূর্তে ওর এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, আমার পুরুষ মন বিব্রত বোধ করলেও, ওকে দেখে কেন যেন কষ্টও হচ্ছে। দুঃখ দহনের এ আর এক রূপ। বললাম, 'একেই যে সুখের সংজ্ঞা বলে, তা আমার জানা নেই।'

রঞ্জিতা আমার চোখে চোখ রেখে প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'কিন্তু শ্যাম, তুমি কিছুই জানো না, আমাকে সবাই সুখী বলে। আমার মা ভাই বোন বন্ধু স্বামী, দিল্লীর সবাই।'

বললাম, 'হয়তো তারা সত্যি বলে, তারা আপনাকে দেখেছে। আমি আপনার সুখের কিছুই এখনো দেখিনি।'

'সে কি শ্যাম, আপনার সামনে বসে এত মদ্যপান করছি, হাসছি, গান করছি, তবু না ?'

রঞ্জিতা কি আমাকে এতটা অন্ধ ভেবেছে, এই ঝলক দেখে, আমি আলো চিনবো। কিছু না বলে, ওর চোখের দিকে চেয়ে হাসলাম। ও এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপরে চোখ বুজে বলে উঠলো, 'শ্যাম, চোখ ফিরিয়ে নিন, আমি ভেসে যাচ্ছি।'

সত্যি সত্যি আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। রঞ্জিতা দুঃখকে বাড়াচ্ছে। একলা ওর না, আমাকেও সেই দুঃখের দুয়ারে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। অথচ আমাদের জীবনের, কারোর কোথাও মিল নেই। কোনো কিছুতেই না। আমি চলে যাবো দূরে, আমাদের মধ্যে সারা জীবনে হয়তো আর দেখাও হবে না। আর মানুষের মন। সে তো বহুকাল থেকেই জানি, ভাঁটার পলির মতো, অনেক কিছুই চাপা পড়ে যায়। হয়তো ভুলে যাবো। তবু আমি বুঝতে পারছি, এক বিহঙ্গ ডাকছে। ফুলেরা নিঃশব্দে ফুটছে। রঞ্জিতা ডাকলো, 'শ্যাম।'

'বলুন।'

'তাকান আমার দিকে।'

তাকালাম। সহসা যেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ওর মুখ এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। ওর চোখের দিকে আমি তাকাতে পারছি না। বললাম, 'রঞ্জিতা, দুঃখকে বাড়াবেন না।'

'আমার চারপাশে অনেক সুখ, দুঃখকে আমি ডরাই না।'

'আমি ডরাই।'

'আপনি? দুঃখকে?' ও আমার কোলের ওপর রাখা আমার একটি হাতের ওপর হাত রাখলো। ওর হাত গরম। ওর মুখ আবার উঠে এল আমার মুখের কাছে। সুগন্ধ উষ্ণ নিশ্বাসের হলকা লাগছে আমার ঘাম ভেজা মুখে। অগ্নিশ্বরীর আগুনের স্পর্শ আমার গায়ের ছোঁয়ায়। প্রায় অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'হায় আমার মিষ্টি বিষ। একটু বিষ দাও আমাকে তোমার মিষ্টি পাত্র থেকে।'

চোখ নামিয়ে দেখলাম, তরল আগুন টলটল করছে, অথবা শরীরে, রক্তিম ঠোঁটের তৃষ্ণার্ত ফাঁকে। আর নিজের জন্য, বাউলের সেই গানের কলি আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, 'আগুন আছে ছাইয়ের ভিতরে।' কিন্তু নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অসহায় একটা কষ্টে বিদ্ধ হচ্ছি। আমি হাত দিয়ে ওর কপালের কাছে স্পর্শ করলাম।

গাড়ি হঠাৎ বাঁক নিল। চলে এলাম অন্য এক পরিবেশে। ঘিঞ্জি রাস্তা, চারদিকে লোকের ভিড়। ফুটপাতে গরীবের শয্যা, শিশুরা এত রাত্রেও চিৎকার করে খেলা করছে। এখানে সুপার মার্কেটের ঝলক নেই। এখনো সব হাট করে খোলা। বাতাসে বিচিত্র গন্ধ। মাছের আঁশটানি থেকে ঘোড়ার বিষ্ঠা। অপেক্ষাকৃত একটু অন্ধকার জায়গায়, রঞ্জিতা গাড়ি দাঁড় করাতে বললো। ঘাগরা আর জামা পরা একটি বারো তেরো বছরের গরীব মেয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা দরজার কাছে। রঞ্জিতা তাকে আঙুলের ইসারা করতেই, সে এগিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমিনা, তেরা আব্বাজান কঁহা?'

মেয়েটি বললো, 'অন্দর মে।'

'বোলা।'

মেয়েটি দরজা দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। একটু পরেই, মাঝবয়সী, লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি গায়ে একটি লোক বেরিয়ে এল, গাড়ির সামনে দাঁড়ালো। কপালে হাত ঠেকিয়ে হেসে, রঞ্জিতাকে সেলাম করলো। বললো, 'ফরমাইয়ে মেমসাব?'

রঞ্জিতা বললো, 'কুছ হ্যায়।'

'জী হাঁ, পিলা ওর কাত্‌থই ?'

রঞ্জিতা ওর ব্যাগ থেকে পার্স বের করে, কিছু টাকা গুঁজে দিল লোকটির হাতে। লোকটি চলে যেতেই, রঞ্জিতাও ব্যাগটা সহ দরজা খুলে নেমে যাবার আগে বললো, 'এক মিনিট আসছি।'

কিন্তু পিলা-ই বা কী, কাত্‌থই-ই বা কী, কিছুই বুঝলাম না। পিলা তো হলুদ রঙকে বলে জানি। কাত্‌থইয়ের অর্থ জানি না। এরকম একটা হতভাগা জায়গায়, টাকা দিয়ে কী বস্তু কিনছে। আমি বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম, লোকটি বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। কাগজে মোড়া কী একটা রঞ্জিতাকে দিল। রঞ্জিতা সেটা ওর ব্যাগে ভরে নিল। কী যেন বললো, ফিরে এল গাড়িতে। ড্রাইভারকে বললো, 'সর্দারজী, অব এক চক্কর লাগানা, ফিন জামা মসজিদকে ইধার ঘুমকে আনা।'

একটু দূরে, ডানদিকে জুমা মসজিদ দেখতে পাচ্ছিলাম। গাড়ি মসজিদের পাশ দিয়েই ঘুরে, রেড ফোর্টের দিকে এগোল। রঞ্জিতা ব্যাগ খুলে, কাগজের মোড়ক থেকে বের করলো ছোট একটি রামের বোতল। তারপরে আমার দিকে তাকালো। বললো, 'এ হল কাত্‌থই রঙের পানীয়।'

মনে মনে ভাবলাম, পিলা তা হলে হুইস্কি। গূঢ় ভাষার কথা। বেআইনী ক্রয়। রঞ্জিতা রিজ্‌ভি এটাও জানে। কিন্তু আবার কেন। সঙ্গে থাকলে খেতে ইচ্ছে করবে বলে ঘরে বোতল রেখে এল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত বদলে গেল ? খানিকটা ভয়ে আর অস্বস্তিতে আমি বোতলটার দিকে তাকালাম। বললাম, 'আবার কেন ?'

রঞ্জিতা চোখ কুঁচকে হেসে বললো, 'একটুখানি।'

লীলার সেই উর্দু গজলের কলি আমার মনে পড়ছে। অন্তর যখন পূর্ণ হয় না, তখন বিষের পাত্রে চুমুক। দেখলাম, রঞ্জিতা ছিপি খুলে শুধু রাম গলায় ঢালছে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলাম, 'কী করছেন মিসেস রিজ্‌ভি ?'

রঞ্জিতা মুখ থেকে বোতল সরিয়ে, আমার দিকে চেয়ে বললো, 'মিসেস রিজ্‌ভি ? ওহ্‌, আপনি রাগ করছেন ?'

'না, আমি ভয় পাচ্ছি।'

'ভয়ের কিছু নেই শ্যাম। আমি হয়তো ঠিক ব্যবহার করতে পারছি না। নিজেকে একটু ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি।'

বলে অবিশ্বাস্য রকমে, বোতলটাকে উপুড় করে গলায় ঢালতে লাগলো। আমি আর থাকতে পারলাম না। কাছে বসে এরকম নির্বিকার দেখা যায় না।

বোতলটা ওর হাত থেকে টেনে নিলাম। খানিকটা রঙীন পানীয় ওর বুকের শাড়িতে পড়ে গেল। ও গাড়িতে হেলান দিয়ে, দুহাত ছড়িয়ে দিল। চোখ বুজে রইলো। রক্ত ঝলকানো মুখ, চোখের আর নাকের পাশ কোঁচকানো। ও বারে বারে ঢোক গিলেছে। খোলা হাত থেকে ছিপিটা নিয়ে, বোতলের মুখ বন্ধ করে, পিছনে রেখে দিলাম।

সর্দারজী গুনগুন করে নিজের ভাষায় গান করছে। বোধহয় তারও নেশা লাগছে। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, গাড়ি গান্ধীঘাট পেরিয়ে, বাঁদিকের মাঠের পাশ দিয়ে মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলেছে। ওই দূরেই কোথাও যমুনা নদী আছে। এত রাত্রে বোধহয় সেখানেও যাওয়া যায় না। কলকাতা হলে, গঙ্গার ধারে যাওয়া যেত। এখানে ওখ্‌লা আছে। এত রাত্রে বোধহয় সেখানেও এখন প্রবেশ নিষেধ। সঠিক জানি না। শুনতে পেলাম, রঞ্জিতা ইংরেজিতে যেন কবিতা আবৃত্তি করছে, যার বাঙলা অর্থ: 'প্রতি বারেই তুমি আমার ঘরে/নগ্ন, আমার শয্যায়/প্রতি রাত্রেই আমি তোমাকে খুন করি/কিন্তু সকালবেলা উঠে দেখি/তোমার কোনো চিহ্ন নেই—অথচ শয্যায় রক্তের দাগ, আমারই/তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার নগ্ন নিটোল বুক দেখি/সেখানে ক্ষতের কোনো দাগ নেই।'···শেষ করেই বলে উঠলো, 'সর্দারজী, গাড়ি ঘুমাও, জামা মসজিদ চলো।'

আমার দিকে পাশ ফিরে, একটা হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরলো। বাঙলায় বললো, 'শ্যাম তুমি রাগ করে?'

ইংরেজির 'য়ু' সম্বোধন এবার বাঙলার 'তুমি'। গাড়ির ভিতরে আবছায়ায় তাকিয়ে দেখলাম, ওর চোখ চকচক করছে, কিন্তু মাতালের মত চোখের পাতা ঠিক ভারি না। ওর মুখে এখন হাসির ঝলক নেই, কটাক্ষেও ঝিলিক নেই। আমার হাতে চাপ দিয়ে আবার বললো, 'রাগ করে?'

বললাম, 'না। কিন্তু আপনার বোধহয় শরীর খারাপ করছে।'

নিঃশব্দ হাসিতে একটু শরীর কাঁপিয়ে বললো, 'নিশ্চিন্ত থাকো, আমি পাথরে গড়া। শ্যাম, একটা কথা, আমাকে তোমার কী মনে হচ্ছে?'

'অস্থির।'

'সে কথা জিজ্ঞেস করিনি, আমি—আমি—আমাকে তোমার কী মনে হচ্ছে?'

'অশান্ত।'

ও পরিপূর্ণ চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো, বললো, 'অ্যাকোরিয়ামের পিছন থেকে বলছো?'

একটু হাসলো, আবার বললো, 'কিন্তু কেন আমি অস্থির অশান্ত, সে কথা তোমার জানতে ইচ্ছে করে?'

'সে কথা আপনি বললে জানবো।'

ও একটু চুপ করে রইলো, আমার হাতের আঙুলের মধ্যে ওর আঙুল গলালো। এ মুহূর্তে বাধা দিতেও পারছি না। বললো, 'আমি যখন এক বছর আগে রিজ্‌ভিকে বিয়ে করি, তখন দিল্লীর লোকেরা কী বলেছিল জানো? একটা চল্‌তি প্রবাদের মত কথা। দিল্লীতে হিন্দু মেয়ের মুসলমানকে বিয়ে করাটা অবশ্যি একটা অপরাধ। তোমাদের কলকাতার একটি নামী পরিবারের মেয়ে একজন মুসলমান অধ্যাপককে বিয়ে করেছে। তাতে কলেজ থেকে অধ্যাপকের চাকরি চলে যায়। কারণ সেই কলেজের পরিচালকেরা একটা কমিউনাল রাজনৈতিক দলের সমর্থক। পরে অবশ্যি, অন্য দিকের চাপে, অধ্যাপককে রিইনস্টেট করা হয়েছে। কিন্তু দুর্নাম থেকে রেহাই পায়নি। আর সেটা হল একটা নোংরা কুসংস্কারের মতো বিশ্বাস।'

রঞ্জিতা একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি বুঝতে পারছো কিছু?'

'না।'

'ওদের ধারণা, বেশি যৌনসুখের জন্যই নাকি মুসলমানকে হিন্দু মেয়েরা বিয়ে করতে চায়।'

আবার নিঃশব্দ হাসিতে ওর শরীর কেঁপে উঠলো, বললো, 'একে মূর্খামি ছাড়া কী বলা যায়? মুসলমান মেয়েরা যখন হিন্দুকে বিয়ে করে? তা হলে পশ্চিমের স্বাধীনচেতা মেয়েরা তো সবাই আরব ইরাণের ছেলেদেরই বিয়ে করতো। কারণ তো একটা ফিজিকাল অপরাশেন। অনেক সময় মুসলমান রাজা বাদশাদের হারেমের কথা বলা হয়। যেন ওদের হারেমেই শত শত মেয়ে পোষা হতো। রাজা বিম্বিসারের পুত্র রাজা অজাতশত্রু যখন বেণুবনে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে, পাঁচশো হাতীর পিঠে চেপে, কেবল পাঁচশো মহিষীই গিয়েছিলেন, তা হলে তাঁর রক্ষিতা কতো ছিলো? তিনি মুসলমান ছিলেন না।'

আবার একটু থেমে বললো, 'তোমাদের বঙ্কিম চ্যাটার্জির দুর্গেশনন্দিনীতে পড়েছি, আয়েষা—কী যেন নাম সেই হিন্দু বন্দীর, যার সম্পর্কে বলেছিল, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'

রঞ্জিতার কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু ও কেন মুসলমানকে বিয়ে করেছে, সে প্রশ্ন আমার মনে জাগেনি। নিশ্চয়ই রিজ্‌ভিকে ও প্রাণেশ্বর রূপে পেয়েছে।

যদিও এই রঞ্জিতাকে দেখে, ভাবতে দ্বিধা হয়, নিজেকে সমর্পণ করার মতো প্রাণেশ্বর ওর আছে। কথাটাই বা কেন তুললো, জানি না। নিজেই আবার বললো, 'আমাকে দেখে অবিশ্যি সকলের কুসংস্কারের বিশ্বাসটাই বড় হয়ে উঠেছে। আমার মতো মেয়ে তা ছাড়া আর কেন মুসলমানকে বিয়ে করবে। তোমার কি মনে হয় শ্যাম?'

বললাম, 'তুমি নিশ্চয়ই রিজ্‌ভিকে ভালবাসো।'

'ভালবাসা ওহ্, কী মিষ্টি কথা। ভালবাস—ভালবাসা। মনে হয়, কথাটাকে-মুখে পুরে, চুষে চুষে খাই।'

বলে কাঁচের চুড়ির ঝনাৎকারের মত শব্দ করে হেসে উঠলো। হাসিটা থামলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। আমার আঙুলগুলো নিয়ে খেললো। তারপরে গম্ভীর স্বরে বললো, 'আমি অস্থির, আমি অশান্ত, কিন্তু আমি বড় বোকা, আর তার জন্যই ভীষণ একটা অন্যায় করেছি। রিজ্‌ভিকে বিয়ে করে বসেছি। কিন্তু অন্যায়টা মুসলমান বলে নয়। রিজ্‌ভি হিন্দু হলেও, একই কথা।'

আমি রঞ্জিতার সিন্দুর চর্চিত মুখের দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকালো না। বললো, 'সেটা এখন আমি বুঝি, রিজ্‌ভিও বোঝে। কবে তালাক হবে জানি না, রিজ্‌ভি ক্রমে তিক্ত হয়ে উঠছে। কোনো বিষয়ে তর্ক হলেই ও আমাকে অপমান করে বসে। আমি যদি বলি, পাণ্ডিত্য জিনিসটা বড় হৃদয়হীন, তা হলে ও বলে, আর সাহিত্য শিল্প কাব্য বুঝি হৃদয়ের স্বৈরাচার? কী ভেবে বলে, আমি বুঝি। ও পণ্ডিত মানুষ, বন্ধুমহলে প্রিয়, আমি ওকে কোনো দিক থেকেই সুখী করতে পারিনি…।'

যেন কথাটা শেষ না করেই ও চুপ করলো। কিন্তু ও বোকা কেন, কী অন্যায় করেছে, সে কথাটা পরিষ্কার করলো না। ও তখনো সামনের দিকে তাকিয়ে। আমি ওর দিকেই দেখছি। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। ঠোঁটের কোণে হেসে বললো, 'প্রতিবাদ?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রতিবাদ?'

'হ্যাঁ। আমার সমাজ পরিবার পরিবেশ বন্ধু, সকলের সব কিছুর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। বোকা না হলে, এরকম একটা অন্যায় কেউ করতে পারে না। এখন সেটা বুঝতে পারি, যে প্রতিবাদে কারোর কিছু এসে যায়নি। শুধু একজনের ক্ষতি করেছি, আমি রিজ্‌ভির ক্ষতি করেছি।'

কনট প্লেসে অন্তর্বাস পোড়াবার কথা আমার মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলাম, 'আর নিজের?'

'আমার আবার ক্ষতি কী। আমি যা ছিলাম, তা-ই আছি।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই, গাড়ি জুমা মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভিড় একটু কম মনে হলেও, একই রকম দেখাচ্ছে চারপাশের পরিবেশ। এখনো যথেষ্ট কলরব। পানের আর এক খাবারের দোকানগুলোতে রেডিও বাজছে। টাঙ্গাওয়ালারা একদিকে অপেক্ষা করছে। রঞ্জিতা উর্দু মেশানো হিন্দীতে বললো, 'সর্দার বড়ে মিয়াঁর দোকানে চলো, ওই যে ওখানে।' একদিকে আঙুল দেখিয়ে দিল।

আমার দিকে ফিরে বললো, 'শ্যাম, আমাকে আর একটু পান করতে দেবে?'

আমি অনুনয়ের স্বরে বললাম, 'প্লিজ, নো মোর।'

ও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, কাঁধের ওপর হাতটা তুললো। গাড়িটা দাঁড়ালো একটা আলোকিত খাবারের দোকানের সামনে। ও হাতটা নামিয়ে নিল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো, কতো মিটার উঠেছে, এবং হালের বাড়তি ভাড়া যোগ করে, কত হচ্ছে। বলেই ব্যাগ থেকে পার্স বের করলো। আমি তার আগেই পকেটে হাত দিয়েছি। ও আমার হাত চেপে ধরে বললো, 'আজ তুমি না। তুমি আমার অতিথি—আমার পাপবোধ হরণকারী—তুমি আমার—।'

সর্দারজী বললো, 'বারো রুপায়া ষাট পয়সা দিজিয়ে।'

অপরূপ বিপরীত ভাষণ। আমার আপত্তি এখন টিঁকবে না জানি। রঞ্জিতা পার্স থেকে টাকা বের করে দিয়ে, পার্সটা হাতে নিয়েই নামতে উদ্যত হল। আমি রামের বোতলটা নিয়ে বললাম, 'এটা আপনার ব্যাগে রাখুন।'

ও বলে উঠলো, 'ওহ্, আসল জিনিসই ফেলে যাচ্ছিলাম।' বোতলটা ব্যাগে পুরে, ব্যাগ নিয়ে নামলো। আমি ওর পিছনে নেমে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ও চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন একটু টলে গেল। হাত বাড়িয়ে আমার পাঞ্জাবীর হাতা চেপে ধরলো, বললো, 'দুঃখিত, হোঁচট খেয়েছি।'

সত্যি কি হোঁচট। রাস্তা উঁচু নিচু বা পাথর তো দেখছি না। যা-ই বলুক একটু কি বেশি হয়ে যায় নি। দ্রব্যগুণ বলে তো একটা কথা আছে। বড়ে মিয়াঁর দোকানের ভিতর থেকে একজন পায়জামা পাঞ্জাবী পরা প্রায় বুড়ো মানুষ অনেকটা দৌড়েই এল। আমাদের দুজনকেই সেলাম জানিয়ে বললো, 'ফরমাইয়ে বিবিসাহেবা, ক্যা চাহিয়ে।'

রঞ্জিতা আমার জামার হাতা ছেড়ে দিয়ে, বললো, 'কাবাব দিজিয়ে বড়ে মিয়াঁ, বড়ে কাবাব দো আদমিকে লিয়ে।'

বড়ে মিয়াঁ জিজ্ঞেস করলো, 'রোটি?'

'নহি। কাবাব জায়দা দিজিয়ে।'

বড়ে মিয়াঁ ছুটলো। রঞ্জিতা এখানে বিলক্ষণ পরিচিতা মনে হচ্ছে। দোকানের ভিতর থেকে, অনেকেই ওকে তাকিয়ে দেখছে। একটু পরেই, বড়ে মিয়াঁ একটি পাতায় মোড়ক নিয়ে এল। নাকে কাবাবের গন্ধ পেলাম। রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করে দাম দিল পাঁচ টাকা। পার্স'টা ব্যাগে পুরে, কাবাবের মোড়ক নিল। এক হাতে ব্যাগ, আর এক হাতে কাবাব। বললাম, 'আমার হাতে কিছু দিন।'

বললো, 'কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তুমি এসো।'

কোথায় যাবো, কিছু বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাবো না। ও আমার গায়ের কাছ ঘেঁষে চলেছে। আমি একেবারে ভুল দেখিনি, ওর পা ঈষৎ অ-স্থির। ও জুমা মসজিদের সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। আশেপাশে কিছু লোক আমাদের দেখছে। সিঁড়ির ধাপে, দু'দিকের ধার ঘেঁষে, অনেকে শুয়ে আছে। ছেঁড়া জামাকাপড় তাদের গায়ে। রঞ্জিতা আমাকে ডাকলো, 'শ্যাম, এসো বসি।'

ও কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে, ধুলোর ওপরেই বসলো। ঐতিহাসিক জুমা মসজিদের প্রাচীন ধুলিমলিন সিঁড়ি। আশেপাশে ভিখিরির অবস্থান। সেখানে দিল্লীর এক আধুনিকা যুবতী, এখন সিঁথেয় কপালে সিন্দুর, সেই মসজিদের সিঁড়িতে কাবাব খেতে বসেছে। রাত্রি কতো? হাত উল্টে দেখি, এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। আবার আমার সেই অন্তর্বাস পোড়াবার কথা মনে পড়লো। প্রতিবাদ—প্রতিবাদ কিন্তু ও এভাবে বসলে, আমাকেও বসতে হয়। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। ও ব্যাগটা নামিয়ে রেখে, আমার আরো কাছে এসে বসলো। পাতার মোড়ক খুলতে খুলতে বললো, 'তোমার খারাপ লাগছে না তো?'

বললাম, 'দিল্লীতে এ সবই আমার অজানা।'

ও আমার হাতে কাবাব তুলে দিয়ে বললো, 'আমার সবই জানা।' বলে ও কাবাবে কামড় বসালো।

দুটো কুকুর কোথা থেকে সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়ালো। সিঁড়ির এখানে ওখানে ছায়ার মতো কয়েকজন উঠে বসে আমাদের দেখতে লাগলো। দেখছে সিঁড়ির নিচে থেকেও অনেকে। একটু দূরে কয়েকজন তা দাঁড়িয়েই দেখছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছে। কাবাব মুখে দিচ্ছি, খেতে পারছি না। কিন্তু এ ব্যাপারে রঞ্জিতা নির্বিকার। তারপরেই দেখি জুতো মসমসিয়ে একজন সেপাই, সিঁড়ির নিচে, আমাদের সামনেই এসে দাঁড়ালো। শুনেছি, দিল্লীর পুলিস

সাক্ষাৎ যম। আমি অপমানের ভয় পেলাম। রঞ্জিতা সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'ক্যা সিপাইজী, ক্যা দেখতে হেঁ?'

সেপাই বললো, 'আপহি কো। খানা খানেকা বহোত বঢ়িয়া জাহ্‌গা আপকে মিলি।'

রঞ্জিতা ঘাড় দুলিয়ে, হেসে বললো, 'হ্যাঁ ভাইসাব, জাহ্‌গা তো বহোত আচ্ছা না?'

সিপাই বললো, 'হাঁ, মগর আপকি লিয়ে নহি।'

'কেঁও ভাই, এ জাহ্‌গা সবকে লিয়ে ঠিক হ্যায়।'

সিপাই একবার আমার দিকে তাকালো। রঞ্জিতার দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'তো ঠিক হ্যায়, খানা খাইয়ে।'

সে চলে গেল। কিন্তু সেপাইকে কথা বলতে দেখে, কয়েকজন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা আর নড়ে না। কুকুর দুইয়ের বদলে চার। শুধু ল্যাজ নাড়ছে না, নিজেদের মধ্যে একটু গোঙানিও হচ্ছে। সিঁড়ির আশে পাশের মানুষেরা যেন একটু কাছে এগিয়ে এসেছে। সব মিলিয়ে দেখে, আমার হাত আর মুখ অনড়। রঞ্জিতা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হল শ্যাম?'

আমি দ্বিধা না করেই বললাম, 'রঞ্জিতা, আমি এখানে এভাবে খেতে পারবো না।'

রঞ্জিতা চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললো, 'চলো উঠি।'

এবার আমি ওর ব্যাগটা নিলাম। কিন্তু এখানেই বা কোথায় যাবো, কোথায় বসে খাবো। রঞ্জিতা একটা টাঙ্গার সামনে এসে দাঁড়ালো। টাঙ্গাওয়ালা ডাকলো 'আইয়ে।'

রঞ্জিতা পুরনো দিল্লীর একটা জায়গার নাম করলো। তারপরে টাঙ্গায় উঠতে গিয়ে টলে গেল। পড়ে যাচ্ছিল। তার আগেই ওকে আমি ধরে ফেললাম। ও একটু লজ্জিত হেসে বললো, 'দুঃখিত শ্যাম, নীট পানটা একটু বেশি হয়েছে বোধহয়।'

বোধহয় না, নিশ্চিত। আমি ওকে টাঙ্গায় উঠতে সাহায্য করলাম। তারপরে নিজে উঠলাম। ব্যাগটা রাখলাম সীটের ওপরেই। টাঙ্গা চলতে আরম্ভ করলো। রঞ্জিতা একটা কাবাব আমার মুখের সামনে তুলে ধরলো। খোলা টাঙ্গা এখনো আমাদের অনেকেই দেখছে। আমি হাত দিয়ে নিতে গেলাম। ও বললো, 'না, আমার হাত থেকে একটু খাও।'

আমি ওর চোখের দিকে দেখলাম। এখন ওর চোখে অলস মুগ্ধ কটাক্ষ।

ঠোঁটের হাসি জলন্ত অঙ্গারের মতো। নারীর এই রূপ—কী বলবো, একদিক থেকে ভয়ংকরী। ও আমার ঠোঁটে কাবাব ছোঁয়ালো। আমাকে মুখ খুলে নিতেই হল, তারপরে হাতে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

রঞ্জিতা খেতে খেতেই বললো, 'একটা বাড়িতে।'

বললাম, 'বারোটা বাজতে বেশি দেরি নেই।'

রঞ্জিতা অলস ভাবে ঘাড় কাত করে বললো, 'আমার বেজে গিয়েছে।'

টাঙ্গার দোলায় ওর গোলাপী আঁচল খসে গিয়েছে। গোলাপী জামার থেকে ওর গায়ের রঙ উজ্জ্বল। শাড়ির লাল পাড় রক্তের দাগের মতো এঁকে-বেঁকে, কোলের কাছে, টাঙ্গার সীটে পড়ে আছে। ও কি খাচ্ছে? যেন অন্যমনে চিবিয়ে চলেছে। আর আমার চোখের দিকে চেয়ে হাসছে। কিন্তু এই গরম বড় কাবাবের স্বাদ আমার বেশ ভালোই লাগছে। আমরা এখন যে রাস্তা দিয়ে চলেছি, জুমা মসজিদ অঞ্চলের মতো ভিড় ভারাক্রান্ত না। লোকজন বেশ কম। নতুন দিল্লীর মতো আলোকিত রাস্তা না। ছোট রাস্তা, ঘিঞ্জি বাড়ি।

রঞ্জিতা কনুই দিয়ে, আমার কাঁধ স্পর্শ করে বললো, 'শ্যাম তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি?'

অন্তত স্বস্তি পাচ্ছি না। বললাম, 'না।'

'এটাও সত্যি কথা তো?'

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। ও বললো, 'এটা নিয়তি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমাকে একটু কষ্ট দেব। চিরদিন তো দেব না।'

চোখ বুজে হাসলো। আবার বললো, 'শ্যাম তোমার মাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করে। বেঁচে আছেন?'

অবাক হয়ে বললাম, 'আছেন, কেন?'

রঞ্জিতা প্রায় চুপি চুপি বললো, 'তোমার মা বলে।'

ওর ঘাড় আর মাথা দুলে উঠলো, ঝুঁকে পড়লো। ধরবো কী না ভাবছি। ঈশ্বর আমার দৃষ্টিকে মানুষের সকল মোহমুগ্ধতা দিয়ে তৈরি করেছেন। আমি ওর দিকে যেন তাকাতে পারছি না।

তবু ওকে কাঁধে হাত দিয়ে টেনে, সোজা করে বসিয়েছিলাম। ও আমার গায়ের কাছে হেলে পড়লো। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে, এক জায়গায় টাঙ্গা দাঁড়

কয়াতে বললো। টাঙ্গাতে বসেই ব্যাগ খুলে, একটা রুমাল বের করে, আমাকে হাত মুছে নিতে বললো। বললাম, 'আমার রুমাল আছে।'

'কিন্তু আমার রুমালটাই তোমাকে মুছতে দিয়েছি।' বলে ও টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিল। নিজে হাত মুছলো। পাতাগুলো ফেলে দিল রাস্তায়। টাঙ্গাওয়ালা রঞ্জিতাকে প্রায় হাঁ করে দেখছে। রঞ্জিতা বুকের কাছে আঁচলটা ধরে, ব্যাগ নিয়ে নামতে উদ্যত হল। আমি প্রস্তুত থাকলাম, পড়ে গেলে যেন ধরতে পারি। কিন্তু সাবধানেই নামলো। আমি নামতে, কয়েক পা এগিয়ে, আর একটা আরো ছোট রাস্তায় ঢুকলো। খানিকটা গিয়ে, বারান্দায় উঠে, একটি বাড়ির দরজায় করাঘাত করলো। কার বাড়ি কে থাকে, কিছুই জানি না। সঙ্গে এই নারী, আমি এক অপরিচিত বাঙালী।

দরজা খুলে গেল। সামনেই এক যুবক, মেদবর্জিত দীর্ঘ ফর্সা চেহারা। পায়জামা আর গেঞ্জি পরণে। তীক্ষ্ণ নাসা, ঈষৎ পিঙ্গল নাতিদীর্ঘ চোখ। রঞ্জিতাকে দেখেই দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিল। হেসে বললো, 'ওহ্ রঞ্জিতা?'

রঞ্জিতা হেসেই বললো, 'অসুবিধা করলাম?'

হিন্দীতেই যুবক জবাব দিল, 'ছেলেমানুষি করো না, এসো।'

আমার দিকে একবার দেখলো। রঞ্জিতা আমার হাত ধরে, ঘরের মধ্যে ঢুকলো। জিজ্ঞেস করলো, 'গৃহকর্ত্রী কোথায়?'

যুবক জবাব দিল, 'মা নিজের ঘরেই আছে।'

'সেখানে কেউ আছে?'

'মিঃ গওড় আছে।'

'উনকি বিজনেস পার্টনার? এত রাত্রেও! আজ থেকে যাবেন বুঝি?'

'না না, এখুনি চলে যাবেন?'

'তোমার বিবি?'

'খাচ্ছে।'

'আর ললিতা? ও নিশ্চয় কোথাও কোনো পার্টিতে গেছে?'

যুবক কোনো জবাব দিল না, হাসলো। রঞ্জিতাও একটু হাসলো। তারপরে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'জয়শংকর বোধহয় ঘুমোচ্ছে?'

যুবক বললো, 'হাঁ।'

এ সময়েই এক সুটেড বুটেড মাঝবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন মহিলাও এ-ঘরে এলেন। মহিলার কপালের সামনেই, কানের রগের কাছে চুল কিছু সাদা হয়েছে। কিন্তু তার উজ্জ্বল বর্ণ এবং স্বাস্থ্য দেখে, মনে হয় যুবতী।

মাথায় বড় খোঁপা বেঁধেছেন। চোখে ঠোঁটে রঙ। তিনি বলে উঠলেন, 'আহ্ হা বিবিজী যে? এত রাত্রে কোথা থেকে?'

দেখছি, রঞ্জিতার ঠোঁট যেন বিদ্রূপে বেঁকে উঠেছে। বললো, 'আমার মেহ্মানকে নিয়ে একটু জল পান করতে এলাম। আমরা তৃষ্ণার্ত।'

ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্লেন জলের তৃষ্ণা?'

রঞ্জিতা ভুরু কাঁপিয়ে বললো, 'পুরোপুরি নয়।'

ভদ্রলোক যেন বিব্রত, এবং খানিকটা অস্বস্তিতে বললো, 'আমি আর দেরি করবো না, চলি।'

বলে বিদায় নিলেন। যুবক দরজা বন্ধ করে দিল। মহিলা বললেন রঞ্জিতাকে, 'বসো।' আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনি কে?'

রঞ্জিতা বললো, 'বললাম তো, আমার মেহ্মান।'

আমার দিকে ফিরে, ইংরেজিতে বললো, 'শ্যাম, এই আমার মা। ইনি চেয়েছিলেন, আমি হব দিল্লীর সেরা কল্ গার্ল। যতো দেশী আর বিদেশী রাজপুরুষদের মনোরঞ্জন করবো।'

মহিলা হেসেই বলে উঠলেন, 'কী হচ্ছে রঞ্জিতা, বাজে কথা বলো না।'

রঞ্জিতা সে কথায় কান না দিয়ে বললো, 'আমার ছোট বোন ললিতা এখন প্রায় তা-ই।' ওর মায়ের মুখের হাসিটা বোধহয়, সবটা হাসি না। আবার বলে উঠলেন, 'যা তা বকছো। বোধহয় অনেক টেনে এসেছ?'

রঞ্জিতা ঘাড় নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'তুমিও কিছু কম গিয়েছ বলে তো মনে হচ্ছে না।'

মা মেয়ের এরকম কথা শুনতে অভ্যস্ত নই। সংকোচ এবং লজ্জা দুই-ই লাগছে। ওর মা আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'বসুন।'

দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা বেতের চেয়ার ছিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম। বললাম, 'আপনি বসুন।'

এ সময়েই ভৃত্য শ্রেণীর একটি ছেলে, ট্রেতে করে দু'গেলাস জল নিয়ে এল। রঞ্জিতা জিজ্ঞেস করলো, 'কে জল দিতে বললো রে, বড়া 'ভাইয়া?'

ছেলেটি হেসে ঘাড় নাড়লো। একটা গেলাস তুলে রঞ্জিতা আমাকে দিল। তারপর ব্যাগে হাত দিয়ে, দ্রুত রামের বোতল বের করে, আর একটা গেলাসের জলে ঢাললো। আমি গেলাসে মুখ লাগিয়ে, ওর দিকে তাকালাম। ও চোখের তারা কাঁপিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'লিটল মোর।'

বলে এক চুমুকেই গেলাস শূন্য করলো। নামিয়ে দিল ট্রে-তে। আমিও আমার গেলাস দিয়ে দিলাম।

রঞ্জিতার মা, রঞ্জিতার একটি হাত ধরে বললেন, 'তোমার মেহ্‌মানকে দিলে না?'

'না।' রঞ্জিতা আমার দিকে তাকালো। ওর মা বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো। তোমার মেহ্‌মানকেও বসতে বলো। ওঁর কোনো পরিচয় তো দিলে না।'

রঞ্জিতা বললো, 'ওঁর পরিচয় থাক, কেন না, কী বলে ওঁর পরিচয় দেব সে কথা আমি ঠিক জানি না।'

রঞ্জিতা আমার দিকে চেয়ে হাসলো, তারপরেই ওর ঘাড় নুয়ে পড়লো। চুল এলিয়ে পড়লো, আঁচল খসে গেল। ওর মা ওকে ধরে, চেয়ারের কাছে টেনে নিয়ে গেলেন। রঞ্জিতা মায়ের হাত ছাড়িয়ে, আমার দিকে চেয়ে ডাকলো, 'শ্যাম, পাঁচ মিনিট বসো।'

তা বসবো, কিন্তু রঞ্জিতার মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। ওকে আর সুস্থ দেখাচ্ছে না। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। ও পাশের চেয়ারে বসলো। লুটানো আঁচল তুলে নিল না। ব্যাগটা রেখে দিল মেঝেয়। আমার দিকে কাত হয়ে পড়ে বললো, 'শ্যাম, তবু একটা কথা আছে। বেঁচে থাকাটা যদি খুবই প্রয়োজনীয় হয়, তবে বলবো, আমার এই বিধবা মা, আমাদের ছেলেবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এমনকি লেখাপড়াও শিখিয়েছিল, কিন্তু—কিন্তু—।'

কথা বন্ধ হয়ে গেল। ও মাথা নিচু করে নিল। প্রায় আমার বুকের কাছে ওর মাথা নুয়ে এল। আমি ওর মায়ের দিকে তাকালাম। ওর মায়ের মুখে হাসি, একটু করুণ। একবার আস্তে মাথা নাড়লেন, রঞ্জিতার দিকে ফিরে ডাকলেন, 'রঞ্জিতা।'

রঞ্জিতা স্খলিত ভাঙা গলায় বলে উঠলো, 'উচিত হয় নি মা, আমাকে বাঁচিয়ে রাখা তোমার উচিত হয়নি।'

বলতে বলতেই ওর শরীর কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে উঠলো। শক্ত মুষ্টিতে, আমার একটা হাত চেপে ধরলো। কী করা উচিত, বুঝতে পারছি না। তবু আমি একটা হাত আস্তে আস্তে ওর মাথায় রাখলাম। মনে হয়, এ কান্নার মধ্যে, ব্যথা এবং পানীয়ের ক্রিয়া, দুই-ই আছে। লীলাকেও কাঁদতে দেখেছি, কয়েক ঘণ্টা আগে। ওর মা পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ওরকম করো না, একটু

শান্ত হও।' কিন্তু রঞ্জিতা সহজে শান্ত হতে পারলো না। অনেকক্ষণ পরে, আস্তে আস্তে ওর শরীর চেয়ারের হাতলে এলিয়ে পড়লো। ওকে নিস্তেজ দেখালো। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাড়ে বারোটা। ওর মায়ের দিকে ফিরে বললাম, 'ও আজ আপনার এখানেই থাক। আমাকে হোটেলে ফিরে যেতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিতা খাড়া হয়ে বসবার চেষ্টা করলো। আমার বুকের জামা ধরে, মাথা নেড়ে বললো, 'না না শ্যাম, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

ওর কথা ধীর, স্বরে যেন নিঃশ্বাসের কষ্ট। চোখ টকটকে লাল, ভেজা। কপালের সিঁদুরের ফোঁটা গিয়েছে বেঁকে। বললাম, 'রঞ্জিতা এ অবস্থায় তুমি যেও না। রাত্রে এখানে ঘুমোও, কাল সকালে যেও।'

'আমাকে তুমি বইতে পারবে না?'

'এটা বহন করার কথা নয়, তোমার শরীরের কথা।'

ও ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকালো। ভালো করে দেখতে চাইলো আমার চোখের দিকে। বললো, 'রাগ করছো না, আমাকে ঘৃণা করছো না?'

বললাম, 'কোনো কারণ নেই তার।,

'আবার কাল দেখা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছো?'

এই মুহূর্তে এখন সত্যি বলছি কি মিথ্যা বলছি জানি না। বললাম, 'হ্যাঁ, দিয়ে যাচ্ছি।'

ও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। আমি বারণ করলাম, ওকে বসিয়ে দিলাম। ওর মা তাড়াতাড়ি চাকরকে ডেকে ট্যাকসি ডাকতে বললেন। এখানে বোধহয় টেলিফোন করে ডাকার সুবিধা নেই। আমি বললাম, 'কোনো দরকার নেই, আমি দেখে নেব।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোতে গেলাম। রঞ্জিতা হাত চেপে ধরে বললো, 'শ্যাম অপরাধ নিও না, কথা রেখো।'

বললাম, 'ঠিক আছে।'

ওর মা দরজা খুলে দিলেন, বললেন, 'তবু চাকর আপনার সঙ্গে যাক, ও আপনাকে ট্যাকসি ধরিয়ে দিয়ে আসবে।'

অগত্যা। রঞ্জিতা আস্তে আস্তে আমার হাত ছেড়ে দিল। তাকিয়ে রইলো। আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম। চাকর সঙ্গে এল। সুবিধাই হল। এত রাত্রে, একটা অন্ধকার গলির মুখে, প্রায় লুকিয়ে থাকা একটা ট্যাকসি ও আবিষ্কার করে, আমাকে তুলে দিল। ওর হাতে একটা টাকা দিয়ে বিদায়

করলাম। তারপরে……তারপরে চলো এবার নির্বাসিত। সুবন্ধু তুমি আমাকে কোন লগ্নে দেখতে পেয়েছিল।……

রঞ্জিতাকে মিথ্যা বলেছিলাম কিংবা সত্যি বলেছিলাম, এখন আর জানি না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়া যায়নি। সুবন্ধুকে সমস্ত কথাই বলেছি। ওর কথা, আপনার নির্বাসনের চেয়ে, কারোকে যদি একটু শাস্তি দিতে পারেন, তা-ই দিন না।'

ওর চোখে হাসির ঝলক ছিল, মুখের হাসিতে বিষণ্ণতাও ছিল। দিন দশেকের মধ্যে রঞ্জিতা প্রতিদিনই এসেছে। কয়েকবার সঙ্গে করে লীলা ভোরা আর অম্বিকা শ্রেষ্ঠা নামে ওর এক নেপালী বান্ধবীকেও নিয়ে এসেছে। লীলা বা অম্বিকা ওরা কেউ বিবাহিতা না। রঞ্জিতা বিবাহিতা, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি। রঞ্জিতাকে ছাড়া ওরা চলতে পারে না। অম্বিকাকে আমি কখনো কাঁদতে দেখিনি। যদিও সুরা পানে ওরা তিন বন্ধুই সমান। বরং লীলা একটু কম। খুব বেশি সহ্য করতে পারে না। একটা সময় আসে, ও যখন কেবল উর্দু গজল গায়। সব গানই দুঃখ শোক আর বিরহের। রঞ্জিতা আমাকে সেই সব গানের মানে বলে দেয়। উর্দু ভাষা মনে করে রাখি, তেমন স্মৃতিশক্তি আমার নেই। মানে শুনে বুঝতে পারি, সে সব গানের ভাষা যেমন সুন্দর, তেমনি গভীর অর্থব্যঞ্জক। সেই গান শুনতে শুনতে, রঞ্জিতা উচ্ছ্বাসে আবেগে অনেক সময় লীলার গালে চুমোও খেয়েছে।

একটা হোটেলের নাম আমি করতে চাই না। কেন না, সেখানে সবাইকে মদ্য পরিবেশন করা হয় না, কিন্তু এস্‌প্রেস্সো বার-এ, রঞ্জিতার তুক-এ পানীয় পরিবেশিত হয়েছিল। বিদেশীরা অবিশ্যি তাদের নথিপত্রের জোরে সেখানে পান করছিল। লীলা গলা খুলে অনায়াসে সেখানে গজল গেয়ে উঠেছিল। প্রথমে রঞ্জিতাই, তালে তালে হাততালি দিয়েছিল। তারপরে, গোরা গোরী যুবক যুবতীরা সবাই মিলে তালে তালে হাততালি দিতে আরম্ভ করেছিল। সে দৃশ্য একদিক থেকে যেমন কৌতুককর, অন্য দিকে তেমনি একটা পাগলাগারদ বলে মনে হচ্ছিল। স্বভাবতঃই হোটেলের কর্তৃপক্ষের লোককে ছুটে আসতে হয়েছিল। সে বেচারি খানিকক্ষণ সকলের পাগলামি দেখে, কীভাবে থামাবে, বুঝতে পারছিল না। তারপরে আস্তে আস্তে লীলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিচু হয়ে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, 'ম্যাডাম, অনুগ্রহ করে, থামুন, হয়তো কেউ কেউ বিরক্ত হচ্ছেন।'

লীলা গান থামিয়ে আরক্ত ভেজা চোখ মেলে বলেছিল, 'তাই নাকি? তাহলে আর গাইবো না।'

কিন্তু বিদেশী যুবক যুবতীরা আরো জোরে হাততালি দিয়ে, লীলাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছিল। কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি কর্মচারী সবাইকে অনুনয় করে বলেছিল, 'আপনারা অন্যদের কথা ভাবুন, এ ঘরের মর্যাদা রক্ষা করুন।'

তারপরে আস্তে আস্তে সবাই থেমেছিল। না থামা পর্যন্ত আমি মনে মনে প্রমাদ গণছিলাম। আমি পাগল হতে পারিনি। ভয়টা বেশি, দ্রব্যগুণ কম ছিল। তারপরেও তিনটি টলায়মান যুবতীকে নিয়ে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়, লবির সমস্ত মহিলা পুরুষ যেন একটা অভিনব মিছিল দেখেছিল। তখন যতো লজ্জা এই পুরুষের, সঙ্গিনীদের কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

রঞ্জিতার মুখে আরো শুনেছি, স্বয়ং অধ্যাপক রিজ্‌ভি লীলা ভোরার উর্দু গজল শুনতে ভালোবাসেন।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম। লীলাকে প্রায়ই কাঁদতে দেখেছি। রঞ্জিতার মুখেই শুনেছি, লীলা এক ব্যর্থ প্রেমিকা। একদা যে পুরুষ ওকে এই দিল্লীর পথে পথে বুকে করে নিয়ে ঘুরেছে, সেই পুরুষই এখন আর একজনকে নিয়ে তেমনি করেই ঘুরে বেড়ায়। আর তা লীলা ভোরার চোখের সামনে দিয়েই। বলা যায়, দিল্লীর রাজপথ দিয়ে না, লীলার বুক খুঁড়ে। লীলার অপরাধ?

রঞ্জিতা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, ঘাড় কাত করে বলেছিল, 'এ কথা জিজ্ঞেস করছে কালকূট? কে কার বুক থেকে কার বুকে চলে যায়, তার কার্য কারণ কি অপরাধ? কোনো অপরাধের নিরীখে কি তার বিচার করা যায়?'

আমাকে ঘুরিয়ে বলতে হয়েছিল, 'তবু দুঃখটাকে তো ভোলা যায় না।'

রঞ্জিতা বলেছিল, 'কালকূট কি জানে না, দুঃখ অমর?'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কিন্তু লীলা?'

রঞ্জিতা জবাব দিয়েছিল, 'প্রতি রাত্রের কান্না, প্রতি রাত্রের মুক্তি। এ কান্না কোনোদিন শেষ হবে না, হয় না।'

রঞ্জিতার কথা থেকে লীলাকে এইটুকু বুঝেছি। আর বুঝেছি, জীবনের হাসি মুখে, কোথায় যে সেই রেখাটি লুকিয়ে আছে, যখন সে হঠাৎ নিষ্ঠুরের মতো বক্র হয়ে, বজ্রে বাজে। দেখা যায় না, জানা যায় না।

অম্বিকাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি, কিন্তু হিমালয় কন্যাটিকে ফুঁসতে

দেখেছি। রঞ্জিতার মধ্যেও আর্দ্রতা দেখেছি। অম্বিকার মধ্যে তাও নেই। সে যেন মেয়ে দুর্বাসা। রাগে তো বটেই, হাসিতেও। ওর এক কথা, 'পুরুষদের চিনি।'

যথা? অম্বিকা শরীর কাঁপানো বাঁকানো বিদেশী নাচের ছন্দ তুলে বলে, 'লে লে বাবু দো আনা। পুরুষরা তো আমাদের শুধু এভাবে বিক্রি করতেই চেয়েছে!'

রঞ্জিতার মুখে শুনেছি, অম্বিকার জীবনটা দুর্ভাগ্যের। ও কারোকে কখনো ভালোবাসেনি, কিন্তু ওদের গোটা পরিবারটা নিয়ে অভিজাত বংশের লোকেরা ছিনিমিনি খেলেছে। অম্বিকার মা, মাসী এবং বোনেরা, কেউ কখনো সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ পায়নি। অম্বিকা নেপালে ছেলেবেলা থেকেই এসব দেখেছে, নিজেও বড় হয়েছে সেই পরিবেশের মধ্যে। দিল্লীতে এসে অম্বিকা অন্য স্রোতে বহেনি, নিজের স্রোতেই ভেসেছে।

ভাবি, এ বিদ্রোহে ক্ষতি কার?

আমার ধারণা ওরা জানে, ক্ষতি কার। কারণ ওরা জানে, জীবন অর্থহীন। ওদের তিনজনের মধ্যে, ছাঁচে মেলানো মিল না থাকলেও, কোথাও একটা মিল আছে। প্রতিবাদ ওদের শরীর মনকে আঁকড়ে আছে। কেবল রঞ্জিতার মুখেই শুনেছি, ও ভুল প্রতিবাদ করেছে। তথাপি, অন্তর্বাস পোড়ানোর কথাটা ভোলা যায় না।

একদিন ওরা তিনজনেই ছিল, সেদিন হৃদয়নাথ এসে পড়েছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পালিয়েছিলেন। লীলা ভোরা ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মিঃ অধিকারী, আমাদের সকলেরই মরে যাওয়া উচিত কী না।'

হৃদয়নাথ হেসে বলেছিলেন, 'আমরা সকলেই একদিন মরবো।'

প্রশ্ন, 'তাহলে জন্মাবার দরকার কী ছিল?'

জবাব, 'মরবার জন্যই।'

প্রশ্ন, 'তবে এ বেঁচে থাকার মূল্য কী?' হেসে জবাব, 'তোমার মতো বাচাল প্রফেসর মেয়ে তা কোনোদিনই বুঝবে না।' বলেই উঠে পড়েছিলেন, আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। লীলা আর অম্বিকা খুব হেসেছিল। আমি হাসতে পারিনি। রঞ্জিতা বন্ধুদের বলেছিল, 'তোমরা জানো না, মিঃ অধিকারী আমার ওপরেই বেশি রেগে গেলেন। ভাববেন ওঁকে ভাগাবার জন্যই এসব কথা বলা হল।'

রঞ্জিতার সাথীদের সে রকম দুষ্ট চিন্তা ছিল কী না আমি ঠিক জানি না।

হেনা ওর মায়ের অসুখের জন্য তিন চার দিন আসতে পারেনি। টেলিফোন করেছে, তারপরে আবার রোজই আসছে। সৌভাগ্য, ওর সঙ্গে একদিনও রঞ্জিতার দেখা হয়নি। অথচ কোনো লুকোচুরি নাটকীয় খেলার কথা ভাবিনি। তার জন্য একদিকে আমার বিব্রত লজ্জা, আর একদিকে আমার স্বেচ্ছা নির্বাসন গিয়েছে রসাতলে। আমার ঘরে রঞ্জিতা হেনার দেখা হয়ে যাওয়াটা এখন আমার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়েছে। যদিও এই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার দায় আমার থাকবার কথা না। এর মূলে রয়েছে হেনার বিরাগ বিদ্বেষ, তারো বেশি কিছু, ঘৃণা। কিন্তু রঞ্জিতার মুখে হেনার কথা কখনো শুনিনি। তবে ওদের মধ্যে পরিচয় আছে, সেটা জানি। হেনার দিক থেকে সে পরিচয় তিক্ত।

তথাপি একটি কথা আমার মনে হয়েছে। ওদের দু'জনের মধ্যে কোথায় একটা মিল আছে। বিদ্রোহ ওদের দু'জনের মধ্যেই আছে। যদিও চরিত্রের দিক থেকে, হেনা অন্তর্মুখী, রঞ্জিতা বহুর্মুখী। সেটা হয়তো ওদের জীবন ধারণের পার্থক্য, পরিবেশের বিভিন্নতা, সমাজ ও পারিবারিক ছকের তফাত। সম্ভবতঃ বাঙলা আর সিন্ধুর চেহারায় অমিলটাও আছে।

সেটাকে কেমন করে বুঝিয়ে বলা যায়? রঞ্জিতা অন্তর্বাস পোড়ায় দিবালোকে রাজপথে দাঁড়িয়ে। হেনা পোড়ায় মনে মনে। কিন্তু মনের ইচ্ছাকে ও রাজপথে সকলের চোখের সামনে টেনে নিয়ে যেতে চায় না। ও জীবনকে অর্থহীন মনে করে না, কিন্তু নতুন মূল্যবোধের মাপকাঠিতে যাচাই করতে চায়।

মতিমহলে খেতে গিয়ে, আমার কাছে ওর যে সব প্রশ্নের উল্লেখ করেছিল, পরে একদিন, সেইসব প্রশ্নেরই জবাব আমি দিয়েছি। কেবল একটি অনুরোধ করেছি, ও যেন পত্রিকায় ছাপবার সাক্ষাৎকার হিসাবে আমার জবাবগুলো না নেয়। হেনা আমার কাছে কী চেয়েছে জানি না। একটা দিন ভোর থেকে সন্ধ্যে অবধি ওর সঙ্গে আমি ঘুরেছি। সেই ঘোরাটা অন্য কিছুতে না, টাঙ্গায় করে। টাঙ্গায় করে ওর সঙ্গে ঘুরেছি হাউজ খাশ্-এর ভাঙাচোরা মুঘল ইমারতের ছায়ায় ছায়ায়, প্রান্তরে দূরে গাছতলায়। সেখান থেকে কুতব মিনার। কুতব মিনার থেকে ওর যাবার ইচ্ছা ছিল তুঘলকাবাদ। টাঙ্গায় এতদূর যাওয়া সম্ভব হয়নি, বিশেষ করে এক দিনের মধ্যে।

অস্বীকার করবো না, সেই টাঙ্গা ভ্রমণ আমার ভালো লেগেছিল। মাঝে

মাঝেই টাঙ্গা থেকে আমাদের নামতে হয়েছে কোনো ভাঙা ইমারতের ছায়ায়, মাঠের ধারে গাছতলায়। ঘোড়ার বিশ্রাম এবং খাবার জন্য। আমরা খেয়েছি পথে পথে, যখন যা পেয়েছি। গোটা একটা দিনের মধ্যে, হেনার অনেক জিজ্ঞাসা ছিল। সব জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে, আমি সংকোচে থমকে গিয়েছি। হেনার শ্যামলী মুখে লজ্জার ছটা লেগে গিয়েছে। তবু ওর লজ্জা চলকানো চোখ থেকে প্রশ্ন অপসারিত হয়নি। যতগুলো চিঠি ও আমাকে লিখেছিল, অথচ জবাব পায়নি, তার আদ্যন্ত বিবরণ আমি শুনেছি।

চলতে চলতে, কথা বলতে বলতে, হেনাকে কখনো দেখেছি লজ্জা বিধুর ব্রীড়াময়ী। কখনো বা ওর চোখে একটি আবেগের ঘোর, হঠাৎ নির্বাক এবং স্থান কাল পাত্র ভুলে যাওয়া আচ্ছন্নতা। কখনো হয়তো হঠাৎ বলে উঠেছে, আমারই কোনো উপন্যাসের নায়িকার নাম নিয়ে, 'সেই মেয়েটিকে আমি হিংসা করি।'

আমি অবাক হয়ে বলেছি, 'তুমি যার কথা বলছো, শেষ পর্যন্ত সে তো এক দুর্ভাগ্যবতী।'

হেনা বলেছে, 'তবু সে দুর্ভাগ্যের যাতনার ভিতর দিয়ে, জীবনকে অনুভব করেছিল।'

'তুমিও কি জীবনকে অনুভব করছো না।'

'এ অনুভূতি অসার। কিছু না পাওয়া শূন্যতা।'

'কবিতা তোমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করছে।'

হেনা প্রতিবাদে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, 'না না, নিজেকে পূর্ণ করে তুলি, সেরকম কবিতা আমি লিখতে পারি না। তা ছাড়া—।'

একটু থেমে, আবেগ ঘন স্বরে, মাথা নেড়ে বলেছে, 'কবিতা লিখে আমি পূর্ণ হতে চাই না। আমি মানুষ হিসাবে পূর্ণ হাত চাই—আমি একটি মেয়ে, হেনা। হেনা হিসাবে পূর্ণ হতে চাই, আমার মতো করে।'

সারাদিনে হেনা অনেক কথা বলেছে। অনেক জবাব নিয়েছে। বেলা শেষে আমরা যখন কুতব থেকে ফিরেছি, তখন হরিয়ানার তপ্ত বাতাস দিল্লীতে উড়ে এসে একটু ঠাণ্ডা। আকাশে অস্ত ছটা। হেনার ঘাম শুকনো মুখে ধুলোর স্তর। তথাপি সেই মুহূর্তেই ওকে দেখাচ্ছিল অপরূপ। বারে বারে আমার দিকে দেখছিল, যেন লজ্জায় কিছু বলতে পারছিল না, চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল। তারপরে বলেছিল, 'আপনার চলে যাবার আগে, একটা কথা বলবো।'

বলেছি, 'এখনই বলো না।'

হেনা মুখ নিচু করে, ঘাড় নেড়ে বলেছে, 'এখন না। একেবারে শেষ দিন।'

কিন্তু সে কথা আমার আর কোনোদিনই শোনা হয়নি।

ও কয়েকদিন ধরেই বেশ গম্ভীর হয়ে থাকছিল। ওর কালো চোখের তারায় একটা তীব্র জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল যেন ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। হঠাৎ হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছে, 'আপনার অজ্ঞাতবাস ভালো কাটছে তো?'

হেসেই বলতে হয়েছে, 'মন্দ বলবো কেমন করে?'

কিন্তু গতকাল ও একটা কাণ্ড করে গিয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা গল্প করার পরে, বিদায় নেবার সময়ে, হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'বল।'

'আপনার সঙ্গে রঞ্জিতা রিজ্‌ভির পরিচয় হয়েছে?'

একটু অস্বস্তির ভাব নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আপনি ওর সঙ্গে হোটেলে, রেস্তোঁরায়, নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন?' বলতে বলতে ওর ঠোঁট যেন কেঁপে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বললো তোমাকে, সুবন্ধু?'

এবার স্পষ্টতই ওর ঠোঁট কাঁপলো, গলার স্বর নিচু আর রুদ্ধ শোনালো। ঘাড় নেড়ে বললো, 'না, সুবন্ধুদা ছাড়াও দিল্লীতে লোক আছে, তাদের চোখ আছে, তাদের কাছেই নানান কথা শুনেছি। সবশেষে শুনেছি, আমার বাবার মুখে।'

এই পর্যন্ত বলেই, ওর কালো চোখে জল এসে পড়লো। আমি ডাকলাম, 'হেনা।'

হেনা পিছন ফিরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমি ওর পিছনে পিছনে গেলাম। দেখলাম, করিডর দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে। আমিও যেতে যেতেই আবার ডাকলাম, 'হেনা, শোন।'

শুনলো না। করিডরের শেষে পৌঁছে দেখলাম, ও লিফটে উঠে, নিজেই গেট টেনে দিল। হাত বাড়িয়ে, বোতাম টিপে লিফট নিয়ে নেমে গেল। ও মাথা নিচু করে ছিল, মুখ দেখতে পাইনি।

চমৎকার আমার নির্বাসনের পালা। ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে টেলিফোনের গাইড তুলে নিয়েছিলাম। ট্রেনের বুকিং-এর নম্বর দেখে নাম্বার চেয়ে জানিয়েছিলাম, পরবর্তী রাজধানী এক্সপ্রেসের একটা টিকিট চাই। সৌভাগ্যবশতই তা পাওয়া গিয়েছে। আগামী পরশু আমার নির্বাসনের খোয়ারির শেষ দিন। যাবার দিন। খবরটা জানালাম শুধু সুবন্ধুকে। সুবন্ধু

বারে বারে বললো, 'রঞ্জিতাকে একটু জানিয়ে যান।' বলেছি, 'আপনার এই কথাটা রাখবো না।'

সন্ধ্যাবেলা রঞ্জিতা এল একলা। ওর ইচ্ছা, আজ রাতটা ওর হিপি-হিপিনী বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় কাটাই। বললাম, 'সারা রাত পারবো না। কিছুক্ষণ।' ও তাতেই রাজী হল। রঞ্জিতাকে দেখলাম, ওর অঙ্গার ঠোঁটে দিব্যি গঞ্জিকা সেবন করলো। আমি পারলাম না। ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় বললো, 'কাল তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?'

'কোথায়?'

'বাদ্‌খেল লেক, হরিয়ানায়। বেশি দূরে না, পঁচিশ তিরিশ মাইলের মধ্যেই।'

আগামীকাল শেষ দিন, পরশু আমার প্রত্যাবর্তন। রঞ্জিতা রিজ্‌ভির এই কথা রেখে যাবো। এই তো শেষ কথা। বললাম, 'কেমন করে যাবো, কিসে যাবো?'

ও বললো, 'আমার এক বন্ধুর গাড়ি নিয়ে যাবো। কাল বেলা তিনটেয় যাবো।' রাজী হয়ে ফিরে এলাম। পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় রঞ্জিতা এল। তৈরি ছিলাম বেরিয়ে গেলাম। ওর বন্ধুর গাড়ি, ড্রাইভারও তারই। এক ঘণ্টার মধ্যেই অন্য রাজ্যের অন্য পরিবেশে চলে এলাম। ছোট ছোট টিলা বেষ্টিত, গ্রামীণ জায়গা। গ্রাম দূরে, এদিকটা প্রান্তর। দেখলাম, চারদিকে উঁচু টিলা, আর বাঁধ, মাঝখানে একটা জলাশয়। বাঙলা দেশে এরকম দীঘি এখনো অনেক চোখে পড়ে। এটা আঁকাবাঁকা ছড়ানো, প্রাকৃতিক জলাশয়। বিভিন্ন ধরনের কিছু নৌকা রয়েছে বেড়াবার জন্য। একটি উঁচু টিলার ওপরে, বড় একটি গোলঘর, বার-কাম-রেস্তোরাঁ, শীততাপনিয়ন্ত্রিত। সামনে খানিকটা সবুজ ঘাস, বাগান। ঝরনার উৎস মুখে জল ঝরছে। হরিয়ানায় পাবলিক বার থাকার অনুমতি আছে। রঞ্জিতা মীনের মতো, ওপরের জলের দিকে ছুটলো। বললো, 'বড় পিপাসা, আগে একটু জল পান করে নিই।'

কী জল, তা জানি। কিন্তু জায়গাটা সুন্দর, ভালো লাগছে। রোদের উত্তাপও কম। ভিড় মোটেই নেই। রঞ্জিতার মুখেই শোনা গেল, রবিবারে নাকি মেলা লেগে যায়। টিলার উপরে উঠে, গোলঘরে ঢুকে দেখলাম, ঠাণ্ডা মেশিন চলছে না। খুব গরমও লাগছে না। এতবড় ঘর, অনেক টেবিল চেয়ার কিন্তু খরিদ্দার প্রায় নেই। এক পাশে, লম্বা টেবিলের ধারে, সোফার ওপরে

একটি দল বসে আছে। প্রায় সাত-আটজন যুবক-যুবতী। তাদের পোশাক অত্যাধুনিক। সকলেই পানীয় নিয়ে বসেছে।

রঞ্জিতা আজ র সিল্কের গাঢ় রঙের লুঙ্গির ওপরে, একটা হাত-কাটা ছাপানো জ্যাকেট পরে এসেছে। আর সব সাজ যেমন তেমনই। আমরা গিয়ে বসতে, বেয়ারা এগিয়ে এল। রঞ্জিতা বললো, 'পহ্‌লে ঠাণ্ডা পানী, উস্‌কে বাদ বীয়ার।'

যাক, এই প্রথম, খানিকটা অন্য ধরনের পানীয়র কথা ওর মুখে শুনলাম। তীব্র সুরা ছাড়া—আগে কখনো পান করতে দেখিনি। বেয়ারা জল বীয়র বরফ সব এক সঙ্গেই নিয়ে এল। বীয়রের দুটো গেলাসে বীয়র ঢাললো। আমি বললাম, আমি কিন্তু মোটেই তৃষ্ণার্ত নই।'

রঞ্জিতা চোখে ঝিলিক দিয়ে হেসে বললো, 'জানি তুমি মরুভূমির উট। বিশেষ করে আমি কাছে থাকলে তোমার এ সবের তৃষ্ণা একদম ঘুচে যায়।'

রঞ্জিতার কথার মধ্যে কি অন্য কোনো অর্থ রয়েছে। ও কাছে থাকলে আমার এ সবের তৃষ্ণা ঘুচে যায়, তার কারণ কি, আমার তৃষ্ণা মিটে যায়? প্রশ্ন করতে পারবো না, কথা কোন্ দিকে বইবে, বলতে পারি না। যদিও আগের তুলনায় ওর কাছে আমি এখন অনেকখানি সহজ। ওর সবটুকু বুঝি বা বুঝেছি তা বলতে পারবো না। কিছুটা বুঝেছি। জীবনটা ওর নানান ধাঁধায় জট পাকিয়েছে, ছেলেবেলা থেকেই। পারিবারিক জীবনটা খুব সুস্থ ছিল না। অথচ মায়ের জবরদস্ত একটা পরিচালনা ছিল, যার সঙ্গে ওর ছেলেবেলা থেকে বিরোধ, কিন্তু লড়ে উঠতে পারেনি। ফলে ভিতরে ভিতরে দানা বেঁধেছে প্রতিবাদ প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদগুলো ওকে ভাবিয়েছে। তার কারণ ওর ভিতরে প্রতিবাদগুলোর কেবলমাত্র রাগ বা বিদ্বেষ ছিল না, বেদনাও ছিল। ছেলেবেলা থেকে যে সব অপমান ওকে সহ্য করতে হয়েছে, তার জন্য লুকিয়ে অনেক কাঁদতে হয়েছে। সেই অপমান, ব্যথা এবং কান্না থেকে যে ভাবনা জন্ম নিয়েছে, পরবর্তী কালে তাই ওর শিল্পসাধনার রূপ। সেখানে ও কতোখানি সার্থক, আমি জানি না। অস্বীকার করবার উপায় নেই, বাইরে থেকে ওকে দেখলে যা মনে হয় তার চেয়ে গভীরতর ওর মনের ভাবনা। অথচ ভুগছে একটা তীব্র অর্থহীনতায়।

তারও কারণ আছে। এই যে ওর অগ্নিনশ্বরী রূপ, দুরন্ত যৌবন—এসব ওর জীবনের চারপাশে ডেকে নিয়ে এসেছে অনাচারের অন্ধকার। ওর মা তার জন্য অনেকখানি দায়ী। অন্ধকারের পথে তিনি অনেকখানি টেনে নিয়ে গিয়ে-

ছিলেন এবং সেই একান্ত মূঢ় অন্ধকার থেকে রঞ্জিতা ওর নিজের শক্তিতেই ফিরে এসেছে। ওর আজকের জীবনটা আলোকময় তা বলবো না, কিন্তু যে অসহায় মূঢ় অন্ধকারে নারী কেবল একটা শিকার মাত্র, ও তা নয়।

কোনো কোনো রূপ অভিশাপ। রঞ্জিতার রূপ ওর অভিশাপ। এই রূপ আগুনের মতো। পতঙ্গেরা পুড়ে মরে, কিন্তু মানুষ এই আগুন নিয়ে বোধহয় সুখের ঘর বাঁধতে ভয় পায়। রঞ্জিতাকে চেয়েছে অনেকে, কিন্তু যা ও পায়নি সেটা ভালবাসা। স্নেহ ভালবাসা কোনোটাই পায়নি। তৃষ্ণা ওর প্রবল। পেতে চাওয়াটা তীব্র। এই না পাওয়াটাই ওর চরিত্রে এনেছে যতো অসাম্য, নানান বিপরীত সংঘর্ষ। অথচ ওর হৃদয় অমলিন, বুদ্ধিতে দীপ্তির ধার, অনুভূতি গভীর। ওকে যতটা অসহজ মনে হয় তা নয়। আবার ও-ই অসহজ হয়ে ওঠে অন্য ক্ষেত্রে। প্রথম দিন যে রাত্রে জুম্মা মসজিদে গিয়েছিলাম, আকণ্ঠ পান করে যে কবিতা ও আবৃত্তি করেছিল, সে কবিতা ওর নিজেরই সৃষ্টি।

একদিক থেকে আমি বিড়ম্বিত বোধ করছি, আমার নির্বাসনটাকে ও কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু এখন আর ওকে আমি ভয় পাই না। ভয় ঠিক কখনোই পাইনি, ওর চারিত্রের তীব্রতায় কোন্ অস্বস্তি আর অশান্তির আবর্তে পড়ে যাবো, সেই একটা আশঙ্কা ছিল। সেটা আমার ভুল। আমার মধ্যে ও যা আবিষ্কার করেছে, সেটা একান্ত ওর। দুঃখ কী, আমি তা জানি, তাই সুবন্ধুর মতো এখন আমিও বলতে পারি, ও একটি দুঃখী মেয়ে। অস্বীকার করবো না, এই মেয়েটির প্রতি এখন আমার একটি মমতাবোধ, প্রীতি এবং স্নেহের অনুভূতি জেগে উঠেছে।

হঠাৎ আমি চুপি চুপি স্বর শুনতে পেলাম, 'শ্যাম, শ্যাম, আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি, আমাকে এভাবে ভাসিও না।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল ?'

রঞ্জিতা যেন লজ্জায় লাল, ব্রীড়াময়ী হয়ে উঠেছে। বললো, 'তুমি তো আমার দিকে কখনো এমন নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখনি।'

আমি নিজেই লজ্জা পেলাম। অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছি। নিজেরই মনে নেই। অকপটেই বললাম, 'তোমাকে দেখছিলাম, তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

ও আমার পাশের চেয়ারে বসেছে। আমার দিকে ঝুঁকে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ভাবছিলে শ্যাম ?'

'তোমার জীবনটা।'

'কী দেখতে পেলে?'

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। এত সহজে কেমন করে সে কথাটা বলি। এক কথাতে কীই বা বলি। সহসা ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। চোখ নামিয়ে নিল। ওর ঠিক এই রূপটা দিল্লীতে কেউ দেখেছে কী। সামনে ফেনিলোচ্ছল বীয়রের পাত্র। অগ্নিশ্বরী রঞ্জিতা লজ্জায় ব্রীড়াময়ী, আবার পরমুহূর্তেই চোখ ছলছলিয়ে উঠছে, দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে।

আবার চোখ তুলে বললো, 'তুমি এরকম করে দেখলে আমার চোখে জল আসে।'

'কেন।'

'এমন করে যে আমাকে কেউ দেখে না।' বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, 'কী দেখলে শ্যাম বল। আমাকে কী দেখলে?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না। সুধা। অমৃত।'

'আহ্।' রঞ্জিতা শব্দ করে চোখ বুজলো। কয়েক পলকের মধ্যেই চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো। কিন্তু বলতে পারলাম না, এই সুধা, এই অমৃত রয়েছে বিষের পাত্রে। যে বিষের পাত্র এমনি দেখা যায় না, যা ছড়িয়ে আছে এই দিল্লী নগরে, সমাজ পরিবারে। আমি ওকে ডাকলাম, 'রঞ্জিতা।'

রঞ্জিতা চোখ মেললো। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখের কোণ চেপে মুছলো। তারপরে একটু হেসে বীয়রের পাত্র তুলে বললো, 'ভিত্ত তৈরি করা যাক।'

মনে মনে বললাম, 'শেষ দিনের জন্য।' মুখে বললাম, 'ভিত্ত তৈরি করছো মানে কী, এর পরে—।'

ও বাধা দিয়ে বললো, 'দেখা যাক না।'

আমরা বসেছি কাচের দেওয়াল ঘেঁষে। পর্দা সরিয়ে দেখতে পাচ্ছি রৌদ্র-চকিত আকাশের ছায়ায় বাদখেল লেকের নীল জল। ওপারে অনেকখানি সবুজ প্রান্তর। ডাইনের টিলাটিও সবুজ।

যুবক যুবতীদের দলটা ক্রমেই উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। দু'তিনজন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বোধহয় হিন্দী ছবির গান করছে। বাকিরা শরীর দুলিয়ে টেবিলে চাটি মেরে তাল দিচ্ছে। আধঘন্টা না যেতেই রঞ্জিতার বীয়র শেষ। বেয়ারাকে ডেকে হুইস্কি চাইলো। আমি বললাম, 'থাক না, বেশি হয়ে যাবে।'

ও তর্জনী তুলে বললো, 'ওনলি ওয়ান।'

এ ব্যাপারে ওকে আমি বিশ্বাস করবো না। ওনলি-ওয়ান কতো ওনলিতে যে গিয়ে দাঁড়াবে, বলা যায় না। ঠিক এ সময়ে এক ব্যক্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। তাঁর মোটা ভুরু কোঁচকানো। সাদা কালোয় ধূসর চুল উসকো খুসকো। বয়স পঞ্চান্নর মতো। ট্রাউজার আর হাওয়াই শার্ট গায়ে। গলায় ঝুলছে ক্যামেরা। হিন্দীতে যা বলে উঠলেন, তার বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়, 'আরে শঠ, প্রবঞ্চক, শ্যালক, তুই এখানে বসে আছিস, তাও আবার রঞ্জিতা রিজ্‌ভির সঙ্গে, অ্যাঁ? একি শালা আমি ঠিক দেখছি, না খোয়াব?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আরে আসুন উপাধ্যায়দা, আপনি এখানে কোথা থেকে?'

চুল ঝাঁকিয়ে, খাড়া নাক কুঁচকে, তেড়ে বললেন, 'আমি আসছি জাহান্নাম থেকে। তোকে আমি সত্যি দেখছি কিনা বল।'

হেসে বললাম, 'নিশ্চয়ই। আমি ভূত নই।'

'তুই ভূত না, ভূত তোর থেকে ভালো। তুই আমার হাফ ডজন চিঠির জবাব দিসনি। শেষ পর্যন্ত টেলিগ্রাম করলাম, তারও জবাব নেই। আমি তো ভেবেছি, তুই মরে গেছিস, একটা মুর্দা।'

রঞ্জিতা একটা শব্দ করে বললো, 'এতোটা বলবেন না উপাধ্যায়জী।'

'আরে বিবিজী, তোমাকে কী বলবো। গেল বছর ও লখনৌতে আমার ওখানে গিয়েছিল। আর ওকে দেখে তুমি বুঝতেই পারছো, তুমি হলে দিল্লীর রঞ্জিতা রিজ্‌ভি, এ শালা মন কাড়তে ওস্তাদ। আমি তো মরেইছি, আমার বিবি লেড়কীগুলো পর্যন্ত মরেছে।

রঞ্জিতা আমার দিকে চেয়ে হেসে উঠলো। বিখ্যাত ফটোগ্রাফার চন্দ্রনাথ উপাধ্যায় হাত তুলে বললেন, 'আরে না না, শোন, মনে হয়েছিল আমাদের জন্য ও কী না করতে পারে। মনে হয় ওর সবটা ভালবাসায় ভরা। কিন্তু ওর মতো ক্রুয়েল হার্টেড অভদ্র আর দেখিনি। আমার বিবি একজন লেখিকা, ওর সমগোত্রের, ও তাকে ভাবী বলে, তাকে পর্যন্ত একটা চিঠি লেখেনি। আমার টেলিগ্রামের কোনো জবাব পর্যন্ত দেয়নি। আমি টেলিগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছিলাম, কেননা ও আমার চিঠিগুলো পাচ্ছে কী না, সেটা জানবার জন্য।' আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'চিঠিগুলো পেয়েছিলে তো। মিথ্যা বললে লড়ে যাবো।'

বললাম, 'পেয়েছিলাম দাদা, কিন্তু আমার কথা একটু শুনুন।'

উপাধ্যায় ধমকে উঠলেন, 'কোনো কথা শুনতে চাই না। কান মলা দিয়ে বলো অন্যায় হয়েছে।'

আমি একেবারে সোজা দু'কানে হাত দিয়ে মলে বললাম, 'অন্যায় হয়েছে।'

রঞ্জিতা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। দুর্বাসা দাদা বসলেন। অবিশ্যি মানতেই হবে, আমার দিক থেকে খুবই অন্যায় হয়ে গিয়েছে। যদিও তাতে কারোর কোনো কাজের ক্ষতি বা অমঙ্গল করিনি। জবাব দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে লখনৌতে তাঁর গৃহে আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী কন্যাদের আমি ভুলিনি, ওঁকে তো নয়-ই। উপাধ্যায় বসবার পরে আমি বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কী নেবেন দাদা?'

উপাধ্যায় একবার রঞ্জিতার পাত্রের দিকে দেখে নিয়ে বললেন, 'হুইস্কি।'

বেয়ারাকে ডেকে হুইস্কি দিতে বললাম। আজ দেখছি সকলেরই রেচকের আকর্ষণ। রঞ্জিতাকে আগে কখনো দেখিনি। বললাম, 'রঞ্জিতার সঙ্গে আপনার আগে থেকেই পরিচয় আছে দেখছি।'

উপাধ্যায় চোখ বড় করে রঞ্জিতার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'কতো দিন হবে রঞ্জিতা বিবি, চার বছর?'

রঞ্জিতা বললো, 'ওইরকমই হবে, দিল্লী রেডিওতে।'

উপাধ্যায় গেলাসে চুমুক দিয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন, 'আরে তোমাকে যে চেনে না, সে দিল্লীর কিছুই চেনে না। এমন একটি মক্ষীরাণী।'

রঞ্জিতা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। গেলাসে চুমুক দিল। উপাধ্যায় ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি একে ভেড়ালে কোথা থেকে?'

উপাধ্যায়দার ভাষা একটু এইরকমের, তবু কানে লাগছে। রঞ্জিতা বললো, 'কলকাতা থেকে খুঁজে নিয়ে এসেছি।'

উপাধ্যায় এক চোখ বুজে অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন, 'আচ্ছা, তাই বলো। কী ব্যাপার, টি ভি না রেডিও, না জার্নালের সাক্ষাৎকার।'

রঞ্জিতা বললো, 'ওসব কিছুই না!'

উপাধ্যায় আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে, রঞ্জিতাকে চোখ ঘুরিয়ে বললেন, 'ধরেছ বুঝি?'

রঞ্জিতার মুখ লাল হয়ে উঠলো। মুখের হাসিটা বজায় রেখে বললো, 'ওঁকে ধরা যায় না।'

'তোমার মত মেয়ে এ কথা বলছে?' রঞ্জিতা গেলাসে সুদীর্ঘ চুমুক দিল। উপাধ্যায় আবার বললেন, 'তুমি তো এসব বাজীতে হারো না।'

রঞ্জিতার হাসিটা আর তেমন নেই। জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের বাজী?'

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'এসব কথা থাক দাদা, আপনি দিল্লীতে কবে এলেন বলুন।'

'আমি চার পাঁচদিন এসেছি, আবার দু'একদিন বাদেই চলে যাবো। আজ হঠাৎ কী খেয়াল হল, এখানে একলা বেড়াতে চলে এলাম। অবিশ্যি ক্যামেরার কাজ তেমন কিছু নেই এখানে, কিছু সট নিয়েছি। কিন্তু—।'

তিনি আবার রঞ্জিতার দিকে তাকালেন। বললেন, 'ব্যাপারটা আমার জানতে ইচ্ছে, তোমরা জোট বাঁধলে কোথা থেকে? সেই জন্যই বলছি, তুমি তো বাজীতে হারো না। আর কিসের বাজী বলছো বিবিজী? আমি বলছি ধরা ছোঁয়ার বাজী।'

রঞ্জিতা একদৃষ্টে উপাধ্যায় দেখছে। উপাধ্যায়কে আবার বললেন, 'গোটা দিল্লী তোমার কটাক্ষে ধরা পড়ে আছে, আর একেই পারছো না!'

রঞ্জিতা বললো, 'না।'

ওর গলার স্বর গম্ভীর। উপাধ্যায় সেটা খেয়াল করলেন না যেন, বা গায়ে মাখলেন না। মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন, 'তা হলে যা দিয়ে সবাইকে মজাচ্ছো, ওকেও তাই দিয়ে মজাও।'

'সেটা কী?'

উপাধ্যায় রঞ্জিতার শরীরের দিকে চেয়ে বললেন, 'ঘোড়াই জানে, তার বাজীর আসল জিনিস কী।'

'স্টুপিড!' রঞ্জিতা চাবুকের শিসের মতো বেজে উঠলো। পরমুহূর্তেই হাতের গেলাসটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। হাত বাড়িয়ে টেবিলের বোতল গেলাস সমস্ত মেঝেয় ছড়িয়ে দিল, চিৎকার করে বললো, 'য়ু রট্, রাস্কেল, হোয়াট ডু য়ু থিংক অব মী।'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো।

রঞ্জিতা যেন আগুনের মতো লকলক করছে, কাঁপছে, চোখ মুখ টকটকে লাল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বেয়ারারা ছুটে এল। উপাধ্যায় বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। আমি ডাকলাম, 'রঞ্জিতা।'

রঞ্জিতা চোয়াল শক্ত করে চোখ বুজলো। আমি আবার ডাকলাম ওকে। ও হঠাৎ আমার কাঁধের ওপর দু'হাত রেখে বুকে মুখ গুঁজে দিল। ঝরঝর করে কেঁদে উঠলো, কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগলো, 'একসকিউজ মী স্যার, একসকিউজ মী!...'

আমি ওর মাথায় একটা হাত রাখলাম। যুবক যুবতীদের ওদিক থেকে হাসি আর শিস বেজে উঠলো। আমার দুই কানে যেন তালা লেগে গেল। আমি ওদের দিকে ফিরে তাকালাম না। রঞ্জিতা আবার বললো 'শ্যাম, আমি এখানে আর বসবো না।'

বললাম, 'ঠিক আছে।'

ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে বিল দিতে বললাম। রঞ্জিতার ব্যাগটা তুলে, ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি আসছি।'

ও ব্যাগ নিয়ে, মাথা নিচু করে গোল ঘরের বাইরে চলে গেল। উপাধ্যায় বিস্মিত আচ্ছন্ন স্বরে বললেন, 'আমি এটা আশা করতে পারিনি।'

বললাম, 'ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে তো নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু রঞ্জিতা ·রিজ্‌ভির এতো তেজ, আমি জানতাম না।'

বেয়ারা বিল নিয়ে এল। টাকা মিটিয়ে, বললাম, 'যাচ্ছি উপাধ্যায়দা, পরে দেখা হবে।'

'কোথায়?'

'তা জানি না। আমি আগামীকালই চলে যাচ্ছি কলকাতায়।'

বলে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম, রঞ্জিতা ঝরনা উৎসবের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতে, ও মুখ নামিয়ে রেখে বললো, 'শ্যাম, চলো আমরা নৌকায় ভেসে বেড়াই।'

'চলো।'

বাঁধের নিচে নেমে দেখলাম, নৌকা ভাড়া দেবার জন্য লোক রয়েছে। আমি রঞ্জিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সাঁতার জানো।'

একটু হাসলো, বললো, 'না ডুবতে জানি।'

আমরা দু'জনে ছোট টিনের নৌকায় উঠলাম, পাশাপাশি বসে প্যাডেল করলেই নৌকা চালিত হয়, নৌকা চলতে থাকে। দু'জনেই পা চালাতে লাগলাম আস্তে আস্তে। রোদের তাপ কম। জলের বুকে আরো কম। দু' পাশে ছোট ছোট তরঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। একটু আগের ঘটনার উত্তেজনা যেন এই জলের বুকে ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। রঞ্জিতা গুনগুন করছে, চেনা গান: আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান/তুমি জান নাই, তুমি জান নাই—

ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে গেলাম, সবুজ পাড় ছুঁয়ে আবার মাঝখানে ফিরে এলাম। দূরের টিলায় ছায়া নামছে।

রঞ্জিতা বললো, 'শ্যাম, এখনো কি আমাকে অমৃত মনে হচ্ছে?'

বললাম, 'হচ্ছে, তুমি অমৃত।' এবং এবার বললাম, 'ভুল বুঝো না, কিন্তু বিষের পাত্রে।'

কথাটা বলতে আমার কষ্ট হল। ও আমার চোখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপরে বললো, 'তাই বুঝি একটুও গ্রহণ করলে না?'

বলে ও আমার একটা হাত চেপে ধরলো। ওর ঠোঁট কাঁপা দেখে বুঝতে পারছি, ওর চোখে জল আসছে। আমি ডাকলাম, 'রঞ্জিতা।'

রঞ্জিতা মাথা নেড়ে অস্ফুটে বললো, 'কিছু না।'

তারপর ভেজা চোখ তুলে হেসে বললো, 'এই মাঝখানে, জল কত গভীর?'

'মনে হয় অনেক?'

'তবে ডুবি!' বলে হালকা টিনের নৌকায় এক পাশে চাপ দিতেই, নৌকা কাত হয়ে হুড়হুড় করে জলে ঢুকে পড়লো। আমি দু'হাতে ওকে কাছে টেনে নিয়ে, উদ্বেগে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'কী করছো? কী করছো তুমি?'

ও আমার কোলের ওপর মুখ গুঁজে, দু'হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠলো। আসলে উত্তেজনাটা কি এখনো ওর মধ্যে বর্তমান? কান্নাটা বুঝি ওর শেষ হয়নি।

আমি ওকে ডাকলাম। ও আস্তে আস্তে মুখ তুললো। চোখের কাজল ধোয়া, চোখ মুখ ভেজা লাল। বললাম, 'দীন যে কেবল দান করতে পারে না, তা নয়, গ্রহণের যোগ্যতাও তার নেই। তবু বলি, তোমার কাছ থেকে যা নেবার তা আমি নিয়েছি।'

ও আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'কী, বিষ?'

'অমৃত।' বলতে গিয়ে আমার গলায় যেন ঠেক লাগছে। ওর ভেজা চোখ দুটো চিকচিক করছে।

নৌকা বাতাসে ভাসতে লাগলো।

রাজধানী একস্প্রেসের কামরায় বসে আছি। সুবন্ধুর কাছ থেকে টেলিফোনে বিদায় নিয়েছি। বাইরের দিকে তাকিয়ে লোকের আনাগোনা দেখছি। ভিড় আর ব্যস্ততা। লোকজনের ছুটোছুটি। তার মধ্যেই চোখে পড়লো,

রঞ্জিতা ছুটে প্ল্যাটফরমে ঢুকলো। শাড়ি পরা, সিঁথেয় কপালে সিঁদুর। চুলগুলো যেন আলুথালু। কী করে জানলো? সুবন্ধু? একটি নামই আমার মনে এল। কিন্তু এই দেখাটা আর আমি করতে চাই না।

একটু পরেই দেখলাম, অ্যাণ্টনি প্ল্যাটফরমে ঢুকলো। ওর গোঁফ দাড়ি-ওয়ালা মুখে, চোখের কালো চশমায় রঞ্জিতাকে খুঁজে ফেরার উদ্বেগটা টের পাওয়া যায়। এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ির কামরার ভিতর থেকে সব দেখা যায়। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। দেখছি রঞ্জিতা, এপার ওপার ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যাত্রী নয় বলে কামরার মধ্যে প্রবেশ নিষেধ। অ্যাণ্টনি রঞ্জিতাকে দেখতে পেয়েছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছে।

অস্বস্তি বোধ করছি। ঘড়ি দেখলাম। এখনো সাত আট মিনিট বাকী আছে গাড়ি ছাড়তে। অ্যাণ্টনি চোখ থেকে কালো চশমা খুললো। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি চলাচলে বুঝতে পারছি রঞ্জিতা কখন কোন্ দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। কী করবো? হঠাৎ গাড়ির মধ্যে লাউডস্পীকারে আমার নাম ধরে সম্বোধন শুনতে পেলাম, 'এত নম্বর কামরা, এত নম্বর সীট, আপনি একবার বাইরে আসুন। মিসেস রঞ্জিতা রিজ্‌ভি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

এর পরে আর বসে থাকা যায় না। কামরার বাইরে এলাম। রঞ্জিতা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গেলাম, ও তাকালো, কিছু বলতে পারলো না। ডাকলাম, 'রঞ্জিতা।'

ওর ঠোঁট কাঁপছে। আশেপাশে অনেক লোক। অ্যাণ্টনি নিশ্চয় আমাদের দেখছে। রঞ্জিতাকে ও নিয়ে যাবে।

রঞ্জিতা অস্ফুটে বললো, 'চলে যাচ্ছো? বলোনি কেন?'

বললাম, 'চলে যাচ্ছি বলে।'

ওর সিন্ধু চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো, হাসতে চাইলো, বললো, 'তাহলে তোমাকে চিনেছিলাম ঠিকই।'

'কে তোমাকে খবর দিল।'

'সুবন্ধু।'

জানতাম, সুবন্ধু শেষ মুহূর্তে না বলে পারবে না। রঞ্জিতাকে ও ভালবাসে, স্নেহ করে। রঞ্জিতার গলা প্রায় রুদ্ধ, তবু বললো, 'কিন্তু শ্যাম, এ কী রকম করে যাচ্ছো? এমন করে যাচ্ছো কেন?'

বললাম, 'যেতেই যখন হবে, তখন বোধহয় এমনি করে যাওয়াই ভালো।'

বাইরের মাইক ঘোষণা করলো, প্যাসেঞ্জাররা যেন তাদের আসনে গিয়ে বসে। গাড়ি ছাড়বার সময় হল। রঞ্জিতা আমার দিকে তাকালো, কী যেন বলতে চাইলো। পারলো না। চোখ বুজে গেল। এবার অসংকোচে ওর একটি হাত ধরলাম।

বললাম, 'যাচ্ছি।'

ও আমার হাতটা মুঠি পাকিয়ে ধরলো, ছেড়ে দিল। আমি গাড়িতে উঠে আমার জায়গায় গিয়ে বসলাম। রঞ্জিতা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ নিচু। দূরে দাঁড়িয়ে অ্যান্টনি ওকে দেখছে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। অ্যান্টনি রঞ্জিতার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। রঞ্জিতা চোখ মেলে তাকালো। ও আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমি পাচ্ছি। মনে হল কলকল করে আমার কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছে।…জানি, যতো বিষই থাক্। কলকল করে যা ভাসছে, তা অমৃত। নির্বাসনে এসে অমৃত নিয়ে ফিরছি। আমার চোখের সামনে, যমুনার ওপরে আকাশ টলমল করছে, একটি মুখ ভাসছে। অমৃতের মুখ, বিষের পাত্রে টলটলানো।

লোকে বলে, ছক ছাড়া তোর নাই রে গতি। সত্যি কি তাই? বাইরে থেকে দেখলে পরে, ছকেই সবার আনাগোনা। মন চলে কোন্ ছকে, কিসের ছকে? বে-ছকে। কিংবা বলি, মন চলে তার নিজের ছকে, যে-ছকেতে নেই বাহ্য জগতের নিয়ম কানুন বিধি নিষেধের নির্দেশ। সে হিসাবে মন কারোর দাস না। যাকে বলে দশের সঙ্গে এক হয়ে মিছিল করে থাকো, মন সেখানে বে-মিছিল।

শুনতে ভারি ভালো লাগে, 'মৌমাছি মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি।' কিন্তু মৌমাছি জীবনটা কি সুখের? মধুর সঙ্গে যুক্ত বটে, প্রকৃতির এমন লাঞ্ছিত পরাধীন বন্দী বোধ হয় আর কেউ নেই। বিদ্রোহী সাহিত্যিক দার্শনিক ভলতেয়ারের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর যে-কথাটি ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য, তা হলো 'ফ্রান্সের জনসাধারণ মৌমাছি না, তারা স্বৈরতান্ত্রিক রাজপরিবারের চাকের জন্য মধু সংগ্রহের শ্রমিক না।'

মৌমাছি প্রকৃতির হাতের অন্ধ ক্রীড়নক। সে বেঁচে থাকে কেবল মক্ষীরাণীর চাকে মধু সংগ্রহের জন্য। নির্বীর্য সেই পতঙ্গের কোনো সৃষ্টি ক্ষমতা নেই, তার আছে শুধু শ্রম। কথাটা এলো ছক বে-ছকের কথায়। মন যদি জীবনের বাহ্য চলনের ছকে চলতো, তাহলে মানুষকে আর মানুষ বলা যেত কী না সন্দেহ। চলে না বলেই, তার নানা রূপ, নানা ছন্দ। ধন্দ তো লাগেই, কারণ নানা রঙ্গে ভরা। সেই মনকে পাছে কেউ মৌমাছি বলে রঙ দিতে চায়, তাই মনীষী বাক্য মনে পড়ে গেল। মন মৌমাছি না, সে অভিশাপ থেকে মনমুক্ত। মানুষ পরাধীন, যে-কোনো তন্ত্রের কাছে, মন স্বাধীন।

কিন্তু কথাটা, মূলে এলো কেন?

রহস্যটা সেইখানে। কথাটা মনে এলো, খানিকটা আত্মবিদ্রূপের কারণে। এবার কোনো কাজে না, অকাজেই চলেছি আরব সাগরের কূলে। কবির কথায় হয়তো অতিশয়োক্তি আছে, তবু কেন জানি না, অনেকবার সেই লবণাক্ত

অম্বুজরাশির ফেনিলোচ্ছল রূপোলি তরঙ্গ দেখে, আকাশের দিকে হাত বাড়ানো তার মাতাল ধ্বনি শুনেও, চোখের তৃপ্তি হলো না। হৃদয় জুড়ানো গেল না।

আত্মার সন্ধানী আমি না, সে যোগ্যতা আমার নেই। আরব সাগরের কূলের আত্মাকে খোঁজা আমার তান লয় মানে নেই। কী তৃষ্ণা সে আমার প্রাণে জাগিয়ে রেখেছে আমার চোখের কূলায় হৃদয় মধ্যে। সে নিজে আমাকে ডাকে না, ডাক আসে আমার ভিতর থেকে। যে-দেবীর নামে সাগর কূলের নগরের নাম সে-দেবীর বিগ্রহ আমার অচেনা। কিন্তু আমার ভিতরের ডাকটা যে বহুকালের ওপার হতে, তা বুঝতে পারি, কেননা, তার সুরে স্বরে বিশ্বের নানা ধ্বনি বাজে। সাত সাগর তেরো নদীর স্রোত এসে মিলেছে সেখানে, মহামানবের অনেক খেলা ঘটেছে সেই কূলে, ঘটছে এখনো। তার সাগরদ্বীপের পাথরের গায়ের বিগ্রহে, গুহাগাত্রের নরম পাথরের গায়ে বহুকালের ছবিরা সজীব হয়ে নেমে আসে নিচে, নিজেদের বহুযুগের ফেলে আসা জীবন নাট্যের ভূমিকা গ্রহণ করে, আর তারও অনেক পরে, সাগরের অন্য কূলের মানুষেরা আসে তার ধর্মের বাণী নিয়ে, আরব-দেশ যার নাম। তখন ইতিহাসের অনিবার্য কারণে, নিরস্ত্র সংগ্রামীকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়, ঘোষণা করতে হয়, ঈশ্বর এক। একমেবাদ্বিতীয়ম্। তেত্রিশ কোটির দল ভাগ নেই। বিভিন্ন মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের ভিন্ন নাম সত্য না, বিভিন্নের জন্যও বিভিন্ন বিগ্রহ নন। সকলের জন্য এক, তিনি একজন, সমস্ত হিন্দুর তিনিই আরাধ্য, এক ঈশ্বর। সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামীর নাম শঙ্করাচার্য। দক্ষিণ পশ্চিম কূল দিয়েই, আরবরা এসেছিলেন জাতিপাতি বর্ণ দুষ্ট অন্ধকার কূলে। তবে, হায়, সেই যে এক কথা আছে, সর্ষের মত ভূত। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, আর, এক ঈশ্বরের নাম নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন, রাজনীতি তো তাঁদের ছিলই, থাকেই, তার সঙ্গে ছিল, সেই ঈশ্বরের অন্ধতা, যা একদিক থেকে মূঢ়, নিষ্ঠুর। তার সব কিছু সমর্পিত ধর্মের কাছে, নিশ্ছিদ্র, নিরেট, ইংরেজিতে বলে বুঝি ফ্যানাটিক্স, বিপরীত বলেছ কি, মুণ্ডচ্ছেদন।

অন্ধতাকে অন্ধতা দিয়ে উচ্ছেদ করা যায় না।

তবু হায়, শঙ্করাচার্যের স্লোগান, এ দেশের কোটিকে গোটিক শুনেছিল। আরবরা কিছুটা নিশ্চয় সার্থক হয়েছিলেন, বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী ছবি কি? বেশি দূরে কি যেতে হবে? এই সেদিনও এ দেশের মাটিতে হরিজন পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পর্তুগীজ আরমেনিয়াম ডাচেরা যখন এসেছে, তখন দেখা গিয়েছে, খোদ শঙ্করাচার্যের দেশে, শূদ্রাণীর স্তনে

আবরণ নিষেধ, ব্রাহ্মণের সামনে। সাবধান, ছায়া যেন স্পর্শ না করে। সে তো প্রায় সারা ভারতের ছবি। তবু রাজশক্তির ভয় ছিল বৈ কী! মুসলমান শাসকেরা অনেকে মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। খ্রীস্টানরাও দিয়েছিলেন। তারও আগে বৌদ্ধ জৈনরা। কিন্তু আসল কথাটা ছিল রাজশক্তি। যখন যে-রাজশক্তি আসনে, তখন তার ধর্ম শ্রেষ্ঠতম। নিয়ম তাই। ধর্মের পরে এসেছে রাজনীতি—রাজশক্তির অন্যরূপ—রাজার নাম গণেশ। কারণ তিনি গণনেতা। তাদের সম্প্রদায় নেই, হালফিল বলা হয়, পার্টি। তাদের আছে পার্টি। যে পার্টি যখন আসনে—তখন তার নীতি আদর্শই অমোঘ। আর হরিজনরা?

হরিজনকে যদি প্রলেতারিয়েত্ বলা যায়, তাহলে বিশ্বের শত কোটি প্রলেতারিয়েতের জন্য, অনেক গণেশ, অনেক পার্টি এসেছে, আসবে। কিন্তু কি প্রমাণিত হয়েছে? আর হবে?

আহ্, এ সব কী কথা? এ আবার কী চিন্তা কালকূটের ভাবনায়?

পরের নাট্যে, তুমি কেন নাট হতে যাও? এঁড়ে গরুতে তোমার দরকার কী? তাঁত চালাও, বুনে যাও তাঁতী?

সেই ভালো। ভাবেতে থাকো, ভজনে থাকো। যা তোমার আপন ভাব ভজন। আসলে কথাটা ছিল, সেই সাগর কূলের রূপ আর অরূপের খেলায়, ভিতরের ডাক, আমার তৃষ্ণা। তার বহুদিনের ওপার হতে, এপারের সীমানায়, যা কিছু বিরাজ করে, দেব-দেবী মানব-মানবী তার প্রকৃতি, নানা লীলা। কেন আমাকে ডাকে, আমার নিজের সেই অতৃপ্তি আর তৃষ্ণার মরুকেন্দ্রটি খুঁজে দেখতে ইচ্ছা করে। এক কথায় বলি, সেই কূপেতে নিজেকেই একবার দেখবার বাসনা।

এই ডাকের যাত্রাটাকে, অকাজের যাত্রা বলা যায়। রথ দেখা, কলা বেচা, দুয়ের মাঝে নেই। এবার তাই হুস্ করে হাওয়াই জাহাজে ওড়া না, এমন কি মেল গাড়িতেও না। একটু আলস্যে বিলাসে চলি এক্সপ্রেস গাড়িতে। ভিড়-ভাট্টা নেই, যাত্রীর ওঠা-নামার দৌড়-ঝাঁপ কল-কলরব নেই, অথচ গাড়ি চলছে বিস্তর ঠেক খেতে খেতে, অনেক ইস্টিশন ছুঁতে ছুঁতে। একটা রাত্রি পার করে দিয়েছি। গতকাল দুপুর থেকে সারা দিনটাও।

অলসের পর বিলাসের কথাটাও বললাম, কারণ চলেছি কাস্টোকেলাসে। চার বার্থের এ কুঠরিখানি, আজ সকাল-ইস্তক ভরাট ছিল। এক ভারতীয়

সেনা ছিলেন সপরিবারে। সকালবেলা কুঠরি খালি করে দিয়ে নেমে গিয়েছেন। গোটা কুঠরির মালিক হয়ে একটি কোণ নিয়ে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে একটু লেনা-দেনা চলছে। পানপাত্র থেকে অনেকেই রসে চুমুক দেয়। কিন্তু পাত্র হাতে না নিয়েই আমার চোখ দিয়ে পান করি, আকণ্ঠ ভরে ওঠে, মনে মনে বলি, সব কিছু তফাত যাও, আমি এখন সাগরকূলের যাত্রী। কাজের কাজীর কোনো ধাপ্পা এখানে নেই।

আত্মবিদ্রূপের কথাটা এখানেই এলো। হঠাৎ একটি করুণ মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে, আর সকরুণ অনুরোধ, 'দাদা, গিয়েই পোস্ট করবেন কয়েক পাতা, না হলে মারা পড়ব।'

আহ্, মনে হলো, ঝাপড় মারি নিজের গালে। মন নিয়ে এত কথা, বে-ছন্দে চলি। কিন্তু ভুলে গেলে চলে না সেই প্রবচন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কথাটা তো আর এমনি এমনি মানুষ বানায়নি। মানুষ কোনো কথাই এমনি এমনি বানায় না। বিদ্যাসাগর সেইজন্যই বোধ হয় বলেছেন, ভেতরে ভাব থাকলেও, ভাবার ভাবনা নেই। সে তো ভাবের দাসী। তার অর্থ হলো, যত নিষ্কৃতি চাও, যেখানেই যাও, তোমার কাজ তোমাকে করে যেতে হবে। এই ভাবটি ভেতরে আছে বলেই, ঢেঁকি আর স্বর্গের উল্লেখ।

অতএব সেই 'কয়েক পাতা' লেখবার জন্য এ্যাটাচি কেস্‌টা টেনে নিই। কাগজ কলম সাজিয়ে বসি। ধান ভানতে বসি।

কখন এক সময়ে বাইরের প্রকৃতি থেকে, অন্য জগত নিয়ে অক্ষরমালার সঙ্গে মিশে গিয়েছি, খেয়াল নেই। খানাওয়ালা খাবার নিয়ে ঢুকলো। জানিয়ে দিল, 'সাব্‌ আপকা খানা, দাল রোটি কারি ভাজি—ইয়ে হ্যায় পানী।'

বলে একটি বোতল বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। বাইরে তাকিয়ে দেখি, গাড়ি ইস্টিশনে দাঁড়িয়ে। স্নানাদি সকালেই সারা হয়েছিল। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বাইরের করিডর দিয়ে বাথরুমে হাত ধুতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, কুঠরিতে নতুন যাত্রীর আগমন ঘটেছে। দুই পুরুষ, এক মহিলা। একদিকের পুরো আসনটি ছেড়েই তাঁরা বসেছেন। একজন কুলির মজুরি মেটাতে ব্যস্ত। মেঝেয় ছড়ানো বেডিং স্যুটকেস।

মেজাজ মিয়োনো বলে একটা কথা আছে। আমার সেই রকম মেজাজটা একটু মিইয়ে গেল। পরের সামনে খেতে পারি না, এমন গ্রামীণ গৃহস্থ বধূ আমি না। তবে একেবারে অচেনা লোকের সামনে একটু অস্বস্তি হয়। যদিও দূরপাল্লার গাড়িতে চেপে ও সব মনে রাখলে চলে না। মনে রাখতে হয়,

তুমি আপনার আমি আপনার। তোমরা তাকিয়ে থাকো বা যা খুশি তাই করো, আমার অনিবার্য প্রয়োজন আমাকে মেটাতেই হয়। খাওয়া তেমনি একটি অনিবার্য প্রয়োজন, সবাই তা যে যার মতো মিটিয়ে থাকে। অবিশ্যি সবাই একসঙ্গে খেতে বসলে, এ কথাটা আর মনে আসে না। কিন্তু এ গাড়ি সে গাড়ি না। মেল ট্রেনে খাবার বগী থাকে, এক্সপ্রেসে তা থাকে না।

আমি বেডিং স্যুটকেস ডিঙিয়ে নিজের জায়গায় যাই। দেয়ালের গায়ে হুক দোলানো তোয়ালেয় মুখ মুছে, মুখ ফিরিয়ে খাবার নিয়ে বসি। এই এক দুঃখ, এ পথের যাত্রায় খাবার সুখ নেই, যা থাকে দিল্লী উত্তর প্রদেশের পথে। এ পথে দামে বেশি, কামে কম। কামে কম অর্থে, রান্নার স্বাদ। রান্নার অন্যতম প্রধান ভূমিকা সরষের তেল, দেশের এ সীমানায় তার বিশেষ চল্ নেই। ফলে আসল মারটা সেখানেই। বাঙালীর রসনায় সরষের তেল মানে অন্য এক জিনিস। নিতান্ত দুঃখের বরাত, তাই আমাদের খাঁটি সরষের তেল মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে ব্যাপারীরা টাকা করে, ভেজাল মিশিয়ে তিল তিল বিষে খুন করে না, কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ করে রাখে। তার চেয়ে এক কোপে মারা ভালো, মরা ভালো, প্রতিদিন ব্যাধির জ্বালা থেকে। তাতে কোনো লাভ নেই। তাতে ব্যাপারীর টাকাও হবে না, খুনের দায় আসবে। সরষের তেল দিয়ে কেবল রান্না কেন, কাঁচা সরষের তেল দিয়ে বাঙালী শুধু ভাত মেখে খায়, একটু কাঁচা লংকার টাকনা দিয়ে, তাও দেখেছি। ইদানিং কালের একজন বর্ষীয়ান দিক্‌পাল সাহিত্যিককে দেখেছি দক্ষিণ কলিকাতায় তাঁর রম্যপ্রাসাদে, আধুনিক ডাইনিং রুমে টেবিলে খেতে বসে ঝকঝকে স্টিলের বাটি ভরে সরষের তেল নিয়েছেন, আর আলু সেদ্ধ গরম ভাত, আর কিছু না, একেবারে যাকে বলে কনুই ডুবিয়ে খাচ্ছেন। একটা অক্ষর মিথ্যে না, সত্যি সত্যি কনুই ডুবিয়ে। খেতে খেতে তাঁর কনুই বেয়ে তেল পড়ছিল। অথচ আমাদের পরিবেশন করা হয়েছিল কালিয়া কোপ্তা। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, সরষে কিনে, বিশেষ জায়গার ঘানিতে ভাঙিয়ে নিয়ে আসেন, অতএব নির্ভয়।

শিবের গীত গাইতে আরম্ভ করেছি ধান ভানতে গিয়ে। তবে কী না, এই শুকনো লঙ্কার ঝাঁজ মিশিয়ে, কী এক অদ্ভুত তৈলাক্ত বস্তু দিয়ে রান্নার স্বাদ নিতে, খাঁটি সরষের তেলের স্মৃতি মন্থন না করে পারি না। এ দেশের লোকেরা বোধ হয় কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্নাও জানে না, একমাত্র চিবিয়ে খাওয়া ছাড়া। কোনো রকমে পিত্তি পড়ানো থেকে পাকস্থলীকে রক্ষা করে খাবার থালাকে সরিয়ে দিই। ওদিকে তখন গোছ-গাছের পালা চলেছে। কথাবার্তা যতটুকু কানে এসেছে,

সেটাকে বোধ হয় ঝকঝকে হিন্দীই বলা যায়। ঝকঝকে বলতে, আমরা বাঙলাদেশে পথ-চলতি কাজে-কর্মে যে হিন্দী শুনি, তার থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। বাক্‌ভঙ্গির সুর আর উচ্চারণও ভিন্ন রকম, তার সঙ্গে কিছু ইংরেজির মিশেল আছে। তার থেকে অনুমান হয়, যাত্রীত্রয়ের সঙ্গে নগর জীবনের যোগাযোগ আছে। নাম মাত্র একজনেরই শুনেছি, ইয়াকুব। ইয়াকুব ইয়াকুফ কি না জানি না, তবে ইয়াকুবই য়োরোপের সীমায় পৌঁছলে সম্ভবত জ্যাকব হয়ে যায়। আমার সহযাত্রীরা তাহলে মুসলমান?

ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুমাত্র নেই। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ, যাঁরাই উঠুন, লেখার কাজ আপাতত বন্ধ। তিনজনের কথা-বার্তার মধ্যে, মনোযোগ দেওয়া একটু কঠিন হবে। খাবার শেষ করে এবার সামনে ফিরে বসি। গোছানো-গাছানো সাঙ্গ। বেডিং উঠে গিয়েছে উপরে। বাক্স-প্যাটরা চলে গিয়েছে আসনের নিচে, কিন্তু নিচের আসনে চওড়া শোবার গদী এই দ্বিপ্রহরেই নামিয়ে দেবার কারণ কি? দিবানিদ্রা হবে নাকি?

তাতেই বা আমার কি? আমি হত্যারহস্যের বইটি টেনে নিয়ে সিগারেট ধরাই। গাড়ি ইতিমধ্যে চলতে আরম্ভ করেছিল। বইয়ের দিকে মনোযোগ দেবার আগে, সহযাত্রীদের দিকেও একটু মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। মনোযোগ অর্থে, দৃষ্টিযোগ। একটু বাইরে থেকে দেখা যাকে বলে।

পুরুষ দু'জনকেই মনে হলো সমবয়সী, প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। যদিও হলফ করে তা বলা যাবে না, কমবেশিও হতে পারে। দু'জনেরই পরণে হালফিল সময়ের চলতি ট্রাওজার আর শার্ট। দু'জনেরই দেখছি চুলের বহর বেশ বড়, ঘাড় অবধি বেয়ে পড়া। দু'জনকেই উজ্জ্বল বর্ণ আর স্বাস্থ্যের অধিকারী বলতে হয়। চুলের বড় বহরের মধ্যেও একজনের মাথার মাঝখানে একটু চাঁদির দর্শন মেলে। একজনকে একটু গম্ভীর, আর একজনকে একটু চঞ্চল মনে হয়। চঞ্চলতা চোখের দৃষ্টিতে, মুখের অভিব্যক্তিতে তার, যার চেহারায় স্থূলতা বলে কিছু নেই। অন্য জনকে চেহারায় একটু স্থুল মনে হয়, দৈর্ঘের জন্য তা বেমানান লাগে না।

তৃতীয়জন মহিলা, পা তুলে কোণ নিয়ে জানালা ঘেঁষে বসেছেন। বয়স? নারীর বয়স কি হিসাব করা যায়? বিশেষ করে, যে নারীর মুখে গলায় হাতে পায়ে কোথাও রেখা পড়েনি। শ্রীচরণ থেকে যদি শুরু করা যায় তবে বলি, শ্রীচরণকে যদি পদ্ম বলা যায়, তাহলে এ চরণ যুগল পদ্ম-শ্রী অর্থাৎ পদ্মের শ্রী আছে সুগৌর চরণে, তার সঙ্গে আছে রঞ্জিত নখশ্রী, নখরঞ্জনে। তিনি যা পরে

আছেন, তা বর্ণবিচিত্র। অনেকটা ঢোলা পায়জামার মতো। তার ওপরে যেটা, সেটা নিশ্চয় রঙ-বেরঙের, ছেলেদের হাওয়াই শার্ট না, তবে প্রায় তা-ই। পোশাকটির নাম আমার জানা নেই। জামাটির কাঁধের কাছে কলার না থাকলে বলতে পারতাম, কলকাতায় বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের চৈনিক মহিলাদের গায়ে এ রকম জামা দেখেছি। চৈনিকরাই বা তাঁদের সেই জামাকে কী নামে ভূষিত করেন জানি না। মহিলার চুল মসৃণ কোমল, ঘাড়ের কাছে ইতি। প্রায় গোল ফর্সা তাঁর মুখ, কিন্তু দ্বিগুণ চিবুকের ভাঁজ নেই। নাক টিকলো, চোখ আর ভুরু আঁকা নিঃসন্দেহে, এবং ওষ্ঠ তো বটেই, রঙে রাঙানো। চোখ দু'টিকে ডাগরই বলতে হবে, দৃষ্টি হাতে ধরা ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতায়। ম্যাগাজিন ধরা আঙুলের নখেও, চোখ-সাওয়া-রঙের পালিশ। সারা গায়ে অলঙ্কার নাস্তি, দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি মাত্র। হালফিল এ রকম দেখি, মহিলাদের হাতের ঘড়ি ক্রমে আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঘড়ির বন্ধনী ক্রমেই পাথালিতে বাড়ছে। কামরার মধ্যে যে গন্ধটা ছড়িয়ে গিয়েছে, তা ওঁর পোশাক-আশাক থেকেই নির্গত কী না বলতে পারি না, সন্দেহটা সেই রকম। এঁকে তরুণী বলব কী না বুঝতে পারছি না, অভিজ্ঞতা আন্দাজে বলছে, বয়স ত্রিশের ঊর্ধ্বে।

গম্ভীর ব্যক্তি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। তিনি গম্ভীর বা অন্যমনস্ক কী না ঠিক বুঝতে পারছি না। যার দৃষ্টি আর অভিব্যক্তিতে একটু চঞ্চলতা লক্ষণীয়, তিনি কিন্তু একটি বই হাতে নিয়ে বসেছেন। তথাপি, বইয়ের দিকে যে তার মনোযোগ নেই, চঞ্চলতা সেটাই প্রমাণ করে। একমাত্র তার সঙ্গেই আমার দু'একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। করিডরের সামনে খোলা দরজার দিকে তিনি কখনও ফিরে তাকাচ্ছেন। কখনও বা তার নিজের সঙ্গীদের দিকে। আবার কখনও বইয়ের দিকে।

একে সরেজমিন তদন্ত বলে না। একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া। এবার আমি বইয়ের দিকে মনোযোগ দিই, সে সময়েই মহিলার স্বর শুনতে পাই। তিনি হিন্দীতে যা বললেন, তার বাঙলা মানেটা এই রকম দাঁড়ায়, 'কী হলো বের করলে না?'

গম্ভীর বা অন্যমনস্ক ব্যক্তি বললেন, 'তোমরা বললেই বের করতে পারি। কিন্তু তোমরা তো বই নিয়ে বসে গেলে।'

মহিলা ম্যাগাজিনের পাতা বন্ধ করে রেখে দিলেন। পুস্তক-পাঠকও বইটি আসনের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, 'বের করে ফ্যালো, বসা যাক।'

মহিলা বললেন, 'হাফেজ, তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

বলেই তিনি চকিত দৃষ্টিপাতে একবার আমার দিকে দেখলেন। পুস্তক-পাঠক, চঞ্চল-দৃষ্টি পুরুষ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ করছি।'

হাফেজ কে, জানা গেল। বাকি পুরুষটি যিনি, তিনি ওপরের বার্থে রাখা মহিলারই ব্যাগ খুলে কি যেন বের করছিলেন, অনুমান করছি, তিনিই তাহলে ইয়াকুব। বুঝতে পারছি না, কি বের করা হচ্ছে, দরজা বন্ধ করারই বা কি দরকার হয়ে পড়লো। মহিলার স্বর আবার শোনা গেল, 'সাহাব, আমার ব্যাগটা আমার কাছেই নামিয়ে দাও।'

সম্বোধনে সাহাব, সম্পর্কটা কি? নিজেকেই বিদ্রূপ করতে ইচ্ছা হলো, কৌতূহল যদি দমন না করতে পারো, জিজ্ঞেস করলেই হয়। ছি ছি ছি, তাই আবার কখনও করা যায় নাকি? সম্মান দেখানো হতে পারে, প্রীতিবশতও সাহাব সম্বোধন হতে পারে, কিংবা হয়তো আরো কিছু। যা আমার জানার নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। দেখলাম ইয়াকুব সাহাব ব্যাগ থেকে দু'বাক্স তাস বের করে ব্যাগটি নামিয়ে দিলেন মহিলার সামনে। ইয়াকুব সাহেব একবার আমার দিকে দেখলেন, তারপরে মহিলার দিকে। মহিলা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। দু'জনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। ইয়াকুব প্যাকেট থেকে তাস বের করে কায়দা মতো এলোমেলো করতে লাগলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে সাফ্‌ল করা। হাফেজ দরজা বন্ধ করে বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, 'আরে ইয়ার, তাসগুলোকে একেবারে নয় ছয় করে দিও না, ওদের একটু নিজেদের মতো থাকতে দাও না।'

মহিলা হাফেজের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তারপরে ব্যাগের ভিতর থেকে বের করলেন কিছু টাকার নোট আর খুচরো পয়সা। হাফেজও বুকপকেট থেকে টাকা পয়সা বের করে আসনের ওপর রাখলেন।

ইয়াকুব বললেন, 'ভুলেই গেছি।' বলে উরত-পকেট থেকে বের করলেন একটি মোটা চর্ম-পেটিকা, মানিব্যাগ পার্স, যা-ই বলা যাক তাকে, সেটা খুলে কিছু টাকা পয়সা বের করে তিনিও রাখলেন আসনের ওপর।

মহিলা তখনও টাকা পয়সা হাতেই রেখেছেন। বললেন, 'আমি মাঝখানটায় বসি, তোমরা দু'জনে দু'দিকে বস।'

এরপরেও আর বুঝতে বাকী থাকে না, আয়োজনটা কিসের। কেনই বা প্রথম থেকেই শোবার চওড়া গদীটি ট্রেনে নামানো হয়েছে। বোধ হয় ঠিক ছিল আগে থেকেই, খেলা হবে। মহিলা দেওয়াল ঘেঁষে মাঝখানে সরে

বসলেন। ইয়াকুব আর হাফেজ, পাশ ফিরে মুখোমুখি। চওড়া গদীর ওপর মোটামুটি তিনজনে বসে খেলা যায়। তবে খেলাটা একেবারে নির্জলা না, উত্তেজনার খোরাক হিসেবে পয়সার বাজীর খেলা। তাতে বোধ হয় খেলার দায়িত্ব বাড়ে, প্রতিযোগিতা জমাট বাঁধে।

আমি চোখ সরিয়ে নিয়ে এসেছি বইয়ের দিকে। সে সময়েই শুনতে পেলাম, ঝকঝকে ইংরেজিতে, 'যদি কিছু মনে না করেন, স্যার, আপনি কি খেলতে উৎসাহী।'

জিজ্ঞাসাটা কি আমাকেই নাকি? চোখ তুলে তাকালাম। তিনজনেই আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনজনের মুখেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে একটু ভদ্রতার হাসি। ইয়াকুব সাহেবের হাসিটিই একটু বেশি বিস্তৃত, জিজ্ঞাসাটা বোধ হয় তিনিই করেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসাটা এতই আকস্মিক এবং অভাবিত, হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। তা ছাড়া জবাব দেবার আগে নিজের গুণের কথাটাও তো ভাবতে হবে। বলব না যে, ও রসে আমি একেবারেই বঞ্চিত গোবিন্দদাস। তবে রসের দু-এক ধারায় ভাসতে পারি, তার বেশি না।

আমার কুণ্ঠা বিব্রত ভাব দেখে তিনজনেই নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইয়াকুব সাহেব বললেন, 'অবিশ্যি, আপনার যদি আপত্তি থাকে—।'

আমি তাড়াতাড়ি ইয়াকুব সাহেবের ভাষাতেই জবাব দিই, 'না না, আপত্তির কোনো প্রশ্ন নেই। আসলে তাস খেলার ব্যাপারে আমি খুবই আনাড়ি, আর জানি মাত্র দু'একটি খেলা।'

মহিলা হঠাৎ হেসে কিছু একটা বললেন দু'জনের দিকে তাকিয়ে, তারপরে তাঁর রাঙানো নখর-আঙুল দিয়ে ঠোঁট চেপে আমার দিকে তাকলেন। সাহেবদ্বয় হেসে উঠলেন, এবং যিনি হাফেজ, তিনি ইংরেজিতে যা বললেন, তার বাঙলা করলে দাঁড়ায়, জেসমিন একজন প্রকৃত শোষক।

জেসমিন! সুন্দর নাম। এবার মহিলার নামটিও জানা গেল। জেসমিন মানে কি জুঁই? বোধ হয়। জুঁইয়ের রূপ আর গন্ধের সঙ্গে বাঙালীর দুর্বলতা গভীর। ইয়াকুব আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, ইনি (জেসমিনকে দেখিয়ে) জেসমিন—আমার স্ত্রী, বলছেন, আপনার মতো আনাড়ি খেলোয়াড়ই ভালো, বেশ ভালো করে আপনার পকেট শোষণ করা যাবে।'

জেসমিন আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। আমি হেসে উঠে কেতার সঙ্গে মিসেস ইয়াকুবকে বললাম, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে, ধন্যবাদ।'

তিনজনেই হাসিতে বেজে উঠলেন এবং আমিও। হঠাৎ-ই যেন আমাদের অপরিচয়ের আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটে গেল। বলতে হবে, তা সম্ভব হলো ওঁদেরই অগ্রসরতায়। ইয়াকুব আবার বললেন, 'আমার নাম এম. কে. ইয়াকুব, ইনি আমার বন্ধু, ইউ. এল. হাফেজ। আর আমার স্ত্রীর কথা আপনাকে আগেই বলেছি।'

ইয়াকুব সরাসরি নিজেদের পরিচয় দিয়ে দিলেন এবং হাফেজ সাহেব ও জেসমিন বিবি একসঙ্গেই প্রায় মার্কিন কেতায় ঘাড় বাঁকিয়ে আওয়াজ দিলেন, 'হেলো!'

অর্থাৎ নমস্কার জাতীয় সম্বোধন। অতএব আমার নিজের নামটাও বলতে হলো।

হাফেজ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বাঙালী, নিশ্চয় কলকাতা থেকে আসছেন?'

বাঙালীরা আর কোথা থেকে আসে—আমার মতো ঠেট্ বাঙালী। বললাম, 'হ্যাঁ, আমার গন্তব্য বম্বে।'

ইয়াকুব বললেন, 'আমাদেরও। ভালোই হলো, শোবার আগে পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে খেলে গল্প করে কাটাতে পারবো।'

জেসমিন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাফ করবেন, যে দু'একটি খেলা আপনি জানেন বলছিলেন, সেগুলো কী?'

সেখানেই তো গলদ। মুখ খুলতে গেলেই এ কেরামত আলীর কেরামতি সব বেরিয়ে পড়বে। তবু বলতে তো হবে। সংকোচের সঙ্গে বললাম, 'দয়া করে হাসবেন না, আমি জানি ব্রে আর ফিশ।'

জেসমিন বিবি একটু হতাশ বিস্ময়ে বললেন, 'ব্রিজ বা ফ্লাশ জানেন না?'

আগেই জানতাম, খেলাব বিষয়ে হতাশ করা ছাড়া আমি আর কিছু করতে পারি না। বিবির কথায় আরো সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, 'ফ্ল্যাশটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে অন্ধ খেলা খেলতে পারি।'

ইয়াকুব আর হাফেজ হাসলেন। হাফেজ বললেন, 'ফিশ চলুক না।'

জেসমিন বললেন, 'চলুক। ফিশ খারাপ না।'

খারাপ না ঠিকই, কিন্তু আমি ডুবে জল খেতে পারি না, শেষ পর্যন্ত ডাঙায় পড়ে না খাবি খেতে হয়। কিন্তু এখন আর তা ভাবতে গেলে চলে না। সব কিছুরই তাল আছে, লয় আছে, ঠোকা দিয়ে ঠিক মতো বাজাতে হয়। ডাক দিলে সাড়া না দিয়ে উপায় কী। তা না হলে ভদ্রতা আর কাকে বলে। তুমি

মুখ ফিরিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারো, সেটা সব থেকে সহজ কাজ। তার মধ্যে আনন্দ নেই। দশের মধ্যে নিজেকে একঘরে রাখা, দলছুট বিষণ্ণতায় ভুগতে হয়। তার চেয়ে সাড়া দিয়ে দুঃখের ভাগীদার হওয়া ভালো। তা ছাড়া, এই খুপরির মধ্যে বসে বই নিয়ে নিরঙ্কুশ মনোযোগ দিতে পারতাম কী? মন আর নজর নিয়ে টানাটানি হতো। মন আর নজর থাকলেই, তা হয়ে থাকে। অতএব খেলোয়াড়দের মতো আমিও পকেট থেকে টাকা বের করি।

ইতিমধ্যে চারজনের ঠিক মতো বসা নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, ইয়াকুব সাহেব সেটি সমাধান করেছেন। আসনের নিচে থেকে টেনে বের করেছেন স্টীলের ট্রাংক। সেটিতে বসে খেলতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি ট্রাংকের দিকে এগিয়ে গেলাম, ইয়াকুব বাধা দিলেন, গদীর ডানদিকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনি ওখানে উঠে বসুন, আমি ট্রাংকের ওপর বসব, জেসমিনের মুখোমুখি।'

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, বললাম, 'আপনি ওখানে বসুন, আমি এখানে বসেই বেশ খেলতে পারবো।'

ইয়াকুব বললেন, 'পারবেন, আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু ট্রাংকটা একটু নিচু। আমি লম্বা আছি, আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

সে কথা হাজারবার মানতে হবে। এই দুই পুরুষের তুলনায়, আমার খাটোত্ব একেবারে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। এ শরীর জন্মসূত্রে পাওয়া, বাবা মায়ের কাঠামোটা ছেড়ে আসার উপায় কী। অতএব আমি গদীতে উঠে জেসমিন বিবির বামে বসলাম। তাঁর দক্ষিণে হাফেজ এবং মুখোমুখি ইয়াকুব। তাস কেটে দিলেন হাফেজ, দ্রুত হাতে বাটলেন ইয়াকুব।

জেসমিন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো বোর্ড মানি নেই তো?'

ইয়াকুব বললেন, 'না। বোর্ড তো আমাদের নিজেদেরই, অন্যের বোর্ডে বসে আমরা খেলছি না।'

প্রথম চিত-করা তাসটি দেখলাম, ইসকাবনের বিবি। অতএব জোকার হলেন রাজা। তাস দেখতে গিয়ে সকলের মুখের দিকে একবার দেখলাম। জেসমিন বিবির ঠোঁটের কোণে হাসি, চোখের কোণ দিয়ে একবার দেখলেন হাফেজের দিকে। ইতিমধ্যে আমার স্নায়ুতে চাপ পড়তে আরম্ভ করেছে।

ইয়াকুব বললেন, 'প্রতি পয়েণ্টে পাঁচ পয়সা।' বলে তিনি জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম, কারণ হাঁড়িকাঠে মাথা গলানো জীবের থেকে

আমার অবস্থা ভালো না। দু'চারবার যা খেলেছি, জয়ের টিকা কখনও আমার ললাটে পড়েনি, আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গিয়েছে। আর হারলেই আমার মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। অনুশোচনায় ভুগি। তবে ভোগান্তিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, এটাই যা রক্ষে।

খেলা শুরু হলো। সিগারেট জ্বললো, আমার আর হাফেজের। ইয়াকুব খেলতে ব্যস্ত। তাস তোলা আর ফেলা নিয়ে, এ ওকে, ও তাকে, কিছু কিছু আন্দাজের মার দিতে লাগলেন। জেসমিন বিবি হঠাৎ আমাকে বললেন, 'দুটো জোকার খেয়ে তো বসে আছেন, ফেলুন না।'

আশ্চর্য! সত্যই তো! কি করে বিবিজী জানলেন? প্রবৃত্তিবশতই তাড়াতাড়ি হাতের তাস সরিয়ে নিলাম। জেসমিন খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'না না, আমি আপনার তাস দেখিনি, ওটা আমার স্পেকুলেশন।'

আমি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি আবার হাত এগিয়ে নিয়ে এলাম। বললাম, 'না না, আপনি দেখেছেন, তা বলছি না।'

ইয়াকুব আমাকে বললেন, 'কিন্তু স্যার, আপনার আচরণেই আপনি ধরা পড়ে গেছেন, জেসমিন বোধহয় ঠিকই বলেছে।'

হাফেজ বললেন, 'সে কথা তোমার শোনবার দরকার নেই। ওঁর খেলাটা ওঁকেই খেলতে দাও।'

জেসমিনের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার স্পেকুলেশন তোমার মনে মনেই রাখো, প্রকাশ করবার দরকার নেই। মনে রেখ স্পেকুলেশন আমাদেরও কিছু আছে।'

জেসমিন হেসে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, অত ওস্তাদি করতে হবে না। দেখবো, তুমি কখনও মুখ খোলো কী না।'

জেসমিন আমার বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা একেবারে অব্যর্থ। দুটি জোকার আমার হাতে, ছ'টি তাস পেকেছে। বাকী দুটোর জন্যই আমার যতো হাঁসফাঁস। কিন্তু একবার জানাজানির পরে আর ধরে রাখতে সাহস পেলাম না। হাতের দান আসতেই, ছ'টি তাস নামিয়ে দিলাম। জেসমিন আমার দিকে চোখের তারা আর পাতা কাঁপিয়ে হাসলেন, বক্তব্য, কী রকম বলেছিলাম?

তারপরেই জেসমিনের হাতের দান যখন এলো, তিনি সাতটি তাস নামিয়ে দিলেন এবং ঠোঁট কুঁচকে, শরীরে একটি বক্র ভঙ্গিমায়, চোখের পাতা নামিয়ে রাখলেন। হাফেজ গদীতে চাপড় মেরে বললেন, 'একে বলে ডাকিনীতন্ত্র।'

জেসমিন চোখ ঘুরিয়ে বললেন, 'ওটা আমি ভালোই জানি, তুমি জানো।' বলতে বলতেই, তাঁর চোখে যেন একটি ইশারার ঝিলিক হেনে গেল।

হাফেজ চকিতে একবার তাকালেন ইয়াকুবের দিকে। ইয়াকুব তখন ভুরু কুঁচকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নিজের হাতের তাস আর আমাদের নামিয়ে দেওয়া তাসের দিকে দেখছেন। তারপরেই তিনটি তাসের সঙ্গে বাকী দুটি তাসের একটি আমার সঙ্গে আর একটি জেসমিনের তাসের সঙ্গে গুঁজে দিলেন। হাফেজ ঠোঁট উল্‌টে ঘাড় নাড়লেন, আর জেসমিন যেন ইয়াকুবের তাস নামাবার অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁর হাতেই অবশিষ্ট তাসটি আমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখা ইয়াকুবের তাসের পাশে গুঁজে দিলেন। হাফেজ বললেন, 'সাপের দংশন।'

জেসমিন ঘাড়ের চুলে ঝটকা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'আমি জানতাম, ইয়াকুব সাহেব তাস নামালেই আমি শেষ তাস নামাতে পারব, ওঁর সঙ্গেই আমার ভাগ্য জড়ানো ছিল।'

ইয়াকুব হাতের তাস ফেলে দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে জেসমিনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, 'সত্যি?' বলেই চোখ নামিয়ে পয়সা গুনতে লাগলেন।

জেসমিন আর হাফেজ দ্রুত একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। দেখলে মনে হয়, সেই দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে যেন বিশেষ কোনো কথাও বিনিময় হয়ে গেল। কিংবা তা না-ও হতে পারে, আমার দেখার মধ্যেই হয়তো ভুল।

জেসমিন বললেন, 'তাস তাই প্রমাণ করে দিল।'

ইয়াকুব টাকা পয়সার হিসাব করতে করতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তাসের প্রমাণ?'

'হ্যাঁ, তা বটে! তাস খেলার ভাগ্য আমার খুব খারাপ না।'

জেসমিন বললেন, 'আপনার কথা বলিনি, আমার ভাগ্যের কথা বলছি।'

ইয়াকুব সে কথার জবাব না দিয়ে সামান্য কম দু'টাকা আগে দিলেন জেসমিনকে, একই হিসাবে আমাকেও দিলেন। সেই ফাঁকে জেসমিন একবার হাফেজের দিকে তাকালেন। হাফেজ তখন তাঁর তাসের হিসাব করে টাকা গুনছেন। কেন যেন বারেবারেই, আমার মনের মধ্যে মিঁয়া বিবির কথাগুলো পাক খেয়ে খেয়ে অন্যমনস্ক করে দিতে লাগলো। সেই সঙ্গে বিবির সঙ্গে হাফেজের দৃষ্টি বিনিময়টাও আমার মনে জেগে রইলো। সঙ্গত কোন কারণ

থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কৌতূহল নিশ্চয়ই অহেতুক, রীতিবিরুদ্ধও। ভাগ্য ভালো, মনের কথাটা ছবির মতো ওর চোখের সামনে জেগে ওঠে না।

আমি আমার তাসের হিসাবে আশী পয়সা জেসমিনকে দিলাম। জেসমিন ঘাড় কাত করে বললেন, 'ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে যতোটা আনাড়ি ভাবা গেছলো, আপনি তা নন দেখছি।'

বললাম, 'প্রথম হাতেই রায় দেবেন না। আমার হাতে দুটো জোকার ছিল, সে হিসাবে আমি কুশলী খেলোয়াড় না। কিন্তু আপনার স্পেকুলেশনেই বুঝেছি, আপনি আমাকে নখে টিপে মারতে পারেন।'

হাফেজ সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে পুরো দিশি বচনে বললেন, 'বাহ্ সাব্ বাহ্, কেয়াবাত? ইস্‌সে বড়া বাত নহি।'

জেসমিন হেসে উঠে বললেন, 'আরে পয়সা তো ছাড়ো জী।'

ইয়াকুব সাহেব তখন তাস ভাঁজছেন। হাফেজ আমাদের তিন জনকে দিলেন প্রায় চার টাকা করে। দেখে আমার পিপীলিকা-প্রাণ ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হলো। জানি ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, এমন দিন সবারই আসে। এখন হাত বাড়িয়ে টাকা নিতে বড়ই ভালো লাগছে। দেবার সময়ও ভালো লাগবে তো? কেন যে লাগে না, বুঝি না। বোধ হয় মনটা খাঁটি খেলোয়াড়-সুলভ না।

জেসমিন তাস কেটে দিলেন। হাফেজের বাটা। জেসমিন তাস বাটার দিকে চোখ রেখে বললেন, 'খোদা যেন তোমার হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখেন।'

হাফেজ বললেন, 'আগে তাস দেখ, তারপরে বল।'

জেসমিন বললেন, 'তোমার হাত দিয়ে আমার হাতে কখনও খারাপ তাস আসবে না।'

হাফেজ বললেন, 'এতটা আশা কোরো না।'

জেসমিন বললেন, 'দেখা যাক।'

ইয়াকুব সাহেব একটি একটি করে তাস তুলে নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে সাজাচ্ছেন। জেসমিনবিবির পোশাক থেকে বিদেশী সুগন্ধির গন্ধ ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ তিনি বাঁ দিকে, অর্থাৎ আমার দিকে, হাঁটু পিছনে মুড়ে বসেছিলেন, অতএব তাঁর রাঙানো নখযুক্ত শ্রীপদ্ম আমার দিকে ছিল, তাঁর শরীরের সম্মুখ ভাগ অনেকটা হাফেজের দিকে। এবার তিনি আসন পরিবর্তন করলেন। তাঁর সম্মুখভাগ কিছুটা আমার দিকে ফিরলো, কিন্তু পদযুগল স্পর্শ

করলো হাফেজের কোমরের কাছে। আমি তাস তুলে নিলাম। প্রথম চিত করা তাস রুহিতনের টেক্কা। জোকার তবে ছুরি।

খেলা চলতে লাগলো। প্রথম দিকে, আমার হারজিত একটা সমতা রক্ষা করে চলতে লাগলো। কিন্তু ক্রমেই আমার অন্যমনস্কতা বাড়তে লাগলো। একবার জোকার হলো টেক্কা, তাস কেটেছিলেন হাফেজ সাহেব, চিত করে দিয়েছিলেন চিড়িতনের রাজা। প্রথম তাস তুলেছিলেন জেসমিন, আর চকিতেই সেটা পাশ ফিরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে, হরতনের টেক্কা।

ইয়াকুব সাহেব বলে উঠেছিলেন, 'কি ব্যাপার, তুমি কি বাঙালী সাহেবের সঙ্গে তাস দেখাদেখি করে খেলছো নাকি?'

জেসমিন হাফেজকে আড়াল করে তাসটা ইয়াকুবকেও দেখিয়েছিলেন। ইয়াকুব ইংরেজীতে যা বলেছিলেন, তার বাংলা হল, সুন্দর! খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

জেসমিন হেসে ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তাৎপর্যপূর্ণ কেন?'

ইয়াকুব বলেছিলেন, 'তুমি তা ভালোই জানো।'

হাফেজ জিজ্ঞাসু কৌতূহলিত চোখে সকলের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তারপরে দাবী করেছিলেন, 'এটা খুব অন্যায়। জেসমিন সবাইকে তাসটা দেখাচ্ছে, কিন্তু আমাকে নয় কেন?'

ইয়াকুব জবাব দিয়েছিলেন, 'তোমাকে দেখালে, সব আনন্দ মাটি।'

জিসমিন ফিক করে হেসে উঠে হাফেজের দিকে তাকিয়েছিলেন। হাফেজ একটু জেদ করে বলেছিলেন, 'কেন, আনন্দ মাটি হবে কেন? তা বললে আমি শুনবো না। সবাই যখন তাসটা দেখেছে, তখন আমিও নিশ্চয়ই দেখবো।

ইয়াকুব বলেছিলেন, 'না দেখলেও তোমারই জিত হয়েছে, মনে করো।'

হাফেজ একটু বিভ্রান্তভাবে জেসমিনের দিকে তাকিয়েছিলেন। জেসমিন ঠোঁট টিপে হেসে চুপ করে ছিলেন। তারপরে ইয়াকুবের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'হাফেজের না, জিতটা আমারই।'

ইয়াকুব বলেছিলেন, 'কিন্তু তাস কেটেছে হাফেজ, ওর হাত দিয়েই ওটা তুমি পেয়েছো।'

জেসমিন ঘাড় কাত করে বলেছিলেন, 'সেটা কি ওর জিত বোঝায়?'

ইয়াকুব জেসমিনের চোখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে ছিলেন, তারপরে হেসে উঠেছিলেন, সে হাসিটা অবিমিশ্র আনন্দের ধারায় ভাসেনি, কেমন

একটা ক্লান্তি যেন ফুটে উঠেছিল। জানি না, ঠিক দেখেছিলাম কি না। আমার চোখের সামনে একটি রক্ত রঙ হরতনের ছবি ভাসছিল। ইংরেজিতে যাকে বলে হৃদয়। হাফেজ তাস বেটে অবশিষ্ট তাস থেকে একটি চিত করে দিয়েছিলেন, যেটি ছিল রাজা। অতএব টেক্কা-ই জোকার। প্রথম তাস টেনেছিলেন জেসমিন, সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যের সূচনা, টেক্কা পেয়েছিলেন, আর সেটি হরতনের টেক্কা, যার অর্থ একটি হৃদয়। তৎক্ষণাৎ আমাকে দেখিয়ে ছিলেন এবং পরে ইয়াকুব সাহেবকেও। বাদ কেবল হাফেজ। এই বাদ দেওয়া আর ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে জেসমিন বিবির কথাবার্তা, এবং ইয়াকুব সাহেবের স্থির চোখে তাকিয়ে ক্লান্ত হেসে চুপ করে যাওয়া, আমাকে যেন অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। অন্য এক দিগন্তে চিন্তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। ইয়াকুব সাহেবের মতে, সৌভাগ্যটা জেসমিনের না, হাফেজের। কেন? সহজ ভাবে দেখতে গেলে তো, সৌভাগ্যটা জেসমিনেরই। আমার সামনে বসে তিনে মিলে, কি এক রহস্যের খেলা খেলে যায়, আমি তার থেই ধরতে পারি না। রহস্যটা কি হৃদয়-ঘটিত? মিঁয়া বিবির রকম এক। আর এক বিবির সঙ্গে হাফেজের রকম সকম আর এক। আপনা থেকে দুয়ার না খুললে, এ দুয়ার আমি হাত দিয়ে খুলতে পারি না। নতুন পরিচয়, কোনো পশ্চাদ্‌পট আমার জানা নেই।

আমি তাস তোলবার আগেই হাফেজ বললো, 'কিন্তু এটা তোমাদের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। কি একটা ঘটে গেল, আমি জানতে পারলাম না।'

'নীতিবিরুদ্ধ?' বলে, ইয়াকুব সাহেব হাস্য করলেন উচ্চরবে। আবার বললেন, হাফেজ, 'নীতিবিরুদ্ধ বলতে তুমি কি বোঝো একটু বলে দাও।'

জেসমিন বিবি তাঁর রাঙানো ঠোঁট টিপে টিপে হাসেন, দৃষ্টি তাসের দিকে। হাফেজের দৃষ্টিতে এখন একটা জিজ্ঞাসা আর বিভ্রান্তি। জেসমিন বললেন, 'শুনেছি, পৃথিবীতে কিছু কিছু ব্যাপার আছে, সেখানে নিয়ম নীতির মানামানি নেই।

ইয়াকুব ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সেটা হলো যুদ্ধ আর প্রেম।'

জেসমিন আর ইয়াকুবের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো। ইয়াকুব জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক বলেছি জেসমিন?'

জেসমিন তাঁর কাজলদীপ্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'আপনি কি বলেন?'

আমি সত্য ভাষণের আশ্রয় নিয়ে বললাম, 'মিসেস ইয়াকুব, আমি নিজেকে একজন দর্শক আর শ্রোতা মনে করছি। নাটকের সব ঘটনা আমার জানা নেই, কুশীলবদের কথা শুনছি মাত্র। কি মন্তব্য করব, বলুন।'

'চমৎকার!' জেসমিন চোখে-মুখে হাসির ঝলক তুলে তাঁর রাঙানো নখ, সুন্দর দক্ষিণ হস্তটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, আবার বললেন, 'আপনাকে প্রশংসা না করে পারছি না, সুন্দর কথা বলেছেন।'

প্রশংসার সঙ্গে এই স্পর্শের দানটুকুও আমার পাওনা? রূপসীর হাত, কেতার কথা বাদ, প্রত্যাখানের কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না, যদিও চকিতেই আমার চোখে ভেসে উঠলো কৃষ্ণকান্তের উইলের সেই দৃশ্য, উড়িয়া মালী যেখানে শান বাঁধানো ঘাটের ওপর, অচেতন রোহিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। জলে ডোবা রোহিনীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য, তার মুখের কাছে ফুঁ দিতে মালীর সাহস হয় না, যদি রোহিনী তার বঙ্কিম চোখে সহসা রোষ কটাক্ষ হানে।

এদিকে তাসের খেলা বুঝি রসাতল, খেলা অন্যদিকে বহে। জেসমিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাঙালী মহাশয় কি কবি?'

আমি তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বললাম, 'বিশ্বাস করুন, আজ পর্যন্ত আমি একটিও ছন্দ আর ভাষা মেলাতে পারিনি।'

জেসমিন খিলখিল করে হেসে উঠে ইয়াকুবের দিকে তাকালেন। ইয়াকুব আস্তে আস্তে ঘাড় ঝাঁকালেন। জেসমিন আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি শুধু সুন্দর কথা বলেননি, একটি সুন্দর সত্যি কথা বলেছেন, নাটকের ঘটনা জানেন না, কুশীলবদের কথা শুনেছেন মাত্র।' বলেই তিনি রেশম কালো চুলে একটি ঝটকা মেরে হাফেজের দিকে ফিরে, সেই হরতনের টেক্কাটি দেখিয়ে বললেন, 'তুমি রাজা চিত করেছিলে, তারপরেই তাস টেনে আমি এইটি পেয়েছি। এবার খেলা শুরু করো।'

আমার মনে হলো মুহূর্তের মধ্যে হাফেজের দৃষ্টি বদলে গেল। দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা, না মুগ্ধতা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু জেসমিনের দিক থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে সময় লাগছে। জেসমিন তাকালেন ইয়াকুবের দিকে। ইয়াকুব আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'আপনি তাস তুলেছেন, এখনও ফেলেননি স্যার।'

আমি ত্রস্ত লজ্জায় হেসে তাড়াতাড়ি হাতের তাসের দিকে তাকালাম। কোন্ তাস তুলেছি তাও মনে করতে পারছি না, দু' সেকেণ্ড দেখেই একটি তাস ফেলে দিলাম। ইয়াকুব সাহেব নিজের হাতের তাস দেখে আমার ফেলে দেওয়া তাসটি কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ স্যার।'

হাফেজের খেলায় তেমন মনোযোগ নেই, তবু খেলা চলতে থাকে। কোনো একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে, ক্যাটারিং বেয়ারা দুটি ট্রে নিয়ে ঢুকল।

বৈকালিক চা। দুপুরে খাবার সময়েই বলা ছিল। খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ। আমার বলা ছিল শুধু চা। ওঁদের এসেছে ডিম মাখন রুটি আর চা। বণ্টনের দায়িত্ব নিলেন জেসমিন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। একটু আড়মোড়া ভাঙা। তারপরে চা ঢালতে বসলাম আমার নিজের আসনে সরে গিয়ে।

জেসমিন বললেন, 'শুধু চা খাবেন না, একটু খাবার নিন।'

বিনয় করেও সত্যি বললাম, 'ধন্যবাদ, মাফ করবেন, এ সময়ে আমি কিছুই খাই না এবং সেটা ভদ্রতা করে বলছি না।'

'ঠিক তো?' জেসমিন ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন, দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস।

আমি বললাম, 'তাহলে তো আমি খাবার দিতেই বলতাম।'

জেসমিন বললেন, 'ঠিক আছে, আমি দেখব কোন্ সময়ে আপনি কী খান।'

কথার মধ্যে একটু যেন বক্রতা, ইতির শেষে কিছু থেকে যাওয়ার মতো। হাফেজ আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'এদিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন?'

বলে, সে গদীর ওপরে জেসমিন আর ইয়াকুবের টাকার দিকে দেখালো। দেখবার মতোই। এখন বিকেল পাঁচটা। যদিও আমাদের গতি, সূর্য অয়নের বিলম্বিত চক্রের দিকে। বিকেল পাঁচটা যেন কলকাতার প্রায় চারটের মতো মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই যতো টাকা নিয়ে প্রথমে বসেছিলাম, তার প্রায় সমুদয় মিয়াঁ-বিবির তহবিলে চলে গিয়েছে। আমার একলার না, হাফেজের তহবিলও। প্রথম দিকে যদিও বা কয়েক হাত দিয়ে নিয়ে চলছিল, পরে আর তা হয়নি। তারপর থেকে শুধু দিয়ে যাওয়া। খেলার ভাগ্য কখন থেকে জেসমিন আর ইয়াকুবের দিকে সম্পূর্ণ চলে গিয়েছিল, খেয়াল করিনি। তবে দিয়ে চলেছিলাম, সেটা মনে ছিল। এ অভিজ্ঞতা আমার নতুন না। জুয়ায় আমি বরাবর হারাধন।

জেসমিন ঘাড়ে দোলা দিয়ে চোখের তারা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আফশোস হচ্ছে হাফেজ সাহেব?'

হাফেজ বললেন, 'মোটেই না। খেলায় হারজিত আছেই।'

ইয়াকুব বললেন, 'বিশেষত জুয়ায়। জুয়ার হারজিতের মধ্যে, কিছু কিছু প্রবচন আছে।' বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। একটু হেসে তাঁর ভাগের রুটিতে কামড় বসালেন। জেসমিন আর হাফেজ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ইয়াকুব আমার দিকে তাকিয়েই বললেন, 'আমি বম্বেতে ব্যবসা করি, হাফেজও তাই করে। আপনি কী করেন।'

আমি? ইয়াকুব আগেই নিজের জীবিকার কথা বলে নিলেন প্রথানুযায়ী, অতএব আমাকেও তারপরে বলতে হয়। কিন্তু সব জায়গায়, সব সময়ে সত্যি ভাষণ করতে ইচ্ছা করে না। সম্ভবত তাতে অপরিচয়টাই বাড়ে। যে-অর্থে আমি মসীজীবি, সেটা হয়তো এঁদের কাছে অর্থহীন মনে হবে। এমন আশা করতে পারি না যে, এঁরা আমার ক্ষুদ্র রচনার সঙ্গে পরিচিত। নামটাও হয়তো জীবনে কখনো শোনেননি। বললাম, 'আমি চাকুরিজীবি।'

জেসমিন বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি শিল্পী।'

ইংরেজিতে বললেন, 'আর্টিস্ট।' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শিল্পী? কী রকম?'

জেসমিন নিজেকে পরিষ্কার করার জন্য হঠাৎ যেন কথা খুঁজে পেলেন না। বললেন, 'এই ধরুন, মানে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এক একজনকে দেখলে মনে হয়, ইনি বোধ হয় একজন শিল্পী। আপনি কবিতা লেখেন না আগেই বলেছেন। শিল্পী অনেক রকম হতে পারে, যেমন ধরুন গায়ক বা আর কিছু, হয়তো ছবি আঁকেন।'

আশ্চর্য, সেসব কি চেহারায় বা গায়ে লেখা থাকে নাকি? আমার চোখের সামনে অনেক গায়ক, চিত্রাঙ্কন-শিল্পীর চেহারা ভেসে উঠলো। তাদের কারোর সঙ্গে কোথাও নিজের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না, বা তাঁদের গায়েও কোথাও শিল্পীর বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তবে হ্যাঁ, কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসের কথা আমার মনে পড়ছে, যেখানে বলতে গেলে গায়েই শিল্পীর লক্ষণ থাকে, দেখলেই তা মনে হয়। কিন্তু সেটা নিতান্ত কলকাত্তাই—যাকে বলে বাঙালী শিল্পীর লক্ষণ। সে কথা ওদের বলে লাভ নেই, কারণ তা একান্তভাবে প্রাদেশিক।

আমি হেসে বললাম, 'না, সেরকম কিছু আমি নই।'

ইয়াকুব বললেন, 'আমিও প্রায় জেসমিনের মতোই ভেবেছিলাম। যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি যে কথা জিজ্ঞেস করছি, তার সঙ্গে পেশা বা জীবিকার কিছু যায় আসে না। নিতান্তই একটু হাল্‌কা মেজাজী গল্প করা যাক, অন্য ভাবে নেবেন না, কিন্তু কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবেন। আপনার প্রেমের ভাগ্য কেমন?'

প্রেম! আমার প্রেমের ভাগ্য! হঠাৎ, কথা কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে চলছে তার সর্পিল গতিবিধি ধরতে পারছি না। প্রেম মানে কী, পীরিতি! সে তো শুনেছি বিষম জ্বালার ব্যাপার। তার আবার ভাগ্য! সে বস্তুই বা

কেমন। দেখছি তিনজনেই আমার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন, প্রতীক্ষা, জবাবের। বললাম, 'বিপদে ফেললেন।'

জেসমিন হেসে উঠলেন, বললেন, 'সত্যি ব্যাপারটা বিপদেরই। সাহেব যেভাবে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, জবাবটা বোধ হয় সে রকম সোজাসুজি সহজভাবে দেওয়া যায় না।'

আমি বললাম, 'তার আগে আর একটু কথা আছে, সেটা হলো, প্রেমের বিষয়ে ভাগ্যের ব্যাপারটা কোনোদিন ভেবে দেখিনি।'

জেসমিন চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিলেন, কাপ নামিয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা হচ্ছে জবাব এড়িয়ে যাওয়া। এটা ভাববার বিষয় না, ঘটবার বিষয়। যা ঘটেছে, সেই অভিজ্ঞতার একটু পরিচয় দেওয়া। কিন্তু প্রথম থেকেই আপনি পালাবার মতলব করছেন।'

বুদ্ধিমতী জেসমিন কথাও বেশ সুন্দর বলতে পারেন। উনি আমার পথ-বন্ধনের উদ্যোগ করছেন। বিব্রত হেসে বললাম, 'পালাবার মতলব করব কেন?'

জেসমিন বললেন, 'আমি যে বুঝতে পারছি, আপনি পালাবার চেষ্টা করছেন।'

ইয়াকুব হেসে বললেন, 'আমাদের পরিচয় খুব কম, সেরকম ভাবে বন্ধুত্বের দাবী করা যায় না। কিন্তু আমি বিষয়টাকে খুব সহজ ভাবে নিতে চাই। সম্ভবত আপনার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে না কখনও, তবু বলব, পথ চলতি এরকম একটা আসর, ভাগ্যে না থাকলে হয় না। আমরা কেউ আপনার সমালোচক নই, আপনিও আমাদের নন। আমাদের এই ট্রেনের কামরার কথার জন্য, কোনো দায়িত্বও কাউকে বহন করতে হবে না। এটা নিতান্তই একটা আনন্দের খেলা।'

ইয়াকুব সাহেব কথাগুলো অত্যন্ত দ্রুত বললেন, চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনার প্রেমের ভাগ্য ভালোই। জুয়ার প্রবচনটা একেবারে মিথ্যা না। আমার প্রেমের ভাগ্য সত্যি খারাপ, মানে আমাকে দুর্ভাগা বলতে পারেন।'

কথাটা শোনা মাত্রই আমার দৃষ্টি জেসমিনের দিকে পড়লো। নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করলো। কারণ ইয়াকুব সাহেবের কথা শুনেই তাঁর বিবির দিকে ফিরে দেখাটা একান্ত অশোভন। কিন্তু জেসমিন বিবি হঠাৎ-ই যেন মুখ নিচু করে তাঁর সেই রঙীন ছবির পত্রিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন। হাতে

চায়ের কাপ, ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসির চিকুর হানছে। হাফেজ বাইরের দিকে তাকিয়ে খাবার খেতে ব্যস্ত।

তবু না ভেবে পারি না এমন অনায়াসে ইয়াকুব সাহেব নিজের কথা বললেন কেমন করে। বিশেষ করে তাঁর আলোকপ্রাপ্তা রূপসী বিবিরই সামনে।

পরমুহূর্তেই ইয়াকুবের গলায় প্রশ্ন শোনা গেল, 'তাই না জেসমিন?'

দেখলাম ওঁর মুখে হাসি। জেসমিন ওঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন করে বলব সাহেব বলুন, আপনি দুর্ভাগা প্রেমিক কী না?'

ইয়াকুব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'অবিশ্যি আমি একজন ভাগ্যবান স্বামী, জেসমিন আমার বিবি।'

জেসমিনও সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'সেটা আমার ভাগ্য।'

ইয়াকুব উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। এতটা উচ্চস্বরে, আশা করা যায়নি, এবং ওঁর উচ্চহাসির সঙ্গে, আর কারো গলা বেজে উঠল না বলেই, কেমন যেন বেখাপ্পা লাগলো। জেসমিন চোখের কোণে তাকালেন হাফেজের দিকে, হাফেজ দেখছিলেন ইয়াকুবের দিকে।

জেসমিন বললেন, 'কী হাফেজ সাহেব, তুমি কোনো কথা বলছ না কেন?'

ইয়াকুব সহসা হাসি থামিয়ে বললেন, 'ও আবার কি বলবে? ওর তো জুয়ার ভাগ্য খারাপ, প্রেমের চন্দ্র ওর ললাটে হাসছে।'

হাফেজ হেসে বললেন, 'আমি জানি তুমি এ কথা বলবে।'

ইয়াকুব বললেন, 'অনেক আগেই বলেছি। আর তুমি নিজেও জানো তোমার প্রেমের ভাগ্য কী রকম ভালো।'

জেসমিন বলে উঠলেন, 'তাহলে আমার ভাগ্যকে কী বলতে হবে? মানে প্রেমের ভাগ্যকে?'

ইয়াকুব বললেন, 'মেয়েদের প্রেমের ভাগ্য জিতলেও ভালো হারলেও ভালো। রূপসী মাত্রেরই প্রেমের ভাগ্য ভালো।'

সাহেব দেখছি বিবির রূপ সম্পর্কে খুবই সজাগ। কথাটাও বোধ হয় একেবারে মিথ্যা বলেননি। রূপসী মাত্রেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। পহ্লে দর্শনধারী পিছে গুণ বিচারি। আমি এখনও পর্যন্ত জেসমিন বিবির গুণের খবর জানি না। কিছু কিঞ্চিৎ যেটুকু আপাতত জানা গিয়েছে তাতে বুঝেছি, তিনি বাক্‌পটীয়সী এবং রসিকাও। অপরিচিতের সঙ্গে আলাপে কুণ্ঠিত না, খেলাতেও না, অবিশ্যিই তাস। ভিতরের খবর কে বলতে পারে? কিন্তু মানুষটা আমি কালকূট, হলাহল আমার ভিতরে। আমি সিঁদুরে মেঘ দেখলে

ভয় পাই। আমার মন বারে বারে ঠেক খায়, চমকায়। আমি যেন এই তিনের মধ্যে সিঁদুরে মেঘের রক্তাভা দেখতে পাই। যে সিঁদুরে মেঘের কোলে জমা আছে ব্যথা বঞ্চনা প্রেম আকাঙ্ক্ষা, তার মধ্যে কার কতখানি দায়, তা জানি না। ধরতাই পাই না, কিন্তু মনে হয় কোথায় যেন তাল বেজে যায়।

জেসমিন বললেন, 'কিন্তু আমি জানি, আমার প্রেমের ভাগ্য মোটেই ভালো না।'

ইয়াকুব বললেন, 'কি রকম ?'

জেসমিন বিবি গলার স্বর টেনে টেনে একটি কবিতার লাইন উচ্চারণ করলেন, উর্দুতে বা আরবীতে, যা আমার মতো আনাড়ি লোকের পক্ষে বোঝা যেমন সম্ভব না, মনে রাখাও তেমনি সম্ভব না। আমি তাকিয়েছিলাম জেসমিনের দিকেই, ইয়াকুব আওয়াজ দিলেন, 'ওয়াহ্ ওয়াহ্ !'

জেসমিনের দৃষ্টি পড়লো আমার দিকে। বললাম, 'দয়া করে আমাকে একটু ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিন, আমি ধরতে পারলাম না।'

জেসমিন বললেন, 'এর মানে হল, "তোমরা তার মদিরাক্ষিতে কেবল হাসির ঝিলিক দেখেছ, চোখের জল দেখনি। তোমরা তাকে পেয়ালা ভরে পান করতে দেখেছ, তবু তার ছাতি ফেটে যাওয়া দেখনি।"

এবার আমাকেও বলতে হয়, 'চমৎকার।'

এবং এ ক্ষেত্রেও জেসমিন বিবির নম্রা পরিচয়। ইয়াকুব সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি লব্জের প্রশংসা করছেন, না জেসমিনের হৃদয়ের ব্যাখ্যার ?'

চমকে উঠি। তাইতো, শুধু মাত্র ছন্দ আর কথায় মুগ্ধ, না কি জেসমিনের প্রেমের ভাগ্যের তুলনায় ? নিশ্চয়ই কথা ও ছন্দে। জেসমিনের এমন বেদনাদায়ক ভাগ্যকে আমি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করব কেমন করে ? বললাম, 'আমি কবিতারই প্রশংসা করেছি।'

জেসমিন তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘাড় ছাঁটা চুলে ঝাপটা দিয়ে আমার দিকে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন ? আমার প্রেমের ভাগ্যের কথাই তো আমি বলতে চেয়েছি। আপনার কি বিশ্বাস হয়নি ?'

এ যে বড়ো বিপদের কথা। মিয়াঁ বিবি যে শাঁখের করাত হয়ে ওঠেন ! উনি বললেও কাটা পড়ি, উনি না বললেও কাটা পড়ি।

ইয়াকুব সাহেব বলে উঠলেন, 'বিশ্বাস করার কোনো উপযুক্ত কারণ নেই বলেই উনি করেননি। তাহলে শোনো, আমি বলি।' বলে তিনিও

জেসমিনের মতোই কোনো কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে তার অর্থ ধরিয়ে দিলেন, এর মানে হলো, "বাদশা যখন ফকির সেজে বোরোয় তখন তাকে চেনা যায় না। সুখে যে কাঁদে, কে বলবে সে সুখে আছে? জলের মধ্যেই যে মাছ থাকে, কে মেপে বলতে পারে কত পেয়ালা জল সে পান করেছে?"

শুনতে সবই ভালো লাগে, কিন্তু প্রশংসা করব কী না বুঝতে পারি না। ফিরে তাকাই জেসমিন বিবির দিকে। জেসমিন ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, 'তার মানে সাহেব আমাকে কপট বলছেন?'

ইয়াকুব বললেন, 'না, কপট বলব কেন? অনেক সময়েই, অনেকের কথাবার্তা আচরণ থেকে সব ঠিক বোঝা যায় না, এ কথাই বলছি।'

জেসমিন আমার দিকে তাকিয়ে চোখের তারার ঝিলিক দিলেন। এ সময়ে কাপ ডিস ট্রে আর বিল নেবার জন্য বেয়ারা এল। আমি বিল নেবার আগেই ইয়াকুব নিয়ে নিলেন, বললেন, 'আপনার চায়ের বিলটা আমাকে মেটাতে দিন, কারণ এর পরে অনেক দানই তো আমার কাছে আপনাকে হারতে হবে। আমি না হয় একটু প্রতিদান দিলাম।'

কিছু বলা গেল না, যদিও বলার ইচ্ছা ছিল, গলা যখন কাটবেনই, তখন আর এ প্রতিদানটুকুই বা কেন? বলতে পারলাম না। বেয়ারা বিল টিপস্ আর কাপ ডিস ইত্যাদি নিয়ে চলে গেল। হাফেজের ঠোঁটে তখন সিগারেট, তিনি বললেন, 'তাহলে আমিও একটা বয়েদ বলতে চাই।' বলে তিনিও জেসমিন আর ইয়াকুবের মতোই কবিতা বলে আমাকে মানে বলে দিলেন, "আমি গোলাপ ভেবে যখন ফুল ছুঁতে গেছি, তখন আমার কাঁটা বিঁধেছে। যখন রবাব বাজাতে গেছি, তার ছিঁড়ে গেছে। পেয়ালা তুলে যখন সরাব পান করতে চেয়েছি, তা বিষ হয়ে গেছে। নারীকে যখন আলিঙ্গন করতে গেলাম, তখন আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে গেলাম। খোদা আমাকে জানালেন, দুনিয়ায় সকলের ভাগ্যে সব কিছু জোটে না।"

জেসমিন সঙ্গে সঙ্গে যেন বড় সমবেদনায় জিভ দিয়ে তু তু শব্দ করলেন। কিন্তু চোখের কটাক্ষে, ঠোঁটের হাসিতে বিদ্রূপ।

ইয়াকুব বললেন, 'ওয়াহ্ ওয়াহ্, হাফেজ তোমার মতো এমন দুঃখী আর হয় না।'

জেসমিন বিবি তাঁর উন্নত বক্ষে হাত চাপা দিয়ে সনিশ্বাসে বললেন, 'আমার বুক ফেটে যাচ্ছে হাফেজ, তুমি হাত দিয়ে দেখতে পারো।'

হাফেজ হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'হাত দিয়ে কি কাটা বোঝা যায়? কাটা বোঝা যায় দিল কাটা মানুষকে দেখলেই।'

ইয়াকুব আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বাঙালী দাদা, এবার আপনি কিছু বলুন।'

হাত জোড় করে অসহায় ভাবে বললাম, 'বিশ্বাস করুন, আপনাদের এরকম কোনো কবিতা আমার জানা নেই।'

জেসমিন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'মানতে পারি না। বাঙালীরা খুব কবিতা জানে।'

বললাম, 'জানি, কিন্তু আপনারা যে রকম সুন্দর সব ছড়ার মতো বললেন, এ জিনিস আমাদের কবিতায় ঠিক নেই।'

জেসমিন বললেন, 'তবু যা হোক কিছু বলুন, যে কোনো ভাষা থেকে।'

একে বলে বিপদ! বিপদ নানা রকমের, এও তার রকমফের। বাঙলা থেকে সহসা কিছু খুঁজে না পেয়ে বাঙলায় অনূদিত একটি ছোট জাপানী কবিতা বললাম—

'কী করি কোথা যাই
কোথা গেলে শান্তি পাই।
ভাবিলাম বনে গিয়া
জুড়াব তাপিত হিয়া।
শুনি সেথা অর্ধ রাত্রে
কাঁদে মৃগী কম্প গাত্রে।'

আমার অক্ষম ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলতে হলো। ওঁরা সবাই উল্লসিত হয়ে বাজলেন, 'চমৎকার, চমৎকার!'

জেসমিন আলাদা ভাবে বললেন, 'আমরা সবাই যা বলেছি, তার মধ্যে আপনারটাই সব থেকে সুন্দর।'

ইয়াকুব বললেন, 'এটা আমারও বক্তব্য এবং মনে হলো আপনি যেন আমারই মনের কথা বললেন।'

হাফেজ বলে উঠলেন, 'আমার মনে হলো আমার নিজের মনের কথা।'

'চমৎকার! পাওনাটা এখন আমার ভাগেই বেশি দেখছি।' জেসমিন বললেন, ওঁর কথাটা ওঁর নিজেরই থাকতে দাও না, নিজেদের দলে টেনে নিতে চাইছো কেন?' বলে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'বড় করুণ

আপনার কবিতা। কোথাও শান্তি নেই, এমন কি বনের গভীরেও না, কারণ সেখানেও হরিণী কাঁদে। আপনার অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক।'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না না, আমার অভিজ্ঞতা না। আপনাদের আমি শুনিয়েছি এক জাপানী কবির কবিতা।'

জেসমিন বললেন, 'কবিতা যারই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কবি যখন লিখেছিলেন, সেই মুহূর্তে সেটি কবির অভিজ্ঞতা। পাঠকের যখন তা কোনো কারণে মনে পড়ে যায়, তখন তা পাঠকেরই অভিজ্ঞতা।'

জেসমিনকে এই মুহূর্তে মনে হলো সে বিদুষীও বটে। একদিক থেকে কবি, কবিতা এবং পাঠকের সম্পর্কটা এই রকমই। স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য এই, তিনি অনুভবের জগতে তাঁর ভাষা দিয়ে আমাদের মধ্যে বিচরণ করেন। নিজেদের প্রকাশের জন্য আমরা কবির ভাষাকে ছেঁকে তুলে নিই। জেসমিনকে বললাম, 'সে হিসাবে আপনার কথা ঠিক, সম্ভবত জাপানী কবির অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনেও কখনও কখনও ঘটে।'

ইয়াকুব বললেন, 'মানতেই হবে, জেসমিনের কথা আপনাকে মানতেই হবে। আমিও মানি। আরও বেশি করে বলতে পারি, অভিজ্ঞতাটা আমার বড়ো বেশি নিজস্ব বলে মনে হচ্ছে। সেজন্য আমি কবিতার লাইনগুলো ইংরেজিতে লিখে রাখতে চাই, উর্দুতে অনুবাদ করার চেষ্টা করব।'

বলতে বলতে তিনি পকেট থেকে একটা মোটা পার্স বের করলেন। আমার সঙ্গে একবার জেসমিনের দৃষ্টি বিনিময় হলো। তিনি হেসে হাফেজের দিকে তাকালেন। হাফেজ তাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে জেসমিনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জেসমিন আসন ছেড়ে নেমে বললেন, 'আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।'

প্রথমে তেমন ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি, এখন জেসমিন বিবিকে দেখছি, যা দেখেছিলাম, তিনি তার থেকে অনেক বেশি সুন্দরী। দাঁড়াবার আগে তাঁর উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের সুগঠিত শরীরের পূর্ণ ছবিটিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর নিটোল অনেকখানি খোলা কাঁধ, ঈষৎ দৃশ্যমান কণ্ঠা, বুকের নিচে মেদবর্জিত নাভিস্থল, ক্ষীণ কটি এবং প্রায় বক্ষ সমান নিতম্ব তাঁর রূপকে অনেকখানি যেন শাণিত করেছে। তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে ইয়াকুব সাহেব তৈরি। পার্স থেকে বের করেছেন ছোট এক টুকরো কাগজ, হাতে কলম। বললেন, 'দয়া করে আপনার কবিতাটি আর একবার পুনরুক্তি করুন।'

অগত্যা। তবে এখানে যে যা-ই বলুন, কেন যেন বারে বারে মনে হচ্ছে, সব থেকে মর্মান্তিক অবস্থাটা যেন ইয়াকুব সাহেবেরই। আমি বলতে আরম্ভ

করার সময়ই হাফেজ উঠে বাইরে গেলেন। ইয়াকুব ফিরে তাকিয়ে দেখলেন না, লিখতে ব্যস্ত থাকলেন। আর কবিতা বলতে বলতে আমার মনে হলো, সম্ভবত আমার সামনে একটি ত্রিকোণ চক্রের বর্ণালীবীক্ষণ দেখছি, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লাডিওস্কোপ···ছেলেবেলায় এ খেলাটা আমরা নিজেরা খেলনা তৈরি করে দেখেছি। তিন খণ্ড কাঁচের টুকরো, ত্রিকোণ ভাবে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধেছি, যেন একটি নলের মতো। তার নিচের দিকটা থাকতো এক ভাঁজ সাদা কাপড়ে ঢাকা। তার মধ্যে ফেলে দিতাম কয়েকটি মুসুরির ডাল, হলুদে রঙের মুগ ডাল, আর গুটিকয়েক কালো জিরা। তারপরে এক চোখ বন্ধ করে ঘুরিয়ে দেখতাম প্রতিবারেই বিচিত্র আকারের ত্রিবর্ণ তিনটি চিত্র ফুটে উঠত। ঘোরালেই চিত্রে পরিবর্তন, রঙ কালো লাল হলুদ। মিলেমিশে তিনটি চিত্র বদলে বদলে নানা ছন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠতো।

আজ এই মুহূর্তে সেই হাতে বানানো খেলনা, বর্ণালীবীক্ষণের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি যেন সেই রকম বর্ণালীবীক্ষণের মধ্যে ত্রিবর্ণের তিনটি ছন্দের রূপ দেখছি। কখনই কোনোটির সঙ্গে কোনোটির মিল নেই। এখানেও সময়ে মিল নেই, আর এঁরা নিতান্তই তিনটি রঙের দ্রব্য মাত্র না, তিনটি মানুষ। অবধারিত ভাবে এখানে একটি ত্রি-হৃদি নাটক চলেছে, যার অভ্যন্তরের চেহারাটির পুরোপুরি দেখতে পেয়েছি বলব না, ক্ষীণ একটা অনুমান যেন পাচ্ছি। আমার সেই ক্ষীণ অনুমানের মধ্যে যদি সত্যের সূত্র কিছুমাত্র থেকে থাকে, তবে বলতে পারি, জাপানী কবিতার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এখন ইয়াকুব সাহেবের ক্ষেত্রেই বোধ হয় সব থেকে সত্যি।

কবিতাটা লেখা শেষ হয়ে গেলে, ইয়াকুব তা পাঠ করলেন, কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপরে একটু হেসে বললেন, 'একটু শান্তির জন্য যার কোথাও যাবার নেই, আমার মনে হয়, একটি মাত্র জিনিসই তাকে শান্তি দিতে পারে।'

আমি কৌতুহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী সেটা?'

ইয়াকুব বললেন, 'মৃত্যু!'

আমি যেন সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলাম, চমকে ইয়াকুবের দিকে তাকালাম। ইয়াকুব বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাইরের অপরাহ্নের আলোয় একটু রক্তাভা দেখা দিয়েছে। গাছপালা মাঠের শস্য সবই যেন বিকালের ম্লান রক্তাভায় বিষন্ন মুখে হাসছে। যদি ঠিক দেখে থাকি, আমার মনে হলো, ইয়াকুবের মুখেও একটি রক্তাভা; কিন্তু বিষণ্নতার থেকেও যেন একটি যাতনা দমনের কষ্ট তাঁর মুখে। পথ চলতি সামান্য পরিচয়। এমন অনেকের সঙ্গে

হয়। রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গেই যাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে হয়তো সারা জীবনে আর কখনও দেখা হবে না, তাঁদেরই একজনের জন্য সহসা আমার বুকের কাছে একটা তীর বেঁধা অনুভূতি চিন্‌চিন্‌ করে উঠেছে। আমি বললাম, 'কিন্তু মাফ করবেন ইয়াকুব সাহেব, মৃত্যুই কি সব শান্তি এনে দিতে পারে ?'

ইয়াকুব যেন একটু চমকালেন, হয়তো আমার অস্তিত্বের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। বললেন, 'তা ছাড়া এমন মানুষের শান্তি আর কিসে আসতে পারে। সে তার শেষ অভিজ্ঞতার কথাই মন দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে এবং শান্তি যে কোথাও নেই এটাই বলেছেন। অতএব ?'

আমি বললাম, 'মৃত্যু নয়। যদি মৃত্যুই সেই শান্তি হয় তবে সেই শান্তি ভোগ করবে কে ? মৃত্যু শীতল শূন্য অন্ধকার, তারপরে আর কিছুই থাকে না।'

ইয়াকুব বললেন, 'থাকবার দরকার কী ? জীবন যদি এমন জায়গায় আসে, যখন যেদিকেই ছুটে যাওয়া যাক, তাতে শুধু আগুন বেড়ে ওঠে, আরও বেশি জ্বলতে থাকে, তখন তো মৃত্যুই শ্রেয়, সে-ই তো শ্রেষ্ঠ বন্ধু।'

আমার মনে পড়ে যায়, 'মরণরে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' কিন্তু সে তো শ্যামের মধ্যে লীন করে দেওয়ার মৃত্যু। সে মৃত্যুতে সুখ আছে। ইয়াকুব সাহেব যে মৃত্যুর কথা বলেন তার মধ্যে জীবনের রূপ নেই। আবার ঠাকুরের কথাই মনে আসে,

"রূপহীন মরণের মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ···।"

ইয়াকুব সাহেব যে রূপহীন মৃত্যুর কথা বলেন, তার মধ্যে মৃত্যুহীনতার অপরূপ সাজ দেখতে পাই না। আসলে আমার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট চমক যেখানে, তা হলো আত্মবিনষ্টি। আমার মনে হয়েছে তিনি আত্মহত্যার কথা বলেছেন।

আমি বললাম, 'দুঃখ আর যন্ত্রণার মধ্যেও একটা শান্তি আছে। মাফ করবেন, এটা নিতান্ত আমার ধারণার কথা। অন্যথায় কী নিয়ে আমরা থাকতে পারি ? আমার মনে হয়, হরিণীর কান্নার সঙ্গে একাত্ম হয়েই জীবনকে বুঝে নিতে হবে। অবিমিশ্র শান্তি বলে বোধ হয় কিছু নেই।'

ইয়াকুব বিষণ্ণ হাসলেন, বেলা শেষের ম্লান আলোর মতোই। বললেন, 'হয়তো আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু এমন মানুষ যদি থাকে, যে মনে করে, তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আর নেই, সে অপ্রয়োজনীয়, তার কী জবাব ?'

বহুকথিত জবাব হয়তো অনেক আছে, জাবর কাটার মতো কিন্তু আবার ঠাকুরের কথা মতোই প্রশ্ন আসে মনে,

'ঘরেও নহে পারেও নহে
যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে।'

সংসার যাকে অপ্রয়োজনীয় বলে জবাব দিয়ে দেয়, সেখানে সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, প্রয়োজন অপ্রয়োজনকে যাচাই করা যায়। তার অবকাশ থাকে। কিন্তু যে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় বলে জবাব দিতে চায় তাকে কী বলার থাকতে পারে। চর্বিতচর্বন কথা বলে লাভ নেই, কারণ কথা এক জিনিস, বঞ্চনা যন্ত্রণা আর এক জিনিস। যে জ্বলে সে-ই জানে আগুন কী। কথা দিয়ে আগুন নেভানো যায় না, অন্তরের জ্বালাও না। ইয়াকুব আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। ওঁকে আমি কোনো মামুলি কথা বলতে পারলাম না। বললাম, 'ইয়াকুব সাহেব, আপনি অনুভূতিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আপনাকে আমি নতুন কথা কিছু বলতে পারব না।'

ইয়াকুব বললেন, 'পৃথিবীতে নতুন কথা খুব কম আছে, আমরা তাতে নানান রকম রঙ দিতে পারি। তবু আপনি যে কথা বলেছেন, হরিণীর কান্নার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতে হবে, সেটাই ঠিক। আরো একটা ঠিক আছে, তা হলো জোর করে থাকা। মৃত্যু না, হত্যা। অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ নাশ করা।'

বলতে বলতে ইয়াকুবের মুখ যেন টকটকে লাল হয়ে উঠলো, তাঁর দুই চোখ যেন রাগে আর ঘৃণায় জ্বলে উঠলো। শক্ত চোয়াল আর ছুরির মতো শাণিত তাঁর বন্ধ ঠোঁটের অভিব্যক্তি। এক মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠলো তাঁর প্রকাণ্ড হাতের মুঠি। পরমুহূর্তেই আবার শিথিল হয়ে গেল। একটি নিশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কঠিন মুখের অগ্নিঝলক অপসৃত। ফিরে এলো সেই অন্তরাগ বিষণ্ণতা। নিজের মনেই মাথা নেড়ে হাসলেন, বললেন, 'না, পৃথিবীতে সকলের জন্য সব পন্থা নয়। অনেকে হয়তো বিরুদ্ধ অস্তিত্বকে নাশ করার মধ্যেই নিজের অস্তিত্বের মূল্য বোঝে। কিন্তু এ তো অত্যন্ত সাময়িক। বিনষ্টির মধ্য দিয়ে কখনই নিজের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করা যায় না। তাতে হয়তো যন্ত্রণাই বাড়ে। তাই নয় কী?'

আমি তাড়াতাড়ি সম্মতি জানিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়। এর থেকে সত্যি কথা কি হতে পারে। আপনি আপনার মহত্বের কাথাই বলেছেন।'

ইয়াকুব ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করে বললেন, 'না না, মহত্বের কথা বলবেন

না। কথাটা আমাকে দু'একবার শুনতে হয়েছে, তাতে মহত্ব শব্দটার প্রতি আমার অশেষ ঘৃণা। আমি মহৎ নই, মহত্ব প্রকাশের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই, তার ওপরে সেই মহত্ব, যদি হয় নিতান্তই অক্ষমের অসহায়তার কারণে।'

এ সময়েই জেসমিন কামরায় প্রবেশ করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কোনো গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে নাকি?'

আমি বললাম, 'কিছুমাত্র না।'

ইয়াকুব জেসমিনের দিকে ফিরে তাকালেন, হেসে বললেন, 'অনেক গুরুতর বিষয়ও, অত্যন্ত হালকা চালে চালিয়ে নেওয়া যায়। গুরুতর বিষয় হতে পারে, গুরুত্ব না দিলেই হলো।'

ইয়াকুব শব্দ করে হেসে উঠলেন। হাফেজ ঢুকলেন। ক্রমেই আমার চোখের সামনে তিন কুশীলবদের ত্রিকোণ নাটক অনেক পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। পশ্চাৎপট জানা নেই। কিন্তু একজনের রক্তের শিরা ছিন্ন হচ্ছে, আর অন্য দু'জনের প্রাণে রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে এটা বুঝতে পারছি। সঞ্চারিত রক্তের আভা দু'জনের চোখে মুখে। ছিন্ন-শিরা ব্যক্তির মুখ ক্রমাগত নীরক্ত। মূল কারণ কী? কোনো সাংসারিক স্বার্থ? অথবা একান্তই শাসনহীন হৃদয়ের খেলা?

জবাব নেই। জবাব হয়তো পাওয়াও যাবে না। রহস্যঘেরা নাটক আগামীকাল সকালে বম্বের ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকেই হয়তো অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য নিয়েই শেষ হয়ে যাবে। পথ চলতে আমি কেবল হাঁতড়েই মরব। কী তার দরকার? জীবনে সব প্রশ্নের জবাব মেলে না। জবাব চেয়েও কোনো ফল নেই। অতএব চলো বোম্বাই এক্সপ্রেস। তুমি যাত্রী বহন করে চলবে, যাত্রীরা তোমার গর্ভে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে যাবে। তারপরে আর কেউ কারোর খোঁজ নেবে না।

ইয়াকুব সাহেব আমাকে ডাকলেন, 'আসুন স্যার, আপনার আসন নিন, আর টাকার থলিটা বের করুন, বধ করা যাক।'

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা না। প্রথমে যা নিয়ে বসেছিলাম, তার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। থলিতে হাত দিতে হবে বৈ কি। আমি টাকা নিয়ে বসলাম গিয়ে জেসমিন বিবির বামে। তাঁর দক্ষিণে হাফেজ ইতিমধ্যেই একগোছা টাকা সামনে রেখে বসেছেন। বললেন, 'বধ হবার জন্য বসেই আছি ইয়াকুব ভাই, তোমার অস্ত্র বের করো।'

ইয়াকুব সাহেব তাস ফাটাতে ফাটাতে থেমে গিয়ে খুব যেন অবাক হয়েছেন এমনি ভাবে হাফেজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বধ হবার জন্যে বসে আছো ? তুমি ? আমি তো জানি তুমি ইতিমধ্যেই একটা মুর্দা !'

আমি আর হাফেজ দু'জনেই ইয়াকুবের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। কিন্তু জেসমিন বিবি খিলখিল করে হেসে বেজে উঠলেন, ঝুঁকে পড়লেন, তাঁর নরম কালো কেশ মুখ ঢেকে দিল। হাফেজের মুখে চকিতে একটা লাল ছটা লেগে গেল। একটু অপ্রস্তুত ভাবে হেসে জেসমিনকে দেখলো তারপরে বিড়বিড় করে বললো, 'তা বলতে পারো, আমি আগেই হেরেছি।'

ইয়াকুব সে কথা যেন শুনলেন না, জেসমিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ঠিক বলিনি জেসমিন ?'

জেসমিন হাসতে হাসতেই আবার সোজা হলেন, মুখে পড়া চুলের গোছা হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'এক রকম ঠিকই বলেছেন সাহেব, কিন্তু আপনাকে কিছুতেই বধ করা যাচ্ছে না।'

ইয়াকুব জেসমিনের দিকে তাকালেন অপলক স্থির চোখে। জেসমিন হাসি-মুখ অন্যদিকে ফেরালেন। ইয়াকুব একটি নিশ্বাস ফেলে নীরবে তাসের গোছা এগিয়ে দিলেন জেসমিনের দিকে। জেসমিন তাসের গোছা তাঁর হাত থেকে নিলেন। ইয়াকুব বললেন, 'সত্যি কথা হলো না।'

জেসমিনের টেপা ঠোঁটে হাসি, ঝটিতি একবার ইয়াকুবের দিকে দেখে আমার দিকে তাসের গোছা বাড়িয়ে ধরলেন। আমি কেটে দিলাম। জেসমিন বিবি তাস বণ্টন শুরু করলেন। আমি ওঁর হাতের দিকে দেখছি, আর অবদমিত কৌতূহলে আমার ভিতরটা যেন ফানুসের মতো ফুলে উঠছে। মনে হচ্ছে নিঃশব্দ কিন্তু বাঙ্ময় এই দৃশ্যের মধ্যে নাটকীয়তার একটি তীব্র মুহূর্ত উপস্থিত। অথচ চরিত্ররা তাদের সংলাপ বন্ধ রেখেছে। সংলাপের ভিতর দিয়েই আমি নিকটবর্তী। ঘটনার অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই আমার জানা নেই। সেই সংলাপ বন্ধ, তার পূর্বে একজনের মুখে শোনা গিয়েছে, আপনাকে কিছুতেই বধ করা যাচ্ছে না। আর একজন স্থির অপলক চোখে কেবল তাকিয়ে বলেছেন, সত্যি কথা হলো না। তারপরে, নিঃশব্দ তাস বণ্টন। আমি জেসমিনের হাতের দিকে তাকিয়ে আছি। হাফেজও তা-ই। কেবল ইয়াকুব তাকিয়ে আছেন এখন জেসমিন বিবির মুখের দিকে। কেবল একটা ব্যাকুল আবেগের ছাপ ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। যেন এখনও কোনো জবাবের প্রত্যাশা। আর এই মুহূর্তের সমস্ত কিছুর কেন্দ্র যেন জেসমিন। দর্শক হিসাবেই যদি আমার এতখানি

ব্যাকুলতা জাগে, চরিত্রের অবস্থা কী? এই চরিত্রদের মতো ভূমিকা যদি নিজেকে কখনও গ্রহণ করতে হয়, মনে হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে।

তাস বণ্টন শেষ হলো। জেসমিন তাকালেন ইয়াকুবের দিকে। তাঁদের দৃষ্টি বিনিময় হলো। জেসমিন বিবি আস্তে আস্তে তাঁর ডান হাত ইয়াকুবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ইয়াকুব তাঁর হাত ধরলেন। জেসমিন আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালেন। ইয়াকুব আস্তে আস্তে জেসমিনের হাতে ঝাঁকুনি দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যেই কি ঘটে যায়, বুঝে উঠতে পারি না। ইয়াকুব আর জেসমিন বিবি হেসে উঠেন আস্তে, তারপরেই দু'জনে উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। হাফেজ হেসে বলে উঠলো, 'ইয়াকুব—জেসমিন—জিন্দাবাদ!'

ইয়াকুব বললেন, 'ও হে মূর্দা, খেলা শুরু করো তো! তোমার তহবিল ফাঁক করি।'

হাফেজ বললেন, 'তোমরা যা খেলছো তাতে আমার খেলার সুযোগ কোথায়?'

জেসমিন বললেন, 'সুযোগ অনেক আছে।'

ইয়াকুব আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দুঃখিত দাদা, কিছু মনে করবেন না।'

আমি হেসে মাথা নেড়ে বললাম, 'কিছুমাত্র না।'

জেসমিন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি আমাদের বন্ধু।'

বললাম, 'ধন্যবাদ।'

জেসমিন আবার বললেন, 'এবং আপনি বুদ্ধিমান।'

আমি আবার বললাম, 'ধন্যবাদ।'

জেসমিনের সঙ্গে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। ইতিমধ্যে জেসমিন তাস উল্টে দিয়েছিলেন, একটি রুহিতনের চার। তার মানে জোকার হলো পাঁচ। আমারই প্রথম টানা, বণ্টন করেছেন জেসমিন। তাস টানলাম একটি ইস্কাবনের টেক্কা, একেবারে মূল্যহীন। জেসমিন তাকালেন আমার দিকে। আমি ঠোঁট উল্টে টেক্কাটি দেখিয়ে দিলাম। জেসমিন বললেন, 'সরি।'

জুয়াতে যার দুঃখের কপাল তাকে আর দুঃখ জানিয়ে কি হবে। আমাদের কথায় আছে, 'কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি।' তবু খেলতে হবে।

খেলতে খেলতে কখন অন্ধকার হয়েছে, কে আলো জ্বেলেছে, নজর করে দেখিনি। টনক নড়লো যখন দেখলাম, দ্বিতীয়বারের নিয়ে বসা তহবিল শূন্য।

ব্যাপারটা প্রায় অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে। আমার আর হাফেজের একই অবস্থা। দু'জনের তহবিলই প্রায় শূন্য। ওদিকে মিয়া বিবির তহবিল রীতিমত ফেঁপে উঠেছে। বুঝতে পারছি না এটা কেমন করে হয়। ইতিমধ্যে একটা বিষয় পরিষ্কার, জীবনের ভাগ্যে যাঁরা, আজ একদিকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, খেলার ভাগ্যে তাঁরা যেন রীতিমত হাত মিলিয়ে চলেছেন। এও কী ভাগ্যের ব্যাপার?

জেসমিন ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে চোখের তারা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সাহেব, উঠছেন কোথায়? খেলায় ইস্তফা দিচ্ছেন?'

বললাম, 'না ম্যাডাম, টাকা বের করতে যাচ্ছি।'

জেসমিন খিল খিল করে হেসে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কতো হেরেছেন বলে অনুমান করেন?'

হাফেজ, বললেন, 'আমি বলে দিচ্ছি। আমাদের বাঙালী সাহেব তিরিশ থেকে বত্রিশ টাকা হেরেছেন, আমি নেট পঁয়ত্রিশ।'

ইয়াকুব বললেন, 'তাহলে তো আমাকেও কিছু বের করতে হয়।'

বলে, জেসমিনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় যেন কিছু জিজ্ঞেস করলেন। জেসমিন ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন। ইয়াকুব উঠে দাঁড়িয়ে ওপরের বার্থ থেকে একটি চামড়ার বড় হাতব্যাগ টেনে নামালেন। আমি যখন উঠে গিয়ে নিজের অ্যাটাচি খুলে পার্স থেকে টাকা বের করছি, ইয়াকুব তাঁর ব্যাগ থেকে বের করলেন আন্‌কোরা ঝকঝকে একটি বিলাতি হুইস্কির বোতল, যার নাম ভ্যাট উনসত্তর। হাফেজ উঠে দরজা বন্ধ করে, ভিতর থেকে লক করে দিলেন।

জেসমিন বিবিও আসন ছেড়ে নেমে, আসনের নিচে রাখা একটি বেতের ঝুড়ি থেকে বের করলেন তিনটি কাঁচের গেলাস। বড় একটি রূপোলী ঝকঝকে জলের পাত্রে জল ছিল আগেই দেখেছি। সব বের করে সাজালেন দেওয়াল আয়নার নিচের টেবলে। এতক্ষণ আমি ওঁর কাছে ছিলাম মিস্টার বা স্যর। এখন সাহাব। বললেন, 'সাহাব, আপনার পানপাত্রটা দয়া করে দিন।'

পানপাত্র আমার একটি নিশ্চয় আছে, প্লাস্টিকের রঙীন গেলাস। কিন্তু সেটাতে জলপানই হয়ে থাকে, সুরা না। এতক্ষণে দেখছি জুয়ার আসরের ষোলকলা পূর্ণ। এতক্ষণ জুয়া ছিল, নারী ছিল (অবিশ্যিই সৎ অর্থে), এবার সুরা। সন্দেহ নাই জেসমিন বিবিও সুরাপান করবেন, কারণ তিনটি গেলাস

সাজাবার পরে আমার কাছে চতুর্থটি চেয়েছেন। বললাম, 'ওটাতে আমি ঠিক সুবিধা করতে পারব না'

ইয়াকুব বললেন, 'অন্তত পরাজয়ের গ্লানিটা সামলাতে পারবেন।' বলে হাসলেন।

আমি বললাম, 'উল্টোটাই হবে। একে হারছি, ওই বস্তু আমার পেটে গিয়ে বুদ্ধি লোপাট করবে, আরও হারতে থাকব।'

জেসমিন জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন যা হারছেন তার থেকেও বেশি হারবেন?'

ইয়াকুব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'তাহলে ওঁকেই আগে দাও জেসমিন, সব থেকে বেশি করে দাও।'

ওঁর বলার ভঙ্গিতে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। তার মধ্যেই জেসমিন বললেন, 'দিন সাহাব, আপনার গেলাসটা দিন। আমাদের সঙ্গে আপনাকে একটু নিয়ে বসতেই হবে।'

আমি জেসমিনের চোখের দিকে তাকালাম। বিবির চোখে এবার বলতে গেলে মদির কটাক্ষ। শত হলেও আমি পুরুষ তো! জেসমিন বিবির রূপের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। চরিত্রকে দোষ দিয়ে কী করব। মাতৃজাতি যে আসলে প্রকৃতির অংশ। কেবল যে তাঁদের গর্ভে জন্মাই, তা না, জীবননাট্যের অনেকখানি খেলা তো তাঁদের সঙ্গেই। কোন্ গুণনিধির গান যেন শুনেছিলাম, নায়িকার দিকে তাকিয়ে বলছেন, কেন এই অভাজনের নয়নের দোষ দাও, যদি নিজেকে দেখতে পেতে, তাহলে এমন দোষ দিতে পারতে না। আর মনে পড়ে যায়, সম্ভবত কে. মল্লিকের রেকর্ডেই শুনেছি, 'বঁধু চরণ ধরে বারণ করি, টেনো না আর চোখের টানে।' তার চেয়ে বাড়িয়ে দিই গেলাসখানি।

আমার ছোট জল বোতলের মুখে গেলাসটি ছিল। সেটা নিয়ে জেসমিন বিবির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'প্রাণে মারবেন না, কিঞ্চিৎ জীইয়ে রাখবেন।'

জেসমিন তাঁর সর্বাঙ্গে প্রায় একটা সর্বনাশের কাঁপন দিয়ে খিলখিল করে হেসে বাজলেন। একটি চোখের পাতা নিবিড় করে বিদুষী রূপসী বললেন, 'আপনারও কি মৃত্যু ঘটছে?'

বললাম, 'কী করে আর তা অস্বীকার করি? শত হলেও পুরুষ হয়েই জন্মেছি যে!'

হাফেজ আর ইয়াকুব, একসঙ্গে আওয়াজ দিলেন, 'ওয়াহ্ ওয়াহ্!'

ইয়াকুব সাহেব তাঁর মস্তবড় দক্ষিণ হস্তখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হাত মেলান বাঙালী দাদা, হাত মেলান।' বলে আমার হাত টেনে নিয়ে, জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন। হৃদয়ের উত্তাপ কতখানি আছে জানি না, সাহেবের হাতের উত্তাপ বেশ।

জেসমিন বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ সাহাব, আমি খুবই আহ্লাদ বোধ করছি। তবে একেবারে প্রাণে মেরে আমার সুখ হয় না। আপনি যেমনটি চেয়েছেন তেমনি ভাবেই আপনাকে আমি একটু একটু জীইয়ে রাখবো, কিন্তু চালাব আমার খুশি মতো, আপনি বাদ সাধবেন না।'

আমিও এখন প্রগল্‌ভ। জানি না, কতটা নিজের ইচ্ছায়। এ রকম ক্ষেত্রে প্রগল্‌ভ বোধ হয় আপনি আসে। অন্তত বক্র ওষ্ঠ সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তি ছাড়া। এখানে আমার সে রকম কোনো চিন্তা মাথায় আসছে না। বরং আমি একটু উৎফুল্লই বোধ করছি। আমার এই ঝুকঝুক এক্সপ্রেসের যাত্রায়। বললাম, 'আমার সে সাহস নেই।'

জেসমিন আবার বললেন, 'ধন্যবাদ।'

ইয়াকুব তাঁর হাতে বোতলটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার হাতে পরিবেশন, ছিপিটাও তুমি খোলো।'

জেসমিন বিবি মাথা নেড়ে বললেন, 'পুরুষের কাজটা পুরুষরাই করুক।'

কথাটা বলেই ওঁর মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। তিনি চকিতে একবার আমার দিকে দেখে দৃষ্টি নত করলেন। তাঁর লজ্জাটা আমাকেও যেন বিঁধলো, আমি টাকা বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। জেসমিন বিবির মুখের আগলখানি বেশ খোলা, বোধ হয় প্রাণটাও। তা না হলে এমন বাক্য অনায়াসে বলে আবার নিজেই লাল হয়ে ওঠেন?

ইয়াকুব বোতলটি হাফেজের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তাহলে হাফেজ খোলো।'

হাফেজ বললেন, 'না, বাঙালী সাহাবকে দাও।'

জেসমিন বললেন, 'তা-ই ঠিক। আমার নতুন শিকার।' বলেই চোখে ঝিলিক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

শিকার? বেশ আপাতত তাই স্বীকার করে নিলাম। আপাতত বলে না, অনেকটা তো স্বীকার করেই নিয়েছি। বললাম, 'খুশির সঙ্গে।'

ইয়াকুব বোতলটি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। জেসমিন তাকিয়ে ছিলেন বোতলের ছিপির দিকে। আমি ছিপিতে মোচড় দিতে গিয়ে একটু যেন

অস্বস্তিতেই পড়ে গেলাম। জেসমিনের নিজের মুখ লাল হয়ে ওঠা, ওঁর নিজের কথা তো এই মুহূর্তেই ভুলে যাওয়া যায় না। তথাপি খুলতেই হলো।

জেসমিন হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এবার আমাকে দিন।'

জেসমিনের প্রতিটি কথা এবং কটাক্ষেই যেন একটি বিশেষ ইঙ্গিত। অনেকটা চর্যাপদের গানের মতো, শুনতে এক রকম, কিন্তু কথার মানে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় যাকে সন্ধ্যা ভাষা বলা হয়েছে। সন্ধ্যার ছায়ায় যা স্পষ্ট না, অথচ একেবারে অস্পষ্টও না। জেসমিনের ভাষাও সেই রকম যেন। উনি নিচু হয়ে গাড়ির ঝাঁকুনিতেও বোতল থেকে গেলাসে প্রায় এক মাপে পানীয় ঢাললেন। তারপরে জলের জাগ তুলে পাত্রে পাত্রে জল মিশিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হতে দিন, আপনাদের মাঝখানে। আপনারা তিনজনে কাঁচের গেলাস নিন, আমি নিচ্ছি এই রঙীন প্লাস্টিকের গেলাস। আপনার আপত্তি আছে সাহেব?'

ইংরেজিতে বোধ হয় একেই বলে আইডিয়া এবং মানতেই হবে আইডিয়াটি অপূর্ব! তিনকে এক করে, চারের এক হিসাবে তিনি নিজেকে চিহ্নিত করতে চাইছেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপত্তির কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।'

ইয়াকুব বললেন, 'তোমার কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। অতএব—।'

তিনি গেলাস তুলে ধরলেন। আমরা সকলেই তুলে ধরলাম। জানি না, এর পরেও উচ্ছ্বাসবশত, কেউ সব গেলাসগুলো জেসমিনকে প্রসাদ করে দিতে বলবেন কী না। স্রোতের ধারা যদি সেদিকে যায়, তাহলে অনেক দূরই যেতে পারে। ঠোঁটের স্পর্শ না হয়ে তা চরণের স্পর্শও হতে পারে অথবা তারও অধিক। কিন্তু ততোদূর গড়াবার মতো স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী এখানে নেই। জেসমিন তাঁর পাত্রে চুমুক দিলেন এবং একে একে সকলেই।

জেসমিন তাঁর জায়গায় উঠে বসে বললেন, 'প্রথম পরিবেশন করে আমি শুরু করে দিলাম, তারপরে যে যার নিজেকে সাহায্য করবে।'

ইয়াকুবের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি একটু নিশ্চিন্ত করে দিন, আপনার ভাণ্ডারে কি এই একটি বোতলই আছে?'

ইয়াকুব বললেন, 'চিন্তিত হয়ো না। যার যতো প্রয়োজন, সে ততোখানিই পাবে।'

হাফেজ জিভ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে বললেন, 'আমি আরও বহুবার খেলায় হারতে রাজী আছি।'

জেসমিন বললেন, 'তাহলে খেলা শুরু হোক।'

তাস বণ্টন এবং খেলতে গিয়ে গেলাস রাখা একটু সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। গদীতে রাখলে গাড়ির ঝাঁকুনীতে রাখা সম্ভব না। গেলাস হাতে নিয়েও খেলা যায় না। একমাত্র আমার আর ইয়াকুব সাহেবের সুবিধা, আমারা টেবলের সব থেকে নিকটবর্তী। গেলাস পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। একটু দূরে হলেও হাফেজেরও খাবার পাত্র রাখার জায়গায় অনায়াসে গেলাস রাখার সুবিধা আছে। অসুবিধা একমাত্র জেসমিনের, কেননা উনি বসেছেন একেবারে মাঝখানে। যাঁর দুদিকেই হাতের নাগালে কোনো জায়গা নেই। কিন্তু তার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত না। জোড়াসন করে বসে দিব্যি তাঁর পাজামা পরা কোলের মাঝখানে পাত্রটি রেখে, দু'হাতে তাস নিলেন।

বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ এই আসর দেখলে নিশ্চয়ই একটি অনাচারের গন্ধ পেতেন। ভ্রূকুটি চোখে দেখে অনেক নীতিবিগর্হিত ঘটনার কল্পনায় সন্দিগ্ধ ক্ষুব্ধও হতে পারতেন। আমি এখন লিখতে লিখতে সেই অভাবনীয় ভ্রমণের ঘটনাটি মনে করে নিজেও অবাক হই। আসলে সমস্ত আসরটাই ছিল এক মর্মন্তুদ ব্যাথা ও যন্ত্রণার নাটক। অথচ বাইরের চেহারাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেন নারী সুরা বিলাস খেলার এক আসর। মানুষ আর তার বাস্তবতা কোনো ছকেই বাঁধা নেই।

পানের প্রথম ক্ষেপ শেষ করে দ্বিতীয় ক্ষেপ শুরু হতেই বন্ধ দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। হাফেজ উঠে দরজা খুললেন, ক্যাটারিং বেয়ারা, খাদ্যের পাত্রের বোঝা তার দু'হাতে। কখন গাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়েছে কারোরই খেয়াল ছিল না। ইয়াকুব হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, 'এটাই হচ্ছে ট্রেনের মুশকিল, সন্ধ্যে না হতেই খাবার। বেজেছে মাত্র সাড়ে আটটা।'

জেসমিন বললেন, 'আমি তো কিছু খাবই না, আপনারা যা হোক একটু মুখে দিন। একটা রাত্রের ব্যাপার তো।'

মানতেই হবে। নগরবাসী কয়োরই বোধ হয় এই সন্ধ্যে রাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। নগরজীবনে রাত্রি মাত্রেই অবসর বিশ্রাম এবং শয়ন না। তথাপি আতুরে যেমন নিয়ম নাস্তি, তেমনি, পথ চলায় অনেক অভ্যাসকেই বিসর্জন দিয়ে চলতে হয়। এখন হয়তো ক্ষুধার খাদ্য গলাধঃকরণ করা হবে না, কিন্তু ভিতরের মহাপ্রাণীটি যেন কাতর না হয়ে পড়ে, সেজন্য কিছু মজুদ করে

রাখাই শ্রেয়ঃ। বেয়ারা ততক্ষণে খাবারের ট্রে নামিয়ে দৌড় দিয়েছে। আবার ফিরে এলো চার বোতল জল নিয়ে। পান করো বা না করো তার কর্তব্য সে করে যাবে।

হাফেজ বললেন, 'কিন্তু জেসমিন, একাবারে কিছু না খাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না।'

জেসমিন তখন তাঁর আসন ছেড়ে নেমে এসেছেন। হাতে পানপাত্র এবং সেই প্লাস্টিকের রঙীন গেলাসটিই। বললেন, 'আমার মোটে খিদেই নেই। এক আধটা রাত্রি না খেলে আমি ভালোই থাকি। তোমরা শুরু করো, এ-পাট যতো তাড়াতাড়ি মেটানো যায়, ততোই ভালো।'

সেটাও ঠিক কথা। জেসমিন সত্যিই বসলেন না। তাঁর পাত্র পড়েই থাকলো। আমরা তিনজনে মোটামুটি সদগতি করলাম। গাড়ি ইতিমধ্যে চলতে আরম্ভ করেছিল। হাফেজ বাইরে গিয়ে, বেয়ারাকে ডেকে নিয়ে এসে নির্দেশ দিলেন ঝটিতি বাসনপত্র সরিয়ে নিতে। এবারও বিল মেটাবার জন্য ইয়াকুব তাঁর জুয়ায় জেতা তহবিলে হাত দিলেন। আমার বিলটাও তাঁর হাতে। আমি বললাম, 'এবার বিল মেটাবার সুযোগটা আমাকে দিন।'

ইয়াকুব বললেন, 'কখনই না।'

জেসমিন তাড়াতাড়ি ইয়াকুবের হাত থেকে বিলগুলো নিয়ে বললেন, 'কারোকেই দিতে হবে না, আমি দিচ্ছি।'

ইয়াকুব বললেন, 'খুব ভালো।'

জেসমিন বিল দেখে, টাকা গুণতে গুণতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটাও আপনাকে এক রকম শিকারই করছি। আপনাকে খাইয়ে-দাইয়ে তাজা রাখছি।' বলে হাসলেন। তাঁর গণ্ডদেশে রক্তাভা, চোখেও ঈষৎ, সম্ভবত পানীয়র গুণেই। বেয়ারাকে টাকা মিটিয়ে দিলেন। সে হিসাব বুঝে বখশিসের মাত্রায় প্রায় আভূমি নত সেলাম ঠুকল। তারপর বাসন বোতল ইত্যাদি নিয়ে চলে গেল।

হাফেজ দরজা বন্ধ করলেন। খেলার আসর বসতে বিলম্ব হলো না। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, পানের মাত্রা বেড়েছে। আমার পক্ষে এঁদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব না। তা ছাড়া ত্রিকোণ নাটকের আমি কোনো চরিত্র না। ত্রয়ীর কথোপকথনের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা তাদের পানের মাত্রাকে বাড়াচ্ছিল, ত্বরান্বিত করছিল। জেসমিন আমাকে একেবারে রেহাই দিচ্ছিলেন না, তবে

পরিমাণের দিক থেকে কিঞ্চিৎ দয়া প্রদর্শন করছিলেন। সেটাও আমি তেমন সহজে গ্রহণ করতে পারছিলাম না।

একটি বোতল শেষ হতে ইয়াকুব সাহেব দ্বিতীয় বোতল বের করলেন। এ বোতলের চেহারা ভিন্ন, গায়ে কালো কুকুরের ছবি। পানীয়ের নাম কালো কুকুর। কারণ বা পশ্চাৎ ইতিহাস, কিছুই জানি না। কিন্তু নিজেকে ক্রমেই বিপাকে পতিত বোধ করছি। ইতিমধ্যে হাফেজ এবং জেসমিনের মধ্যে একটু ধস্তাধস্তি হয়ে গিয়েছে। হাফেজ খেলায় একটু কারচুপি করতে গিয়েছিলেন। এক তাস তুলতে গিয়ে দুই তাস তুলেছিলেন, কিন্তু এক তাস ফেলতে গিয়ে দুই তাস ফেলেই ধরা পড়েছিলেন। ফলতঃ, তাস দেখতে চাওয়ার দাবী, টানাটানি, লুকানোর চেষ্টা—হাসি আর জেদ একসঙ্গে চলেছিল।

ইয়াকুব সাহেব গম্ভীর হেসে বলেছিলেন, 'শিশুরা কেবল খেলার সুযোগ খোঁজে।'

জেসমিন পান করে কী বলতেন জানি না। তখন বলেছিলেন, 'হ্যা সাহাব, শিশুরা তাই করে, বড়োরা (এল্ডারস) কী করেন?'

ইয়াকুব বলেছিলেন, 'শিশুর খেলা দেখে।'

জেসমিন বলেছিলেন, 'দুঃখ সেইখানে। বড়োরা যখন নিজেদের বড়ো ভাবেন, তখন তাঁরা কিছুতেই শিশু হতে পারেন না।'

ইয়াকুব বলেছিলেন, 'আমার ধারণা বড়োদের তাতে দুর্ভোগ বাড়ে। আমি সেই দুর্ভোগ ভোগ করতে চাই না।'

জেসমিন বলেছিলেন, 'দুর্ভোগ ভোগ করতে না চাইলেও দুর্ভোগ অনেক সময় ভাগ্যে থাকে।'

ইয়াকুব বলেছিলেন, 'ভাগ্য অনেক সময় সুন্দর, কখনও নির্দয়।'

জেসমিন বলেছিলেন, 'আমার ভাগ্য নির্দয়। তাই দুর্ভোগ।'

ইয়াকুব হেসেছিলেন, তাঁর চোখ রীতিমত রক্তিম এবং মুখও।

দ্বিতীয় বোতল আসরে নামতেই আবার আমার সেই 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘের দুশ্চিন্তা। নাটকের পরিণতি কোন্‌দিকে যাবে, কোথায় তার যবনিকা কিছুই বুঝতে পারছি না।

এক সময়ে ইয়াকুব সাহেব গুনগুনিয়ে উঠলেন। দৃষ্টি তাসের দিকেই, কিন্তু চোখের তারা যেন ক্রমেই অনড় হয়ে উঠেছে। জেসমিনের মুখ লাল, চুল কপালে ও গালে পড়েছে। কখন যেন তিনি আর হাফেজ পরস্পরের অনেকখানি ঘনিষ্ঠ স্পর্শে এসেছেন, যদিও তাঁদের তাস কেউ দেখতে পাচ্ছেন না।

ইয়াকুব সাহেবের গুনগুনানি ক্রমে ভাষায় ফুটলো, স্বর চড়লো। সুর শুনে মনে হলো তিনি গজল গাইছেন। গানের ভাষা আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল। কেবল কয়েকটি শব্দ আমার চেনা মনে হচ্ছিল। 'বেদরদ' 'ইনত্‌জার' 'দিল' ইত্যাদি জাতীয় শব্দ। গান গাইতে গাইতেও তিনি খেলছিলেন। কিন্তু প্রথম খেলা বন্ধ করলেন জেসমিন, তারপরে হাফেজ। দেখলাম, জেসমিন চোখ বুজে দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছেন। হাফেজ মাথা নিচু করে গানের সঙ্গে তাল দিয়ে একটু একটু মাথা দোলাচ্ছেন। তারপরেই ওপারের বার্থের ছায়ায় ঢাকা জেসমিনের চোখের কোণে দুটি মুক্তা বিন্দু চিকচিক করে উঠতে দেখলাম। মুহূর্তেই আমার চোখের সামনে যেন সমস্ত পরিবেশ বদলিয়ে গেল।

আমি গানের ভাষা বুঝতে পারি না। সুর এমন জিনিস, সে ভিতরে একটা ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইয়াকুব সাহেবের গলা এমন কিছু মিষ্টি না, কিন্তু তিনি যে গভীর আবেগে গাইছেন, তা বোঝা যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝি না, তবু 'অয় গুল' মানে 'হে গোলাপ' তা বুঝতে পারি। 'আঁসু' শব্দের অর্থ যে অশ্রু তাও জানি। সবটা জোড়া দিতে পারি না, কিন্তু জেসমিনের চোখ গলানো মুক্তাবিন্দু সহসা যেন আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল।

নাটক এবার সত্যিকারের। কুশীলবেরা এখন কেউই এই দর্শকের দিকে তাকিয়ে দেখছেন না। ইয়াকুব সাহেবের হাতে তাস ধরা, গান করছেন চোখ বুজে। আমি দেখতে পাচ্ছি, জেসমিন ঠোঁট টিপছেন, তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফীত, মুক্তাবিন্দু ঝরে তাঁর কপালে। আমার করনীয় কিছুই নেই। আমি তাস নামিয়ে দিয়ে বসলাম। ইচ্ছা করছে কামরার বাতি নিভিয়ে দিই। কিন্তু নাটকে সে-রকম কোনো অংশ গ্রহণের অধিকার আমার নেই। আলোক সম্পাতের টেকনিশিয়ান আমি না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, জ্যোৎস্না ফুটেছে। তেমন ফুটফুটে না, হয়তো শুক্লা সপ্তমী বা অষ্টমী। মনে হচ্ছে, গাড়ির গতি যেন কমে আসছে। মহারাষ্ট্রে প্রবেশের বিলম্ব আছে নিশ্চয়ই। আমার ভ্রমণটা কখনোই এমন না, যে ভৌগলিক নাম-ধাম জেনে নিয়ে যাত্রা করি। কোন্ দেশের ওপর দিয়ে এখন চলেছি, কিছুই জানি না। উজ্জয়িনীর সীমানা হয়তো এখনও দূরে। নর্মদা রাত্রের ঘুমেই হয়তো হারিয়ে যাবে। উজ্জয়িনী আর নর্মদার কথা ভাবলেই মনে পড়ে যায়, মহাকবি কালিদাসের কথা। আর এখন ভাবতে ইচ্ছা করে, তিনি যদি থাকতেন, আজ এই রেলগাড়ির কামরায়, তা হলে কী কাব্য সৃষ্টি করতেন?

গাড়ি একটা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। যাত্রীদের ওঠানামার কোনো সাড়া শব্দ নেই। যেন কোনো ঘুমন্ত স্টেশনে গাড়ি ঢুকলো, আর সুদীর্ঘ যান্ত্রিক শব্দ করে অনিচ্ছায় দাঁড়ালো। ইয়াকুব সাহেবের গান চলেছে। এঁদের কারোর কাছেই, এখন আমার অস্তিত্ব নেই। গান চলুক, আমি একটু বাইরে যাবার জন্য আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। অনেক সময় নাটক সামনে বসে দেখলে, তার সব খানিকে পাওয়া যায় না। একটু দূরে যেতে হয়, একটু আড়াল নিয়ে ভাবতে হয়।

যতোটা সম্ভব শব্দ না করে দরজা খুলে বেরিয়ে, আবার দরজা বন্ধ করে, করিডর দিয়ে গাড়ি থেকে নামবার দরজার সামনে গেলাম। কণ্ডাক্টর গার্ড কাছেই বসে ছিল, একবার দেখলো। আমি দরজা খুলে নেমে আগে সামনের দিকে সিগন্যাল দেখলাম। লালবাতি জ্বলছে। স্টেশনে বিদ্যুতের কোনো ব্যাপার নেই, কেরোসিনের কয়েকটি আলো টিমটিম করে জ্বলছে। তাতে অন্ধকার তেমন ঘোচেনি। স্টেশন মাস্টারের ঘর বা টিকেটঘর, যা-ই হোক, সেখানে কেরোসিনের আলো জ্বলছে। দু'একজন লোকের অস্তিত্ব সেখানে টের পাওয়া যায়। কেউ একজন টেলিফোনে কিছু বলছে। যাত্রী একজনও দেখি না। বোঝা যাচ্ছে এ স্টেশনে এক্সপ্রেসের থামবার কথা না, কোনো বিশেষ কারণে দাঁড় করাতে হয়েছে।

আমি আস্তে আস্তে সামনের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। জ্যোৎস্নাকে কুহেলীর আলোর মতো মনে হচ্ছে। প্রতি কামরায় আলো জ্বলছে, যাত্রীরা কথাবার্তা বলছে। আমার মতো আরও কয়েকজন এদিকে ওদিকে নেমেছে। লাল বাতির দিকে তাকাতে ভুলছি না, কারণ কখন সবুজ আমন্ত্রণের আলো জ্বলে উঠবে, কে জানে। তখন আবার দৌড় দিতে হবে।

অনেকখানি এগিয়ে, পিছন ফিরতে যেতেই বাধা পেলাম। আমার পথ আটকেই যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে দেখি ইয়াকুব সাহেব। বললেন, 'আপনাকে খুবই বিরক্ত করা হয়েছে, মাফ করবেন।'

বলে তিনি হাত বাড়াতে, আমিই এবার সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে, ওঁর হাত ধরে বললাম, 'না না, বিশ্বাস করুন। আমাকে মোটেই বিরক্ত করা হয়নি। আমার বাইরে আসাটা নিতান্তই অন্য ব্যাপার।'

ইয়াকুব বললেন, 'আমি বুঝতে পারি, অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে ও রকম পরিবেশে বসে থাকা সম্ভব না।'

বললাম, 'আমার পক্ষে তা মোটেই অসম্ভব ছিল না। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ চিত্তে আপনার গান শুনছিলাম। সম্ভবত আপনি উর্দুতে গজল গান করছিলেন?'

ইয়াকুব মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক ধরেছেন।'

বললাম, 'আমি সুর বুঝি, ভাষাটা আয়ত্তে নেই। কিছু শব্দের মহিমা আমাকে কিছুটা ধরতাই দিচ্ছিল। আর, আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে বলতে পারি আপনার গানের সঙ্গে, মিসেস ইয়াকুব এবং মিঃ হাফেজও অত্যন্ত মিশে গেছলেন। আমি ততোটা মিশে না যেতে পারলেও, শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার গান আর সমস্ত পরিবেশ আমার বুকের মধ্যে টনটনিয়ে দিচ্ছিল।'

ইয়াকুব কিছু বলতে পারলেন না, আমার হাতে একটু জোরে চাপ দিলেন।

আবার বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি, আমার মনে হয়েছিল আমার সামনে গায়ক এবং বাকী দুই শ্রোতা, সকলেরই আলাদা আলাদ সমস্যা আছে।'

ইয়াকুব এবার দু'হাত দিয়ে আমার হাতটি চেপে ধরে বললেন, 'আহ্, এর থেকে সত্যি আর হয় না। হয়তো আপনার মতো এ ভাবে ব্যাপারটা আমিও ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। আশ্চর্য আপনার দৃষ্টিশক্তি, সেই সঙ্গে আপনার অনুভূতিশীল মন।'

লজ্জা পেলাম, বললাম, 'না না, এ রকম করে বলবেন না। আমার যা মনে হয়েছে, তাই বললাম।'

ইয়াকুব বললেন, 'জানি। আপনাকে অনুভূতিশীল বললাম এই কারণে, আপনি আমাদের প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছেন। আমি জানি কোনে চতুর্থ ব্যক্তি থাকলে, এত অনায়াসে আমাদের প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করতে পারতাম না। কারণ, সে আমাদের এ মর্যাদা দিতে পারতো না, সমস্ত ব্যাপারটাকে হয়তো অন্য চোখে দেখতো।'

আমি বললাম, 'আমার সে কথা কখনও মনে হয়নি। বরং, আপনার গান শুনতে শুনতে আমার মনে একটা বাংলা গানের কলি জেগে উঠেছিল, ইংরেজিতে সেটা কতোখানি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব, জানি না।'

'তবু বলুন, আমি শুনি।' ইয়াকুব বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন।

আমি ইংরেজিতে যা বললাম, তা এই রকম, 'মাই কাপ ইজ ফুল উইথ্ গ্রেট পেইন। ড্রিংক, ওহ্ ডার্লিং, ড্রিংক!' যার বিখ্যাত কলি এই রকম, 'বেদনায়, ভরে গিয়েছে পেয়ালা, পিও হে পিও।'

ইয়াকুব যেন একটা ব্যথা ধরা উচ্ছ্বাসে আমার হাত ধরে বারবার ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, 'চমৎকার! অপূর্ব! আমি জানি, বাঙলা গানের শব্দ অত্যন্ত ধনী, দুঃখের বিষয় আমি বুঝি না। কিন্তু আমার গান শুনতে শুনতে, আমাদের দেখে, এ গান কেমন করে আপনার মনে এলো? যে আমাদের জীবনের অংশভাগী নয়, কিছুই জানে না, সে কেমন করে, এমন গভীরে যেতে পারে?'

জ্যোৎস্নার কুহেলি আলোয় ইয়াকুব সাহেবের রক্তিম চোখে অপার কৌতূহল চিকচিক করছে। যেন তিনি বহুদূর থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, চিনতে চাইছেন, আমি কে। বললাম, 'ইয়াকুব সাহেব, বিগত ঘটনাবলীই যে মানুষকে সব সময় চিনিয়ে দেয়, তা না। এবং বলব না, আপনাদের আমি চিনতে পেরেছি। তবে এ কথা ঠিক, কোনো কোনো বিষয়ে কারো কারো ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে একটা ইন্দ্রিয় থাকে যা তাকে অনেক জানিয়ে আর চিনিয়ে দেয়। যেমন শিকারীর ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে জানিয়ে দেয়, শিকার কাছাকাছি এসে গেছে, যদিও তাকে চোখে দেখা যায়নি। তেমনি আপনাদের ক্ষেত্রেও। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বোধ হয় কাজ করেছিল।'

ইয়াকুব সাহেব আমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে হেসে বললেন, 'ওহ্, আপনিও দাগা খাওয়া। দাগা না খেলে তো এমন ভাবে কেউ বুঝতে পারে না? সেইজন্যই আপনার অনুভূতির এই গাঢ়তা, এখন বুঝতে পারছি।'

এই সময়েই হঠাৎ গাড়ির হুইসল্ বেজে উঠলো। এত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম দু'জনের কেউই লক্ষ্য করিনি, কখন সবুজ বাতি জ্বলে উঠেছে। 'যারা নেমেছিল, তারা সবাই উঠে গিয়েছে, এখনও কেউ কেউ উঠছে। আমাদের বাগীটা বেশ পিছনে, আমরা অনেকখানি সামনে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। আমি পিছন দিকে ছুটতে গেলাম, ইয়াকুব আমার হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'থাক, পিছন দিকে আর ছুটবেন না। গাড়ির গতি বেড়ে যাবো। আসুন, আমরা এই কামরাতেই উঠে পড়ি।'

বলেই, তিনি আমার হাত ধরে, এক রকম জোর করেই সামনের একটি দরজার হাতল ধরিয়ে দিলেন। আমি লাফ দিয়ে উঠতে না উঠতেই, তিনিও পিছন থেকে আমার গা লেপটে উঠে হাতল ধরলেন, দরজা খোলবার চেষ্টা করতেই একজন যাত্রী ভিতর থেকে বলে উঠল, 'ইয়ে রিজার্ভ স্লিপার হ্যায়।'

ইয়াকুব একটু ধমকের সুরে বললেন, 'ম্যায়লোগ এক্সপ্রেসকে ফার্স্ট ক্লাসকি

প্যাসেঞ্জার। গাড়ি ছোড় দি তো ইধার উঠ গয়া, রোখ্নে সে ফিন্ উতর যায়েঙ্গে।'

বলেই দরজা খুলে, আমাকে আগে ভিতরে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। দরজা বন্ধ করে বললেন, 'আপলোগকা কুছ তখলিফ নেহি দেঙ্গে,.ম্যায় লোক দরওয়াজে সামনেই ঠাহ্বরতে হ্যায়।'

একজন যাত্রী বললেন, 'কোই বাত নাহি হ্যায় জী, 'আরামসে ঠাহ্বরিয়ে।'

ইয়াকুব সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন। কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করলাম অন্য কারণে। বললাম, 'মিসেস ইয়াকুব আর মিঃ হাফেজ নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করবেন, জানতে পারবেন না, আমরা উঠতে পারলাম কী না?'

ইয়াকুব খানিকটা নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন, 'হয়তো একটু দুশ্চিন্তা করতে পারে, কিন্তু বুঝে নেবে, আমরা তাড়াতাড়ি অন্য কোনো কামরায় উঠে পড়েছি। আমি আপনাকে খোঁজবার কথা বলেই, কামরা থেকে বেরিয়ে ছিলাম। আপনাকেও ফিরতে না দেখে, বুঝতে পারবে, আমরা দু'জনেই একসঙ্গে আছি।'

ইয়াকুব সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো অন্য কামরায় উঠে পড়ার এই দ্রুত সিদ্ধান্তটি তিনি যেন ইচ্ছা করেই নিয়েছেন। তিনি একটু হেসে আবার বললেন, 'পাখিরা সকলেই বাসায় ফিরবে। কখনো কোনো কোনো পাখি কোনো সময় পথভ্রষ্ট হয়, ফিরতে একটু দেরি হয়।'

ওঁর শেষের কথা যেন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল, তিনি ইচ্ছা করেই অন্য কামরায় উঠেছেন। কেন এই ইচ্ছাকৃত বিচ্ছিন্নতা? নিতান্ত দায়, না দয়া, হাফেজ আর জেসমিনের প্রতি এবং নিজের প্রতি?

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। ইয়াকুবকে ইতিমধ্যে, একটি সিগারেটও পান করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি নিজের থেকেই বললেন, 'সাহাব, একটা সিগারেট আমাকে দিন, একটু ধূমপান করা যাক।'

আমি একটু অবাক হয়েই, সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

সিগারেটটি দিয়ে আমিই দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিলাম। ইয়াকুব আনাড়ির মতো সিগারেট মুখে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'দেখুন, আপনি কে, কেমন লোক, আমি তা জানি না, শুধু জানি আপনি কোনো কাজ করেন, বম্বে যাচ্ছেন, একজন বাঙালী। কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না, ইতিমধ্যেই আপনি আমাদের বন্ধু হয়ে গেছেন। এটা খুবই আশ্চর্যের, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার সামনে আমাদের জীবনের ঘটনাবলীর অস্পষ্ট অধ্যায়, ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছেন, তাই, নয় কী?'

এ কথার স্পষ্ট জবাব কী হতে পারে আমি জানি না। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'আপনি কী বলতে চাইছেন বলুন।'

ইয়াকুব বললেন, 'বলব বলে তো আপনাকে নিয়ে এ ভাবে আলাদা কামরায় উঠলাম, আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সম্ভবত আমার এ আচরণকে হাফেজ এবং জেসমিনও ভুল বুঝবে। তা বুঝুক, সেটা পরে মিটে যাবে। কিন্তু আপনাকে আমি সামান্যই দু-একটি কথা বলে নিতে চাই। আমি জানি আপনি কিছু একটা অনুমান করেছেন, যে একটা ত্রিকোণ ঘটনা আপনার ঘটেছে। সত্যি নয় কী ?'

আমি ইয়াকুব সাহেবের চোখের দিকে তাকালাম। দ্বিধাবোধ করছি, তবু বললাম, 'আপনার অনুমতি নিয়েই বলছি, আমার সেই রকমই মনে হয়েছে।'

ইয়াকুব বললেন, 'সাহাব, আমি বেয়াকুফ না, আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আর এটুকু বুঝতে পারি না ? এর জন্য আবার অনুমতি নিয়ে বলবার কী দরকার আছে ?' বলে তিনি হেসে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'এই ত্রিকোণের ত্রয়ী, আমি, আমার স্ত্রী আর আমারই স্ত্রীর সম্পর্কিত ভাই হাফেজ।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'হাফেজ সাহেব আপনার শ্যালক ?'

ইয়াকুব বললেন, 'হ্যাঁ। হাফেজ জেসমিনের মায়ের বোনের ছেলে। হাফেজের সঙ্গে জেসমিনের ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব। ওরা যদি বিয়ে করতে চাইত বিয়ে করতে পারত। কিন্তু ওদের মধ্যে সেরকম কোনো ব্যাপার ছিল না। ব্যাপারটা ঘটলো অনেক পরে, আর ঘটেছিল এমন ভাবে, স্বীকার করতেই হবে, হাফেজ আর জেসমিনও তা বুঝতে পারেনি, ওরা নিজেদের এত কাছাকাছি ক্ষেত্রে চলে আসছে, যখন পরস্পর পরস্পরকে ছাড়া থাকতে পারে না।'

ইয়াকুব সাহেব সিগারেটে আবার টান দিয়ে বিস্বাদ বোধ করায়, জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'বরং ব্যাপারটা আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারিনি। হাফেজের স্ত্রী একজন পারসিয়ান মহিলা। হাফেজ দীর্ঘকাল ফ্রান্সে ছিল। ওর দুটি সন্তান আছে। আমারও আছে, আমার আর জেসমিনের এক মেয়ে। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা বলতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। আপনাকে শুধু এইটুকু বলছি, এখন এমন একটা অবস্থার মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছি, আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। হিংসা বা ঈর্ষার স্বীকার আমরা কেউ হইনি, তা বলবো না।

বিশেষ করে হাফেজের স্ত্রী আর আমি ঈর্ষায় যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছি। আমার দিক থেকে কষ্ট পর্যন্তই, আমি কোনো ইতর আচরণ করতে পারিনি। পারিনি তার কারণ—'

ইয়াকুব সাহেব একটু থামলেন, এক মুহূর্তের জন্য অন্য দিকে তাকালেন, তারপরে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'জেসমিনকে দুঃখ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। জেসমিনকে বিয়ের আগে থেকে চিনি, আট বছর একসঙ্গে সংসার করেছি, জেসমিন আমার জীবনেরই আর একটি সত্তা। আমার অস্তিত্বের অন্য একটা রূপ! ঈর্ষা করেও, ওকেই যদি হারাই, তবে সে ঈর্ষার মূল্য কী? মানি, মন তথাপি মানে না। অসহ্য কষ্টে, বুকের মধ্যে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। তবু জেসমিনকে তো আমি পাবো না। জেসমিন আমাকে নিজে থেকেই সব বলেছে, তারপরে আমি হাফেজের সঙ্গেও কথা বলেছি। হাফেজ বা জেসমিন কেউই বিগেমস্টি আচরণ করতে চায়নি, তাহলে ওরা লুকিয়ে, নিজেদের সঙ্গে অনায়াসে মেলামেশা চালিয়ে যেতে পারতো। জেসমিন অন্তত সে ভাবে ঠকাতে চায়নি।'

ইয়াকুব সাহেব আবার থামলেন। আর আমি যেন একটা ত্রিকোণ নাটকের, আবহ সঙ্গীতের মতো ট্রেনের ঘরঘর শব্দ শুনে চলেছি। ইয়াকুব সাহেব আবার বললেন, 'আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি, জেসমিনকেও বলেছি, ভেবে দেখতে যে, এটা একটি সাময়িক অবসেশন কি না। জেসমিন পরিষ্কার করে তা বলতে পারেনি। তবে পরিষ্কার করে বলেছে, আপনি আমাকে তালাক দিন। বিচ্ছিন্ন হতে দিন, আপনার কাছে থাকবার সব অধিকার আমি হারিয়েছি। এর পরে আর এক দণ্ডও থাকা চলে না। আবার যদি আপনার কাছে কখনও ফিরে আসতে হয়, তখন কি আপনি আমাকে আর গ্রহণ করবেন?'

ইয়াকুব সাহেব হাসলেন। বললেন, 'জেসমিনকে এ-কথার কী জবাব আমি দিতে পারি? এখন আমাদের তালাক হয়নি, একমাত্র কারণ জেসমিনের দ্বিধা। কোনো সময় সে হঠাৎ তালাক চেয়ে বসে, আবার পরমুহূর্তেই বলে, না না; এখন না। আর একটু ভাবি। তবে তার আর দরকার নেই। সে পর্ব শেষ হয়েছে। এবার বম্বে গিয়েই আগে তালাক। হাফেজের পারসিয়ান স্ত্রী, এক সপ্তাহ আগে, একটি বাচ্চাকে নিয়ে প্যারিসে চলে গেছে। আমি জেসমিনকে নিয়ে আমাদের নিজেদের বাড়িতে, শেষবার গেছলাম। আপনাকে এইটুকু না বললে, আমার ভালো লাগত না। আপনি যখন বম্বে থাকবেন,

আমার ঠিকানায় কয়েক দিন বাদে এলে খুশি হবো। কামরায় ফিরে গিয়ে আপনাকে আমার কার্ড দেব।'

আমি ইয়াকুব সাহেবের দিকে তাকালাম। কার কষ্ট বেশি, ঠিক যেন বুঝতে পারছি না। জেসমিন-চরিত্র আমার কাছে কেমন জটিল হয়ে উঠলো। হাফেজ তার জীবনের অনেকখানি পার হবার পরেও বুঝতে পারেনি, পরবর্তী-কালে, একজনের স্ত্রী এবং একটি জননীকে দেখে হয়তো সে তার জীবনের তৃষ্ণার জলাশয় খুঁজে পেয়েছে। কারোকে দোষ দেওয়ার চিন্তা অবান্তর। কেননা, ব্যাপারটা সে ভাবে ঘটেনি! তথাপি কেন জানি না, ইয়াকুবের মুখের দিকে তাকিয়ে, আমার কোথায় যেন টনটনিয়ে বাজছে। কেবলই মনে হচ্ছে, যা হারাবার, তা উনিই হারাচ্ছেন। আমি আমার হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'ধন্যবাদ।'

ইয়াকুব আমার হাতটি চেপে ধরে, আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিলেন।

গাড়ি একটি স্টেশনে এসে দাঁড়ালো।

আমরা দু'জনে নেমে, খানিকটা অগ্রসর হতেই, হাফেজকে দ্রুত উদ্বিগ্ন মুখে আসতে দেখা গেল।

সামনে এসেই ইয়াকুব জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় ছিলে তোমরা?'

ইয়াকুব হেসে বললেন, 'খুব ভাবছিলে তো? আমরা অন্য কামরায় উঠেছিলাম।'

হাফেজ জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তোমাদের সঙ্গে জেসমিনকে দেখছি না কেন?'

আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম। ইয়াকুব জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে? জেসমিন কামরায় নেই?'

হাফেজ বললেন, 'না তো? সেও তো নেমে গেছল।'

ইয়াকুব উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'কী বলছ তুমি!'

হাফেজ বললেন, 'ঠিকই বলছি। অ্যাটানডেন্ট গার্ড জেসমিনকে নামতে দেখেছে।'

ইয়াকুব হন্তদন্ত হয়ে স্টেশন মাষ্টারের কাছে গেলেন। বলে গেলেন, আমি আর হাফেজ যেন প্রত্যেকটি কমপার্টমেণ্ট তন্নতন্ন করে খুঁজি। হাফেজ পিছন দিকে যেতে যেতে বললেন, 'আমি গার্ডকেও একটু বলি।'

তারপরে চলে খোঁজার পালা। স্টেশনটিতে বিদ্যুতের আলো ছিল, সেটাই যা ভরসা। জেসমিনের বর্ণনা নিয়ে, আরও কয়েকজন খুঁজতে লেগে গেল। কিন্তু আমি ব্যাপারটা ঠিক ভাবে নিতে পারছি না। যত সুরাপানই করুন, জেসমিন বিবি এ রকম একটা কৌতুক করতে পারেন না, যে তিনি অন্য কোনো কামরায় গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকবেন। কথাটা মনে হতে, আমি স্টেশন মাস্টারের অফিসে ইয়াকুব সাহেবের সন্ধানে গেলাম।

অফিসের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। ইয়াকুব সাহেব টেলিফোনে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছেন, তাঁর হাতে রিসিভার থরথর করে কাঁপছে, তিনি চিৎকার করে বলছেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পায়জামা আর ছোটো কলার জ্যাকেট ছিল। আঙুলে ডায়মণ্ডের সোনার আংটি ছিল। আছে? ওহ্ হ্যাঁ হাতে ঘড়ি? ওহ্ খোদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব-সব বিলকুল মিলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি যে ভাবেই হোক ফিরে যাচ্ছি।'

রিসিভার রেখেই, ইয়াকুব সাহেব ঠাস করে টেবিলের উপর মাথা ঠুকলেন। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন রেল কর্মচারী দাঁড়িয়ে। কেউ কথা বলছে না। আমি কাছে গিয়ে, দ্বিধা করে, তাঁর কাঁধে হাত দিতেই চমকে মুখ তুলে তাকালেন, বললেন, 'ওহ্, আপনি? জেসমিন আমাদের ছেড়ে গেছে।'

'ছেড়ে গেছে?'

ইয়াকুব সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ। আগে গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই জেসমিন নেমেছিল আর সেখান থেকে যখন গাড়ি ছাড়ে, সকলের অগোচরে সে চাকার তলায় গলা পেতে দিয়েছে। তার ছিন্ন শিরের সংবাদ এই মাত্র পেলাম।' বলতে বলতেই তিনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি নির্বাক, স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। জেসমিনের মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে!

হঠাৎ কণ্ঠধ্বনি শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে কামরার দিকে গেলাম। দেখলাম ইয়াকুব আর হাফেজ তাঁদের মালপত্র নিয়ে নামছেন। গাড়ি হুইসল দিয়ে নড়ে উঠলো, ইয়াকুব আমার হাত চেপে বললেন, 'বিদায় বন্ধু, আপনি একটা পরিণতি দেখে গেলেন।'

হাফেজ দূরের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে। গাড়ি এগিয়ে চলল।

আমার ঘরের বাইরের দুরন্ত তৃষ্ণা, আশা কখনও মেটে না। কিন্তু যাত্রা পথে, এমন আকস্মিক ঘটনা আর কখনও ঘটেছে বলে মনে করতে পারছি না। গাড়ি

চলে, চলবে, আমিও চলব, তথাপি, মনে হচ্ছে, আমি রয়ে গেলাম পিছনে, যেখানে রক্তাক্ত জেসমিন এখনো শায়িতা।

জীবনের কার্যকারণের ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পেতে চেয়েছি। ব্যাখ্যা যে একেবারেই নেই, এমন কথা বলি না। কিন্তু এমন কথা যেন জোর করে কোনো দিন না বলি, জীবনের বাস্তবতা, কতকগুলো চাক্ষুষ আর স্থূল ছকে বাঁধা। তা যদি হতো, তাহলে এমন করে, জেসমিন বিবি আমার চলার পথটিকে তাঁর আত্মনাশের রক্তরেখায় এঁকে দিয়ে যেতেন না।

আমার যাত্রা ছিল আপাতত মহারাষ্ট্রে, রথের নাম বোম্বাই এক্সপ্রেস। তার চেয়ে দ্রুতগামী মেল গাড়ির আসন আমার কপালে জোটেনি। তাতে দুঃখ ছিল না। আমি রাজা নই, রাজার লোকও না, কোনো রাজকার্যেও আমার যাত্রা না। অতএব ধিকিধিকি এক্সপ্রেসের যাত্রায়, একটু অলস মন্থর গমন ভালোই লাগছিল। হাওড়া থেকে ওঠবার সময়, আমার প্রথম শ্রেণীর কূপের চারটি বার্থই ভরা ছিল। এক রাত্রি পরেই, কে কোথায় নেমে গিয়েছিল, মনে নেই। স্বার্থপরের মতো মনে মনে একটু আহ্লাদ বোধ করেছিলাম, চলন্ত রথের গোটা একখানি কামরা আমার দখলে। নিজের রাজ্যপাট ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া যাবে ভালোই। তারপরে অবিশ্যি মনে হয়েছিল, একেবারে নিঃসঙ্গ যাত্রাটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা। তা হোক, খোলা জানালা ছিল, চোখের সামনে ছিল অসীম আকাশ, উদার প্রকৃতি। তার সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ ঘটে গেলে, নিঃসঙ্গতার মধ্যেও একটি অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করা যায়।

মনে মনে যখন সেই আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি, তখনই কোন্ এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই, হুড়মুড় করে আমার কামারাখানি গেল ভরে! ঝপাঝপ ঢুকে পড়লো একরাশ বাক্সো প্যাঁটরা। রক্ষে এই, যাত্রীর সংখ্যা বেশি না, তিন। দুই পুরুষ এক মহিলা। তাঁদের সঙ্গে একটি বিশেষ জিনিস যা ঢুকলো, তা চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ছোঁয়াও যায় না। একমাত্র ঘ্রাণেই তা পাওয়া যায়, যাকে বলে অতি নামী ও দামী প্যারিসিয়ান পারফিউম। বাঙলায় যারে কয়, বিলাতী সেণ্ট।

যাঁরা উঠলেন, প্রথমে তাঁদের জাত জাতি বোঝা দায়। বাত শুনেও বোঝা মুশকিল। উর্দু মেশানো হিন্দী, ভারতের অনেক জায়গাতেই চল্। পরে তাঁদের কথাবার্তাতে, নিজেদের মধ্যে সম্বোধনে জানা গেল, একজনের নাম ইয়াকুব আর একজনের হাফেজ, মহিলার নাম জেসমিন। সব মিঁয়া বিবির ব্যাপার। কিন্তু গায়ে কুত্রাপি লেখা নেই। দুই মিঁয়া হাল ফ্যাশানের পাতলুন কমিজে একেবারে

সাহাব। বিবির ঘাড় অবধি কৃষ্ণকালো কেশ, আধুনিকাদের যা লক্ষণ। গায়ে কলারওয়ালা ছোট জ্যাকেট, হাওয়াই শার্ট বললেও চলে, আর চৈনিক মহিলাদের মতো পায়জামা। চোখে কাজল, ঠোঁটে রঙ। রাঙানো নখ মুকুরের মতো, মুখ দেখলেই হয়। রূপসী তিনি বটেন, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে, চোখের তারায় বিদ্যুতের ঝিলিক হানে, হাসিতেও।

সেই সঙ্গে সাহেবেদের কথাও বলতে হয়। হাফেজ সাহেব একটু রোগা আর দীর্ঘ, ইয়াকুব সাহেবও দীর্ঘ পুরুষ, চওড়াতে তিনি একটু বেশি। জেসমিন যেমন গৌরী, সাহেবরাও তেমনি গৌরাঙ্গ এবং সুপুরুষ। বয়স তাঁদের চল্লিশের মধ্যে। বিবির বয়স? তোবা তোবা! তেমন ক্ষ্যামতা আল্লা আমাকে দেননি, যে বিবিদের দেখেই তাঁদের হক্ বয়সটা বলে দেব। তবে হ্যাঁ, চেষ্টা চরিত্তির করে বলা যায়, তিরিশের এপাশ-ওপাশ ঘেঁষে তাঁর বয়স হতে পারে।

প্রথমে বুঝতে না পারলেও, মির্যা বিবিদের কথাবার্তায় সম্পর্কটা অনুমান করতে পেরেছি। জেসমিন বিবি হাফেজকে হাফেজ বলে সম্বোধন করেন, ইয়াকুবকে সাহাব। অবশ্যি সেটা আদারের ডাকও হতে পারে। পরে শুনেছি ওঁরা দু'জন কর্তা গিন্নি।

তারপর তাঁরা যখন তাস নিয়ে বসলেন, তখন আমার ডাক পড়লো। আলাপটা সেই সূত্রেই। যেমন তেমন তাস খেলা না, পুরো জুয়া। টাকা দিয়ে খেলা। কিন্তু এটাকে গ্যাম্বলিং বললে হবে না, গেম্ বলতে হবে। খেলতে খেলতে তাঁদের সঙ্গে, কখন এক সময় থেকে কিঞ্চিৎ নৈকট্য ঘটে গিয়েছে খেয়াল করিনি। যাকে বলে ইন্টিমেসি। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছিল, ত্রয়ীকে ঘিরে একটা নাটক চলছে। দর্শক আর শ্রোতা আমি। গোয়াল পোড়া গোরু আমি এ কথা ঠিক বলা যাবে কী না জানি না, কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। তিনজনের হাসি কথাবার্তায়, কেমন একটা আঁচ পাচ্ছিলাম, তাতেই একটা ভয় হচ্ছিল। কেননা, কোথায় একটা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ঝগড়া বিবাদ মারামারিকে আমার বড়ো ভয়।

কিন্তু না! সে পথ তাঁদের ছিল না। ইয়াকুব সাহেবকে স্বামী হিসাবে অসহায় ব্যথিত পুরুষ মনে হচ্ছিল। একই অসহায়তা ও বিষণ্ণতা মাঝে মাঝে হাফেজ আর জেসমিনের মধ্যেও ফুটে উঠছিল।

এক সময়ে উর্দু শায়ের-এর মধ্যে দিয়ে তাঁদের মনের কথা ব্যক্ত হচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে চরিত্রও। সন্ধেবেলা জেসমিন বিবির ঝাঁপি থেকে বেরিয়েছিল লাল পানীয় বোতল, ভ্যাট উনসত্তর। জানি, দৃশ্যটা অনেকের চোখে ভ্রুকুটি

ক্রোধের সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, জুয়া, নারী, সুরা, সবই এসেছে, আর বাকী রইলো কী?

বাকী যা তা শোনা যাবে কালের ধ্বনিতে। শ্রবণ সচেতন রাখলে প্রাণের ধ্বনি শোনা যায়। যার তা নেই, সেই সমাজপতিরা তফাত যাও।

খেলাতে হেরে মরছিলাম আমি আর হাফেজ। জিতে নিচ্ছিলেন কেবল মিঁয়া বিবি। বিবি তো আমাকে জানিয়েই ছিলেন, আমি শিকারটি বেশ ভালো, তিনি আমাকে আয়েস করে খাবেন। মুখটি একটু আলগা, প্রাণের সন্ধান পেলাম তখন, যখন খেলতে খেলতে ইয়াকুব সাহেব গুনগুন করে একটি গজল ধরলেন। দেখলাম, খেলা ঝিমিয়ে আসছে, জেসমিন বিবির চোখের কোণে মুক্তাবিন্দু চিকচিক করছে।

তারপরে খেলা একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। পরিস্থিতিটা আমার কাছে অস্বস্তিকর। দর্শক হলেও। গাড়িটা সিগন্যাল না পেয়ে একটা ছোট স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়তেই নেমে গেলাম। প্রায় অন্ধকার স্টেশন, দু-একটা টিমটিমে কেরোসিনের আলো। দূরে সিগন্যালের লাল আলো। অনেকখানি এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। ফিরতে গিয়ে ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনিও বেরিয়ে এসেছেন। কয়েকটি কথাবার্তার মধ্যেই হঠাৎ লাল আলো নীল হলো। গাড়ি ছেড়ে দিল। ইয়াকুব সাহেব আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন অন্য একটি কামরায়। কেন যেন মনে হলো, জেসমিন আর হাফেজকে তিনি ইচ্ছা করেই একসঙ্গে এক কামরায় থাকবার অবকাশ করে দিলেন। আর প্রীতি আর আবেগবশত আমার কাছে খুলে দিলেন নাটকের নেপথ্য ছবি।

জেসমিন আর হাফেজ মাসতুতো ভাই বোন। ছেলেবেলায় ওরা মেলামেশা করেছে এবং বড়ো হয়েও করেছে। কিন্তু কখনো প্রেম তাঁদের মধ্যে জন্ম নেয়নি। হাফেজ বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী ফরাসী মহিলা, তাঁদের দুটি সন্তান। ইয়াকুব দশ বছর আগে বিয়ে করেছেন জেসমিনকে। তাঁদের একটি আট বছরের কন্যা আছে। কিন্তু সম্প্রতি কিছুকাল দেখা যাচ্ছে, হাফেজ আর জেসমিনের মধ্যে গভীর প্রেম জন্মেছে। জেসমিন ইয়াকুবের কাছে তালাক চেয়েছেন। ইয়াকুব সাহেব তা দিতেও চেয়েছেন। অথচ জেসমিনই আবার বাধা দিয়েছে। এই অবস্থায়, হাফেজের ফরাসী বিবি একটি সন্তানকে নিয়ে চলে গেছেন তাঁর স্বদেশে। ইয়াকুব সাহেব শেষবারের মতো জেসমিনকে তাঁর দেশের বাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বম্বে গিয়েই শুধু একটি কাজ, জেসমিনকে তালাক। উদ্দেশ্য জেসমিন আর হাফেজ সুখী হোক। ইয়াকুব সাহেব ভীরু

নন, জেসমিনকে তিনি ভালোবাসেন বলেই এ সিদ্ধান্ত। আমাকে অনুরোধ করলেন, বম্বে গিয়ে, এক সপ্তাহ বাদে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কামরায় ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর নাম ঠিকানা মুদ্রিত কার্ড দেবেন।

এই নেপথ্য কাহিনীর মধ্যেই গাড়ি এসে দাঁড়ালো একটি বড় স্টেশনে, বিজলী বাতির আলো সেখানে। আমি আর ইয়াকুব সাহেব ভিন্ন কামরা থেকে নেমে নিজেদের কামরার দিকে ফিরে চললাম। মাঝপথে ছুটে এলেন হাফেজ সাহেব। জিজ্ঞেস করলাম, জেসমিন কোথায়? তিনি জানালেন, আমাদের পিছনে-পিছনে জেসমিনও নেমে এসেছিলেন সেই স্টেশনে, আর তাঁর কামরায় ফেরেননি।

ইয়াকুব সাহেবের মুখ পাংশু হয়ে উঠলো। তিনি আমাকে আর হাফেজকে সারা ট্রেন তন্নতন্ন করে খুঁজতে বলে, নিজে গেলেন গার্ডের কাছে।

জেসমিনকে কোনো কামরায় দেখতে পাওয়া গেল না। ইয়াকুব সাহেব টেলিফোন করলেন সেই ফেলে আসা ছোট স্টেশনে। জানা গেল, এই গাড়ি ছেড়ে আসার সময়, এক মহিলা লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বর্ণনায় মিলে গেল, তিনি আর কেউ নন, জেসমিন।

ইয়াকুব আর হাফেজ তাঁদের মালপত্র নিয়ে নেমে গেলেন সেই ছোট স্টেশনে ফিরে যাবার জন্য। বম্বে এক্সপ্রেস আবার যাত্রা করলো। চাকায় তার জেসমিনের রক্তের দাগ।

করিডর দিয়ে আস্তে আস্তে সেই কূপের খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে মনে একটা ব্যাকুল প্রত্যাশা ছিল, চারজনের সেই কামরার মধ্যে, হয়তো এতক্ষণে অনেক নতুন যাত্রীর দেখা পাব। কিন্তু না, আমার সে প্রত্যাশাটাই ভুল। এ কামরা বম্বে পর্যন্ত চারজনের জন্য রিজার্ভ ছিল। রাত্রি ন'টা বেজে গিয়েছে, তারপরে আর প্রথম শ্রেণীর কামরায় নতুন যাত্রীর আসবার প্রশ্নই থাকে না।

তথাপি প্রত্যাশা করেছিলাম, আসলে যেটা আমার আকাঙ্ক্ষা। কারণ, সারাটা রাত্রি, এ কামরায় একলা থাকবো কেমন করে? কায়াহীনের ভয় আমার অপাতত নেই। বরং জেসমিন যদি তাঁর কায়াহীন অস্তিত্ব নিয়ে এ কামরায় আসেন, ঘোষণা করেন তাঁর আগমন বার্তা, তবু জানবো, আমি একলা নই। যে মহানাটক সারাদিন, এই রাত্রি পর্যন্ত আমি দেখেছি, তার

নায়িকা এই কামরার মধ্যেই কোথাও আছেন, তা যতোই উন্মাদনাকর হোক, রাত্রিটা কাটাবার পক্ষে তা-ই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমি জানি, সংসারের বাস্তবতায় তা সম্ভব না। ইংরেজিতে যাকে বলে অবসেশন, জেসমিন বিবি আমার মস্তিষ্কে তা কতোখানি গভীরতা সৃষ্টি করেছেন, এ মুহূর্তে আমি তার পরিমাপ করতে পারছি না, শুধু ভুলতে পারছি না তাঁর কথা। ঢুকতে পারছি না শূন্য কামরার মধ্যে। আমার দৃষ্টি, জানালার ধারে আসনের ওপরে, যেখানে এসে তিনি প্রথম বসেছিলেন, এক ঝলক রূপের দীপ্তি নিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে একটি অনতিতীব্র সুগন্ধ। যদি শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারতাম, তাহলে, দর্শকের প্রতিক্রিয়া নিয়ে মনে মনে একটু ভাবনা চিন্তা নিয়ে চলতে পারতাম। কিন্তু কখন যে আমিও একজন কুশীলব হয়ে উঠেছিলাম, সেটা খেয়াল করিনি। কুশীলব যদি না-ও হয়ে থাকি, নাটক দেখবার পরে, কোন্ দর্শক আর সাজসজ্জাহীন অন্ধকার শূন্য মঞ্চে পড়ে থাকতে চায়?

আমার অবস্থা এখন অনেকটাই সেই রকম। কুশীলবরা যে যার ভূমিকা সেরে চলে গিয়েছে। পড়ে আছে শুধু মঞ্চ, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি। তবু জানি, ঘটনাকে যেমন করেই ভাবি, যে চোখেই দেখি, আমাকে এ কামরাতেই ভ্রমণ করতে হবে, আগামী কাল সকালে ভিক্টোরিয়া টারমিনাস পৌঁছানো পর্যন্ত।

রাতের গাড়ি, যাত্রীরা সকলেই প্রথম শ্রেণীর। অধিকাংশেরই দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। করিডরের আলো স্তিমিত। কামরায় প্রবেশের আগে, আমি একবার পিছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম, শেষ প্রান্তে, দরজার কাছে কণ্ডাক্টর গার্ড এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুঝতে পারলাম না, লোকটির চোখে বিস্ময়, না অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। মুখটা ফিরিয়ে নিলাম, মনে পড়ে গেল, হাফেজ সাহেবের কথা, কণ্ডাক্টর গার্ড তাঁকে বলেছিল, জেসমিন বিবিকে সে নেমে যেতে দেখেছিল। শেষ দেখা।

আমি কামরার মধ্যে ঢুকলাম। দরজাটা তখনই বন্ধ করতে পারলাম না। ঢুকেই মনে হলো, অস্পষ্ট আর হালকা ভাবে, জেসমিনের সেই বিদেশী সুগন্ধের রেশ এখনো যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। অসম্ভব কিছু না, আট-ন'ঘণ্টা সময় তিনি এ কামরায় ছিলেন। তাঁকে দেখেই বোঝা গিয়েছিল, কিছু বিলাসিতা ছিল তাঁর জীবনে। তাঁর নানাবিধ প্রসাধনের গন্ধ কামরায় ঈষৎ ছড়িয়ে থাকাটা কিছুমাত্র বিচিত্র না।

কালকূট তার যাত্রার পথে, দু'বার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলো। একটা ছিল করাল য়োগের গ্রাসে মৃত্যু, যাত্রা ছিল 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। শুধু আমার যাত্রা না, অমৃতের যাত্রা ছিল, সেই যাত্রীরও, যে বুকের উৎস থেকে রক্তধারা ছিটিয়ে দিয়েছিল মুখ থেকে। অস্বীকার করতে পারবো না, ভয় পেয়েছিলাম। সে কথা তখন ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করিনি। তার মৃতদেহ যখন কামরা থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছিল, পুবের আকাশেও তখন রক্তরেখা। সূর্যোদয়কে মনে হয়েছিল সেই অমৃত সন্ধানীর বুকের রক্তে মাখা।

অমৃতের সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে, আজকের এই যাত্রায়, মৃত্যুকে আর একবার প্রত্যক্ষ করলাম। মৃত্যু না, আত্মনাশ। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটেনি শুধু জানি, যে রথে চলেছি, দাগ তার চাকায়। আশ্চর্য! জেসমিনের সেই মুখ মনে করে, এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না, আত্মনাশের সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন। কখন নিয়েছিলেন? তাঁর হাসির কথার প্রতিটি টুকরোর ঝংকার এখনো কানে বাজছে। শেষ দিকে, ইয়াকুব সাহেব খেলতে খেলতেই গান ধরেছিলেন, খেলা আসছিল ঝিমিয়ে, আর জেসমিন বিবির চোখের কোণে মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দু টলটল করে উঠেছিল, তখনই কি তিনি সেই সর্বনাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

আমার তা মনে হয় না। বরং এখন মনে হচ্ছে, নিঃশব্দ কান্নার চোখের জলে, মনে মনে তিনি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। স্বামী, প্রেমিক, কন্যা, তাঁর সকল আপনজনদের কাছ থেকে। আসলে তিনি হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন, যখন সেই উর্দু শায়েরি উচ্চারণ করেছিলেন, 'তোমরা তার মদির আঁখিতে কেবল হাসির ঝিলিক দেখেছো, চোখের জল দেখোনি / তোমরা তাকে পেয়ালা ভরে পান করতে দেখেছো, তবু তার ছাতি ফেটে যাওয়া দেখোনি /...সেই কি তাঁর শেষ ঘোষণা? তোমরা আমার কান্না দেখতে পাওনি, বুক ফেটে যাওয়া দেখতে পাওনি? অতএব তাঁর আত্মনাশ আপাতদৃষ্টিতে যতোটা আকস্মিক ও বিস্ময়কর মনে হচ্ছে, বিশেষত আমার চোখে, আসলে তা না। চিন্তা করলে সে সম্ভাবনার সূত্র হয়তো ছড়িয়ে ছিল তাঁর নানা কথার মধ্যেই। তিনি তালাক চেয়েও, বারে-বারে তা রোধ করেছেন। বারে-বারে হাফেজের কাছে যেতে গিয়েও যেতে পারেননি। কেমন যেন সেই অন্তগামী পূরবীর গান মনে পড়ে যায়। 'ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে/সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে/ওরে আয়'...মনে হয় জেসমিন অনেক আগেই, তাঁর অস্ত-গমনোন্মুখ জীবনের ঘাটের কিনারায় এসে বসে-

ছিলেন। বাকী ছিল, নিবিড়তর ছায়ার গ্রাস। সেই ছায়ার গ্রাসকে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেছেন।

কিন্তু কি হবে যাত্রাপথের এই নিষ্করুণ ঘটনার তীব্রতাকে তীব্রতর করে। জানি, সবই নিজের ইচ্ছায় হয় না। ইচ্ছা করলেই মনের সমস্ত প্রতিক্রিয়াকে যখন খুশি দমন করা যায় না। এখন আমার মনের দু-কূলে জোয়ারের কাল বহে যায়। এই চলন্তা দরিয়ার নাম জেসমিন। ভাঁটাও অনিবার্য, প্রকৃতির নিয়মেই নেমে যাবে সমুদ্রের টানে, পলি পড়বে মনের তটে। এমনি পলি পড়ে পড়ে, মনের তটে অনেক কিছুই চাপা পড়ে যায়, অবচেতনের অন্ধকারে ডুবে থাকে অনেক জীবন, অনেক ঘটনা। সেই চাপা পড়া পলির ওপর দিয়ে আমরা জীবনের পথে চলতে থাকি। থেমে থাকে না কিছুই। সে অর্থে, কেবল আমি বা একটি ব্যক্তি বা সত্তা মাত্র না, সামগ্রিক ভাবে জীবন অমর, মানুষ জীয়ে যুগে যুগে।

আস্তে আস্তে নিজের পুরনো জায়গাটিতেই বসি। কামরাটির চারপাশে ফিরে তাকাই, আর হঠাৎ-ই বুকের কাছে সাপের ছোবলের মতো একটা যন্ত্রণা অনুভব করি। চোখে পড়ে আমার সেই প্লাস্টিকের পানপাত্রটি। জেসমিনদের সঙ্গে ছিল তিনটি কাঁচের গ্লাস। ওঁদের তিনজনের জন্য তিনটি। আমারটা ছিল গোলাপি রঙের প্লাস্টিকের পাত্র। জেসমিন তাঁর নিজের মনের সিদ্ধান্তে, তিনটি কাঁচের পাত্রে পানীয় ঢেলে তিন পুরুষকে দিয়েছিলেন, নিজে নিয়েছিলেন, আমার পাত্রটি। মনে আছে, জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার পাত্রটিতে তিনি পান করলে, আমার কোনো আপত্তি আছে কী না। কেন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা জানি। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেই বলে, স্ত্রী দুষ্কুলাদপি। তায় আবার যদি জেসমিনের মতো রূপসী মহিলা তিনি হন, তারপরে আর কী কথা! আমি সাগ্রহে সম্মতি দিয়েছিলাম। দেখছি, সহযাত্রীদের কোনো চিহ্নই নেই, পড়ে রয়েছে কেবল আমার পানপাত্রটি, যার গায়ে জেসমিনের ঠোঁটের স্পর্শ লেগে রয়েছে।

সামান্য প্লাস্টিকের পাত্রটির দিকে তাকিয়ে আমি যেন চকিত আঘাতে অবশ হয়ে গেলাম। জেসমিনের হাতে পাত্রটিকে তাঁর ঠোঁটে স্পর্শিত হতে দেখতে পেলাম, সেই সঙ্গে তাঁর চোখের কোণে মদিরেক্ষণা দৃষ্টি। ইয়াকুব আর হাফেজ সাহেব সবই নিয়ে গিয়েছেন, এ পাত্রটি কেন নিয়ে গেলেন না? এ অসামান্য

ভয়ংকর বোঝা বইবে কে? আমি পারবো না। বস্তু অতি কঠিন মায়া। এ মায়াপাশে আমি বাঁধা পড়তে চাই না। পাত্রটির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি না, জেসমিনের রঞ্জিত ঠোঁটের কোনো চিহ্ন লেগে আছে কী না।

কামরার খোলা দরজায় ছায়া পড়তে চমকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, কণ্ডাক্টর গার্ড। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলামের ভঙ্গি করল। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে তার জবাব দিলাম। তাকালাম জিজ্ঞাসু চোখে। সে হিন্দীতে বলল, 'আপনি কিছু ফিকির করবেন না, নিশ্চিন্তে ঘুমোন।'

কেন সে এ কথা বলল, হঠাৎ বুঝতে পারলাম না। আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

সে আবার বলল, 'আমি জানি, আপনার মনটা একটু খলবলি (চঞ্চল) হয়েছে। একই কামরার মধ্যে আপনি ছিলেন। কিন্তু আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন। ইচ্ছা না করলে, আলো নেভাবেন না।'

লোকটির গায়ে পড়া ভাব দেখে আমি বিরূপ হতে পারলাম না। তার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, সে আমার জন্য কিঞ্চিৎ উদ্বেগ বোধ করছে। পরমুহূর্তেই মনে হলো, শুধু তাই না, সমস্ত ঘটনার আকস্মিকতার একটা গভীর ছাপ যেন তার মুখেও চেপে বসেছে। চকিতেই আমার মনে পড়ে গেল, জেসমিনকে এই ব্যক্তিই শেষবারের জন্য গাড়ি থেকে নেমে যেতে দেখেছিল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে ভিতরে ডেকে বললাম, 'আসুন, আপনাকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করব।'

কণ্ডাক্টর গার্ড ভিতরে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তো দেখেছিলেন সেই মহিলাকে নেমে যেতে?'

সে বলল, 'জী হাঁ।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আমাকে নামতে দেখেছিলেন?'

সে বলল, 'হ্যাঁ দেখেছি, আপনাকে নামতে দেখেছি, সেই সাহেবকেও নামতে দেখেছি, যাঁর বিবি—।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তখন কি আর একজন সাহেব আর সেই বিবি কামরার মধ্যেই ছিলেন?'

সে বলল, 'হ্যাঁ, খানিকক্ষণ ছিলেন। তারপরেই মেমসাহেব নেমে গেলেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?'

সে বলল, 'তারপর তো গাড়ি ছেড়ে দিল। আপনি, সেই সাহেব আর মেমসাহেব কেউ এলেন না। তখন কামরা থেকে আর এক সাহেব বেরিয়ে

এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেউ উঠেছেন কী না। আমি বললাম, না, আপনারা কেউ ওঠেননি। তবে চিন্তার কিছু নেই, হঠাৎ গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখে, আপনারা নিশ্চয়ই কোথাও উঠে পড়েছেন, চালিশগাঁও জংশনে আবার আপনারা নিজেদের কামরায় ফিরে আসবেন। আমার কথা সাহেব শুনলেন, কিন্তু দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন, ভেতরে ঢুকলেন না। তারপর চালিশগাঁও না আসা পর্যন্ত সাহেব পায়চারি করতে লাগলেন। কখনো কখনো কামরাতেও যাচ্ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, সাহেব সরাব পান করবার জন্য কামরার ভেতরে যাচ্ছিলেন। গাড়ি চালিশগাঁওয়ে দাঁড়ানো মাত্রই সাহেব গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে গেলেন, তারপরে তো—।'

কণ্ডাক্টর গার্ড থামল, কথাটা সে পুরো শেষ করতে পারল না। আমার মনে একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠলো, হাফেজ কি কোনো সর্বনাশের অনুমান করছিলেন! তিনি কি কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিলেন?

সে কথা আমি আর কোনোদিনই জানতে পারব না। জীবনে, অনেকের সঙ্গেই, অনেকেবার যখন ঘুরে ফিরে দেখা হয়, তখন ভাবি, পৃথিবী সত্যি ছোট। কিন্তু জীবনে অনেক মানুষ একবারের জন্য দেখা দিয়েই চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছে। কখনো তার দেখা পাইনি। এ ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনাই বেশি। ইয়াকুব সাহেবের ইচ্ছা ছিল, কামরায় ফিরে গিয়ে, তিনি তাঁর নাম ঠিকানা মুদ্রিত কার্ড আমাকে দেবেন। সে ইচ্ছাপূরণ আর সম্ভব হয়নি। বম্বে শহরে তাঁদের দেখা আর কখনো পাবো, সে সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। যা ঘটে গিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, আবার কবে তাঁরা বম্বে ফিরবেন, এবং কোথায় ফিরবেন, তা হয়তো চিরদিন আমার অগোচরেই থেকে যাবে। যদি দেখা হতো, তবে হাফেজ সাহেবকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম, ট্রেন থেকে নেবে যাবার আগে, জেসমিন শেষ কথা কী বলে গিয়েছিলেন? জেসমিন তাঁর জীবনের শেষ যা কথা, তা একমাত্র হাফেজকেই বলে গিয়েছিলেন। অনুমান করতে পারি, নিশ্চয় তিনি বলে যাননি, সে যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া, তিনি আত্মহত্যা করতে চলেছেন। কিন্তু এমন কথা নিশ্চয় কিছু বলে গিয়েছিলেন, যার মধ্যে তাঁর শেষ বিদায়ের সংকেত ছিল।

—'কী হয়েছিল সাব?'

কণ্ডাক্টর গার্ডের প্রশ্নে আমার সংবিত ফিরল। আমি শব্দ করলাম, 'অ্যাঁ?'

গার্ড হাত জোড় করে বলল, 'সাব, কোনো গোস্তাকি নেবেন না। আমি জিজ্ঞেস করছি কী হয়েছিল? কোন ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল নাকি?'

বাইরের লোকের মনে, এ চিন্তাটাই সর্বাগ্রে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কী বলবো আমি এই লোকটিকে? শুধু এই লোকটিকে কেন, কোনো লোককেই কি আমি সঠিক বিষয় ও কারণ ব্যক্ত করতে পারবো?

বললাম, 'না ঝগড়া বিবাদ কিছুই হয়নি। সবাই বেশ আনন্দে আর ফুর্তিতেই ছিলেন। ওই স্টেশনটায় গাড়ি না থামলে বোধ হয় কোনো গোলমালই হত না।

গার্ড লোকটি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে উচ্চারণ করল, 'তাজ্জব ব্যাপার! দুনিয়ার হালচাল দুনিয়াদার জানে। আমরা কতোটুকু জানি।' বলে, সে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'ঠিক আছে সাব, আপনি শুয়ে পড়ুন, কী আর করবেন।'

সে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল। সত্যই, কী আর করতে পারি। জোয়ারের স্রোত যতোক্ষণ মনের দুই কূল প্লাবিত করে যাবে, ততোক্ষণ ভাসতে থাকব। তাছাড়া আমার করণীয় নেই। কেবল এইটুকু পারি, জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে, দু' হাত জোড় করে, মানুষের উদ্দেশ্যে মাথা নত করে বলতে পারি, দুর্জ্ঞেয় তুমি নও, তথাপি তোমার অতল গভীরতাকে দেখতে দাও।

দেখেছি, সদ্য সন্তানহারা শোকার্ত জননীও নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। আমিও ঘুমিয়ে পড়বো, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে। হাতের ঘড়িতে দেখছি সকাল আটটা বাজে। বাইরের প্রকৃতিতে নগরীর চিহ্ন স্পষ্ট। গন্তব্য নিকটেই, তারই নিদর্শন।

গত রাত্রের সব ঘটনা মনে না পড়ার কিছু নেই। উঠে, গুছিয়ে নিলাম ঝোলাঝুলি। তৃষ্ণার্ত বোধ করে জলের পাত্রটি নিয়ে জানালার ধারে প্লাসটিকের গ্লাসটা তুলতে গিয়ে থমকে গেলাম। এপানপাত্রে কি আর চুমুক দেব? মনে পড়ে গেল জেসমিনের কথা। 'আপনার এই গ্লাসটিই নিলাম, তবু আপনাদের তিনজনের থেকে আমাকে আলাদা করে চেনা যাবে। আপনার আপত্তি নেই তো?'

তাঁর জিজ্ঞাসার কারণটা মনে করেই, গ্লাসটা হাতে তুলে নিলাম। গরম কাপড় মোড়া এলুমিনিয়ামের পাত্র থেকে জল ঢেলে, মুখ ঠেকিয়ে পান করলাম। মনে হলো যেন, গলা দিয়ে নেমে, বুকের কাছে ঠেকে যাচ্ছে। একটি মুখ ভাসছে চোখের সামনে। কিন্তু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণা কি মিটল?

জানি না। গলাটা ভিজলো। গ্লাসটা নামিয়ে রাখলাম, যেখানে জেসমিন গ্লাসটা রেখেছিলেন।

গাড়ি দাঁড়ালো শেষ গন্তব্যে। না, এ পানপাত্র আমি বহন করব না। এপাত্র চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাক আমার কাছ থেকে। এ ভার বহন সম্ভব না। কেননা, এ নিতান্তই একটি ভারি বোঝা। পথের বোঝা পথেই ফেলে যাই।

গাড়ি থেকে নামতেই একজন এগিয়ে এলেন আমার কাছে। তাঁর পোশাক দেখলেই বোঝা যায় তিনি পুলিশের লোক। সঙ্গে সেই কণ্ডাক্টর গার্ড। মনে মনে প্রমাদ গণলাম। এ আবার কি বিপদ!

পুলিশ! কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। পুলিশ স্পর্শ করলে, সেটা যে কতো ঘা হতে পারে, কেউ হিসাব করে বলতে পারে না। জেসমিন বিবি আত্মবলি দিয়ে কি শেষে আমাকে ফাটকে পুরে গেলেন নাকি?

পুলিশের লোকটি বেশ সপ্রতিভ এবং মোটেই রামগরুড়ের ছানা নন। ইংরেজি কেতাব, হেসে ক্ষমা চেয়ে, ইংরেজিতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বম্বে এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর বিশেষ ইংরেজি অক্ষরটির কামরাতেই আমি ভ্রমণ করছিলাম কি না!'

আমি বললাম, 'তিনি ঠিকই বলেছেন।'

অফিসার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনাকে একটু কষ্ট দেব, কয়েক মিনিটের জন্য আপনি আমাদের অফিসে একবারটি চলুন।'

জানি, হেথা বাক্যব্যয় বৃথা। কোনো জিজ্ঞাসাও অবান্তর। তবে দেশের নাগরিক হিসাবে, এটি আমার অবশ্য পালনীয় কর্তব্যও বটে। বললাম, 'চলুন।'

অফিসার আমার স্যুটকেস আর অ্যাটাচির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কোনো বিছানাপত্র নেই?'

আমি হেসে বললাম, 'ওটাকে বড় বোঝা বলে মনে হয়। দু'রাত্রির ব্যাপার তো। কেটে গেছে কোনোরকমে।'

অফিসারও হাসলেন, বললেন, 'দু'রাত্রি শয়ন করেননি বলুন?'

বললাম, 'করেছি। আসনে গদী আর একটি বায়ুপূর্ণ ফানুস বালিশেই আমার কাজ চলে গেছে।'

আমার কথায় অফিসার হেসে উঠলেন। এই সময়ে একজন রেলপুলিশ এগিয়ে এসে অফিসারকে বললো, 'সাব, ইয়ে পিলাস্টিককা গিলাস কামরে মে থা।'

আমি অবাক হয়ে দেখি, পথের বোঝা-জ্ঞানে পরিত্যক্ত, এটি আমারই সেই গ্লাস। বুঝতে অসুবিধে হলো না, আমি অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই, কামরাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাস করা হয়েছে। অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গ্লাস কি আপনার?'

আমি নির্বিকার ভাবে বললাম, 'না তো। এটা অন্য যাত্রীদের হাতেই দেখেছি।'

অফিসার সেপাইকে নির্দেশ দিলেন, গ্লাসটি অফিসে নিয়ে যেতে। কণ্ডাক্টর গার্ডকে বললেন, 'তুম দফতর মে যাও।' বলে, আমাকে ডাকলেন, 'আসুন।'

একজন কুলি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমার স্যুটকেসটি হাতে তুলে নিল। নাগরিক হিসাবে কর্তব্যের দায় আছে ঠিকই, তবু মনে মনে না বলে পারছি না, কি ঝামেলা রে বাবা! গত পরশুদিন ভরদুপুরে গাড়িতে উঠেছি। এখন কি না থানা পুলিশ! গেরো আর কাকে বলে!

অফিসার চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে কি কেউ রিসিভ করতে আসার কথা আছে? থাকলে, সেটা আমি মাইকে ঘোষণা করে জানাতে চাই, আপনি কোথায় আছেন।'

অফিসার বুদ্ধিমান, কথাটা একেবারে মন্দ তোলেননি। বম্বেতে আপাতত যার অতিথি হিসাবে আমার আগমন, সেই বন্ধুকে পত্রে জানানো আছে, কোন্ গাড়িতে কখন এসে পৌঁছুচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানানো আছে, তাকে স্টেশনে আসতে হবে না, আমি ট্যাক্সি নিয়েই চলে যাবো। তথাপি যদি তার মন না মানে, সে যেন তার ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়, তার আসবার দরকার নেই। বন্ধুটি কাজের লোক বলে যে আমি এব্যবস্থার কথা লিখেছিলাম তা না, আমি জানি, বন্ধু মহাশয় এখনো তার শয্যায় নিদ্রা মগ্ন। মানুষটি একটু সুখী, বা বলা যায়, দীর্ঘকালের তৈরি অভ্যাসের অভ্যস্ত জীবন। প্রায় উষালগ্নে যে শয়ানে যায়, বেলা দশটায় সে ঘুম থেকে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কি! বন্ধুর ড্রাইভার আমার নাম জানে, আমি তার গাড়ির নম্বরটাও জানি।

অফিসারকে বললাম, 'নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো নেই, তবে একজন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসতে পারে।'

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, ''ড্রাইভার কি আপনার নাম জানে?'

বললাম, 'জানে।'

অফিসার যেন স্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, 'ভালোই হলো।'

ইতিমধ্যে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে দেখছি। আমি অনেকেরই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। না করার কেনো কারণ নেই। গাড়ি থেকে তল্পি-তল্পা নিয়ে নামল্যাম ভালো মানুষ, তারপরেই হঠাৎ পুলিশ ডেকে নিয়ে তার অফিসে চলেছে, সাধারণের কৌতূহল হবারই কথা। শুধুই কি কৌতূহল। ইতিমধ্যেই কতো জনে, কতো কি সাব্যস্ত করে বসে আছে, তা-ই বা কে জানে। এখন আমি কারোর চোখে হয়তো ঠগ, কারোর চোখে চোর বা জুয়াচোর বা দাগী আসামী। কে বলতে পারে, হয়তো খুনীও।

হায়রে কালকূট, কি তোর কপাল! একেই বোধ হয় বলে, 'নিয়তি কে ন বাধ্যতে।' তাছাড়া একটা ঝমেলায় পড়লেই, মনে নানান্ কু গাইতে থাকে। জেসমিনের স্পর্শিত যে গ্লাসের বোঝা বহন করতে চাইনি, তা-ই পড়লো পুলিশের হাতে। বলে তো খালাস হলাম, ও গ্লাস আমার নয়। তারপরে যদি ওটা ফরেন্সিক পরীক্ষায় যায়, তখন মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হতে বাকী থাকবে না। একবার মিথ্যা ধরা পড়লে, তখন এমন প্রশ্নই-বা উঠবে না কেন, আমিই হয়তো জেসমিন বিবিকে বিষ পান করিয়েছি!

কল্পনার কি দৌড়! প্রাণে একবার ভয় জাগলে, কত কথাই মনে আসে। মনে মনে না হেসে পারলাম না। বিষ দেবার প্রশ্নটা কোথায়। জেসমিন তো রেলের চাকায় গলা দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে হ্যাঁ, ফরেন্সিক একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পারে। গ্লাসের গায়ে আমার আর জেসমিনের দু'জনের হাতের ছাপই আছে। তাতেও অবিশ্যি প্রমাণ হবে না, গ্লাসের মালিক আমি। যা ত্যাগ করেছি, তা করেছি। এখন সবই ভবিতব্য।

অফিসার তাঁর নিজের ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। প্রথমেই তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে, টেলিফোন করলেন ঘোষকের কাছে। জানিয়ে দিলেন, যেন ঘোষণা করা হয়, আমি হাওড়া থেকে অমুক নামের যাত্রী এখন এই অফিসে আছি। আমাকে কেউ রিসিভ করতে এসে থাকলে, সে যেন এখানে এসে খোঁজ করে। ওঁর কথায় জানলাম, ইতিমধ্যেই তিনি আমার নামটি জেনেছেন। সেটা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার না। যাত্রীদের নামের তালিকাতেই আমার নাম আছে।

অফিসার তাঁর নথিপত্র কলম নিয়ে তৈরি হলেন এবং আর একদফা ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, আমি আমার কর্তব্য করছি মাত্র। আপনাকে বিরক্ত করা আমার মোটেই অভিপ্রেত না।'

আমি বললাম, 'আপনি অসংকোচে আপনার কর্তব্য করুন। আমিও আমার কর্তব্য করতে চাই।'

অফিসার আমার কথায় খুশি হয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ।'

তারপরে তিনি জানতে চাইলেন, বম্বেতে আমি কোথায়, কার কাছে উঠেছি এবং কী কারণে আমার আগমন। আমার জবাবের সবই তিনি লিখে নিলেন। জানতে চাইলেন, আমার কলকাতার ঠিকানা। তারপরে এলো আমার সহযাত্রীদের কথা। এক্ষেত্রে অনায়াসেই, সহযাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা আমি এড়িয়ে গেলাম। নিতান্ত প্রয়োজন বোধে, যেটুকু বলা উচিত, তা-ই বললাম। তাঁদের সঙ্গে, আহ্বানে আমি তাস খেলেছিলাম। নিতান্ত একজন সহযাত্রী হিসাবে। মোটামুটি তাঁদের নামগুলো জেনেছিলাম। আর কিছুই আমার জানা নেই। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, তাঁরা কে কী করেন, সব কথাই আমি এড়িয়ে গেলাম। জেসমিন যে স্টেশনে আত্মহত্যা করেছেন, সেই স্টেশনে ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে আমি এক কামরায় উঠেছিলাম, সে কথাটাও জানালাম।

এই সব জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই একজন মহিলা এসে পড়লো। মহিলাকে তরুণী বলাই সঙ্গত, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হতে পারে। পুরোপুরি আধুনিকা। মেদবর্জিত উদরের উপরে জামা, নাভির নিচে শাড়ির বন্ধনী। যাকে বলে সাঁট মেলানো, তেমনিই ওর হরিদ্রা বর্ণের শাড়ি জামা, ইস্তক পায়ের শ্লিপার থেকে, কানের ও গলার এবং হাতের রুলি বা ওই জাতীয় কিছু আর হাতে ঝোলানো ব্যাগটিও। সত্যি কথা বলতে কি তরুণীর শরীরের বর্ণেও হরিদ্রাবর্ণ আভা, যাকে বলে গৌরাঙ্গী। ওর কপালের টিপটিও হরিদ্রা বর্ণের। চোখে কাজল, ঠোঁটেও হালকা রঙ ছোঁয়ানো। মাথার চুল ঘাড়ের একটু নিচে, সমান করে কাটা, আর আঁচড়ানো। এমন কিছু রূপের অধিকারিণী সে না, তথাপি বলতে হবে, স্বাস্থ্যের দ্যুতির সঙ্গে, যাকে বাঙলায় বলে চটক, সেটি পুরোমাত্রায় বর্তমান। প্রথমেই ভাবলাম, বোম্বাই নগরী বলে কথা। ইনি রূপোলি পর্দার হুরী পরী নন তো!

তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকেই একটি চেয়ারের দিকে এগিয়ে, কিছু বলতে উদ্যত হতেই, অফিসার বিরক্ত ভ্রূকুটি চোখে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, এবং বেশ রাশভারি স্বরে বলে উঠলেন, 'কোনো কথা না। আমার সঙ্গে দরকার থাকলে আপনি পরে আসবেন, এখন বাইরে যান। আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি।'

তরুণী তখনই কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই, অফিসার এবার বেশ রুষ্ট স্বরে বললেন, 'আপনাকে আমার যা বলবার, তা আমি বলে দিয়েছি। আমি একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছি। আপনি এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার কথা পরে শুনছি।'

আমি তরুণীর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। সে যেন বিমর্ষ মুখে, আমাকেই কিছু বলতে চাইলো কিন্তু বললো না, আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। একেই বলে পুলিশ অফিসার! সুন্দরী আর রূপসী আছ, থাকো গিয়ে। কাজের সময় ওসব চলবে না। নিতান্ত যদি আসতেই হয়, তার জন্য সময় আছে। কিন্তু তরুণীটিরও হয়তো কোনো জরুরী ব্যাপার ছিল, যা অফিসারকে বলবার দরকার ছিল।

আমি বললাম, 'মহিলা হয়তো আপনাকে কোনো জরুরী কথা বলতে এসেছিলেন।'

অফিসার হাসলেন। বললেন, 'তা যে উনি আসেননি, তা ওর চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা ছাড়া সাজগোজের ঘটাটা দেখলেন তো? কাজের কোনো বিষয় ঘটলে বা জরুরী দরকার থাকলে, সে এই সাত সকালে সেজে-গুজে পুলিশের কাছে আসে না। বলুন, ঠিক বলেছি কী না?'

কাথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো না। বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়। এই সব অফিসাররা, আমাদের থেকে লোকচরিত্র কিছু কম বোঝেন না।

অফিসার আবার বললেন, 'অবিশ্যি আপনি একজন লেখক মানুষ, আপনাকে আমি আর কী বলব।'

আমি সঙ্কুচিত লজ্জায় হেসে বললাম, 'না না, ওকথা বলবেন না। লেখক হিসাবে আমার কোনো আত্মগরিমা নেই, মানুষের চরিত্রমাত্রেই বুঝতে পারি। তাহলে তো, গত রাত্রে সেই মহিলার আত্মহত্যার কথা আমি আগেই অনুমান করতে পারতাম। ভদ্রমহিলা দিব্যি পান করছিলেন, হাসছিলেন, তাস খেলছিলেন। তারপরে গাড়িটা একটা অপ্রত্যাশিত স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়লো সিগন্যাল না পেয়ে। আমি গেলাম একটু বাইরে পায়চারি করতে। কল্পনাই করতে পারিনি, ভদ্রমহিলা তখন আত্মহত্যার সঙ্কল্প করে বসে আছেন।'

অফিসার বললেন, 'ঠিক বলেছেন। এ সব হচ্ছে সাময়িক ইন্‌স্যানিটি।' তাঁদের ভেতরে কী ব্যাপার ছিল, আপনি কী করেই বা জানবেন। আপনি একজন যাত্রী, তাঁদের জীবনে কখনো দেখেননি, চেনেন না, মাঝপথ থেকে তাঁরা

আপনার সহযাত্রী হয়েছেন। আপনার জায়গায় আমি হলে, একই অবস্থা হতো। আমি বুঝি সবই, তবু আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, আমি মোটেই বিরক্ত হইনি। আমার কাছে আপনার যা জানবার আছে, তা জেনে নিন।'

এই সময়েই আমার পিছনে শুনতে পেলাম, 'সালাম সাব। অ্যালাউন্স শুন কর ম্যয় আপকা ইধার আয়া। ম্যয় ইন্ সাবকো লেনে আয়া।'

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, আমার বন্ধুর ড্রাইভার বব, গোয়ানিজ যুবক। আমি পিছন ফিরতেই, সে একটু হেসে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'গুডমর্নিং স্যার।'

দেখলাম, হাসলেও ববের মুখে একটি উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা ফুটে রয়েছে। বব সাধারণত ইংরেজিতে কথা বলে। বাঙলাও কিছু কিছু বলতে পারে, বুঝতে পারে আরো বেশি। আমি বলালম, 'গুডমর্নিং বব। তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা করো, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

অফিসার ববকে বললেন, 'সিরিফ অওর পাঁচ মিনিট। আপ বাহার বৈঠিয়ে, সাব থোড়া চা পিকে আভি আ রহেঁ।'

বব ঘাড় ঝাঁকিয়ে চলে গেল। কিন্তু চা পানের কথাটা এলো কী করে? আমার ভাবনা শেষ হতে না হতেই, একজন ক্যাটারিং-এর বেয়ারা চা টোস্ট ডিম ইত্যাদি, যাকে বলে পুরা নাস্তাসহ ট্রে নিয়ে হাজির। অফিসার বিনীত অনুরোধ করলেন, 'একটু চা পান করুন।'

আমি কোথায় ছাড়া পাবার চেষ্টা করছি। তার মাঝখানে আবার আপ্যায়ন। তাও আবার পুলিশের আপ্যায়ন। বড়ো ভয় লাগে। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'এ সবের কোনো দরকার ছিল না। কেন আনতে গেলেন?'

অফিসার বললেন, 'আপনি গাড়ি থেকে নামা মাত্রই যদি আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি, এটুকু আমার করা উচিত। আপনাকে আমার যা জিজ্ঞাস্য ছিল, তা হয়ে গেছে। আর আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এটি একটি নিতান্তই আত্মহত্যার ঘটনা। জানি না, কোনো কেস টেস হবে কী না। হলে, আপনাকে হয়তো সাক্ষীর সমন পেতে হবে, আপনাকে কোর্টে উপস্থিত থাকতে হবে।'

সর্বনাশ, এ যে সত্যিই বাঘের ছোঁয়ার বেশি। সাক্ষী হিসাবে কোর্টে উপস্থিত হতে হবে? আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তো এখানে বেশিদিন থাকছি না।'

অফিসার হেসে বললেন, 'তা কেন থাকবেন ? আপনি এখানে এসেছেন বেড়াতে। আপনার কর্মস্থল কলকাতা। দরকার হলে আপনাকে আমরা কলকাতা থেকেই ডেকে পাঠাবো। সেটাই হবে, আপনার পক্ষে সত্যিকারের কষ্ট আর বিরক্তির কারণ। কী করবো বলুন, এ ব্যাপারে তো আমাদের কিছু করবার নেই। এটা আপনার দুর্ভাগ্য, যে আপনি সেই কামরায় ছিলেন। নিন, চা খান।'

বললাম, 'আমি তাঁদের কামরায় ছিলাম না, তাঁরাই মাঝ পথ থেকে আমার কামরায় উঠেছিলেন।'

অফিসার নিজে, চায়ের কাপে, চা চিনি দুধ ঢেলে, আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একই কথা হলো। আমার বক্তব্য, আপনি সেই কামরায় ছিলেন এবং সেই কামরারই একজন মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেটাই আপনার দায়।' বলে তিনি হেসে উঠলেন এবং নিজের জন্য চা নিলেন।

আমি বাসি মুখে কোনো খাবার মুখে তুলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি জোর করলেন না। চা পানের পরে, অফিসার আমার করমর্দন করে, নিজেই আমার হাত ধরে অফিসের বাইরে এলেন।

অফিসের বাইরে আসতেই, সেই তরুণীকে দেখা গেল, তখনো সে দাঁড়িয়ে আছে।

অফিসার তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনি এবার যান, আমার অফিসে বসুন, এক মিনিটের মধ্যে গিয়েই, আমি আপনার কথা শুনছি।'

তরুণীর মুখ যেন একটু আরক্ত হলো, বললো, 'মাপ করবেন অফিসার, আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথাই নেই।' বলে, সে চোখের কোণে আমার দিকে তাকালো।

অফিসার ভ্রূকুটি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে আমার ঘরে গেছলেন কেন ?'

তরুণী বললো, 'আমি মাইকের ঘোষণা শুনে, আপনার ঘরে গেছলাম।'

বলে, তরুণী এবার আমার দিকে ফিরে, পরিষ্কার বাঙলায় উচ্চারণ করলো, 'আমার নাম কলি—ফুলকলি চট্টোপাধ্যায়।' বলে, হাত জোড় করে নমস্কার করে আবার বললো, 'আশা করি, আসবার আগে, আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?'

কলি! ফুলকলি! যার চিঠির পর চিঠি পেয়ে, আমি মনে মনে বলতাম, ফুলকলি না, একটি আস্তাস্ত পাগলী চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু সে কথা এখন বলা

যায় না। আমি তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কার করে বললাম, 'ওহ্ আপনি! আমি চিনতে পারিনি।'

ফুলকলি একটু হেসে, যদিও বা ম্লান, বললো, 'আপনি আমাকে চিনবেন কী করে, কোনোদিন তো দেখেননি। আপনাকে আমি চিনেছি, কারণ আপনার ছবি—।'

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'সে ঠিক আছে। কিন্তু আমি আসবার আগে আপনার কোনো চিঠি পাইনি তো?'

ফুলকলি বললো, 'কিন্তু আমি আপনার চিঠি পেয়েছিলাম, যে চিঠিতে আপনি আপনার আসবার তারিখ জানিয়েছিলেন। তাই আমি স্টেশনে এসেছি, আপনাকে নিতে।'

বিব্রত হয়ে পড়লাম। অদূরেই দেখলাম, বব দাঁড়িয়ে আছে। অফিসার আমাকে বললেন, 'ইনি আপনাকে নিতে এসেছেন?'

বলেই, তিনি ফুলকলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে মার্জনা করবেন, আমি বুঝতে পারিনি। আমি ওঁর সঙ্গে একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

ফুলকলি বললো, 'অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমার বলা উচিত ছিল, মাইকের ঘোষণা শুনেই, আমি আপনার ঘরে ঢুকেছি। কিন্তু, ওঁকে কেন আপনারা ডেকে নিয়ে এসেছেন, কী ঘটেছে, কিছুই বুঝতে না পেরে, আমি রীতিমত উদ্বিগ্ন আর বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কোনো গুরুতর বিপদ আপদ কিছু ঘটেছে নাকি?' বলে, সে আমার দিকে তাকালো।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তা বলা যায়। তবে আমার কিছু ঘটেনি। আমি একটি দুর্ঘটনার সাক্ষী মাত্র।'

ফুলকলি তাকালো অফিসারের দিকে, দৃষ্টিতে যেন একটা অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। কেন, ফুলকলি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না? ভাবছে, আমি তাকে মিথ্যা কথা বলছি?

অফিসার ফুলকলির দিকে তাকিয়ে, হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'উনি ঠিকই বলেছেন। আর সেইজন্যই ওঁকে একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হয়েছি। এবার আপনি আপনার অতিথিকে নিয়ে যান, আপনার ড্রাইভার আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' বলে, তিনি অদূরে দাঁড়ানো ববকে ইঙ্গিতে দেখালেন।

ফুলকলি কাজল কালো ভ্রূকুটি চোখে ববকে দেখে বললো, 'আমার ড্রাইভার? আমার তো কোনো ড্রাইভার নেই। আমি নিজেই আমার গাড়ি ড্রাইভ করি।'

অফিসার আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ফুলকলি বলে উঠলো, 'আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। ও লোকটি কার ড্রাইভার?'

ফুলকলি কথাটা আমাকেই জিজ্ঞেস করলো। আমি হেসে বললাম, 'ও আমার বন্ধুর ড্রাইভার। তার কাছেও খবর ছিল, এই ট্রেনে আজ আমি আসছি।'

ফুলকলি তার কাজল মাখা চোখের তারা একটু ঘুরিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, বাঙলায় বললো, 'এ রকম, আর কতোজনের কাছে খবর আছে, আজ এই ট্রেনে আপনি বম্বে আসছেন?'

ফুলকলির এটা গোঁসা কী না জানি না, তবে একটু অভিমানের সুর যে আছে, সন্দেহ নেই। জীবনে ওকে আমি কখনো দেখিনি, প্রায় এক বছর ধরে, কেবল পত্রালাপই চলছিল। তাও, পত্র লেখার ব্যাপারে সংসারে আমি হচ্ছি দ্বিতীয় অলস। ফুলকলির সমস্ত চিঠির জবাব যদি আমাকে দিতে হতো, তাহলে, মনে মনে ওকে পাগলী না বলে, নিজেকেই পাগল ভাবতে হতো। আমার অলসতার মধ্যে, কোনো অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না, কিন্তু ফুলকলির চিঠির বক্তব্যে এত বেশি একই কথার পুনরাবৃত্তি থাকতো, জবাব দিতে গেলেই, হাত থেকে কলম আপনিই নেমে যেত, আর মনে মনে বলতাম, একটা পাগল মেয়ে। যদিও ওর চিঠির পুনরাবৃত্তির মধ্যে, বারে বারে বেজে উঠতো প্রাণেরই ব্যাকুলতা। আমার জবাবের ব্যগ্র প্রত্যাশা। ও যে আমার একনিষ্ঠ ভক্ত পাঠিকা মাত্র, তা কখনোই বলা যাবে না। সে কথা ও প্রথমেই ঘোষণা করেছিল। ওর প্রথম চিঠির বয়ান, আমার কাছে অবিস্মরণীয় মনে হয়েছিল এবং এখনও তা আমার মনে আছে। কথাটা এইরকম "আমি আপনার একজন ভক্ত পাঠিকা মাত্র, তা যেন মনে করবেন না। ভক্ত হবার মামুলি ব্যাপারে আমি নেই। আপনি জানুন বা না-ই জানুন, আমার দু'হাতে আপনি তুলে দিয়েছেন, অমৃত আর বিষের পাত্র। আমি কোনোটাকেই ছাড়িনি, দু'টোই পান করেছি। আমার অবস্থা কি আপনি বুঝবেন? বুঝলেও, আপনার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। সেটা আপনার লেখা পড়েই বুঝেছি। এখন যা দায়দায়িত্ব, অমৃত আর বিষপানের, সবই আমার। আপনি শুধু দয়া করে, আমার চিঠির উত্তর দেবেন, তাহলেই হবে।..."

তারপরেও, বহু চিঠির মধ্যে, ওর নানান্ পরিচয় পেয়েছি। ও চাকুরিজীবি

মেয়ে। বাবা নেই। মা আর ছোট দুটি বোনকে নিয়ে সংসার। চিঠিতে এ কথা জানাতেও ভোলেনি, "সংসারে দুটো ব্যাপারকে আমি ভীষণ ভয় পাই। এক: জোর করে কারোর কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় করা। দুই: কারোর গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটানো। কারণ কী জানেন? দু'টোরই চরম তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার এবয়সেই হয়ে গিয়েছে। এ সব আমি আপনার লেখা পড়ে শিখিনি, কিন্তু আপনার লেখার মধ্যে পেয়েছি, আমারই অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাসের সমর্থন। আমার আপনিই এক জায়গায়, বোধ হয় "কোথায় পাবো তারে"-র মধ্যে লিখেছেন, "ভালোবাসা পেলেই তা গ্রহণ করা যায় না। অথচ মুশকিল এই, ভালোবাসাকে যাচাই করার কোনো মন্ত্র আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। তবু জানি ভালোবাসা মাত্রকেই গ্রহণ করা যায় না। আবার ভালোবেসেও ভালোবাসা পাওয়া যায় না।" কেমন করে আপনি এ সব অনুভব করেছেন? আপনার জীবনেও কি, আমাদের সাধারণ নারী পুরুষদের মতো ঘটনা ঘটে, অভিজ্ঞতা জোটে? কিন্তু অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আর একটা বিষয় বুঝেছি। আপনার কাছে তো নোতুন না, আমার কাছেও না। ভালোবাসা জোর করে আদায় করা যায় না, এটা যেমন বুঝেছি, তেমনি বুঝেছি, আমার নিরন্তর ভালোবাসাকেও কেউ, কোনো কিছু দিয়ে মলিন করতে পারে না, কারণ, আমার ভালোবাসা, আমার ধর্ম। তা একান্ত আমারই, তার জন্য কারোর কাছে, আমার কিছু দাবী নেই। কী মনে হচ্ছে বলুন তো? আপনার কথাগুলোই আপনাকে শুনিয়ে দিলাম নাকি? দিয়ে থাকি তো বেশ করেছি। কেন আমার প্রাণের কথা, আপনার লেখায় ফুটে ওঠে? তা-ই, এখন ঠিক করেছি, আমার দাবী, আপনার লেখা আসলে আমার প্রাণ থেকেই চুরি করা, অতএব, আপনার লেখা, আমারই লেখা।..."

চিঠিটা পড়ে, মনে মনে খুব হেসেছিলাম এবং অচেনা, অদেখা বোম্বাইবাসিনী কোনো এক ফুলকলি চট্টোপাধ্যায়কে আমার বেশ সরল মনে হয়েছিল। সেই চিঠিটা পড়েই, মনে মনে বলেছিলাম, পাগল মেয়ে। তারপরেও বহু চিঠিতে ওর নানান্ পাগলামি প্রকাশ পেয়েছে। পাগলামি বলছি বটে, সত্যই তা পাগলামি না, অন্তরেরই নানা কথা, যার মধ্যে স্পষ্টবাদিতা, সারল্য এবং অকপটতা ফুটে উঠেছে। আর আমরা, ওই ধরনের উক্তিগুলোকেই, অনেক সময়, হেসে, পাগলামি বলে থাকি। যেমন ও একবার লিখেছিল, "আমি মাত্র বারোশো টাকা বেতন পাই, তাতে আমার চলে যাবার কথা, কিন্তু চলে না। বাড়ি ভাড়া দিয়ে, সংসার খরচ চালিয়ে, উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। তাই ভাবছি,

আমার পরের বোন কৃষ্ণকলিকেও এবার কোথাও চাকরিতে লাগাবো। কৃষ্ণকলিও আপনার লেখা পড়তে ভালোবাসে। কিন্তু চিঠি দিতে লজ্জা পায়। ও খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে। আপনি কখনো বম্বেতে আমাদের বাড়ি এলে, ও আপনার একটা পোর্ট্রেট এঁকে দেবে। এখন ভাবুন তো, বেতনের কথাটা কেন লিখলাম? নিশ্চয়ই কিছু ভেবে পাচ্ছেন না? তাহলে শুনুন, আমার খুব ইচ্ছা কলকাতায় যাই। কলকাতায় আমার মামার বাড়ি আছে। যেতে হলে, মা বোনদের সবাইকে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু টাকার অভাবে যাবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারি না। আমার অবিশ্যি, মামার বাড়ি থেকে, আপনাকে দেখতে যাওয়াটাই আসল। এ কথায় আবার কী ভাবছেন, কে জানে? যা-ই ভাবুন আমি আমার মনের কথাটাই লিখলাম। দিনরাত তো কতো মিথ্যা কথাই বলতে হচ্ছে। এক আধটা জায়গায়, সত্যি কথা বলবার না থাকলে, দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। কিন্তু দোহাই আপনার, টাকার অভাবের কথা লিখলাম বলে, ভাববেন না যে আপনাকে আমার আর্থিক সুরাহা করতে বলছি। যা সত্যি, তা-ই লিখলাম। তবে একটা কথা, সবাই বলে, আপনি নাকি বড়লোক। মানে ধনী। যদি তা না-ও হন, তবু অনুরোধ করি, আপনিই একবার বম্বে আসুন। আমি নিমন্ত্রণ করছি। আমাদের বাড়ির সবাই আপনাকে নিমন্ত্রণ করছে। একবারটি আসুন না। শুনেছি, কয়েকবার নাকি ঘুরে গেছেন। আবার একবার আসুন। কোনো কাজ নিয়ে না, শুধু বেড়াতে। অবশ্য এসে যদি দেখেন, আমাকে বা আমাদের বাড়ির কারোকে ভালো লাগছে না, তাহলে আপনার অন্যান্য পরিচিত বন্ধুদের কাছে যাবেন। জোর করে আটকাব না। আগেই বলেছি, জোর করে আমি পেতে চাই না। এমন মেয়ে কখনো পাবেন না, যে জোর করে কিছু পেতে চায় না, এই বলে দিলাম”……

এ মেয়েকে পাগলী ছাড়া আর কী বলতে পারি? ফুলকলির চিঠির কথা বলতে ও ভাবতে গেলে, সে এক মহাভারত। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আপাতত ভি. টি. স্টেশনে যে মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এই যে সেই পত্র-লেখিকা ফুলকলি চট্টোপাধ্যায় ভাবতে যেন একটু অসুবিধাই হচ্ছে। প্রথমত, ওকে আমি এতটা কম বয়সের তরুণী ভাবিনি। যদিও, দেখেই অবিশ্যি সব বোঝা যায় না আর নারীর বয়স অনুমান করার মতো সাহস যেন আমি না রাখি। তা ছাড়া, ওর পত্রগুলো পড়ে, এ রকম একটি ঝলকানো মেমসাহেব বলে মনে হয়নি। আরো একটা কথা এ মুহূর্তেই জানা গেল, ওর একটা

গাড়ি আছে, আর সেই গাড়ি ও নিজেই চালায়। গাড়ির সংবাদটা কোনো চিঠিতে ও জানায়নি।

কিন্তু, আপাতত সমস্যাটা সেখানে না। সমস্যাটা রয়েছে, ফুলকলির চোখের তারায়। গলার স্বরে। ভাষার বিন্যাসে। ওকে আমি খবর দিয়েছিলাম ঠিকই, এই তারিখে বম্বে এসে পৌঁছুচ্ছি, কিন্তু ওকে স্টেশনে আসতে বলিনি, এমন কোনো ওয়াদাও করিনি, স্টেশন থেকে সোজা ওর বাড়িতে যাব। সংসারে কতগুলো সম্ভব-অসম্ভব বলে ব্যাপার আছে। শুধু মাত্র পত্রে যার সঙ্গে পরিচয়, এক কথায় তার অতিথ্য গ্রহণ করতে পারি না! সেইজন্যই আমার বন্ধুকেই খবর দেওয়া ছিল এবং আমি জানতাম, আমার রাত্রিচর বন্ধুটি আর কিছু না করুক, গাড়িটি পাঠিয়ে দেবে। এখন ফুলকলির প্রশ্নে একটু বিব্রতই বোধ করছি। এ পাগল মেয়ে, আরো কি বলে বসবে, কে জানে। আমি হেসে বললাম, 'আর কারোকেই জানাইনি। আপনাকে জানিয়েছি, আর আমার এক বন্ধুকে জানিয়েছি।'

ফুলকলি মুখ গম্ভীর করলো না, কিন্তু হাসিতে উজ্জ্বল হয়েও উঠলো না, নিতান্ত ভদ্রতার মাত্রা বজায় রেখে বললো, 'তাহলে এখন ডিসাইড করুন, কোন্ গাড়িতে, কোথায় যাবেন। আমি অবিশ্যি আপনাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।' বলে, ও একেবারে সামনে দাঁড়ানো অফিসার এবং একটু দূরে অপেক্ষমাণ ববের দিকে দেখলো।

অফিসার ভদ্রলোক আমাদের বাঙলা কথা শুনে কি ভাবলেন, জানি না। হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা আমি আর আপনাদের কথার মাঝখানে বাধার সৃষ্টি করতে চাই না। আপনার সহযোগিতার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

আমি হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললাম, 'আমি কর্তব্য করেছি মাত্র।'

অফিসার আমার হাত ছেড়ে, ফুলকলির দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বিদায়।'

ফুলকলিও তার জবাব দিল। অফিসার চলে গেলেন।

আমি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, 'চলুন, আপাতত আমরা স্টেশনের বাইরে যাই, তারপরে যা হোক একটা সিদ্ধান্ত করা যাবে।'

ফুলকলির মুখের হাসিতে ম্লানতা, বললো, 'চলুন! আপনি কিন্তু আমার অনুরোধে শেষ দিকের চিঠিগুলোতে, আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন।'

আমি হেসে, অসংকোচেই বললাম, 'তা করেছি, তবে চিঠিতে। এখন মুখোমুখি হয়ে, কেমন যেন আটকে যাচ্ছে। সেটাই বোধ হয় স্বাভাবিক, তাই না?'

ফুলকলি বললো, 'বোধ হয়। তবে আপনার পত্রের সম্বোধন যদি আন্তরিক হয় আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে 'তুমি' করে বলুন, আমি খুব খুশি হব।'

এই মুহূর্তেই কিছু না বলে, আমি হাসলাম। ববের দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, 'কাম বব, লেট আস্ গো।'

বব হেসে, চলতে আরম্ভ করলো। কুলিকে ডেকে বললো, 'তুম্ সাথ্ আও।'

ফুলকলি আমার দিকে তাকলো। ওর দৃষ্টিতে যে জিজ্ঞাসা, তা বুঝতে পারছি। ওর নীরব জিজ্ঞাসা, তাহলে ববের গাড়িতেই আপনার স্যুটকেস উঠছে? ...কিন্তু ও মুখে জিজ্ঞেস করলো, 'ওই বব লোকটি কি আপনার বন্ধুর ড্রাইভার?'

বললাম, 'হ্যাঁ। বব গোয়ানিজ, অনেকদিন থেকেই আমার বন্ধুর ড্রাইভারের কাজ করছে। যদিও, ববকে কেবল ড্রাইভার বললে ভুল হবে। আমার বন্ধুর অনেক কিছুই সে দেখাশোনা করে।'

ফুলকলি বললো, 'দেখাশোনা করে মানে? আপনার বন্ধু কি অবিবাহিত?'

বললাম, 'না। আমার বন্ধু বিপত্নীক। ড্রাইভার পাচক ভৃত্য নিয়েই তার সংসার।'

ফুলকলি জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় থাকেন তিনি?'

বললাম, 'জুহুতে।'

কথা বলতে বলতে আমরা বাইরে এলাম।

বব গলা তুলে ডাক দিল, 'স্যার, গাড়ি এখানে।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে, ফুলকলির দিকে তাকালাম।

ফুলকলি একটু ম্লান হাসলো, জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার বন্ধুর ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা পেতে পারি?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই। তোমার গাড়ি কোথায়?'

ফুলকলি, 'তোমার' শব্দটা শুনেই, চকিতে আমার চোখের দিকে তাকালো। তারপরেই, যেন মুখের অভিব্যক্তি গোপন করার জন্য, এক মুহূর্তের জন্য মুখ নত করলো। আবার মুখ তুলে, ববের গাড়ির তিন চারটি গাড়ি বাদ দিয়ে, একটি দুই দরজার স্ট্যাণ্ডার্ড দেখিয়ে বললো, 'ওই গাড়িটা।' বলে, গাড়ির নাম্বারটা উচ্চারণ করল।

আমি দেখলাম, আকাশ-নীল রঙের স্ট্যাণ্ডার্ড, কোথাও কোথাও রঙ চটে গিয়ে, লোহা দেখা যাচ্ছে। জীর্ণ বলব না, পুরনো গাড়ি।

ফুলকলি আবার বললো, 'তিন মাস হলো গাড়িটা কিনেছি। কৃষ্ণকলির চাকরি হয়েছে, আপনাকে লিখেছিলাম তো?'

'হ্যাঁ, লিখেছিলে।'

'ওর চাকরি পাবার পরে, শস্তায় পেয়ে, গাড়িটা কিনে ফেলেছি।'

হেসে বললাম, 'চালাতেও শিখে গেছ খুব তাড়াতাড়ি।'

ফুলকলি বললো, 'বাবা বেঁচে থাকতে, আমি আমার ষোল বছর বয়সেই গাড়ি ড্রাইভ করতে শিখেছি। লাইসেন্স পেতে অবিশ্যি দেরি হয়েছিল।'

এর পরে আর জিজ্ঞেস করার দরকার হয় না, ফুলকলির বাবার গাড়ি ছিল। ওর চিঠিতে, মোটামুটি জানা গিয়েছিল, এক সময়ে এদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। সে অবস্থা থাকলে, আজ হয়তো ফুলকলিকে চাকরি করতে হতো না। যদিও, অবিশ্যিই, একটা কথা মানতে হবে, ওর বয়সের একটি মেয়ে, চাকরি করে মাসে বারোশো টাকা উপার্জন করে, সেটা খুব ছোট খাটো ব্যাপার না। কিন্তু, ওর চিঠিতেই জেনেছি, বারোশো টাকা উপার্জনটা ওদের পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট না, সে কারণে, ওর ছোট বোন কৃষ্ণকলিকেও চাকরি নিতে হয়েছে। ওর বাবার গাড়ি যে আর নেই, এ প্রশ্নও অবান্তর। পুরনো স্ট্যাণ্ডার্ডই তার প্রমাণ।

বললাম, 'চলো, এগোনো যাক।'

ফুলকলি বললো, 'চলুন। কিন্তু আপনার বন্ধুর নাম-ঠিকানা, ফোন নাম্বারটা তো দিলেন না?'

বললাম, 'দেব। এখানে না।' বলে, আমি ববের দিকে যেতে যেতে বললাম, 'বব, তুমি চলে যাও। তোমার সাহেব ঘুম থেকে উঠলে বলবে, আমি পরে আসছি।'

বব অবাক হয়ে একবার আমার, আর একবার ফুলকলির দিকে দেখলো। বললো, 'ও. কে. স্যার।'

ইতিমধ্যে ফুলকলির মুখে কেবল বিস্ময় না রক্তের একটা ঝলকও লেগে গিয়েছে। আমি পকেট থেকে পয়সা নিয়ে, কুলিকে দিয়ে, ফুলকলির দিকে ফিরে বললাম, 'চলো, যাওয়া যাক।'

ফুলকলির স্বর প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলো, 'কোথায়? আমাদের বাড়ি?'

বললাম, 'তা ছাড়া আবার কোথায় যাব। ববকে তো চলে যেতে বললাম।'

ফুলকলি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো। মনে হলো, ওর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'সত্যি, যে রকম লেখেন, আপনি মানুষটাও সেই রকম দেখছি।' বলে, ব্যাগ খুলে গাড়ির চাবি বের করতে করতে, এগিয়ে গেল।

আমি ওর পিছনে পিছনে গেলাম। কিন্তু স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, ওর পদক্ষেপ কিঞ্চিৎ বেতাল হয়ে গিয়েছে। গাড়ির দরজার চাবি খুলতে গিয়ে, হাত লক্ষ্যের সীমায় স্থির নেই।

ইংরেজিতে যাকে বলে স্টান্ট, এ ক্ষেত্রে ফুলকলিকে আমার তা দেবার কোনো পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল না। নিজেরই কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল। অস্বীকার করতে পারব না, মনটাও কেমন খচখচ করছিল। 'জোর করে ভালোবাসা আদায় করা যায় না' কথাটাও নিজেই আমাকে অনেক আগে চিঠি লিখে জানিয়েছিল। কেবল ভালোবাসা না, নিজের আবদারকে যে ও জোর করে চাপাবে না, তাও বুঝে নিয়েছিলাম। ওর চিঠিগুলোর মধ্যে, নানান্ ভাবে, ও মেয়েটি কেমন, ছড়িয়ে ছিল। সে সব যে ও ইচ্ছা করে জানিয়েছিল, তা বলা যায় না। নিজেকে, ও ওর চিঠির মধ্যেই অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল। আমার বন্ধুর ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা দিয়ে, এখান থেকেই ওকে বিদায় করে দেওয়া যেত। সেটা কথা, আমার দিক থেকে কোনো অন্যায়ও হত না। কারণ, ও আমাকে স্টেশনে নিতে আসবে, এ রকম কোনো পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে লেনা দেনা হয়নি। বরং আমার বন্ধুকে যা জানানো ছিল, সেই রকম ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। ঠিক সময় মতই তার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসেছে। কিন্তু ফুলকলিকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে, কেবল সঙ্কোচ বোধ করিনি, মনটাও কেমন খচখচ করছিল।

মানুষের যা কিছু অনুভূতি এবং অনুমান, সবই তার নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। নিজেকে ফুলকলির অবস্থায় চিন্তা করলে, তারপর আর ওকে ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন। প্রথমেই মনে হয়, ও চাকুরিজীবি মেয়ে। হয়তো আজ ছুটি নিয়েছে, শুধু একটি কারণেই, আমাকে নিতে আসবে। ওর সঠিক বয়সটা আমার জানা নেই। চিঠিতে ওর নিজের ভাষায়, "আমি একটা বুড়ি, বলতে পারেন, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আজ অবধি কেউ আমার এই কঠিন পানিগ্রহণে এগিয়ে আসেনি, কপালে আছে চির আইবুড়ো হয়ে থাকা। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি কিন্তু নিজেকে চিরকুমারী বলছি না। একটু বোধ হয় নির্লজ্জতা প্রকাশ করলাম, তাই না? তা হোক, কেন জানি না, যাঁকে কোনো-

দিন চোখে দেখিনি, শুধু তাঁর লেখা খানকয়েক বই পাঠ করেছি, তাঁর কাছে কেমন করে যেন সব লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে বসে আছি।"…

কিন্তু কোথায় যে ও বুড়ি, আর তিনকাল কোথায় খুইয়ে বসে আছে, তা ওকে দেখে একটুও বুঝতে পারছি না তরুণী শব্দ বললে যদি কিছু কম বোঝায়, তাহলে যুবতী বলতে হয়। এটা ঠিক, ও আঠারো না, এমন কি বিশও না। তেমন উদ্ধত না হলেও, ওর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে একটা প্রাখর্য আছে, যা চকিতেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেটুকু দেখেছি, তাতে এ কথা বলা যাবে না ওর মুখশ্রী অনিন্দনীয় সুন্দর। অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু নজরে পড়েছে, দেখেছি, ওর মুখে অস্পষ্ট কয়েকটি দাগ। এক সময়ে বোধ হয়, ওর মুখে ব্রণের গুটিকা যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করেছিল, যার দাগ একেবারে মিলিয়ে যায়নি। টিকলো না বলে, ওর নাকটিকে একটু বোঁচা বলাই উচিত, কিন্তু চোখ দুটি ওর ভাসা ভাসা, যেন আলাদা করে আঁকা, চোখের তারা দুটি কালো। সাজ-পোশাকে ও সর্বাংশে আধুনিকা, একেবারে আজকালের হালফ্যাশনে সজ্জিতা। ফুলকলির রূপের বর্ণনা দেওয়াটা আমার আপাত উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য, এই কথাটা বলা, বয়স আর রূপ ওর যা-ই হোক, ও একটি আস্তস্ত মেয়ে। এই সাত সকালে সেজে গুজে নিজে গাড়ি নিয়ে ছুটে এসেছে একজনকে নিতে। নিশ্চয় এসেছে, অনেক সংকোচ লজ্জা কাটিয়ে, অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে, অনেক কৌতুহল আর মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে। মনে মনে এতখানি বুঝে, কেমন করে ওকে ফিরিয়ে দেব? তা ছাড়া, আমার অনুমান, ওর এই নিতে আসার পিছনে, আরো কয়েকজনের কৌতুহলিত প্রতীক্ষা আছে। সেখানে একলা ফিরে যেতে, ওর মনের কোথাও একটা ক্ষীণ-ক্ষীণতর অপমানের স্পর্শ লাগতই। আমি যদি এসে না পৌঁছতাম, তাহলে আলাদা কথা ছিল। এসেছি, ওর সঙ্গে দেখা হলো, অথচ ওকে ফিরিয়ে দিয়ে চলে যাব বন্ধুর বাড়ি, সেটা আর যার কাছেই হোক, আমার কাছে একটুও শোভনীয় মনে হচ্ছে না।

আমি ওর সঙ্গে যাব বলাতেই, ওর যে অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম, না গেলে কি হতো, কে জানে! অবিশ্যি, এ সবই আমার অনুমান মাত্র।

বব গাড়ি স্টার্ট করে, আর একবার আমাকে বিদায় জানিয়ে, দ্রুত চলে গেল।

ফুলকলি আমাকে ডাকলো, 'আসুন।'

দরজাটা ও আমার জন্ত এমন ভাবে খুলে ধরে দাঁড়ালো, বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, 'যাও, তুমি তোমার জায়গায় যাও, আমি বসছি।'

চাপল্য বলব না, একটা চঞ্চলতা যেন ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখের রক্তচ্ছটা কাটছে না। কেবলই যেন একটা লজ্জা গোপন করার জন্য ঠোঁট টিপে রেখেছে। অথচ ওর চিঠির কথা মনে করলে, বলতে হয়, চিঠির ভাষায় তেমন কোনো লজ্জা বা ব্রীড়া বিশেষ প্রকাশ পায়নি ···"আমি আর দশটা মানুষের মতোই, উদয়াস্ত খাটি, সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলি। বুঝতেই পারছেন, নারী পুরুষের মাত্রাভেদ, আমার জীবন যাপনের কোথাও নেই।"··· কিন্তু আপতত যা দেখছি, তাতে এ কথা বলা যায় না, নারী পুরুষের মাত্রাভেদ বোধটা ওর জীবন থেকে একেবারে বিসর্জিত হয়ে গিয়েছে।

ফুলকলি অন্যদিক থেকে দরজা খুলে, চালকের আসনে বসলো। এ গাড়ির গিয়ার হলো, যাকে বলে লাট্টু গিয়ার, তাই। চাবি ঘুরিয়ে, এঞ্জিন স্টার্ট করে, গিয়ারে হাত দিয়ে, ওর নজরে পড়লো, আমার অ্যাটাচি কেসটা, আমারই পায়ের কাছে রেখেছি। নিজের ব্যাগটা ও আগেই পিছনের সীটে রেখেছিল। আমাকে বললো, 'অ্যাটাচিটা পেছনে রাখলে ভালো হতো না? বসতে তো অসুবিধে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই রাখা যায়।'

ফুলকলি নিজেই অ্যাটাচির দিকে হাত বাড়ালো, 'আমি বললাম, 'আমি রাখছি, তুমি গাড়ি চালাও।'

কথাটা বলবার সময়ে, কেন যে ও আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, জানি না।

চোখাচোখি হতেই, একটু যেন লজ্জা পেয়ে ঠোঁট টিপে হেসে, গিয়ারে চাপ দিল। আমি অ্যাটাচিটা পিছনের সীটে রেখে, সামনের দিকে চোখ ফেরাবার আগেই, গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো এবং লক্ষ্যণীয়, মন্থর গতির চালিকা ও মোটেই নয়।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস অঞ্চলে এখনো তেমন জনবহুল ব্যস্ততা দেখা দেয়নি। ফুলকলি সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে বললো, 'স্টেশনে মাইকের অ্যানাউন্সমেণ্ট শুনে, আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।'

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী ভেবেছিলে? আমি কোনো অপরাধ করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছি?'

ফুলকলি আমার দিকে একবার তাকিয়ে, ভুরু কুঁচকে বললো, 'মোটেই তা ভাবিনি। তবে আমি ভয় পেয়েছিলাম, আপনার কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা, সেই ভেবে। কত রকম বিপদ আপদ তো হতে পারে। মালপত্র খোয়া যেতে পারে, বা আপনার কোনো রকম—।'

ফুলকলি কথাটা শেষ করলো না, থেমে গেল। আমিই যোগ করে দিলাম, 'অ্যাকসিডেণ্ট হলো কী না ?'

ফুলকলি জবাব না দিয়ে, আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে, একবার আমার শরীরের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। আমি বললাম, 'তবে ঘটনাটা একটা অ্যাকসিডেণ্টই। একেবারে প্রত্যক্ষ না হলেও, আমি তার সাক্ষী। মানে ঘটনাটা আমার কামরাকে ঘিরেই। সেজন্য এখানে নামতেই, রেলপুলিশ আমার স্টেটমেণ্টটা নিয়ে নিল।'

বলতে বলতেই, আমার চোখে জেসমিনের মুখ ভেসে উঠলো, আমার বুকের ভেতর একটা ভারী আর ঘন ছায়া ঘিরে এলো। সত্যি, জীবনের বাস্তবতা কি আশ্চর্য রকম অপ্রাকৃত। কথাটা যিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন, তাঁকে আমার শত কোটি প্রনাম জানাই। তাঁর আবিষ্কারের আলোতেই তো দেখছি, গত সন্ধ্যায় এক নারীর সঙ্গে নানা রঙ্গ আর হাস্যে কাল কাটছিল। সন্ধ্যার পরেই তিনি, পৃথিবী থেকে সারা জীবনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। এখন রাত্রি প্রভাতে, দিনের আলোয়, আমি আর এক নারীর পাশে চলেছি। সে আমাকে, গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলেছে। তার পোশাক প্রসাধন থেকেও একটি মিষ্টি গন্ধ আমার ঘ্রাণে এসে লাগছে, যা মনে করিয়ে দিচ্ছে, গতকালের সেই গন্ধ। পোশাকটা আলাদা তবু তাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিলও রয়েছে। মিলটা আপাতত দু'জনের বহিরঙ্গের আধুনিকতায়। চোখের কাজলে, ঠোঁটের রঙে।

ফুলকলি একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে বলুন তো ? কি অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে ? কেউ কি—'

ফুলকলি আবার থেমে গেল, কথাটা শেষ করতে পারল না। আমিই বললাম, 'কেউ মারা যাননি, একজন আত্মহত্যা করেছেন, একটি মহিলা।'

ফুলকলি আরো অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কেউ ?'

বললাম, 'না। পথেই তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, পথেই শেষ হয়েছে।'

ফুলকলির গাড়ির সেই দ্রুততা আর নেই। ও বারে বারেই আমার মুখের দিকে দেখছে। স্বাভাবিক। আমি আর হাসতে পারছি না, গোপন করতে পারছি না আমার বিষণ্ণতাকে। আমি আস্তে আস্তে সংক্ষেপে, ঘটনাটা ওকে বললাম।

কোন্ রাস্তা দিয়ে ফুলকলি গাড়ি চালাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

মন্থর তার গতি। ওর মুখে নেমে এসেছে গভীর অন্যমনস্ক বিষণ্ণতা। ও নীচু স্বরে বললো, 'জেসমিনের অবস্থায় যে কোনো মেয়ের ওই একটি মাত্র রাস্তাই খোলা ছিল।'

আমি ফুলকলির মুখের দিকে তাকালাম। ও একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'না, ভাববেন না, আমার জীবনে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেছে। আমি শুধু জেসমিনের কথা বলছি, তার আর কোনো উপায় ছিল না।'

আমি বললাল, 'কোনো মেয়ে এ ভাবে বললে, মনে হয় সে যেন তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছে।

ফুলকলি বললো, 'তা কেন? একদিকে ভালোবাসা, আর একদিকে অন্যায়বোধ, মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে, তা তো আপনার লেখাতেই পড়েছি। তা ছাড়া, নিজের ফিলিংস্ বলে একটা ব্যাপার তো আছে।'

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'হয়তো তাই। তবে আমার এবারের যাত্রটা অদ্ভুত। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় যখন গেছিলাম, তখনো একজন তীর্থযাত্রী আত্মহত্যা করেনি, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা গেছিল! কাল রাত্রে সে কথাই ভাবছিলাম।'

ফুলকলি বললো, 'আর আমি ভাবছি, সকালবেলাই আমার একটা নিদারুণ গল্প শোনা হয়ে গেল।'

আমি বললাম, 'গল্প!'

ফুলকলি বললো, 'জীবনের গল্প। আপনার মুখ থেকে শুনলে মনে হয়, আমি যেন বই পড়ছি।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'যাক, যে চলে গেছে, তার প্রসঙ্গ আর না। তুমি কি বাড়ি থেকে বলে বেরিয়েছো, আমাকেই নিতে আসছো?'

ফুলকলি একটু অবাক হয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই। বাড়ির সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মুনাই—মানে আমার পরের বোন কৃষ্ণকলি আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, আমি নিয়ে আসিনি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

ফুলকলি হাসতে লাগলো, 'কোনো জবাব দিল না। আমি ওর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে, তাকিয়ে রইলাম। ও নিশ্চয়ই সেটা অনুভব করেছিল এবং মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'কী বলছেন?'

বললাম, 'আমি তো কিছু বলছি না। শোনবার অপেক্ষায় আছি।'

ফুলকলি বললো, 'শোনবার মতো কিছু না, নিতান্ত ছেলেমানুষি।'

অথচ এ মেয়েই চিঠিতে জানিয়েছিল, সে নাকি একটি বুড়ি। এখন অনায়াসেই কবুল করেছে, সে ছেলেমানুষি করছে। বললাম, 'ছেলেমানুষি ব্যাপারটা আমি খুব উপভোগ করি।'

ফুলকলি এই প্রথম শব্দ করে হেসে উঠলো, যে হাসিটা আমাকে জেসমিনকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে। বললো, 'কেন মুনাইকে আনব? কালকূটকে প্রথম আমি একলা দেখব, তারপরে সবাই দেখবে। তাই বলে এসেছি, আমি ওঁকে নিয়ে আসব, তারপরে তোরা দেখবি।'

বলতে বলতে ও আবার হেসে উঠলো এবং আবার বললো, 'মুনাই রাগ করে কাঁচকলা দেখিয়ে বললো, দেখতে চাই না তোর কালকূটকে। কালকূট মানে তো বিষ। তাকে আবার কেউ দেখতে চায় নাকি?'

বলে, ও হাসতেই লাগলো। আমি মনে মনে একটু বক্রগতি নিলাম, বললাম, 'আসলে মুনাইকে তুমি সত্যি কথাটা বলতে পারোনি, তাই না?'

ফুলকলি ভুরু কুঁচকে আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে বললো, 'তার মানে?'

বললাম, 'তার মানে, আগে তুমি সামনা সামনি লোকটিকে যাচাই করে দেখে নিতে চেয়েছ, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায় কী না। দেখা নেই, শোনা নেই, কে একটা লোক, আগেভাগেই তার সামনে বোনকে নিয়ে আসা ঠিক মনে করোনি। সেটা অবিশ্যি ভালোই করেছ।,

কিন্তু গাড়িটা যে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তা একেবারে খেয়ালই করিনি। পিছন থেকে বেশ কয়েকটা গাড়ি সজোরে হর্ন দিতে আরম্ভ করেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলে?'

ফুলকলি ক্যাকাশে মুখ নিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, 'এসব কী বলছেন আপনি? আপনাকে আগে যাচাই করে তারপরে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব?'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'আমি ঠাট্টা করে বলেছি। তুমি সত্যি ভেবে রাস্তার মাঝখানে এ ভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলে? অদ্ভুত মেয়ে তো? ঠাট্টাও বোঝ না? সে রকম ভাবলে আমি তোমার সঙ্গে এ ভাবে আসতাম নাকি?'

ইতিমধ্যে পিছনের গাড়িগুলোর হর্নে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে। ফুলকলির যেন তাতে কিছুই যাচ্ছে আসছে না। আস্তে আস্তে ওর ক্যাকাশে

মুখে স্বাভাবিক রঙ দেখা দিল। একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, 'সত্যি, কথা তো না, জীবনটাকেই গল্প করে তুলেছেন। আমার বুকের ভেতরটা এখনো কেমন করছে।'

বলে, ও গাড়ি স্টার্ট করলো। বললাম, 'ছেলেমানুষদের ও রকম একটু করে।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, পিছন থেকে একটা গাড়ি ফুলকলির পাশাপাশি এসে, ক্ষুব্ধ হিন্দী ভাষায় যা বললো, তার মানে দাঁড়ায়, ঘরের খোয়ারি ঘরে কাটালেই ভালো হয়। রাস্তার মাঝখানে এ সব খোয়ারি ভালো না। বলেই, লোকটি গাড়ি দ্রুত চালিয়ে চলে গেল।

ফুলকলির মুখটা লাল হয়ে উঠলো বললো, 'ইডিয়ট!'

কিন্তু যতগুলো গাড়ি আমাদের ওভারটেক করলো, সবগুলো গাড়ির যাত্রীরাই আমাদের দিকে একটু বিরক্ত আর বাঁকা চোখে তাকিয়ে গেল। ফুলকলির ওলোকটাকে ইডিয়ট বলে নিজের লজ্জা চাপা দেবারও কোনো মানে হয় না, কারণ লোকটার পক্ষে আমাদের সম্পর্ক নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না। বললাম, 'লোকটা, শুনতে পেল না, তুমি তাকে কি বললে। কিন্তু তার কথা সে আমাদের শোনাতে পেরেছে। যে রকম ভাবে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে ছিলে, আমি হলে বোধ হয় আরো বেশি শুনিয়ে দিতাম।'

ফুলকলি আমার দিকে না তাকিয়েই বললো, 'আমাকে আর চটাতে পারবেন না। আপনাকে একটু একটু বুঝতে পেরেছি।'

আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, 'সত্যি? আশ্চর্য ব্যাপার তো।'

ফুলকলিও একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আশ্চর্য ব্যাপারটা কী?'

বললাম, 'এই আমাকে একটু একটু চেনাটা।'

ফুলকলি কয়েকবারই আমার দিকে, আর সামনের দিকে তাকাতে লাগলো। ও যেন আমার কথা শুনে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পরে বললো, 'হয়তো কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি। আপনাকে বুঝতে পেরেছি, এটা আমি ঠিক বলিনি। কিন্তু আমি কিছু ভুল বললে, আমাকে শুধরে দেবেন।'

বললাম, 'শোধরাবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে তুমি যে আমাকে আমাকে বুঝতে পেরেছ, এতে আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। এত তাড়াতাড়ি বুঝলে কী করে?'

ফুলকলি হেসে বললো, 'তাড়াতাড়ি? তাড়াতাড়ি কোথায় দেখলেন? এক বছরের ওপর তো আপনার সঙ্গে চিঠি লেখালিখিই চলছে। তারও

অনেক আগে থেকে আপনার লেখা পড়েছি। তাতে আপনাকে একটুও বুঝতে পারব না? কালকূট কি নিতান্তই মুখোস আঁটা ছদ্মবেশী লোক?'

আমিও হেসে বললাম, 'ছদ্মবেশটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তবে বাউলের গানের মতো বলতে পারি, এই আমায় এক গুণাহ্গার / নিজের সঙ্গে জানপহ্চন না হইল আমার।" অতএব আমার, সুখের বিষয় এই, তোমাদের বোঝাবুঝির মধ্যে আমি বেঁচে থাকি।'

ফুলকলি সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। বললাম, 'মিথ্যা কথা বলিনি।'

ফুলকলি বললো 'সেটাই আমার সৌভাগ্য। কালকূটের বুকে যে এখনো জেসমিনের স্মৃতি টনটন করছে, অন্তত সেটুকুও তো বুঝি। তবে ওই যে বললেন, মাঝপথে গাড়ি আটকালে, আপনি আরো বেশি কিছু শুনিয়ে দিতেন। তার জবাবে বলছি, শোনাতে আমিও কিছু কম জানি না। আমি খুব ঝগড়ুটে মেয়ে। ঝগড়ায় আপনি আমার সঙ্গে পারবেন না।'

বললাম, 'এ বিষয়ে আমার তেমন উৎসাহ নেই, বরং ভয় পাই। তবে চটাতে আমি খুব ভালো পারি।'

ফুলকলি হেসে বললো, 'তার প্রমাণও একটু আগেই পেয়েছি। তা না হলে আমার বোনকে আনিনি বলে, অনায়াসে ও রকম ঠাট্টা, সিরিয়াস্লি করতে পারতেন না। তবে যা-ই বলুন, আমি একটু স্বার্থপর আছি।'

'একটু?' আমি যেন খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ফুলকলি আমার দিকে তাকিয়ে এবার খিলখিল করে হেসে উঠলো, মুখ নেমে গেল স্টিয়ারিং-এর কাছে।

বললো, 'না, খুব। আমি খুব স্বার্থপর। আমার অহঙ্কার বলুন আর দাবীই বলুন, বাড়ির সকলের আগে আমি কালকূটকে দেখব, আর সবাই কালকূটকে দেখবে আমার সঙ্গে। বোন-টোন বলে, আমি খাতির করতে পারব না।'

বলতে বলতেই, ফুলকলি গাড়ির গতি কমিয়ে, রাস্তার বাঁদিকে, একটি খোলা গেট দিয়ে, প্রশস্ত চত্বরের মধ্যে ঢুকলো। গাড়ির ভেতর থেকেই দেখতে পেলাম, ছ'তলা ম্যানসন হাউস। ফুলকলি প্রশস্ত চত্বরের ডাইনে গিয়ে সরু রাস্তা দিয়ে, বাড়ির পিছন দিকে গাড়ি নিয়ে দাঁড় করালো একটা বেলগাছের ছায়ায়। পিছনে হাত বাড়িয়ে ওর ব্যাগ আর আমার অ্যাটাচি, দুটোই নিয়ে

দরজা খুলে নামলো। ঘুরে আমার দিকে এসে, দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'আসুন।'

আমি নেমে এলাম। ঝকঝকে নীল আকাশের নীচে, হলুদ রঙের বাড়িটা যেন সোনালী হয়ে উঠেছে। আশেপাশে কয়েকটি নারকেল গাছ, বাড়িটাকে ছবির রূপ দিয়েছে।

ফুলকলি বলে উঠলো, 'মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো?'

'কেন?'

'এ রকম একটা জায়গায়, এ রকম একটা বাড়িতে এসে?'

'আমার তো খুব সুন্দর লাগছে। চারপাশে বেশ নিরিবিলি।'

'তবু, জুহুর সমুদ্রের ধার তো এটা না।'

'সমুদ্রের ধারটা নিশ্চয়ই সুন্দর, কিন্তু তা ছাড়াও সুন্দর জায়গা আছে। এখানে দাঁড়িয়েই তা বুঝতে পারছি।'

ফুলকলি ঈষৎ ভ্রূকুটি সন্দেহে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'অনেক সময় নারকেল বীথি ভালো লাগে। কখনো এ রকম দু-চারটি রোদে চিক-চিক করতে দেখলেও খুব ভালো লাগে। তা ছাড়া বেলগাছও আমার প্রিয়। আর তার ডালে ডালে অমন পুষ্ট ফল দেখলে তো কথাই নেই।'

আমার কথাতেই যেন ফুলকলির হঠাৎ বেলগাছের দিকে নজর পড়লো। আর নিটোল শ্রীফলগুলোর দিকে তাকিয়ে, একটু যেন লজ্জা পেয়ে বললো, 'আশ্চর্য, আমাদের তো নজরেই পড়ে না।'

এই সময়ে আমার দৃষ্টি পড়লো, চারতলার একটি জানালায়। সেখানে একটি হাসি মুখ, দৃষ্টি বিনিময় মাত্র, যেন লজ্জা পেয়ে মুখ সরিয়ে নিল। লক্ষ্যটা ফুলকলিরও সেদিকে ছিল। বললো, 'আমার সব থেকে ছোট বোন কুন্দকলি। চলুন, ওপরে যাই। কিন্তু এলিভেটর নেই, চারতলায় উঠতে কষ্ট হবে।'

বললাম, 'সেটা স্বীকার করে নিয়েই ওঠা যাক।'

ফুলকলি, হেসে উঠলো, বললো, 'দেখছি, কথা বলাও সত্যি একটা আর্ট।'

বললাম, 'অথচ দু'রাত্রি জেগে এবং একজন মহিলার আত্মহত্যার স্টেটমেণ্ট দিয়ে, আর্টের কথাটা আমার মাথায়ই নেই। এটা ব্যক্তিবিশেষের বাক্‌ভঙ্গি। সেই হিসাবে, শ্রীমতী ফুলকলিকেও আমি একই কথা বলতে পারি। কিন্তু তার দরকার নেই, অ্যাটাচিটা তোমার হাতে মোটেই শোভা পাচ্ছে না। ওটা আমার হাতে দাও।'

ফুলকলি প্রায় অবাক হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হেসে বললো,

'তা-ই ভালো, আমি ভাবলাম, কি না জানি বলতে যাচ্ছেন। অ্যাটাচিটা শোভা-অশোভার জন্য হাতে নিইনি, নিজে বইব বলে নিয়েছি।'

আমরা তখন পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। বললাম, 'ভাগ্যবানের বোঝা, শুনেছি ভগবানে বয়। ভাগ্যহীনের বোঝা যে ভগবতী বহন করেন, তা তো কখনো শুনিনি!'

ফুলকলি প্রায় দাঁড়িয়ে পড়তেই যাচ্ছিল, চোখে অবাক ভ্রূকুটি দৃষ্টি। তারপরেই সিঁড়িতে প্রতিধ্বনি তুলে হেসে বললো, 'তার মানে, কেউই কোনোটা নয়। আপনিও ভাগ্যহীন নন, আমিও ভগবতী নই। অ্যাটাচিটার মধ্যে আপনার দামী বস্তু থাকতে পারে। কিন্তু প্রায় উঠেই এসেছি, আর দেবার দরকার নেই।'

বললাম, 'আমি ভাগ্যহীন কি না জানি না, তবে কালকূট। তুমি কিন্তু ফুলকলি।'

ফুলকলি হেসে উঠলো এবং কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই, ওপরের ধাপ থেকে বর্ষীয়সী মহিলার স্বর শোনা গেল, 'কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তপ্‌সি, তুই কি সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই, সব কথা শেষ করে নিচ্ছিস নাকি?'

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি, দোহারা চেহারার, পঞ্চাশোর্ধের এক মহিলা। সরু কালো পাড়ের ধবধবে ধুতি তাঁর পরনে, গায়ে সাদা জামা। ধুতির আঁচল গলায় জড়ানো, কিন্তু একটিও পাকা চুলের চিহ্ন নেই। গলায় একটি সোনার হার ছড়া, সারা অঙ্গে আর কোনো অলঙ্কার নেই। তাঁর পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, সলজ্জ হাসিমুখী কুন্দকলি, যাকে একটু আগেই জানলায় দেখেছি। তবে ঠেক খেতে হলো অন্য কথায়। তপ্‌সি! তপ্‌সি কি নাম নাকি? আর সেটা ফুলকলিরই! চমৎকার!

অনেক প্রকারের ডাক নাম শোনা ছিল, এমনটি না। সন্ধানের বিষয়, তপ্‌সে মাছ থেকে তপ্‌সি হয়েছে কি না। তাহলে, মজাটা আরো বাড়ে।

চারতলার শেষ ধাপে উঠে, ফুলকলি মহিলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার মা।'

ফুলকলির মা ডাকলেন, 'আসুন, কি ভাগ্যি আমাদের।'

যতো গোলমাল ওই ভাগ্যি শব্দটির মধ্যে। কিন্তু একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেলাম। ছেলেবেলায় গুরুজনকে প্রণাম করতে ভুলে গেলে, ধমক শুনতে হত, সূর্যবংশের রাজা হয়ে গেলি যে? প্রণাম করলি না? এখন সেই কথাটাই মনে পড়লো। সূর্যবংশ দূরের কথা, কোন বংশদণ্ড ঝাড়ের রাজাও নই। তবে

হালফিলের কালচারের চেহারাটা যে রকম দাঁড়িয়েছে, ঝুপ করে একটা প্রণাম ঠুকলেই যেন সমস্ত চেহারাটা কেমন হাস্যকর হয়ে ওঠে।

ওঠে? তবে উঠুক। না হয় থেকেই গেলাম, হালফিলের পিছন কালে। যা আসে ভিতর থেকে, তাকে বাইরে আটকে রেখে, ধন্দ ভোগ করার দরকার কী? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম ফুলকলির মাকে। তিনি ত্রস্ত লজ্জায় বলে উঠলেন, 'আহা, থাক না বাবা। সরস্বতী আপনার মুখ আরো উজ্জ্বল করুন। আসুন।'

ফুলকলি ইতিমধ্যে দরজা খুলে ধরেছে। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম, এ তো আর এক ঠেক। প্রণাম করলাম, বাবা বললেন, তথাপি, সম্বোধনে 'আপনি'। শ্রবণে ঘা লাগছে।

দরজা খুললেই বসবার ঘর, আসবাবপত্র আসন ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায়। সবাই ভিতরে ঢোকবার পরে, কুন্দকলি দরজা বন্ধ করলো। বিজলি পাখার বোতাম টিপে দিয়ে ফুলকলি বললো, 'আমার সব থেকে ছোট বোন, তখনই বলেছিলাম।'

কুন্দকলির চোখে মুখে লজ্জার হাসি, বয়স অনুমান কুড়ির মধ্যে। অতি সামান্য ওর সাজগোজ, পরিচ্ছন্ন নীল একটি শাড়ি, হলুদ জামা গায়ে। মুখে একটু পাউডারের প্রলেপ। স্নান বোধ হয় সারা, চুল খোলা। আমার দিকে তাকিয়ে, প্রথমটা যেন কিছুই ভেবে পেল না। আসলে, আমারই মতো ওর অবস্থা। তারপরে ডান হাতটা নামিয়ে নিয়ে এলো আমার চপ্পল পরা পায়ের কাছে। তার আগেই আমি ওর হাতটা চেপে ধরলাম, বললাম, 'তথাস্তু! তোমার ডাক নাম কি কাজলী, না মৌরলী?'

আমার 'তথাস্তু' বলা শুনে সবাই হেসে উঠতে যাচ্ছিলো, কিন্তু পরের প্রশ্নটা শুনে, সবাই যেন চমকানো বিস্ময়ে থেমে গেল। কুন্দকলি বলে উঠলো, 'না তো।'

ফুলকলি বললো, 'এ কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

আমার দৃষ্টি ছিল তখন মায়ের অবাক বিভ্রান্ত হাসি মুখের দিকে। বললাম, 'একটা নাম শুনে তপ্‌সে মাছের কথা মনে পড়ে গেল কি না, তাই ভাবলাম, তোমার ডাক নামটাও সেই রকম কিছু নাকি।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ, তারপরে মা ও কন্যাদ্বয়, তিনজনের হাসিতেই ঘরটা ভরে উঠলো।

ফুলকলি বললো, 'দেখলে তো মা, ওইজন্য সকলের সামনে আমার ডাক নাম

ডাক নাম তপ্‌সি হয়েছে।'

মা এবং কুন্দকলির হাসিটা তখনো একেবারে থেমে যায়নি। মা হাসতে হাসতে বললেন, 'তাতে কি হয়েছে। তপ্‌সে মাছ তো খুব ভালো মাছ।'

ফুলকলি কপট অভিমানে বললো, 'মাছ ভালো বলে, নামটাও কি আমার তাই হবে? আমার নাম মোটেই তপ্‌সে নয়, তপ্‌সি।'

বললাম, 'আমি কিন্তু আসলে বলতে চাইছিলাম, নামটা বেশ সুন্দর।'

ফুলকলির চোখে সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসা। আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে আবার বললাম, 'সত্যি ফুলকলির থেকেও।'

ফুলকলির চোখে একটা ঝিলিক দেখা গেল। ওর মা বললেন, 'ওদের কথা ছাড়ুন, আপনি বসুন তো একটু। ট্রেনের ধকল নিয়ে, এখন আর দাঁড়িয়ে গল্প করতে হবে না।'

ফুলকলি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'সত্যি মা, আমার মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

মা বললেন, 'তা হোক। তা বলে যার জন্য মাথা খারাপ, তাঁকে কষ্ট দিবি নাকি?'

আর কেউ কিছু বলবার আগেই, আমি তাড়াতাড়ি একটি সোফায় বসে পড়লাম, বললাম, 'তার চেয়ে আমি বরং আগে বসেই পড়ি।'

এবার মায়ের হাসিটাই যেন বেশি জোরে বেজে উঠলো, বলে উঠলেন, 'খুব ভালো। একটু চা চলবে তো?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

মা বললেন, 'তোরা গল্প কর, আমি চায়ের ব্যবস্থা দেখছি।'

কুন্দকলি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'তুমি বোসো না মা, আমি চম্পাকে বলে আসি।'

মা ইতিমধ্যে, কাঠের পার্টিশনের দরজা ঠেলে, ভিতরে যেতে উদ্যত। বললেন, 'তোরা কথা বল, আমি আসছি।'

আমি কুন্দকলির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু যা নিয়ে এত কথা, সেটাই জানা হলো না। তোমার ডাক নামটা তো বললে না?'

কুন্দকলি নিজের শাড়ির আঁচল পাকাতে পাকাতে, মাথা নিচু করে বলল, 'তুমি বলে দাও।'

ফুলকলি হেসে বলল, 'তুতু।'

আমি বললাম, 'বিউটিফুল।'

তুতু অর্থাৎ কুন্দকলির এমনই লজ্জা হলো, ও ভিতরে পা বাড়াবার উদ্যোগ করলো।

ফুলকলি ডেকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, 'তুতু শোন, খুকু কোথায় রে?'

খুকু নামটা আমার স্টেশনেই শোনা হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণকলি যার ভালো নাম, মধ্যমা ভগ্নি।

ফুলকলির প্রশ্নে, কুন্দকলি কিছু বলতে উদ্যত হয়েও, হঠাৎ যেন ওষ্ঠাগ্রে কথার রাশ টেনে ধরলো, তাকালো একবার ভিতর ঘরের দিকে, তারপরে বললো, 'ছোড়দি অফিসে চলে গেছে।'

ফুলকলির ভ্রূকুটিমুখে তৎক্ষণাৎ যেন একটু কঠিন হয়ে উঠলো। বোধ হয়, আমার উপস্থিতিও ভুলে গেল। গম্ভীর বিস্মিত স্বরে বলে উঠলো, 'অফিসে চলে গেছে?'

কথা কয়টি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, ফুলকলির মুখে যেন একটা আঘাতের ব্যথা ফুটে উঠলো। এক মুহূর্তের জন্য দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো। সম্ভবত খেয়াল নেই, ঠোঁটে ওর ওষ্ঠরঞ্জনী আঁকা এবং দাঁতের স্পর্শে তা বিবর্ণ হচ্ছে। নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে, খানিকটা যেন আপন মনে বললো, 'অথচ আমাকে বলেছিল, দু'দিনের ছুটি নিয়েছে। আমিই ছুটি নিতে বলেছিলাম। তার মানে, ছুটি নিয়েও, আবার অফিসে গেছে?' বলে, শক্ত মুখ তুলে, কঠিন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো কুন্দকলির দিকে।

কুন্দকলি যেন দিদির দিকে চোখ রাখতে না পেরেই, মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পার্টিশনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল।

আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম, কিছুটা সঙ্কোচও। সদ্য পরিচিত কোনো পরিবারে এসে, যদি পারিবারিক কোনো কারণে, কারোকে বিচলিত হতে দেখতে হয়, অস্বস্তিবোধ করা খুব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমি কিছুটা দ্বিধা করেই বললাম, 'অনধিকার চর্চা করছি কি না, বুঝতে পারছি না, বোনের অফিস চলে যাওয়ার সংবাদে, মনটা কি খুবই খারাপ হয়ে গেল?'

ফুলকলি প্রায় চমকে উঠলো এবং খানিকটা সুপ্তোত্থিতের মতো উচ্চারণ করলো, 'অ্যাঁ?' তারপরেই কিছুটা লজ্জিত হেসে বললো, 'না না, মন খারাপ আর কি! আপনি আসছেন, সেই উপলক্ষে আমরা দু' বোনই ছুটি নিয়েছি—মানে, আপনার কাছে মিথ্যে কথা কি আর বলব। আপনার আসাটা আমরা সেলিব্রেট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু খুকু একটু মনটা খারাপ করে

দিল। ও যে সত্যি এ রকম ছেলেমানুষি করবে, তা বুঝতে পারিনি।'

আমি ফুলকলিকে একটু নরম আর সহজ করার জন্যই হেসে বললাম, 'আমি তো পালাচ্ছি না, আর খুকুও অফিস থেকে নিশ্চয় ফিরবে। এর জন্য আর এতটা মন খারাপ করে লাভ কি।'

ফুলকলি বললো, 'লাভ নেই, তবু হয়। আসলে ঠকলো তো ও-ই। কিন্তু কেন যে ও জেদ করে অফিসে গেছে, আমি জানি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন বল তো?'

ফুলকলি বললো, 'সেই যে আপনাকে বললাম না, ও স্টেশনে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু নিয়ে যাইনি, তাতেই আমার বোনটির মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। তাই রাগ দেখিয়ে অফিস চলে গেছে।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'সত্যি ছেলেমানুষ মানে, তোমরা সকলেই।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, পার্টিশনের দরজা ভিতর থেকে খুলে গেল, আর লাল রঙের কিছু যেন বাতাসে উড়ে এসে, নুয়ে পড়লো আমার পায়ের কাছে। চমকে ওঠবার আগেই, লাল শাড়ি পরা একটি মেয়ে, আমার পা স্পর্শ করে, কপালে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'আমি কিন্তু ছেলেমানুষ নই, ছেলেমানুষ আসলে দিদি।'

ফুলকলি খুশিতে প্রায় চিৎকার করে উঠলো, 'ওহ্, খুকু তুই! অফিসে যাস্‌নি?' বলেই, উঠে ভগ্নিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। প্রায় হেঁচকি লাগা বিস্ময়ে আবার বললো, 'ও মা, তুতুটা কি সাজ্যাতিক মেয়ে। আমাকে বললে কী না, তুই অফিসে চলে গেছিস্!'

আমি তখন দুই ভগ্নির লীলা দেখছি। দুই না, তিন বলতে হবে। মনে হচ্ছে, এই লুকোচুরির ষড়যন্ত্রের মধ্যে, স্বয়ং মা-ও জড়িত আছেন।

কৃষ্ণকলি একবার আমার দিকে তাকালো, হাসলো, তারপরে বললো, 'তুতু সাজ্যাতিক হবে কেন? ওকে যা শিখিয়ে রেখেছি ও তাই বলেছে।'

ফুলকলি আমাকে সাক্ষী মেনে বললো, 'দেখেছেন, আমার বোনেদের কাণ্ড?'

আমি কৃষ্ণকলির দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'কাণ্ড আর দেখতে পাচ্ছি কোথায়, এ তো একটা কারখানা।'

ফুলকলি ভ্রূকুটি চোখে, আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, 'তার মানে?'

আমি বললাম, 'মানে রীতিমত কাণ্ডকারখানা।'

কৃষ্ণকলি হেসে উঠলো। ঠোঁট ফুলিয়ে রইলো ফুলকলি। আমার দিকে চেয়ে বললো, 'তার মানে, আপনি এখন খুকুর দলে চলে গেছেন, তাই না?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'তা বলতে পারো, আবার না-ও পারো। আমাকে যে যখন যেমন করে দেখে, আমি তেমনি।'

ফুলকলি বলে উঠলো, 'মারাত্মক আপনি!'

কৃষ্ণকলি বললো, 'সেইজন্যই বোধ হয় উনি কালকূট।' বলে, কাজল-টানা চোখের কোণে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

দেখছি, তেমন করে সাজেনি কেবল কুন্দকলি। ফুলকলির মতো, সাজের ঘটাটা কৃষ্ণকলিরও কম না। যাকে বলে রঙ মেলানো, কৃষ্ণকলি তেমনিই শাড়ি জামায় একেবারে লালে লাল। ওরও দেখছি, ফুলকলির মতোই, ঘাড়ের একটু নিচে থেকেই, চুল সমান করে ছাঁটা। দু'জনের মধ্যে এ ব্যাপারে তফাৎ হচ্ছে, ফুলকলির চুল খোলা, কৃষ্ণকলির ঘাড়ের কাছে, রুপোর আঙটায় বেঁধে, হর্স-টেল করেছে। আপাতত সামনে কুন্দকলি নেই বটে, তবে খেয়াল আছে, ওর চুল দীর্ঘ, প্রায় কোমরের কাছে কটি পর্যন্ত এলানো। এখনো দুই দিদির মতো কাজের মেয়ে হয়নি বলে বড় চুল রাখতে পেরেছে, কারণ কেশ-বিন্যাসের সময়টা ওর হাতে নিশ্চয় বেশি আছে।

কিন্তু চেহারার কথা বলতে গেলে, ফুলকলি অর্থাৎ তপ্‌সি, আর কুন্দকলি মানে তুতুর মধ্যে মিল অনেকখানি। এ কথা বলা যাবে না, ওদের দু'জনের স্বাস্থ্য অনুজ্জ্বল, কৃশ বা নম্র। তপ্‌সির থেকে তুতু এখনো একটু রোগা। কিন্তু যৌবনের সরসী নীরে। টলোমলো দু'জনেই। তপ্‌সির অর্থাৎ ফুলকলির শরীরে যতটা ঢল নেমেছে, ততটা কুন্দকলির মোটেই না। কিন্তু তথাপি, ফুলকলির নাতিদীর্ঘ প্রায় ছিপছিপে শরীরে তেমন একটা ঔদ্ধত্য চোখে পড়ে না, যা লক্ষ্যণীয় কৃষ্ণকলিতে। অর্থাৎ খুকু। ও অনেকটাই ওর মায়ের মতো। হয়তো তিনিও ওর বয়সে, ওরই মতো শক্ত পুষ্ট এবং শরীরে একটু উদ্ধত ছিলেন। একমাত্র এই কারণেই কৃষ্ণকলিকে একটু খাটো দেখায়।

এদিকে দেখছি, দুই বোনের মধ্যে, ও-ভাবেতে ভাব দেখা দিয়েছে। ফুলকলি বললো, 'ঠিক বলেছিস খুকু। এমন মারাত্মক নাহলে, সে কখনো কালকূট হয় না।'

কৃষ্ণকলি বললো, 'কিন্তু দিদি, আমার কি অবাক লাগছে জানিস?'

'কী বল তো?'

কৃষ্ণকলি চোখের তারা সরিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললো, 'ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন আমাদের কতদিনের চেনা, তাই না? একবারও মনে হচ্ছে না, উনি এই প্রথম আমাদের বাড়ি এসেছেন, এই প্রথম ওঁকে আমরা দেখলাম।'

আমি ঠোঁট টিপে হেসে, পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বললাম, 'কৃতিত্বটা নিশ্চয় আমার?'

ফুলকলি বলে উঠলো, 'ইস, মোটেই না। আমি আপনাকে চিঠি লিখতাম। আপনার জবাব এলে, আমরা সবাই পড়তাম। আসলে আপনার চিঠিগুলো পড়ে পড়ে আপনাকে আমরা যেন আগেই চিনে ফেলেছি।'

এ কথার জবাব দেবার আগে, জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি ধূমপান করতে পারি?'

ফুলকলি বলে উঠলো, 'ও মা, আপনি কি আমাদের মেমসাহেব ভাবলেন নাকি, যে স্মোকিং-এর জন্য পারমিশন চাইছেন!'

আমি সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আজকাল কি আর চেহারা দেখে আর ভাষা শুনে, মেমসাহেবদের চেনা যায়? একবার তো মার খেতে খেতে বেঁচে গেছলাম।'

দুই বোনই চোখ কপালে তুলে, একসঙ্গে বলে উঠলো, 'সত্যি?'

বললাম 'প্রায় তাই। পরে অবিশ্যি ঘটনার চাকা ঘুরে গেছল, অন্তত আমি যে মহাভারত অশুদ্ধ করে ফেলিনি এবং আমাকে অপমান করাটা অন্যায় হয়েছে, সেটা কবুল করতে হয়েছে। ঘটনাটা তোমাদের বলি—'

ফুলকলি আর কৃষ্ণকলি, দু'জনেই সোফার সামনে, লাল ঝকঝকে মেঝের ওপরে বসে পড়লো। এ বসাটা আমার কাছে একটু দৃষ্টিকটু, যেন পায়ের কাছে বসার মতো। আমি বললাম, 'উঠে বোসো না।'

ফুলকলি বললো, 'এই বেশ আছি, আপনি বলুন।'

আমি ওদের একটি ঘটনা বললাম, যা ঘটেছিল, আমার মফস্বল শহর থেকে, কলকাতায় আসার ট্রেনের পথে। নিত্য যাত্রীরা সকলেই প্রায় চেনা। প্রথমে বলতে হয়, কামরা প্রথম শ্রেণীর। দু'চারজন মহিলাযাত্রীও নিত্য যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন। আমরা বাঙালী ধূমপায়ীরা আমাদেরও কিছু দোষ আছে। সব সময়ে সৌজন্যবোধটা মনে থাকে না। একদিন, আমার মুখোমুখি আসীন এক মহিলাযাত্রীর বিনা অনুমতিতেই সিগারেট ধরিয়ে বসেছিলাম। মহিলা প্রথমে ভ্রূকুটি করলেন, তারপরে নাকে রুমাল চাপা দিলেন। আমি একটু ঘুরে বসবার চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যে, মহিলা পাশের এক নন্-স্মোকার ভদ্রলোকের

সঙ্গে কথা শুরু করেছেন, উপলক্ষ আমি। বক্তব্য: আমার মতো লোকেরা পোশাকে-আশাকে বাইরে থেকে দেখতে ভদ্রলোক। কিন্তু মহিলাদের মান সম্মান রাখতে জানি না। কোনো মহিলার সামনে ধূমপান করা একটা ঘৃণিত ব্যাপার।...

আমি আর শুনতে না পেরে, পোড়া মুখটা নিয়ে আসন থেকে উঠে গেলাম। কিন্তু অপমান এবং আক্রমণের ভাষা থামলো না, আমার নীরবে উঠে যাওয়ায়, যেন ঘৃতাহুতি পড়লো। আমার মতো লোকেরা মা-ভগ্নির সম্মান রাখতে জানে না। আমার মতো যাত্রীদের ঘাড় ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া উচিত।...

এই পর্যন্ত শুনে ফুলকলি আর থাকতে পারলো না, বলে উঠলো, 'স্টুপিড!'

আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা আর তাঁর সহযাত্রী বন্ধু লোকটি একটু স্টুপিডিটিই করে ফেলেছিলেন, তাঁরা মাত্রা রাখতে পারেননি, ফলে, হঠাৎ এক ভদ্রলোকের গর্জন শোনা গেল, 'নামান দেখি ঘাড় ধরে, দেখি আপনাদের ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে? নরম মাটি পেলে, বেড়ালে এ্যা করে, না? ভদ্রলোক চুপচাপ উঠে গেলেন, তারপরেও এ সব বাজে কথা কেন বলছেন? নিজেদের কথাগুলো একবার নিজেরা ভেবে দেখেছেন, কত বড় ছোটলোক আর ইতর আপনারা?' তারপরেই দেখা গেল, ওই ভদ্রলোকের সমর্থকদের সংখ্যা অনেক বেশি। আমি ভয় পেলাম, মহিলা আর তাঁর সহযাত্রীকেই না সবাই মিলে নামিয়ে দেয়।

কৃষ্ণকলি বললো, 'বেশ হতো।'

আমি হেসে বললাম, 'অত দূর গড়ায়নি। ক্ষমা চাওয়ার ওপর দিয়েই মিটেছিল। কিন্তু সেই থেকে আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। মহিলাদের সামনে ধূমপান করতে গেলেই, আগে আমি পারমিশন নিয়ে নিই।'

কৃষ্ণকলি বললো, 'মেয়েরাই আজকাল যা সিগারেট টানে, তার আবার পারমিশন।'

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'চলবে নাকি?'

কৃষ্ণকলি ফুলকলির দিকে চেয়ে হাসলো। ফুলকলি বললো, 'খেয়ে ভাখ, মারব এক থাপ্পড়।'

কৃষ্ণকলি খিলখিল করে হেসে উঠলো। ফুলকলি বললো, 'জানেন খুকু সব পারে।'

আমি কৃষ্ণকলির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। ও হাসতেই লাগলো, বললো, 'সব আবার কী। আমার খুব মজা লাগে।'

ফুলকলি বললো, 'তা তো লাগবেই। আজ স্মোক করতে মজা লাগবে, কাল ড্রিংক করতে মজা লাগবে।'

কৃষ্ণকলি বললো, 'যাহ্! আমি কোনোদিন ড্রিংক করেছি, যে বলছিস? বন্ধুদের সঙ্গে এক-আধদিন কেবল দু-একটা সিগারেট খেয়েছি।'

আমি বললাম, 'এটা একটা খেলা।'

ফুলকলি বললো, 'ও সব পরে হবে, আমি জানতে চাই, ওই কথাটা কি সত্যি?'

'কোন্‌টা?'

'ওই যে বললেন, আপনাকে যে যখন যেমন করে দেখে, আপনি তেমনই?'

আমি একটু অবাক হলাম, হেসে বললাম, 'কথাটা ভোলোনি দেখছি। কিন্তু আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই, ব্যাপারটা তা-ই নয় কী?'

ফুলকলি একটু যেন জেদের সঙ্গেই বললো, 'কী রকম?'

বললাম, 'খুব একটা জটিল কথা বোধ হয় বলিনি। তোমার নিজের কী ধারণা? তোমাকে, তোমার এই শহরের পরিচিতদের বা অপরিচিতদের কথাও বলি, সবাই কি এক চোখে দেখে। এক রকম ভাবে?'

ফুলকলি বেশ তর্কের সুরে বললো, 'তা ভাবে না। না-ই বা ভাবলো! আমাকে যে যে ভাবেই দেখুক, তাতে আমার কী যায় আসে? আমাকে যে রকম ভাববে আমি কি তেমনি হব?'

আমি জানি, আসলে ওর খটকাটা কোথায়। বললাম, 'তা-ই বা কেন হবে? তুমি যা, তা-ই থাকবে। কিন্তু তোমাকে যে যা-ই ভাবুক, তুমি কি সবাইকে ডেকে ডেকে বোঝাতে যাবে, তুমি তেমনটি নও।'

ফুলকলি ঠোঁট উলটিয়ে বললো, 'দায় কেঁদে গেছে আমার।'

হেসে উঠে বললাম, 'আমি তো সে কথাই বলছি ফুলকলি দেবী, আমাকে যে যখন যেমন করে দেখে, আমি তেমনি। যে দেখে, দায় তো তার, আমার কী? আমি তো জানি, আমি যা, আমি তা-ই। কী বল কৃষ্ণকলি?'

কৃষ্ণকলি নিবিষ্ট মনে আমাদের কথা শুনছিল। হঠাৎ ওকে সাক্ষী মানতে চমকে উঠে বললো, 'অ্যাঁ? হ্যাঁ, ঠিকই তো বলেছেন আপনি।'

বললাম, 'তবে আমি মারাত্মক হলাম কিসে?'

ফুলকলি ঘাড় বাঁকিয়ে, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায়, ভুরু তুলে আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে ছিল। কিঞ্চিৎ সন্দেহও রয়েছে ওর চোখে। বললো, 'মনে হচ্ছে, কালকূটের লেখার ভাষা শুনছি। কিন্তু খেই পাচ্ছি না।'

হেসে বললাম, 'তোমার খেই আমি ধরিয়ে দিতে পারি। আমি যদি কথাটাকে এমন করে বলতাম, "যখন যাহার কাছে থাকি / তখন তাহার মন রাখি", তাহলে তুমি মারাত্মক বলতে পারতে। আসলে তুমি আমার কথাটা সেই অর্থেই ধরেছিলে বোধ হয়।'

ফুলকলি এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ যেন একটু লাল হয়ে উঠলো। তারপরে হাতজোড় করে বললো, 'হার মানলাম। সেই সঙ্গে, এবার আমার নমস্কারটাও সেরে রাখি।' বলেই, ও দ্রুত আমার পায়ে হাত স্পর্শ করে, কপালে ছুঁইয়েই উঠে দাঁড়ালো।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'আরে, পাগল নাকি?'

ফুলকলি বললো, 'না, ভূত! তা না হলে, আমার ছোট বোনেরা যা ভোলে না, আমি তা কেমন করে ভুলেছিলাম? আমার তো উচিত ছিল, ভি. টি.-তেই প্রণামটা সেরে নেওয়া।'

আমি হাতজোড় করে বললাম, 'ফুলকলি, দোহাই, আমাকে ইষ্টগুরুর জায়গায় বসিও না। যা আছি, তা-ই থাকতে দাও।'

'তা-ই থাকবেন, আপনি যা।' শেষের কথায় যেন একটু বিশেষ জোর দিয়ে বললো, 'আমি দেখি, চায়ের কত দূর।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'চায়ের আগে আমি একটু মুখ ধুয়ে নিতে চাই। অ্যাটাচিতে প্রয়োজনীয় আর কিছু না থাকুক, দাঁত মাজা আর দাড়ি কামানোর সরঞ্জামগুলো আছে। অসুবিধে না হলে, তুমি বরং আমাকে একটু বাথরুমটা দেখিয়ে দাও।'

কৃষ্ণকলি বলে উঠলো, 'ও মা, অসুবিধের কী আছে? চলুন, আপনাকে আমি বাথরুম দেখাচ্ছি।'

আমি অ্যাটাচি খুলে ব্রাশ, মাজন আর দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম বের করলাম।

ফুলকলি বললো, 'স্নানের অভ্যাস কি দুপুরে?'

বললাম, 'না, সকালেই। কিন্তু আমার জামা কাপড়ের পেটি তো চলে গেছে বন্ধুর ঘরে, অতএব স্নানটা সেখানে গিয়েই সারতে হবে।'

ফুলকলি বললো, 'এ ব্যাপারে অনেক ডিসপিউট আছে, কোথায় চান করবেন বা খাবেন। আপাতত মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে আসুন। চা খান, তারপরে দেখা যাবে।' বলেই দরজার আড়ালে অদৃশ্য হলো।

আমি কৃষ্ণকলির দিকে খানিকটা বিভ্রান্ত চোখে তাকালাম। ও হেসে উঠে বললো, 'আমি কিছু কমেণ্ট করতে পারব না। চলুন, বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি।'

অগত্যা। আপাতত যা করণীয়, তা-ই করা যাক। বাইরের ঘরের পার্টিশনের আড়ালেই খাবার ঘর। তার একদিকে, আলাদা রান্নাঘর, অন্যদিকে বাথরুম। কোনো কিছু নিয়েই, আমার তেমন বাহানা নেই, বিশেষত যখন বাইরে, পথে নেমে পড়ি। তবু বাথরুম ব্যাপারটার মধ্যে, বোধ হয় অবচেতনে, কোথাও একটু খুঁতখুঁতানি আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, বাথরুমটি বেশ পরিচ্ছন্ন আর শুকনোই পাওয়া গেল। ফ্ল্যাটটি তেমন রাজকীয় না, অতএব বাথরুমও না, সবই সাধারণ। তবে সাজানো গোছানো ভালো। বেসিনের ওপরে আয়নাটি ঝকঝকে পরিষ্কার, বেসিনটিও। পায়ের নিচে, শ্যাওলা জমে, পিছলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

দাঁত মেজে, দাড়ি কামিয়ে, চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে, অনেকটা গ্লানি-মুক্ত হওয়া গেল। বাথরুমের বাইরে বেরিয়ে এসেই দেখি, খাবার টেবিলের ওপরে, চা সহ, ফুল কোর্স নাস্তা সাজানো। ফুলকলি ছাড়া সকলেই টেবিলের সামনে। গৃহকর্ত্রী মা বললেন, 'বসুন।'

কথাটা কানে হঠাৎ এমন খট্ করে লাগলো, না বলে পারলাম না, 'বসতে ইচ্ছা করছে না।'

কৃষ্ণকলি অবাক উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

আমি ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মুখ ফুটে অবিশ্যি কিছু বলিনি। কিন্তু প্রণামের পরে আশীর্ব্বাদ করলেন, এখনো আমাকে 'আপনি' করে বলছেন?'

মা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাই ভালো। আমি ভাবলাম, কি না কি একটা অন্যায় হয়ে গেছে বুঝি!'

আমি স্বরে অবাক সুর ফুটিয়ে বললাম, 'ব্যাপারটাকে কি এখনো আপনার অন্যায় বলে মনে হচ্ছে না?'

মায়ের সঙ্গে, কৃষ্ণকলি আর কুন্দকলিও হেসে উঠলো। মা বললেন, 'আচ্ছা বাবা অন্যায় হয়েছে, এখন বোসো তো। একটু কিছু মুখে দাও। দু'দিন দু'রাত্রি তো গাড়িতেই কেটেছে।'

আমি দুই বোনের দিকে একবার তাকিয়ে হাসলাম, বললাম, 'এসো, সবাই বসি। ফুলকলি কোথায় গেল?'

বলতে বলতেই ফুলকলি এলো, বললো, 'এসে পড়েছি, বসুন।'

সকলেই বসলাম। মা-ও বসলেন একপাশে। বেলা প্রায় দশটা, কিন্তু প্রাতঃরাশের আয়োজন কিছু কম না। বিস্কুট দিয়ে শুরু করে, মিষ্টির পাত্রে যাবার আগে, দুধ কর্ণফ্লেক্স, কলা, মাখন, রুটি, ডিম এবং অবাক করার মতোই, অতি উপাদেয় ককটেল্ সস্! খাদ্যবস্তুতেও অনেক সময় পরিবারের চরিত্রকে কিছু কিঞ্চিৎ চেনা যায়। হাল আমলের শহুরে চাকুরে পরিবারের সকাল-বেলার খাবারের ব্যবস্থা বোধ হয় এ রকমই হয়। অন্তত রান্না পর্বটা অনেক সংক্ষিপ্ত করা যায়।

আমার এই ভাবনার ফাঁকেই মা বলে উঠলেন, 'আমি কিন্তু জানিনে বাবা, তোমার এ সব খাবার ভালো লাগবে কি না। একবার ভেবেছিলাম, লুচি তরকারী করে দিই।'

হেসে বললাম, 'আমি সব রকমেই আছি, আপনি ভাববেন না। খাওয়ার ব্যাপারে, আমার মায়ের কাছে, আমি বরাবর লক্ষ্মী ছেলে।'

মা বললেন, 'খুব ভালো।'

ফুলকলি চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'লক্ষ্মী ছেলে হবার খুব সাধ দেখছি আপনার?'

জবাবটা ওর মা-ই দিলেন, 'হবার সাধ হবে কেন? ও তো এমনিতেই লক্ষ্মী ছেলে।'

ফুলকলি একটু আদুরে অভিমানের সুরে বললো, 'আর আমরা বুঝি অলক্ষ্মী?'

মা যেন চমকে উঠে, কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'ছি ছি, অমন কথা বলিস নে তপ্‌সি। তোরা আমার সবক'টি লক্ষ্মী মেয়ে!' বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠলো।

দেখলাম মায়ের চোখের ছলছলানিটা, তিন কন্যার চোখেই যেন সংক্রামিত হয়ে পড়লো। তার মধ্যে, ফুলকলির মুখে একটু লজ্জার ছটাও লেগে গেল। বললো, 'আমি ঠাট্টা করে বলেছি মা।'

মা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'জানি। তবু, ঠাট্টাও এক এক সময় শুনতে পারিনে মা। তোরা আমার লক্ষ্মী মেয়ে শুধু না, আমার লক্ষ্মী ছেলেও বটে। তোরা আমার ছেলেমেয়ে, সব।'

সকলের মুখেই একটু বিষণ্ণ হাসি দেখা দিল। খাওয়ার তালটাও যেন কিঞ্চিৎ কেটে গেল। আর আমার মনে হলো, পুরুষহীন এই সংসারে, তিনটি

কন্যা আর মা, চারজন নারী, সংসারের পথে চলেছে। কোথাও একটা অসহায়তা আছে। যে সংসারে পুরুষ নেই, সে সংসারই তা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে। আমার অনুভব, আপাতত মায়ের এই যে চমকানো, চোখ ছলছলিয়ে ওঠা এবং কথা, সবই সেই অসহায়তাকেই কেন্দ্র করে।

ফুলকলি আমার অন্যমনস্কতা দেখে, স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো, খাচ্ছেন না ?'

আমি সচকিত হয়ে বললাম, 'খাচ্ছি তো।'

ফুলকলি এমন একটি মেয়ে যে তার পরিবারের কোনো কথাই, আমাকে চিঠি লিখে জানাতে ভোলেনি। অতএব নতুন করে, জিজ্ঞাসার কিছুই নেই। আমি জানি, ওদের একজন বৈমাত্রেয় দাদা আছেন, তিনি মস্ত বড়লোক, থাকেন হায়দ্রাবাদে। ওর বাবার প্রথম পক্ষের সন্তান সেই দাদা। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পরে ফুলকলির মাকে বিয়ে করেছিলেন। এ পক্ষে কোনো পুত্র সন্তান হয়নি, তিনটিই কন্যা, তিন বোন। দাদা ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না। বাবাও কিছু রেখে যেতে পারেন নি, তাঁর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সামান্য টাকা ছাড়া। অতএব সংসারের পথে ওদের এমনি করেই পা বাড়াতে হয়েছে। আর সেই পা বাড়ানোটাকে বলতে হবে শক্তিশালী এবং সক্ষম এবং সম্ভ্রান্তও বটে। নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের হাতে, অপরের চিন্তা মাথায় নিয়ে, কোনো অভিযোগের পাঁচালী গাইতে শেখেনি। সেই হিসাবে, চিঠির মারফত, অনেক আগেই আমি আমার সম্মান জানিয়ে রেখেছি। সব থেকে শ্রেষ্ঠ প্রণামটি ওদের মাকে, তিনিই তিন কন্যাকে শিশু বয়স থেকে মানুষ করে তুলেছেন।

ফুলকলি বললো, 'মা আপনাকে লুচি তরকারি করে খাওয়াতে পারতেন ঠিকই। এ সব হচ্ছে, আমার আর খুকুর অফিসে খেয়ে যাবার খাবার। আজকের ব্যবস্থা এই, পরে আপনাকে মা লুচি তরকারি খাওয়াবেন।'

আমি একটু গম্ভীর স্বরে বললাম, 'না, আমি লুচি তরকারি খেতে চাই না।'

সকলেই জিজ্ঞাসু অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো। এমন কি মা-ও যেন একটু অস্বস্তি নিয়ে তাকালেন।

ফুলকলি জিজ্ঞেস করলো, 'কী খেতে চান আপনি ?'

বললাম, 'কী হবে বলে ? যা খেতে পাব না, তা বলে লাভ কী ?'

আমার নিরস নির্বিকার বচনে সকলের অস্বস্তি আরো বাড়লো। তিন বোন পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। ফুলকলিই আবার বললো, 'তবু

শুনি একটু। হয়তো এমন খাবারের কথা বলবেন; না দিতে পারলেও নামটা অন্তত আমাদের জানা থাকবে।'

ককটেল সঙ্গে কামড় বসিয়ে বললাম, 'পোস্ত দিয়ে লাউডাঁটার চচ্চড়ি ডালের সঙ্গে, ভাত দিয়ে ভাজা বড়ি, বড়ির ঝাল, নারকেল কোরা দিয়ে মোচার ঘণ্ট...'আমার কথা শেষ করার উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে হাসির তুফান বইতে শুরু করেছিল।

কৃষ্ণকলির তো গলায় খাবার আটকে বিষম লেগে কাসি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কুন্দকলির হাতের কাপ থেকে চা চল্‌কে পড়েছে। ইস্তক মা তাঁর কালো পাড়ের ধুতির আঁচল মুখে চেপে ছেলেমানুষের মতো হাসতে আরম্ভ করেছেন।

আমি কপট বিস্ময়ে, ভ্রূকুটি চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে আছি। আবার বললাম, 'খুব একটা হাসির কথা বলেছি বলে তো মনে হয় না।'

ফুলকলি কোনোরকমে একটু হাসির ফোয়ারা থামিয়ে বললো, 'হাসির কথা বলেননি। কিন্তু ও সব মহার্ঘ খাবার সত্যি খাওয়ানো যাবে না।'

মা বলে উঠলেন, 'কেন খাওয়ানো যাবে না? ও যা-যা খেতে চেয়েছে, বম্বের বাজারে তার কোন্ জিনিসটা পাওয়া যায় না শুনি? আমি কী খেয়ে থাকি? রোজই কি আলু কাঁচকলা খাই নাকি? এই তো সেদিনও তোদের কুমড়ো ফুলের বড়া খাইয়েছি।'

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, 'সত্যি?'

মা বললেন, 'হ্যাঁ, কলকাতার লোকেরা বম্বের বিষয়ে অনেক কিছুই জানে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে চালকুমড়ো পাওয়া যায়?'

মা বললেন, 'কেন যাবে না?'

আমি খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, চালকুমড়ো দিয়ে চাল বাটা মাখিয়ে, ভেতরে সরষে বাটা মশলা দিয়ে কি একটা হয়, আপনি রাঁধতে পারেন?'

মা প্রায় হেসেই অস্থির, বললেন, 'কেন পারব না, ওটাকে চালকুমড়োর বড়া বলে। তোমাদের আসল বাড়ি কোথায় বল তো? ঢাকা না ফরিদপুর?'

আমি বললাম, 'ঢাকা।'

মা তাঁর কন্যাদের চেয়েও ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠে বললেন, 'আমি তো ফরিদপুরের মেয়ে মাদারিপুর সাব-ডিভিশন।'

ওদিকে তিনকন্যার চক্ষু প্রায় ছানাবড়া! কৃষ্ণকলি বলে উঠলো, 'মা, তোমরা কি সব বলছো, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ফুলকলি বললো, 'মা, তুমি তো আমাদের কোনোদিন ও রকম চালকুমড়োর বড়া খাওয়াওনি?'

আমি আর মা দু'জনেই হেসে উঠলাম। মা বললেন, 'তোরা তো ছেলেবেলা থেকে ও সব খেতে শিখিসনি, তাই রাঁধি না। এবার রেঁধে খাওয়াব।' বলে, আমার দিকে তাকিয়ে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হ্যাঁ বাবা, তুমি এ সব নিরিমিষ খাবারের ভক্ত হলে কেমন করে?'

বললাম, 'আমিও যে বিধবা মায়ের ছেলে।'

মায়ের মুখে হঠাৎ করুণ ছায়া ঘনিয়ে এলো, সেই সঙ্গে কন্যাদেরও। এ আমি চাইনি। আবার বললাম, 'আমার মা আমিষ রান্নাও অনেক জানেন। কিন্তু মায়ের হাতের নিরামিষ খাবার আমার বেশি ভালো লাগে। সে জন্য মাকে খুব জ্বালাতন করি।'

'জ্বালাতন করেন?' ফুলকলি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, 'করি না? খুব জ্বালাতন করি। মা তো এক-এক সময় রেগে মারতেই আসেন।'

আবার একটা হাসির লহরা বেজে উঠলো। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা ক'ভাই-বোন?

'তিন ভাই, এক দিদি।'

'তুমি কী?'

'সকলের ছোট।'

মা হেসে বললেন, 'সেই জন্যই। তুমি মাকে জ্বালাতন করবে না তো কে করবে?' সবাই হেসে উঠে আমার দিকে তাকালো।

ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছিল। ফুলকলি একটু গম্ভীর ভাবে বললো, 'একটা ব্যাপারের এখনো কোনো কিনারা হয়নি। উনি কিন্তু আমাদের বাড়ি থাকছেন না, চলে যাচ্ছেন।'

মা অবাক স্বরে চমকে উঠে বললেন, 'সে কী?'

ফুলকলি বললো, 'আসল কথাটা তো তোমাদের বলাই হয়নি। দেখছো না, ওঁর অ্যাটাচিটা ছাড়া, সঙ্গে কিছুই নেই? সে সব উনি ওঁর বন্ধুর বাড়িতে, পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি নেহাত গেছিলাম বলে, দয়া করে একটু সময়ের জন্য এসেছেন।'

কৃষ্ণকলি বলে উঠলো, 'সত্যি ?'

কুন্দকলি বললো, 'আমার একবার মনে হয়েছিল, অ্যাটাচিটা ছাড়া আর কিছু দেখছি না কেন ? আপনি আমাদের বাড়ি থাকবেন না ?'

তুতু অর্থাৎ কুন্দকলি ওর ডাগর চোখদুটো মেলে আমার দিকে যেন অসহায় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে, ফুলকলি ছাড়া।

বোধ হয় ও নিজে আমাকে বিপদে ফেলেছে বলেই। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি আমার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলাম, 'থাকব।'

ফুলকলি ভ্রূকুটি সন্দেহে আমার দিকে তাকালো। আমি আবার বললাম, 'দু-একটা দিন আমার একটু কাজ আছে, সে সময়টা আমার বন্ধুর বাড়ি থাকা দরকার। তারপরে এখানেও দু-একটা দিন তোমাদের কাছে থেকে যাব।'

কৃষ্ণকলি জিজ্ঞেস করলো, 'দু-একটা দিন কেন ? কলকাতায় অনেক কাজ বুঝি ?'

বললাম, 'না কলকাতায় যাব না। কয়েকটা দিন বসে কাটিয়ে, ভাবছি ঔরঙ্গাবাদটা ঘুরে যাব।'

ফুলকলি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'ঔরঙ্গাবাদ ? সেখানে কী ?'

হেসে বললাম, 'অজন্তার গুহায় যেতে হলে তো ঔরঙ্গাবাদ হয়েই যেতে হবে, তাই না ?'

ফুলকলি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'ওহ্, তাই বলুন অজন্তায় যাবেন। হ্যাঁ, ঔরঙ্গাবাদ হয়েই যেতে হয়।'

কুন্দকলি বলে উঠলো, 'ও সব পরে যাবেন। এখন অনেক দিন আমাদের বাড়ি থাকতে হবে।'

মা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'সব মেয়েরাই চায়, বাড়িতে একটা দাদা বা ভাই থাকুক। এমনিতেই তপ্‌সি তোমার নামে পাগল। এখন কাছে পেয়ে এত সহজে কি তোমাকে ছাড়বে ?'

আমি বললাম, 'কয়েকদিন তো থাকবই।'

ফুলকলি জিজ্ঞেন করলো, 'আপাতত কী করবেন ? আপনার বন্ধুর বাড়ি যাবেন ?'

হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখে বললাম, 'একবার যাওয়া দরকার। অবিশ্যি আমার বন্ধুর হয়তো এইমাত্র ঘুম ভাঙলো !'

কৃষ্ণকলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন উনি কি সারা রাত্রি কাজ করেন ?'

আমি হেসে বললাম, 'না অকাজ করে।'

বলেই আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমার চোখ পড়লো ফুলকলির দিকে। ও তাকিয়ে ছিল আমার দিকেই। একটু যেন লজ্জা পেয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। মা উঠে পড়লেন, বললেন, 'তাহলে আসল কথাটা কিন্তু আমার জানা হলো না। তুমি কি দুপুরে আমার কাছে খাচ্ছো না?'

তিনি এমন ভাবে আমার কাছে কথাটি উচ্চারণ করলেন, হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। কৃষ্ণকলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কেন যে ছাই আজ অফিস ছুটি নিতে গেলাম। সব দোষ এই দিদিটার।' বলে, ফুলকলির দিকে রুষ্ট চোখে তাকালো।

ফুলকলি কিছুই বললো না, সামনের শূন্য প্লেটে, নখের আঁচড় কাটতে লাগলো।

আমার নিজেকে মনে হতে লাগলো, মস্ত অপরাধী। আজ রাত্রি পোহানোর কালে, জানতাম না, ফুলকলির সঙ্গে আমার দেখা হবে। সে রকম কোনো কথাবার্তাই আমাদের মধ্যে পত্রে লেখালেখি হয়নি। দ্বিতীয়ত, যা-ও বা ওর সঙ্গে এ বাড়িতে এলাম, আসবার আগের মুহূর্তেও এ রকম একটি আন্তরিক পরিবেশে এসে পড়ব, বুঝতে পারিনি, যদিও এই পরিবারের মোটামুটি সকলের পরিচয়ই ফুলকলির চিঠির বয়ানে আমার জানা ছিল। এখন নিজের কাছেও অস্বীকার করতে পারি না, মনের থেকে কোথায় যেন আমিও একটু বাঁধা পড়েছি। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি, প্রাণের মধ্যে যে একটি প্রীতির সুর বেজে উঠছে, তার জন্য, কয়েকটি প্রাণের অকৃত্রিম প্রীতিধারা স্রোত। তাকে একেবারে ঠেকিয়ে রাখব, দেখছি তেমন শক্তি পাচ্ছি না।

এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসাবে, আমার কোনো বৈশিষ্ট্যের দাবী নেই, নিজেকে নিয়ে গর্ব করার মতো দীনতা আমাকে কখনো গ্রাস করেনি। কিন্তু সব কিছুই ছিল কতগুলো ভবিষ্যৎ ছকের লিপিতে বাঁধা। তেমন কোনো জরুরি কাজে মহারাষ্ট্রের এই নগরে আমি আসিনি, সেদিক থেকে বরং আমার এবারের যাত্রাটাই ছিল অলস আর মন্থর। আর মনের কথা যদি সত্যি করে বলতে হয়, তাহলে বলি, চলার পথে কোথাও মনোবেড়িতে ধরা দিতে চাই না। সংসারে তাবত মানুষই সম্ভবত স্নেহ প্রীতি ভালবাসার প্রার্থী। আমি তার থেকে বাদ নেই। কিন্তু প্রার্থীর পাওনাটাই সব সময়ে বড় কথা নয়। কারণ সংসারের

একটা বড় সহজ কথা বোধ হয় এই স্নেহ প্রীতি ভালোবাসার পাশাপাশি বাস করে বিচ্ছেদের বেদনা, দুঃখ আর কষ্ট। পথ চলার ক্ষেত্রে, এগুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারলে, পথ চলাটা তার নিজের সুরে বাজে।

কিন্তু আপাতত, তা পারলাম না। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফুলকলির মায়ের দিকে ফিরে বললাম, 'বেলা তো অনেক হলো। কখন রাঁধবেন, কখন বা খাব?'

মা আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ও মা! আমি এখুনি রান্নার যোগাড় করছি। তিনটে মেয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলে, আমাকে রোখে কে? যখন খেতে চাইবে, তখনই খাওয়াব।'

বললাম, 'তাহলে তাই করুন।'

কুন্দকলি নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারলো না, হাততালি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মা হাসতে হাসতে চলে গেলেন আর একদিকে।

কৃষ্ণকলি চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, আমার দিকে না, ওর দিদি ফুলকলির দিকে। ফুলকলি হাসবে না কাঁদবে, যেন বুঝতে পারছিল না, এমন ভাবে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপরে হঠাৎ, কৃষ্ণকলির দিকে চোখ পড়তেই, ওর মুখে একই সঙ্গে হাসি আর লজ্জার ছটা লেগে গেল, বললো, 'দেখেছিস খুকু, এ সব মানুষের লেখার আর নিজেদের কথার সঙ্গে কোনো তফাত ধরা যায় না, তা-ই না?'

কৃষ্ণকলি বললো, 'ঠিক। কিন্তু ভাই দিদি, আমার খুব ভয় হচ্ছিল, তুই বোধ হয় ভ্যাঁ করে এখুনি কেঁদে ফেলবি।'

ফুলকলি ভ্রূকুটি করে বেশ ধমকেই কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'আহা হা, কাঁদনি তো? এখন চলো তো মেমসাহেব, তোমার গাড়ি চালিয়ে আমাকে আমার বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যাবে। কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

বিস্ময়ের ভঙ্গিতে জবাব দিল কৃষ্ণকলি, 'অসুবিধে? একবার দিদির বুকের কাছে কান পেতে শুনুন না, বেট ফেলে বলতে পারি, ওর হার্টের ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে গেছে। অবিশ্যি আনন্দে!'

ফুলকলির মুখ লজ্জায় একেবারে সিঁদুরবর্ণ ধারণ করলো, বলে উঠলো, 'আহ্‌ খুকু, কী হচ্ছে? ক'ঘণ্টা আলাপ হয়েছে, যে এত বাজে বাজে বকছিস?'

আমি বললাম, 'সত্যিই তো। বাজে কথা বলতে হলে ঘণ্টা কাবারি

হিসেব করে বলবে। আমি তো সেইজন্যই জিজ্ঞেস করলাম, ওর কোনো অসুবিধে হবে কী না। কয়েক ঘণ্টায় আলাপে এর বেশি কিছু বলা যায় কী?'

কৃষ্ণকলি খিল খিল করে হেসে উঠলো। কিন্তু ফুলকলি মোটেই পরাজয় মেনে নেবার পাত্রী না। বললো, 'কয়েক ঘণ্টার আলাপ বুঝি? আমার তা জানা ছিল না। আমি জানতাম, কালকূটের সঙ্গে আমার প্রায় দু'বছরের আলাপ। চিঠিপত্রগুলো অন্তত সে সাক্ষী নিশ্চয়ই দেবে।'

একে বলে উপযুক্ত সময়ে কঠিন বচন। আমাকেই হার মানতে হলো. বললাম, 'যথেষ্ট বলেছ, এর পরে আমার আর কোনো কথা বলা চলে না। তা হলে চলো বেরিয়ে পড়া যাক।'

দুই বোন তখন চোখে চোখে তাকিয়ে হাসছে। ফুলকলি বললো, 'খুকু আয়, দরজাটা বন্ধ করবি।'

আবার গলা তুলে ভিতরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা, ঘুরে আসছি।'

কোনো ঘর থেকে মায়ের জবাব শোনা গেল, 'এসো। তাড়াতাড়ি এসো।'

কুন্দকলিও বোধ হয় মায়ের কাছে গিয়েছে। আমরা তিনজন বাইরের ঘরে এলাম। আমার অ্যাটাচি হাতে নিলাম। ফুলকলি শোফার ওপর থেকে তুলে নিল ওর ব্যাগ। তার ভিতর থেকে বের করলো গাড়ির চাবি।

কৃষ্ণকলি দরজা খুলে দিল। আমরা বেরোবার মুখে ও বললো, 'দেখিস দিদি, অন্য কোথাও চলে যাসনে যেন, বাড়িতেই আসিস।'

ফুলকলি ভ্রূকুটি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই হাসতে হাসতে কৃষ্ণকলি দরজাটা বন্ধ করে দিল!

ফুলকলি গাড়ির দরজায় চাবি লাগিয়ে, দরজা খুললো এবং ভিতরে ঢুকে অন্য দিকের দরজা খুলে দিল। আমি ওর পাশের আসনে বসলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি, কৃষ্ণকলির কথার প্রতিক্রিয়াটা এখনো ওর মন থেকে যায়নি। সেটা বুঝতে পারছি, ওর চোখে মুখের লজ্জার ছটা দেখে, যা ও চাপাবার চেষ্টা করেও পারছে না।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করার পরে আমি বললাম, 'একটু সাবধানে চালিও।'

কথাটা হঠাৎ শুনে, ফুলকলি প্রায় হঠাৎই গাড়ির ব্রেক কষতে যাচ্ছিল। বলে উঠলো, 'কেন, সাবধানে চালাব কেন?'

আমি গম্ভীর ভাবেই বললাম, 'কেউ অন্যমনস্ক হয়ে গাড়ি চালালে, তাকে কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত।'

আমার দৃষ্টি উইণ্ডস্ক্রীনের সামনে রাস্তার দিকে, তথাপি স্পষ্টতই অনুমান করতে পারছি, ফুলকলি অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, ওর গাড়ির গতি, অতি শ্লথ। পরমুহূর্তেই হঠাৎ কি হলো জানি না, গাড়ি তার স্বাভাবিক গতি নিল। আমি ফুলকলির দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে না ফিরেই বললো, 'কৃষ্ণকলিটা আমাকে দিদি বলে একটুও মান্য করে না।'

আমি কপট অবাক স্বরে বললাম, 'তাই নাকি?'

ফুলকলি মুখ ফিরিয়ে ঝটিতি একবার আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'শুনলেন না, বেরোবার সময় কী রকম বাজে কথা বলছিল?'

আমি বিস্মিত ও বিস্মৃতির ভঙ্গি করে বললাম, 'কই, সে রকম কিছু বলেছে বলে মনে হয়নি তো?'

ফুলকলি আবার একবার আমার মুখের দিকে দেখে নিল। আমি আবার বললাম, 'কৃষ্ণকলি তো বলছিল, অন্য কোথাও যেন চলে না যাও। এর মধ্যে এমন আর কি—।'

কথাটা অসমাপ্ত রেখে, আমি ফুলকলির দিয়ে তাকালাম এবং ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখে, হাসি সংবরণ করতে পারলাম না। ফুলকলি নিজেও হেসে উঠলো। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বললো, 'আপনি হয়তো কিছু ভাবতে পারেন।'

বললাম, 'হয়তো পারতাম, যদি না, পত্রালাপে তোমাকে বা তোমাদের পরিবারের কিছু কিঞ্চিৎ না অনুমান করতে পারতাম।'

ফুলকলির মুখের ভাব এবার খানিকটা সহজ হলো, তারপরে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগল আমাদের পরিবারকে?'

বললাম, 'যেমনটি লাগা উচিত ঠিক তেমনটি।'

ফুলকলি জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বললো, 'সকলের উচিত জ্ঞান কি একরকম?'

আমি সহজ ভাবেই বললাম, 'সকলের কথা ভেবে আমি কিছু বলিনি, আমি আমার উচিত বোধ নিয়েই কথাটা বলেছি।'

ফুলকলি বললো, 'তবু আমি বুঝতে চাই। এমন ছোট করে বললে আমি কিছুই বুঝতে পারব না।'

আমি হেসে বললাম, 'কাব্য করে বললে তুমি খুশি হবে?'

ফুলকলি একবার আমার দিকে দেখে নিল, তারপরে বললো, 'কাব্য অকাব্য

জানি না, কালকূটের মুখ থেকে শুনতে চাই, কেমন লাগলো আমাদের পরিবারকে।'

বললাম, 'প্রথমত এত অল্প সময়ে, একটি পরিবারকে বোঝা কঠিন! দ্বিতীয়ত, তোমার চিঠিতে একটা মোটামুটি ছবি আমার মনে আঁকা ছিল, বর্ণনাতে যার মিলটা একেবারে হুবহু। কিন্তু—।' কথাটা শেষ না করে থামলাম।

ফুলকলি একটা গাড়িকে ওভারটেক করে জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু?'

বললাম, 'কিন্তু সেই বর্ণনার অধিক কিছু আমি দেখলাম। আমি দেখলাম, একটি সুখী সুন্দর পাখির বাসা। পক্ষীমাতা বসে আছেন তাঁর নরম ডানা ছড়িয়ে। তাঁর শাবকগুলো ডাগর হয়েছে যতো সুন্দর ততো, এখন তারা কেউ-কেউ বাইরের আকাশে ওড়ে, খাবার সংগ্রহ করে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মতোই মা আর শাবকেরা সদাসতর্ক, নিজেদের বাঁচাতে, কেননা, তারা জানে জীবনে অসহায়তা অনেক, আক্রমণ নানা দিক থেকেই আসতে পারে।'

কথাগুলো বলে, ফুলকলির দিকে তাকাতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, গাড়ি থেমে গিয়েছে। স্টিয়ারিং হুইলের দু'হাতের ওপরে, আমার দিকে পাশ ফেরানো ওর মুখ। সামনে আরব সাগর ফেনিলোচ্ছল, হাসির কিরণ তার তরঙ্গে-তরঙ্গে। আমি নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম। নিজের কথাগুলো, নিজেরই কানে, আঠারো বছরের ছেলের মতো, রোমান্টিক বাচালতায় ভরা শোনালো। নিজের বিব্রত লজ্জাকে চাপা দেবার জন্য, তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আমার বন্ধুর বাড়ি এদিকে না, পেছনে গিয়ে, ডানদিকের রাস্তায় যেতে হবে।'

ফুলকলি সে কথার কোনো জবাব দিল না, যেমন ছিল, তেমনি রইলো। দেখলাম ওর বাঁ চোখের কোণ থেকে এক ফোঁটা জল, উধ্ব´ নাকের পাশে টলটল করছে। আমি বিস্মিত অপ্রস্তুত তো বটেই, একটা সংশয়ের কাঁটাও উঁকি দিল। আমার কথায়, ফুলকলি আহত হয়নি তো? আমি ডাকলাম, 'ফুলকলি।'

ফুলকলি ওর চোখের জল, আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টা করলো না। উধ্ব´ নাকের ওপারে, ডানদিকে চোখের জলের বিন্দু গড়িয়ে পড়লো। সম্ভবত একটা কান্নার আবেগ জমে উঠেছিল, একটু থেমে থেমে, নিচু স্বরে বললো, 'একে কাব্য করে বলা চলে কি না জানি না, যদি চলে, তাহলে বলব, কাব্য জীবনে ফ্যালনা না। কিন্তু রিয়্যাল বলুন, আর ক্রুয়েল বলুন, ট্রুথ ইজ ট্রুথ। যা বললেন,

তার প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। আমাদের পরিবারকে, দেখে এমন আশ্চর্য সত্যি ছবি যে কারোর চোখে ফুটতে পারে, না শুনলে বিশ্বাস হত না।'

কথার শেষ দিকে, ফুলকলির স্বর যেন ডুবে গেল। সমুদ্রের গর্জন আমার কানে, আরো জোরে বেজে উঠলো। সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, তারপরে আবার ফুলকলির দিকে। আমি আবহাওয়াটা হালকা করার জন্য হেসে বললাম, 'কমপ্লিমেণ্ট দিলে? আমি কিন্তু এ ভাবে বলে খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। তবে ব্যাপারটা অবিশ্যি এই রকমই।'

ফুলকলি বললো, 'কমপ্লিমেণ্ট আমি দেব? ভাবছিলাম, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব কি না।'

আমি ভয়ের ভাব করে চমকে বললাম, 'ভাগ্যিস করোনি, তাহলে, সত্যি লজ্জায় ফেলতে। তবে, আমার ইচ্ছা করছিল—।' বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। ফুলকলির চোখের তারা আমার দিকে, যা এখনো ভেজা ও কিঞ্চিৎ আরক্ত।

আমি ওর মাথায় আস্তে হাত রেখে বললাম, 'এইটাই ইচ্ছা করছিল, পাখিটা একটু সহজ হোক। চোখ মোছ।'

ফুলকলির হাত চকিতের জন্য একবার, ওর মাথায় রাখা আমার হাতের ওপর উঠে এলো এবং স্পর্শ করেই তা সরে গেল। স্টিয়ারিং-এর ওপর থেকে মুখ তুলে, কোমরে গোঁজা রুমাল নিয়ে, মুখ চোখ মুছলো। তারপরে সমুদ্রের দিকে তাকালো।

আমিও তাকালাম। ঝকঝকে শুভ্র ফেনিল হাসিতে পাগলা ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমি আবার ফুলকলির দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, তার মধ্যে লজ্জা ছিল। হয়তো আরো কিছু, যা নারীর প্রাণের একান্ত নামহীন অভিব্যক্তি। লাট্টু গিয়ারে হাত দিয়ে, চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে বললো, 'আপনার বন্ধুর বাড়ি যে ছেড়ে এসেছি, আমি তা আগেই জানতাম। ইচ্ছে করেই এখানে চলে এসেছিলাম।'

আমি বললাম, 'কৃষ্ণকলি তাহলে একেবারে মিথ্যা বলেনি?'

ফুলকলি গাড়ি ব্যাক করতে গিয়ে হেসে উঠলো। তারপরে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, 'আমার ইচ্ছেটা অবিশ্যি সেই রকম।'

আমি প্রায় চোখ কপালে তুলে বললাম, 'কী?'

ফুলকলি এবার সহজে হেসে বললো, 'আপনাকে নিয়ে যেখানে খুশি চলে যাই।'

উদ্বিগ্ন স্বরে বললাম, 'হরণ? পুরুষ হরণ?'

'ক্ষতি কি? চিরদিন কি পুরুষরাই নারী হরণ করবে?'

ফুলকলি ঠোঁটের কোণে হেসে, ভ্রূকুটি চোখে আমার দিকে দেখলো। তারপরে খিলখিল করে হাসতে হাসতে, আমার বন্ধুর সঠিক বাড়িটির গেট দিয়ে, পার্কিং লটে গাড়ি থামালো। বিরাট বাড়ি, ওনারশিপ ফ্ল্যাট সিস্টেমের, আজকাল যাকে বলে মালটিপারপাস বিল্ডিং, তা-ই। সমুদ্রের ধারে, আর গাছপালা নারকেল বীথির জন্যই, চেহারাটা আলাদা।

আমি আমার অ্যাটাচিটা নিয়ে নামবার আগে, গাড়ির কাঁচ তুলে লক করে দরজা বন্ধ করলাম। ফুলকলিও দরজা বন্ধ করে নেমে এলো। এগিয়ে গিয়ে এলিভেটরে উঠে পাঁচ নম্বরের বোতাম টিপলাম। উঠতে উঠতে বললাম, 'আশা করি আমার বন্ধু এতক্ষণে উঠে তাঁর ব্রেকফাস্ট খেয়েছেন।

ফুলকলি অবাক স্বরে বললো, 'এখন তো প্রায় লাঞ্চের সময়?'

পঞ্চম মেঝে, কিন্তু বাঙলার ষষ্ঠতলায় পৌঁছে এলিভেটরের দরজা খুলতে খুলতে বললাম, 'সকলের লাঞ্চ ডিনারের সময় এক না। ওটাও উচিত বোধের মতো ব্যক্তি বিশেষে তফাত থাকে।'

ফুলকলি বলল, 'তা বটে।'

বন্ধুর ফ্ল্যাটে ঢোকবার দরজাটা খোলা দেখে অনুমান করলাম সে বোধ হয় ড্রয়িংরুমেই আছে, বাইরের কারোর সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু ঢুকে দেখলাম সেখানে কেউ নেই, তবে নিত্যানন্দের একগাল হাসিসহ কপালে জোড়হস্ত নমস্কারে নত মূর্তি দেখতে পেলাম। বন্ধুর ভৃত্য পাচক এমন কি সঙ্গীও বলা যায়, নামে নিত্যানন্দ হলেও চেহারায় পোশাকে যাকে বলে একটি ক্ষুদে ফিল্ম স্টার। বললো, 'আসুন, আসুন দাদাবাবু।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'দরজাটা কি তুমিই খুলে রেখেছ নাকি?'

নিত্যানন্দ বললো, 'হ্যাঁ। ড্রয়িংরুমের জানালা থেকে দেখলাম আপনারা গাড়ি থেকে নামছেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার সাহেব কী করছেন?'

নিত্যানন্দ বললো, 'ভেতরের ঘরে বই পড়ছেন। এই তো মাত্র চান করে জলখাবার খেলেন।'

আমি একবার ফুলকলির দিকে তাকালাম, বললাম, 'তাহলে তো ও লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেছে। বেলা বারোটার মধ্যেই চান ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট।' বলে, আমি হাসলাম।

ফুলকলি ওর হাতের ব্যাগটা সহ মুখের কাছে তুলে ধরে, নিজের হাসি

আড়াল করলো। ওকে সোফা দেখিয়ে বললাম, 'তুমি একটু বোসো, আমি বন্ধুর সঙ্গে একবার দেখা করি।'

ফুলকলি ঘাড় কাত করে গালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে একটি সোফায় বসলো। আমি ভিতরে যাবার দরজা দিয়ে ঢুকলাম। বাঁদিকে ঘুরে একটি বাথরুম, তারপরেই আমার বন্ধুর শোবার ঘর সমুদ্রমুখী। ঢুকে দেখলাম, বিছানার ওপর জোড়াসনে বসে সে একটি বই পড়ছে। কিন্তু হায়, যা ভেবেছিলাম, তাই, পাশের ছোট টুলের ওপরে গেলাসে রঙীন পানীয়। পায়ের শব্দে আমার দিকে ফিরেই ঝপ করে গেলাস টেনে একটি চুমুক দিয়ে প্রথম অভ্যর্থনা করলো, 'শালা লালটুমোহন এস।'

বন্ধুর গলাখানিও বেশ চড়া আর দরাজ। আমি বললাম, 'লালটুমোহন মানে?'

বন্ধু প্রায় গর্জে উঠে বললো, 'মানে যা, তা-ই। ববের মুখে আমি সব শুনেছি। তুমি শালা আমার এখানে আসবে বলে বব গেছে তোমাকে আনতে, আর তুমি শালা এক খুবসুরৎ ছুকরির সঙ্গে কেটে পড়লে?'

বাধা দেবার চেষ্টা করেও বন্ধুকে থামাতে পারলাম না। তার কথা শেষ হবার আগেই জানি, ফুলকলির কানে কথাগুলো পৌঁছেছে। তবু আমি ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করবার ইশারা করলাম।

কে কাকে বলছে। বন্ধুটি কোলের ওপর থেকে বই বালিশ ছুঁড়ে নিচে লাফিয়ে নেমে বললো, 'তোমাকে আমি চিনি না? আমি শালা কোথায় আজ একটু সকাল-সকাল উঠলাম, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব, শুনি কী না, মেমসাহেবের সঙ্গে চলে গেছে। মেমসাহেব! শালা কোন্ ফুলটুসি মেমসাহেব তোমাকে রিসিভ করতে গেছল স্টেশনে?'

আমি আর পারলাম না। অ্যাটাচিটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে, বন্ধুর গলা জড়িয়ে মুখের ওপর হাত চাপা দিতে গেলাম। সে আমার হাত সরিয়ে, ড্রয়িংরুমের দিকে যেতে যেতে চিৎকার করে ডাকলো, 'নেত্য! এই ব্যাটা নেত্য!'

সব আমার হাতের বাইরে চলে গেল। শুনতে পেলাম নিত্যানন্দর স্বর, 'যাই স্যার।'

বন্ধু যেতে যেতে বললো, 'আসতে হবে না। তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসা। দাদাবাবুর খাবার তৈরি রেখেছিস?'

আমি স্থাণুর মতো বন্ধুর শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রায় মিনিট

খানেক চুপচাপ। তারপরেই আমি বন্ধুর স্বর শুনতে পেলাম, ইংরেজিতে কথা বলছে। নিশ্চয় ফুলকলিকে কিছু জিজ্ঞেস করছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই, বন্ধু তার লুঙ্গিটা কোমরের কাছে চেপে ধরে, ছুটতে ছুটতে শোবার ঘরে এলো, মুখে বিস্ময়, লজ্জা এবং উত্তেজনা। বললো, 'ওই মহিলা তোমার সঙ্গে এসেছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'শালা।' বন্ধু নিচু স্বরে বললো, 'বলবে তো? আমি এই বেশে গেছি, আর ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছি?'

বললাম, 'সে অবকাশ তুমি দিলে কোথায়? যে ভাবে চিৎকার করে, পাড়া মাথায় করতে লাগলে, সাধ্য কি তোমাকে কিছু বলি।'

বন্ধু লজ্জায় ও অনুশোচনায় ঘরের একদিকে ছিটকে গিয়ে বললো, 'ছি ছি ছি। আমি অবাক হয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করতে, তোমার কথা বললেন। ছি ছি ছি।' বলেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে, টুলের ওপর থেকে পানীয়ের গেলাস নিয়ে এক চুমুকে সব শেষ করে দিল।

সত্যি, বেচারি, কী-ই বা করে? লজ্জা আর অনুশোচনায়, ঝটিতি একটু সুরাপান করে নিল। তারপরে এসে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'এই মহিলাই তোমাকে স্টেশনে রিসিভ করতে গেছলেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

বন্ধু বললো, 'ববটা সত্যি অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছে। "এ বিউটিফুল ইয়ং লেডি, আই থিঙ্ক শী ইজ বেঙ্গলী।" একেবারে হুবহু। ছি ছি ছি, তুমি একবারটি বলবে তো।' বলেই, টুলের নিচে থেকে বোতল বের করে, গেলাসে পানীয় ঢাললো।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'করছোটা কী? আবার ঢাললে?'

বন্ধু বলে উঠলো, 'ওহ্, সরি, মনেই ছিল না।'

আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, 'বিপত্নীক প্রৌঢ়দের ওই রকমই হয়।'

বন্ধু আবার সব ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'হোয়াট ডু য়ু মীন বাই বিপত্নীক প্রৌঢ়? অ্যাম আই এ প্রৌঢ়?'

আমি হাত জোড় করে, মিনতির স্বরে বললাম, 'দোহাই, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আজই মাত্র চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে।'

বন্ধু তাড়াতাড়ি এক হাত জিভ বের করে, দু'কান মুলে বলল, 'ইস ছি ছি ছি, আমি আবার ভুল করলাম। কিন্তু তুমিই তার জন্য দায়ী।' বলে টুলের তলা থেকে, জলের বোতল নিয়ে, পানীয়ের মধ্যে মেশালো।

আমি বললাম, 'আবার ?'

বন্ধু বললো, 'খাব না। জল মিশিয়ে রাখলাম, তা নইলে উপে যায় কী না! কিন্তু এখন কি করা যায় বলো তো ?'

বললাম, 'কী আবার করবে ? আমি ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসছি। তুমি একটু ভদ্রস্থ হয়ে সেখানে এসো।'

বন্ধু জোড় হাত করে বললো, 'প্লিজ, একটু বাঁচিয়ে, মানে সবদিক সামলিয়ে নিও।'

আমি এ-কথার কোনো জবাব না দিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে গেলাম। আমার লজ্জা আর কিছু না। ফুলকলির নামে বন্ধু যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছে, সেগুলো যদি ওর কানে গিয়ে থাকে, তাহলে কী ভাবে নেবে, জানি না। আমার বন্ধুকে, আমি চিনি। তার কথাগুলো যা-ই শোনাক, জানি, তার মধ্যে কোনো ইতর ইঙ্গিত বা অপমান করার ইচ্ছা ছিল না। এক্ষেত্রে আমার জানার থেকে, ফুলকলির গ্রহণ করার ভঙ্গিটাই বড়ো। অন্যথায় ব্যাপারটা দাঁড়াবে, ডেকে নিয়ে এসে অপমান করার মতো।

আমি ড্রয়িংরুমের দরজার কাছে গিয়ে, ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ফুলকলি কোনো আসনে বসে নেই। আর একটু এগিয়ে, মুখ তুলতে গিয়ে চোখে পড়লো, ও জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, ডানদিকে দেখছে। অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে। ওর পাশ ফেরানো মুখের সামান্য অংশ দেখতে পাচ্ছি। আমি ওর দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, 'ফুলকলি।'

ফুলকলি চমকে তাকালো। চোখে চোখ পড়তেই মুখে একটু লজ্জার ছটা লেগে গেল। সামনে এগিয়ে এসে বললো, 'এখন যাবেন তো ?'

বললাম, 'যাব, একটু বোসো। আমার বন্ধু আসছে, একটু—।'

আমার কথার মাঝখানেই ফুলকলি চমকে উঠে শব্দ করলো, 'অ্যাঁ ?'

আমি হেসে বললাম, 'খুব ভয় পেয়ে গেলে, মনে হচ্ছে ?'

ফুলকলি নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে বললো, 'না, ভয় আর কী! উনি—মানে, আপনার বন্ধু বোধ হয় আমার ওপর খুব রেগে আছেন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'রেগে ? অবিশ্যি তোমাকে আগে বলা হয়নি, সে সময়ও পাওয়া যায়নি, আমার বন্ধুটি আদতে ভালো মানুষ, একটু হাঁক-ডাক করে কথা বলার অভ্যাস। আর বলতে পারো, কথাবার্তার রাশও একটু আলগা। যারা ওকে চেনে না, তারা অনেকে ওকে ভুল করতে পারে।'

ফুলকলি আমার মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাগুলো

শুনছিল। তথাপি, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, কেমন একটা সংশয় ওর দৃষ্টিকে ছুঁয়ে আছে। আমার কথার পরে, কিছু একটা বলবে ভেবেও, মুখ নামিয়ে নিল।

আমি বললাম, 'তুমি বোধ হয় আমার কথাগুলো, মন থেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলে না, না?'

ফুলকলি অবাক ও সংকুচিত হয়ে দ্রুত বলে উঠলো, 'না না, তা নয়, আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিনি। আমার কেমন মনে হলো, আপনার বন্ধু—আপনি না, আমি এসে পড়ায় বোধ হয় আনটাইম্‌লি ডিস্টার্বড্‌ হয়েছেন।'

ফুলকলির কথাগুলো এক মুহূর্তের জন্য ভাবিয়ে তুললো। মনে হলো, ওর কথার মধ্যে অন্য কোনো ইঙ্গিত আছে। যা ওর চোখের তারায়ও প্রতিবিম্বিত। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো, কথাটা আমার চিন্তায় হানলো, গন্ধ! আমার বন্ধুর সুরার গন্ধ ওর ঘ্রাণে গিয়েছে। অন্তত এ ক্ষেত্রে, মেয়েদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে একটু বেশি মাত্রায় তীব্র, আমার জানা আছে। তা ছাড়া, দু'হাতে লুঙ্গি চেপে, বন্ধুর প্রবেশের ভঙ্গিটি, যে কোনো অপরিচিত মহিলার পক্ষেই ভীতিজনক, তায় যদি তার সঙ্গে থাকে সুরার গন্ধ।

আমি হেসে বললাম, 'বুঝেছি। এই একটি ব্যাপার, ও শুরু করে এখন থেকে। সারাদিন কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝেই চলতে থাকবে, তারপর রাত্রে কখন যে থামে, কে জানে! হয়তো ও নিজেও জানে না।'

ফুলকলি অবাক স্বরে, চোখ বড়ো করে জিজ্ঞেস করলো, 'সারাদিন কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে চলবে? মানে উনি কি এখন কাজ করবেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, এখুনি বেরিয়ে যাবে। আর ওর কাজ চলে প্রায় রাত্রি দশটা অবধি। যারা ওকে একটা বিরাট দায়িত্বের কাজ দিয়ে রেখেছে, তারা জেনে শুনেই রেখেছে, কারণ ওখানে ও হচ্ছে যোগ্যতম ব্যক্তি। আর এই যে একটু হেঁকে ডেকে কথা বলা, বা কথাবার্তার রাশ একটু ঢিলে, সেটা ও ওর কর্মজীবন থেকেই আয়ত্ত করেছে। কিন্তু তার মানে এই না, আমি আমার বন্ধুর সুরা পানের ব্যাপারে তোমার সমর্থন আদায়ের কোনো চেষ্টা করছি। কেননা, ওটা আমি নিজেই সমর্থন করি না।'

ফুলকলি যেন বুকের ভিতর থেকে পুঞ্জীভূত উদ্বেগকে একটা নিশ্বাসের ঝটকায় বের করে দিয়ে উচ্চারণ করলো, 'ওহ্! করেন না?' বলতে বলতে ও ওর বুকের ওপর একটা হাত চেপে ধরলো।

আমি একটু হেসে বললাম, 'কী করে করব বল। যদিও ওকে আমার কথনো তেমন ফ্রাস্ট্রেটেড মনে হয় না, কিন্তু অভ্যাসটা প্রায় আত্মক্ষয়ী। অবিশ্যি অনেক দিনের পুরনো। তবে আর একটা কথাও তোমাকে বলে রাখি। ও মেয়েদের দেখলেই—।'

'দেখলেই ?' ফুলকলির যেন আবার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো।

বললাম, 'একেবারে বোকা বনে যায়, মানে, একেবারে গোবেচারা যাকে বলে।'

ফুলকলি একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, 'আশ্চর্য !'

বললাম, 'হ্যাঁ, আশ্চর্যের কোনো অভাব নেই সংসারে। অবিশ্যি, তা বলে আমার বন্ধুকে মেয়েদের সামনে খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু ভেবে বোসো না। একটু নিরীহ হয়ে পড়ে, আদতে ও যা নয়।'

ফুলকলি বললো, 'তবু শুনে ভালো লাগলো। আপনি তো বলছিলেন, উনি বিপত্নীক ?'

বললাম, 'হ্যাঁ। এ ক্ষেত্রে সেই প্রবাদটা মিথ্যে প্রমাণ হয়েছে। ওর ক্ষেত্রে বলতে হয়, দুর্ভাগার বউ মরে।'

ফুলকলির মুখে ছায়া ঘনিয়ে এলো, বললো, 'আমি আপনার মনে কোনো কষ্ট দিইনি তো ?'

বললাম, 'না। ওর বউয়ের কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসি, তা না হলে ও আসতে পারবে না। তুমি একটু বোসো, কেমন ?

ফুলকলি বললো, 'নিশ্চয়ই !'

বলতে বলতে ও ওর ব্যাগটা সোফা থেকে তুলে বসলো। আমি আবার ভিতরে গেলাম। দেখলাম বন্ধু অতি দ্রুত নিজেকে একেবারে ফুলসাহেব সাজিয়ে ফেলেছে। পুরো স্যুটেড্ বুটেড্ টাইয়ের নটটি পর্যন্ত নিঁখুত। আমি ঢুকতেই, সে তার কাঁচা-পাকা চুলে, শেষবারের মতো চিরুনি টেনে, আমার দিকে ফিরলো। অর্থাৎ, তার বাইরে যাবার পোশাকে সে সজ্জিত। আমার দিকে ফিরে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'সব ঠিক আছে ? কোনো গোলমাল নেই ?'

আমি মুখের একটু নির্বিকার ভাব করে বললাম, 'এসো।'

বন্ধু ঝটিতি গেলাস তুলে চুমুক দিয়ে, সুগন্ধি মাথানো রুমাল পকেট থেকে নিয়ে, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললো, 'মানে, এটুকু নষ্ট হয়ে যাবে কী না তাই—'

সে কথা শেষ করলো না। আমি বললাম, 'এসো।'

আসলে ইচ্ছা করছিল, তার কাঁচা পাকা চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দিই। আমার পিছনে পিছনে সে ড্রয়িংরুমে এলো, যেন বড়ই লজ্জিত এবং অসহায় ভাব নিয়ে। ফুলকলি উঠে দাঁড়ালো। আমি ওকে বললাম, 'তুমি বোসো। আমার বন্ধু পুরন্দর ভট্টাচার্য।'

পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মিস ঘোষ, ফুলকলি ঘোষ।'

পুরন্দর বলো উঠলো, 'চমৎকার।' বলেই, তাড়াতাড়ি মুখে রুমাল চাপা দিল। বিদেশী সুগন্ধীর গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে।

ফুলকলি বসতে বসতে আমার দিকে তাকালো। ফুলকলির চোখের তারায় হাসির ঝিলিক, যদিও মুখে গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা। পুরন্দরের মুখে রুমাল চাপা দেওয়ার ভঙ্গি দেখলে, হাসি পাওয়াই স্বাভাবিক।

পুরন্দর দাঁড়িয়ে ছিল আড়ষ্ট হয়ে। আমি বললাম, 'তোমার বাড়িতে কি তোমাকেও বসতে অনুরোধ করতে হবে নাকি?'

পুরন্দর মুখে রুমাল চাপা দেওয়া অবস্থায় গোঙানো স্বরে একটা কিছু বললো এবং তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে, দূরের একটি সিঙ্গল সোফায় বসলো। আমি ফুলকলির পাশের সোফায় বসলাম। পুরন্দরের দিকে তাকালাম। তার দৃষ্টি তখন ফুলকলির দিকে। কিন্তু মুখে সেই রুমাল চাপা। ফুলকলির দৃষ্টি আমার দিকে। সমস্ত ছবিটা এক দিকে যেমন আড়ষ্টজনক, তেমনি হাস্যকর। আমি পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দয়া করে মুখ থেকে রুমালটা নামাও। তোমার বাড়িতে একজন মহিলা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলো।'

পুরন্দর তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে রুমালটা নামিয়ে, ফুলকলির দিকে তাকিয়ে হাসলো। ফুলকলির হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে মুখ নামালো এবং ওর সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

পুরন্দর অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো, ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো ওঁর?'

ফুলকলি যে ওর হাসির বেগ সামলাতে পারছে না, তা জানি। সেটা সংক্রামিত হচ্ছিল আমার মধ্যেও। পুরন্দরকে বললাম, 'তুমিই জিজ্ঞেস করো না।'

পুরন্দর অবাক স্বরেই বললো, 'আমি জিজ্ঞেস করব?'

ফুলকলি এবার সশব্দে হেসে উঠলো, চাপা দেবার চেষ্টা করলো, হাতের ব্যাগটা মুখের কাছ ধরে।

আমি পুরন্দরের দিকে ফিরে বললাম, 'তা তুমি যদি ও ভাবে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে থাকো, তারপর হঠাৎ দন্ত বিকশিত করে হাসো, দেখলে হাসি পাবে না?'

ফুলকলি নিজেকে সামলে নিয়ে, সারা চোখে মুখে রক্তিম ছটা নিয়ে যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললো, 'মাফ করবেন, আমি ঠিক ইয়ে করতে পারিনি।'

পুরন্দর বললো, 'না না, মাফ চাইবার কী আছে, ও রকম বলবেন না। আমার আচরণটাই একটু ইয়ে, মানে—'

সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। আমি বললাম, 'মানে হাস্যকর।'

পুরন্দর হেসে উঠে বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হাস্যকর।' বলেই, সে ভ্রূকুটি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তার মানে?'

ফুলকলি এবার আর শব্দটাকে সামলাতে পারলো না, খিলখিল করে বেজে উঠলো। আমিও হেসে উঠলাম। পুরন্দর বলে উঠলো, 'শালা!' বলেই, থতিয়ে গিয়ে, কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টাই ধরে টানাটানি করতে লাগলো।

এই সময়ে নিত্যানন্দ ঢুকলো, চায়ের ট্রে নিয়ে। সেণ্টার টেবলে ট্রে রেখে সে চলে গেল। পুরন্দর তাড়াতাড়ি উঠে, নিজেই চা তৈরি করতে উদ্যত হলো। ফুলকলি একবার আমার দিকে তাকিয়ে পুরন্দরের দিকে ফিরে বললো, 'আপনি রাখুন আমি চা করছি।'

পুরন্দর বললো, 'না না, আপনি কেন করবেন। আমার বাড়িতে আমিই চা করছি।'

ফুলকলি আবার আমার দিকে তাকালো। আমি পুরন্দরকে বললাম, 'ছেড়ে দাও। যা করার অভ্যাস নেই, হঠাৎ তা করতে যাওয়ার দরকার কী? চা-ও নষ্ট হবে, নিজের হাত-টাতও পোড়াবে।'

পুরন্দর ভ্রূকুটি করে, ধমকের সুরে বললো, 'তার মানে কী? আমি কি চা করতে পারি না?'

আমি নির্বিকার ভাবেই বললাম, 'কোনোদিন দেখিনি কী না, তা-ই বলছি। তবে ফুলকলিকে নিজের হাতে চা করে খাওয়াবে বলে যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে থাকো, করো। কিছু বলবার নেই।'

পুরন্দর কী বলবে ভেবে পেল না। চকিতে একবার ফুলকলিকে দেখে নিয়ে, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'প্রতিজ্ঞা মানে? প্রতিজ্ঞা করব কেন?'

এবার ফুলকলি পুরন্দরকে বললো, 'ওঁর কথা আপনি ধরবেন না। আপনার বন্ধুকে নিশ্চয় আমার থেকে আপনি বেশি চেনেন!'

পুরন্দর বলে উঠলো, 'চিনি না মানে? মিট্‌মিটে ডান।' কথাটা বলেই, পুরন্দর থতিয়ে গিয়ে, ঝটিতি একবার জিভ কেটে বললো, 'মাফ করবেন মিস ঘোষ। মানে, আমি ঠিক—।'

'আপনি একটুও বেঠিক কিছু বলেননি।' ফুলকলি চকিতে একবার আমাকে চোখের কোণে দেখে নিয়ে, আবার বললো, 'আপনার বন্ধুকে আপনি যে রকম বলে থাকেন, সেই রকমই বলেছেন। আমার জন্য সংকোচ করবেন না, তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে। তবে, চা-টা আমাকে করতে দিলে আমি খুশি হবো।'

পুরন্দর সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।' বলে, সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। হাসির অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু ফুলকলির বচনে আমি একটু অবাক হলাম। ও বেশ সহজ হয়ে উঠেছে এবং পুরন্দরকে একটু উস্‌কে দেওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। প্রবণতাটা নিষ্পাপ এবং কিছুটা আবহাওয়াটাকে খুশির মেজাজে সহজ করার চেষ্টা। তবু আমি বললাম, 'তার মানে বলতে চাও, আমার বন্ধুর আমি শালা এবং আমি একটি মিট্‌মিটে ডান?'

ফুলকলির এখন বসার ভঙ্গিটি সুন্দর। সোফা ছেড়ে গালিচার ওপর হাঁটু পেতে শাড়ি ছড়িয়ে বসে, কাপে কাপে চা ঢালছে। সেই অবস্থাতেই, ও পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'পুরন্দরবাবু, আপনিই জবাব দিন, উনি আসলে আপনাকেই জিজ্ঞেস করেছেন।'

পুরন্দর ভ্রূকুটি করে বললো, 'তুমি আমার শালা হবে কেন? শালা তো আমি—ইয়ে মানে, এমনিই বলি।' বলেই ফুলকলির দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি বললো, 'মাফ করবেন মিস ঘোষ।'

ফুলকলি হেসে বললো, 'মাফ চাইবার এতে কিছুই নেই। আপনি বন্ধুর সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলুন, সেটাই আমি চাই। বলেছি তো, আমার জন্য সংকোচ করবেন না, তাহলে আমার খারাপ লাগবে।'

ফুলকলি ঠোঁট টিপে, হাসি চেপে, চা করতে লাগলো। পুরন্দর উৎসাহিত হয়ে বললো, 'আর মিট্‌মিটে ডান? তার চেয়েও যদি বেশি কিছু হয়, তুমি তা-ই। তুমি একটি ভিজে বেড়াল, ভাব করো যেন, ভাজা মাছটিও উল্‌টে খেতে জানো না।'

আমি ফুলকলির প্রতিক্রিয়া দেখছি। ভিতরের রুদ্ধ হাসির উচ্ছ্বাসে,

ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, চা তৈরি করতে গিয়ে হাতের অবস্থা ঠিক থাকছে না।

পুরন্দর ফুলকলির দিকে ফিরে বললো, 'তা নইলে আপনি ভাবতে পারেন মিস ঘোষ, ভি. টি. থেকে আমার এখানে আসবে বলে আগে থেকে ঠিকঠাক, অথচ আমার ড্রাইভারকে ফেরত পাঠিয়ে নিজে একটি ফুলকুমারীর সঙ্গে হাওয়া! আপনিই বলুন।'

এবার আমারই হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছা করলো। ফুলকলি তাড়াতাড়ি মুখ লাল করে বললো, 'পুরন্দরবাবু, ফুলকুমারী না, ভি. টি. থেকে আমিই ওকে নিয়ে গেছলাম, আমার নাম ফুলকলি।'

পুরন্দরও সমান অপ্রস্তুত এবং মুখ লাল করে বললো, 'এই দেখুন, একদম ভুল হয়ে গেছে, মানে—আপনিই যে তিনি—।'

পুরন্দর কথা শেষ করতে পারলো না। আমি বললাম, 'একেই বোধ হয় খেলায় সেম্‌সাইড বলে।'

ফুলকলি আগে পুরন্দরের দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আমার তা মনে হয় না। পুরন্দরবাবু বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন আপনার ওটাই বৈশিষ্ট্য। কখন কার সঙ্গে কোথায় চলে যাবেন, কোনো ঠিক নেই। তাই না পুরন্দরবাবু?'

পুরন্দর তৎক্ষণাৎ হেসে বললো, 'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আপনি। আমি ঠিক এটাই বলতে চেয়েছিলাম। তা না হলে, আপনি ভাবতে পারেন, এর আগেরবার যখন এল, তিনদিনের জন্য কোনো পাত্তাই ছিল না? আমার মতো লোক, ভেবে অস্থির। তারপর কে পৌঁছে দিয়ে গেল জানেন?'

আমি পুরন্দরের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললাম, 'পুরন্দর, ব্যাপারটা কী? তুমি হঠাৎ একেবারে এতটা উদার হয়ে উঠলে কেন?'

ফুলকলি বললো, 'আর বলবেন না পুরন্দরবাবু। অনেকটা বলে ফেলেছেন, কে পৌঁছে দিয়ে গেছলেন তাঁর নামটা আর বলবেন না।' বলে, ও আমার হাতে চায়ের কাপ তুলে দিল। দৃষ্টি বিনিময় হলো চকিতে।

পুরন্দর বললো, 'তা ঠিক।'

আমি বললাম, 'না তা ঠিক না। বন্ধুদের মাঝখানে কোনো কথা বলতে গিয়ে চুপ করে যাওয়া মোটেই ঠিক না। ফুলকলিও আমাদের বন্ধু, এটা নিশ্চয়ই বলা যায়?'

আমি ফুলকলির দিকে তাকালাম। ফুলকলি আমার দিকে না তাকিয়েই

বললো, 'সেটা আমার সৌভাগ্য, কিন্তু বন্ধুকে সব কথা বলার দরকার কী ?'

পুরন্দর হেসে উঠে বললো, 'ঠিক বলেছেন মিস ঘোষ। আপনার সঙ্গে ওর যা সম্পর্ক, সেটা কেবল বন্ধুত্ব না, তার বেশি কিছু, সেইজন্যই— ।'

ফুলকলি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'না না, বেশি কিছু কী আবার ?'

পুরন্দর হকচকিয়ে ভ্রূকুটি চোখে আমার দিকে তাকালো। তারপরে লজ্জিত হেসে গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, 'না মানে আমি সে রকম কিছু মীন্ করিনি। বন্ধু, হ্যাঁ, বন্ধুই তো। আমি তো তা-ই বলছিলাম।'

আমি আমার উচ্চহাসি রোধ করতে পারলাম না, যাকে বলে, হা হা করে হেসে উঠলাম।

ফুলকলির অবস্থা খুব খারাপ, ততোধিক পুরন্দরের। কিন্তু সে বলে উঠলো, 'হাসি শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়।'

ফুলকলি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'চমৎকার বলেছেন। আপনি সত্যি খুব সুন্দর কথা বলতে পারেন।'

পুরন্দর ফুলকলির দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমার হাসি আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। পুরন্দর ভ্রূকুটি করে বললো, 'ইচ্ছে করে শালার গলা টিপে দিই।'

ফুলকলি চমকে উঠে শব্দ করলো, 'অঁ্যা !'

পুরন্দর তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললো, 'না না, এমনি বললাম, মানে—কথার কথা আর কী! পাগলের মতো এ রকম হাসবার কোনো মানে হয় ?'

আমি হাসি থামিয়ে বললাম, 'যাক, এখন একটু কাজের কথা হোক। তোমার কি আজ কাজে বেরোতে হবে ?' বলে পুরন্দরের দিকে তাকালাম।

পুরন্দর হাতের ঘড়ি দেখে চমকে উঠে বললো, 'মাই গড, আয়াম্ অল্‌রেডি লেট! এক্সকিউজ মী মিস ঘোষ— ।' বলেই, সে গলা চড়িয়ে ডাকলো, 'নেত্য, নেত্য !'

নিত্যানন্দ পুরো হিরোর ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বললো, 'ইয়েস স্যার !'

পুরন্দর বললো, 'শোন আমি বেরুচ্ছি, এঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর। ঘরে কিছু আছে তো ?'

নিত্যানন্দ বললো, 'সবই আছে, এখুনি তৈরি হয়ে যাবে।'

ফুলকলি আমার দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। আমি পুরন্দরকে

বললাম, 'আমি এখন এখানে চান করে, জামা-কাপড় বদলে, ফুলকলিদের বাড়ি যাব, ওদের বাড়িতেই খাব।'

পুরন্দর বলে উঠলো, 'তার মানে ওখানেই থাকবে?'

তার স্বরে অসন্তুষ্টি গোপন থাকে না। আমি বললাম, 'না, থাকব না, রাত্রের দিকে ফিরে আসব। তুমি তো জানো, আমি একটা বিশেষ কাজে এসেছি এখানে, দু'দিনের কাজ।'

পুরন্দর বললো, 'জানি। তার মানে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'কে বললো দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না? তা ছাড়াও আমি কয়েকদিন এখানে থাকব।'

পুরন্দর বলে উঠলো, 'জানি, তারপরে তুমি দাক্ষিণাত্যে যাবে, চিঠিতে সেই রকমই লিখেছিলে।'

আমার সঙ্গে একবার ফুলকলির দৃষ্টি বিনিময় হলো, বললাম, 'সেই রকমই ইচ্ছা আছে।'

পুরন্দর বলে উঠলো, 'ঝেড়ে কাসো! অর্ধেক পেটে রেখে অর্ধেক মুখে বোলো না। এখানে যে ক'দিন থাকবে, সেটা কী রকম থাকা হবে?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আর ফুলকলিদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকব।'

পুরন্দর জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী রকম? এই মিলেমিশে থাকাটা?'

ফুলকলির স্থির অপলক দৃষ্টি আমার দিকে। আমি বললাম, 'মিলেমিশে থাকা মানে, ধরো, তোমার এখানেও রইলাম, ওদের ওখানেও রইলাম।'

পুরন্দর ফুলকলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কী মনে করেন? এটাকে মিলেমিশে থাকা বলে?'

ফুলকলি স্পষ্ট স্বরে বললো, 'এটাকে দু' নৌকোয় পা রাখা বলে।'

'গুড, ভেরি ওয়েল সেড্।' বলেই পুরন্দর ফুলকলির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল এবং তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, 'স্যরি।'

ফুলকলি বললো, 'স্যরি বলছেন কেন? আমি অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা নাকি? আপনার অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য ধন্যবাদ।' বলে ও পুরন্দরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

পুরন্দরই একটু অপ্রস্তুত বিব্রত ভাবে আলতো করে ফুলকলির হাত স্পর্শ করলো।

ফুলকলি বললো, 'সেইজন্য আমি বলছিলাম কী, আপনার বন্ধু যে ক'দিন ঘরেতে আছেন সে ক'দিন আপনিও আমাদের অতিথি হবেন।'

পুরন্দর বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বললো, 'আমি অতিথি আপনাদের? কিন্তু আমার যে একেবারে সময়ই নেই। আমার কোনো কিছুর ঠিক ঠিকানা নেই। কখন খাই, কখন শুই কিছু ঠিক নেই। কারো অতিথি হবার যোগ্যতাই আমার নেই।'

ফুলকলি আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'কথাটা অবিশ্যি একেবারে মিথ্যা না। আমি ওর এখানে এসে যখন থাকি, সকাল বেলার দিকে যা একটু দেখা হয়। একমাত্র রবিবার ছাড়া। রবিবার সারাদিন পাওয়া যায়। তবে পুরন্দর যদি ওর রুটিন একটু চেঞ্জ করে—।' আমি কথাটা শেষ না করে পুরন্দরের দিকে তাকালাম।

পুরন্দর জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী রকম?'

বললাম, 'এই ধরো, তুমি যদি অফিস থেকে বেরিয়ে ফুলকলিদের বাড়ি আসো।'

পুরন্দর বলে উঠলো, 'রাত্রে? অসম্ভব! রাত্রে কারো বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এ ভাবেই বা কত দিন চালাবে? রাত্রে দুটো তিনটেয় খাবে, শোবে, এ সব একটু ছাড়ো না।'

পুরন্দর ভ্রূকুটি চোখে আমার দিকে তাকালো এবং সম্ভবত কিছু ইশারা করারও চেষ্টা করলো। আমি না দেখতে পাওয়ার ভান করে বললাম, 'তোমার কোম্পানি অবিশ্যি, তোমার খুশি মতো কাজ মেনে নিয়েছে, কারণ তাদের কোনো লোকসান নেই। কিন্তু জীবনটা খুশিমত চালাবার জিনিস না। না হয় কয়েকদিন, একটু তাড়াতাড়ি খেলে শুলে। সেটাও তো একটা নতুনত্ব। একঘেয়ে, রোজ এক রকম কাটাতে কি ভালো লাগে?'

পুরন্দর এবার কটমট করে আমার দিকে তাকালো, এবং কিছু বলতে উদ্যত হতেই, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'যা বলবে, একটু রেখে ঢেকে বলো। আমি কিন্তু তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি না। ফুলকলি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছে, সেটা তোমার প্রত্যাখ্যান করা কি উচিত?'

পুরন্দর খানিকটা অসহায় ভাবে ফুলকলির দিকে তাকালো, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রত্যাখ্যান মানে রিফিউজ? না না, আমি রিফিউজ করব কেন? আসলে আমার রাত করাটাও কাজেরই ব্যাপার, অনেকের সঙ্গে আমাকে সময় কাটাতে হয়।'

ফুলকলি বললো, 'এক আধদিনও কি সেটা একটু তাড়াতাড়ি করা যায় না?'

পুরন্দর একবার আমাকে দেখে নিয়ে লজ্জিত ভাবে বললো, 'হ্যাঁ, না, মানে হয়তো করা যায়, কিন্তু আমি রাত্রে—মানে—ইয়ে—হয়তো আপনাদের বাড়ির গুরুজনেরা অসন্তুষ্ট হবেন।'

ফুলকলি জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালো। পুরন্দরের সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি। সে তার সুরাপানের কথাটা খোলাখুলি ব্যক্ত করতে পারছে না। আমি বললাম, 'এক-আধদিন না হয় একটু অল্প-সল্পর ওপর দিয়ে সারবে। একটু স্টেডি থেকে, গল্পগুজব করবে, তাতে ক্ষতি কী?'

আমি ফুলকলির দিকে তাকালাম। ও বললো, 'কিছুই না। গুরুজনের মধ্যে আছেন আমার মা। মা তেমন খুঁতখুঁতে নন। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।'

পুরন্দর হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'অসুবিধে আমার না, আপনাদেরই। পরেও নিশ্চয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে, একটা দিন ঠিক করে আমি যাব। আর আপনাকে বলা রইলো, আপনি যখন খুশি এখানে আসবেন কোনো সংকোচ করবেন না। আর এ যাত্রাটা—।' বলে পুরন্দর একবার আমার দিকে তাকালো, তারপরে বললো, 'বুঝলেন মিস ঘোষ, আমার এই বাউণ্ডুলের আশ্রয়ের থেকে, ওকে আপনাদের কাছেই রাখুন।'

ফুলকলি বলে উঠলো, 'এই অনুমতিটাই আপনার কাছে চাইছিলাম।' বলেই, ফুলকলি লজ্জিত হয়ে পড়লো এবং আবার বললো, 'কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ি আসছেন।'

আমি বললাম, 'পুরন্দর, তোমার এই সাজানো ফ্ল্যাট যদি বাউণ্ডুলের আস্তানা হয়, তাহলে বাবুর বাড়ি কাকে বলে জানি না।'

পুরন্দর ফুলকলির দিকে ফিরে বললো, 'মিস ঘোষ, আমি দেরি করতে পারছি না, আমাকে অনুমতি করুন, বেরোচ্ছি।'

পুরন্দরের বিনয় দেখে অবাক হচ্ছি। নিতান্ত মেয়ে বলেই তাকে এতটা কেতাদুরস্ত হতে হচ্ছে।

ফুলকলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'নিশ্চয়।'

পুরন্দর বাইরের দরজার দিকে পা বাড়িয়ে আমার দিকে ফিরে বললো, 'একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে।'

এ রকম ব্যাপার আমি খানিকটা অনুমান করেছিলাম। কিছু না বলে

ফুলকলির দিকে একবার দেখে, পুরন্দরের সঙ্গে ঘরের বাইরে এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সে প্রথমেই আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো, 'কোথা থেকে তুই এ সব জোটাস্ বল্ দেখি?'

অবাক হয়ে বললাম, 'জোটাব আবার কী, ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পত্রালাপ।'

পুরন্দর মুখটা বিকৃত করে বললো, 'তা শালা পত্রালাপই হোক আর প্রেমালাপই হোক, আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? তুমি জানো না, আমি কোথাও কারো বাড়ি যাই না? তুমি লেখক মানুষ, অনেক ন্যাকামো তোমার জানা আছে, আমি ও সব জানি না, পারিও না। আমাকে মজাবার কী দরকার ছিল?'

আমি নির্বিকার তুষ্ণীভাব ধারণ করলাম, কিছু বললাম না।

পুরন্দর এলিভেটরের বোতাম টিপে বললো, 'বেশ তো রূপসীটি পেয়েছ, বিদুষীও বটে। আমার এই ফ্ল্যাটটা তো ছিল, আবার ওদের বাড়ি কেন? ওকে নিয়ে এখানে কাটালেই তো পারতে?'

আমি বললাম, 'ছি ছি, কী যা তা বলছো? ওর বিষয়ে কিছু না জেনেই, যা-তা বোলো না।'

এলিভেটর উঠতে আরম্ভ করেছে। পুরন্দর বললো, 'হতে পারি বিপত্নীক, তা বলে কি মেয়েদের চোখের চাউনি-টাউনি দেখে, কিছুই বুঝি না? ওকে দেখে তো মনে হচ্ছে, গলায় লটকাতে পারলেই হয়।'

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, 'আহ্ পুরন্দর।'

'চোপ শালা। তোমাকে চিনি না?' পুরন্দর এলিভেটরে উঠতে উঠতে বললো, 'মেয়েটা ভালো, তা আমি জানি। মরেছে রাই কিসের জন্য তাও কি বুঝি না? শালা কালকূট।'

আমি বাধ্য হয়ে পুরন্দরের সঙ্গে এলিভেটরে ঢুকে পড়লাম। এলিভেটর নামতে লাগলো পুরন্দর অবাক হয়ে বললো, 'কোথায় চললে?'

বললাম, 'পুরন্দর, তোমার কথাবার্তা খুবই আপত্তিকর। আমি ফুলকলিকে এখান থেকেই বিদায় করে দিচ্ছি।'

পুরন্দর হাসলো, আমার কাঁধে একটা হাত রাখলো, বললো, 'ও মেয়েটি তোমার ভক্ত পাঠিকা হতে পারে, কিন্তু ওকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। তোমার কাছে আমার একটি নিবেদন, ওকে দুঃখ দিও না।'

এলিভেটর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে থামলো। পুরন্দর বোতাম টিপে ধরে

এক মুহূর্ত দাঁড়ালো, আবার বললো, 'আমার কথার ধরন-ধারণ তুমি ভালোই জানো, কী বলতে চেয়েছি, তাও তুমি ঠিকই বোঝ। মনে রেখ, ও আমার কাছ থেকে তোমাকে নিতে এসেছে, মানে চাইতে এসেছে। যাও। আবার বলছি, ওকে দুঃখ দিও না।' বলেই পুরন্দর এলিভেটরের বাইরে গিয়ে, দুটো গেটই আটকে দিল। চকিতের জন্য মনে হলো, পুরন্দরের চোখ দুটো যেন ছলছলিয়ে উঠেছে। আমার বোতাম টেপার আগেই এলিভেটরের ওপরে উঠতে লাগলো। পুরন্দরের জীবনের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। জীবনের একটা বেগে আমরা সবাই ছুটে চলেছি, নানা ভাবে, নানা দিকে।

আপাত দৃষ্টিতে পুরন্দরকে মনে হয়, তার সারা দিনের জীবনটার মধ্যে, মানুষের বৈষয়িক বুদ্ধির সঙ্গে নানা সংগ্রাম করা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা না। মানুষকে দেখবার এবং বোঝবার দৃষ্টি আর অনুভূতিও ওর আছে। সেটা কারোকে জানতে বা বুঝতে দিতে চায় না। সম্ভবত ব্যথিতের জীবনের চেহারা এই রকমই হয়। ফুলকলিও কি পুরন্দরের মতোই একজন ব্যথিত? অন্যথায় তার মধ্যে এ বেদনা কিসের?

এলিভেটর থামতেই, নামতে গিয়ে দেখলাম, দুইতলা বেশি ওপরে উঠে এসেছি। এক মহিলা দরজা খুলে, দুটি শিশুকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। আমি আগে পাঁচ নম্বরের বোতাম টিপলাম। যথাস্থানে নেমে, এলিভেটর থেকে বেরিয়ে পুরন্দরের ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম, খোলা দরজার সামনে ফুলকলি দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, দরজায় দাঁড়িয়ে কেন?'

ফুলকলি বললো, 'ব্যাপারটা আমিই জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। কোথায় গেছলেন, নিচে নাকি?'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ নিচে। মানে, লিফ্‌টে নামতে নামতে কথা বলছিলাম।'

ফুলকলি দরজা থেকে সরে গিয়ে আমাকে ঢোকবার জায়গা দিল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে, আমার পিছনে আসতে আসতে বললো, 'আপনাদের বন্ধুত্বের যা নমুনা দেখলাম, ভাবলাম, আমার কথা ভুলে হয়তো দুই বন্ধু কোথাও চলেই গেলেন।'

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের বন্ধুত্বের নমুনাটা কি এতটাই আত্মভোলা বলে মনে হলো?'

ফুলকলি হেসে বললো, 'প্রায়। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না, এবার চান করে আসুন দয়া করে।'

আমি বললাম, 'অবিশ্যিই। তার আগে একটু শুনি, কেমন লাগলো আমার বন্ধুকে ?'

ফুলকলি বললো, 'প্রথম দর্শনে যতোটা ভয় পেয়েছিলাম, দ্বিতীয় দর্শনে ততোটাই সাহস পেয়েছি।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'তা তো দেখতেই পেলাম। দু'জনে এককাট্টা হয়ে আমার পেছনে লেগে গেলে।'

ফুলকলি বললো, 'কিন্তু উনি তাতেও অনেক সেমসাইড করে ফেলছিলেন।' বলে ও খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আমি বললাম, 'ওটা তোমারই গুণে।'

ফুলকলি ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রকম ?'

বললাম, 'অত্যুৎসাহে। তোমাকে আগেই বলেছিলাম, মেয়েদের সামনে ও একটু গোবেচারা হয়ে যায়। আর তা হলেই, মানুষের মস্তিষ্কের ভারসাম্য কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক হয়ে যায়।'

ফুলকলি বললো, 'তাহলে সেটা আমার গুণ বলবেন না, বলুন দোষ। কিন্তু আপনার বন্ধুকে আমার একেবারও গোবেচারা বলে মনে হয়নি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী মনে হলো, বলোতো ?'

ফুলকলি একটু ভেবে বললো, 'মনে হবার মতো আর দেখলাম কোথায় ? তবে একটা ব্যাপার বুঝেছি, উনি একদিকে ভীষণ কাজের মানুষ, আর একদিকে ঠিক অতটাই যেন অগোছালো। আপনাকে খুব ভালোবাসেন।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'আমাকে ভালোবাসাটা কোনো বৈশিষ্ট্য না। তুমি অনেকটাই ঠিক বলেছ, কিন্তু তোমার চোখে যেটা ফাঁকি যাওয়া উচিত ছিল না, সেটা হলো, আমার বন্ধু একটি দুঃখী মানুষ।'

ফুলকলি এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হলো, তারপরে বললো, 'কালকুটের সামনে আমি আর কতটুকু বলতে পারি ? সংসারে তো দুঃখী মানুষের সংখ্যাই বেশি, তাই না ?'

আমি ভিতরে যেতে যেতে বললাম, 'জবাব তো তোমার জানাই আছে।'

পৌঁছুবার দিনটা কাটলো যেন একটা উৎসবের মধ্যে। একটি পারিবারিক উৎসব, যার মধ্যে অনেক হাসি ঠাট্টা এবং যাকে বলে, খুনসুটি ঝগড়া, বিশেষ

করে কৃষ্ণকলি আর ফুলকলির মধ্যে যদিও সেই ঝগড়াও ছিল, হাসি ও কৌতুকে ভরা। ওদের মায়ের মুখ ভরা ছিল স্নিগ্ধ হাসির কিরণে।

তারপরে দুটো দিন, আমি নিজে ছিলাম, বিশেষ কাজে ব্যস্ত, সংসারের মানুষ যার নাম দিয়েছে তিক্ত বাস্তবতা মানুষের জীবনের বাস্তবতা, সেটাই সবখানি না এবং সে ক্ষেত্রে বাস্তবের স্বরূপ বিষয়েও আমার ধারণা ভিন্ন। জীবনের বাস্তবতার নানা দিক আছে। আমার ব্যস্ততাও, বাস্তবের একটা দিক মাত্র। অনেক তর্ক বিতর্ক সংশয় অবিশ্বাস, নিয়ম-নীতি আইন ঘাটাঘাঁটি করে শেষদিকে স্বস্তি-হাসির মধ্যে কাজ সমাধা হয়েছে।

কিন্তু যেটা কখনই অলক্ষ্যে রাখা সম্ভব হলো না, সেটা হলো ফুলকলির নিয়ত সঙ্গ। নিজের কাজের কথা ওর মনেই পড়লো না, আমার কাজের সময়টাও ও আমার সঙ্গেই কাটিয়েছে; কারোকে আমার কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি, মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেছি। কিন্তু ওকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। জবাব ছিল ওর একটাই, কালকূটও তো কাজ থেকে ছুটি নিয়ে অকাজেই বেশি থাকতে চায়। আমি সারা জীবন ধরে কেবল কাজ আর কর্তব্যই করে এসেছি। অকাজের স্বাদটা আমারও পেতে ইচ্ছে করছে, ক'দিনের জন্যই বা?

তা ঠিক, তথাপি নিজের কাছে, একান্তে একটা কথা কবুল না করেও পারছি না। যে আশ্রয়টাকে আমি পাখির বাসা নাম দিয়েছি, তার উষ্ণ কোমলতা আমি উপভোগ করছি, একটা ব্যথা ছোঁয়ানো সুখের মধ্যেই। কিন্তু একটা পাখি ক্রমাগত আমার ঘর-বিবাগী প্রাণের একটা দিক জুড়ে তার নরম পাখা বিস্তার করে চলেছে। তার চোখের দিকে তাকালে, আমার নিজের ভিতরটাই কেঁপে যায়। কোথায় একটা কষ্ট বিঁধে যায়, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিই। পাখিটা তার নিজের প্রাণে মনে যেমন সহজ আর রঙীন হয়ে ওঠে, আমার কাছে সেটাই অসহজ, আর রঙের ঝলকটাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। পেরে উঠি না সব সময়ে, অতিমানব হবার মন্ত্রটা কোনোকালে আয়ত্ত করতে পারিনি।

অতিকথন অনাবশ্যক, পাখিটার নাম ফুলকলি। পূর্ব শর্তানুযায়ী, ওকে আমি কলি বলে সম্বোধন করি, অনেক আগে, চোখে না দেখেই, চিঠির ভাষণে। এ সব কথা বলা যাবে না, যা চিঠিতে লেখালেখি বলাবলি হয়েছে, এখন তার থেকে নতুন কিছু ঘটছে। কিন্তু যা ছিল চিঠির ভাষার আদান প্রদানে, এখন সেই পত্রের লেখক-লেখিকারা পরস্পরের মুখোমুখি। যে সব কথা অনায়াসে লেখা গিয়েছিল, সে কথাগুলোই সামনাসামনি বলতে গিয়ে,

দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে, তার অর্থ যেন বদলে যাচ্ছে। হাসিতে বদলে যাচ্ছে তার রঙ। স্বরের মধ্যে সুর মিশে গিয়ে, তা শোনাচ্ছে অন্য এক গানের মতো। চিঠির যে কথায় বাষ্পের সংকেত ছিল, এখন তা চোখের কোণে টলটলিয়ে উঠছে।

আমার এবারের যাত্রাটা, জেসমিনের রক্তের দাগে দাগানো। পথ চলায়, সেটাও যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত অনভিপ্রেত ছিল, আপাতত ফুলকলির এই আত্ম-প্রকাশও তাই। পূর্ব চিন্তানুযায়ী পুরন্দরের ঘরে আমার বাস করা সম্ভব হয়নি। অধিক রাত্রে ফুলকলি যখন বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে, তার অশেষ কথা বুকে নিয়ে, তখন দেখেছি, দূরের অন্ধকারে মায়ের বুকে মেয়ে পাতা পেতে রয়েছে। পক্ষিণী মায়ের দৃষ্টি যেমন সজাগ, তেমনি কন্যার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের জানাজানিটাও স্পষ্ট।

ইতিমধ্যে পুরন্দর এক রাত্রে, ফুলকলিদের বাড়ি এসেছিল। মেজাজ তার বেশ প্রসন্নই ছিল। মাত্রাতিরিক্ত না হলেও, সে পান করে এসেছিল। কোটের পকেটে এনেছিল পানীয়র বোতল। ইচ্ছাটা, সম্মতি সাপেক্ষে অধিকন্তু ন দোষায়। সম্মতি সে পেয়েছিল, আসর জমিয়েছিল কৃষ্ণকলিও। পুরন্দরের পানীয় সে নিজের পাত্রে নিয়ে, কিঞ্চিৎ পান করে শাসানি বকুনি এবং হাসাহাসির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। রান্নাঘরে মায়ের কাছে ছুটি পেতে দেরি হয়েছিল কুন্দকলির।

কুন্দকলির পক্ষে, সেই আসর ছিল কিছুটা দ্বিধা ও সংকোচের। সেটা কাটিয়ে উঠে ও গান ধরেছিল, অবিশ্যি ওর দিদিদের অনুরোধ আর নির্দেশেই। কুন্দকলি যে এমন গান গাইতে পারে, ক'দিনের মধ্যে, একবারও জানতে পারিনি। গান শুনে মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের থেকে অতুলপ্রসাদেই ওর দখল বেশি। কিন্তু দ্রব্যগুণে কী না জানি না, কুন্দকলির গানের এক সময়ে দেখা গিয়েছিল, পুরন্দর চোখের জলে ভাসছে। ওর বাইরের পরিচয়টা ডাকসাইটে মিঃ ভট্টাচারিয়া। কে জানতো, পাথর চিড় খায়, আর তার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে জলের ধারা। অবিশ্যি পুরন্দর দ্রুত নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছিল। তবু আর যেমন তার স্বতস্ফূর্ত ভাবটি দেখা যায়নি, তেমনি আসরটাও কেমন যেন ভিজে উঠেছিল। পুরন্দর রাত্রে বিদায় নেবার সময় আমাকে আলাদা পেয়ে বলেছিল, 'শালা, তোমার সঙ্গে জীবনে আমার এই শেষ। যত আজেবাজে জায়গায় নিয়ে এসে মেজাজ খারাপ করিয়ে দেওয়া।...'

হেসেছিলাম। সেটাকে কি হাসি বলে, জানি না।

অতঃপর বম্বে থেকে বিদায়ের পালা। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বলতে আমি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের কথা কখনই ভাবিনি। উদ্দেশ্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদের নিদর্শন, অজন্তার গুহাচিত্র আর ইলোরার ভাস্কর্য দর্শন। প্রত্যাবর্তনের পথটাও মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি। ঔরঙ্গাবাদ থেকে পুনরায় বম্বে না, নিচের দিকে, হায়দ্রাবাদ হয়ে, ভিন্ন কূলের বঙ্গোপসাগরের বাতাস গায়ে মাখতে মাখতে কলকাতা।

পথের কথা ভেবে রেখেছিলাম, পথের বাঁকের কথাটা মনে রাখিনি। সেটা জানা গেল যাত্রার প্রায় পূর্বমুহূর্তে বলা যায়। যাত্রার আগের দিন ভরদুপুরে ফুলকলি ঘরের নিরালায় ঘোষণা করলো, 'আপনার বোঝা হয়ে যাব না, একসঙ্গে অজন্তা ইলোরা দেখব। আমার আয়োজন হয়ে গেছে, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?'

প্রথমটা ঠেক খেলাম, যেন কথাগুলোর ঠিক অর্থ বুঝে উঠতে পারলাম না। ফুলকলি আবার বললো, 'এত কাছে থাকতেও কোনোদিন যাইনি, এবার আর থাকতে পারলাম না। খুবই অসুবিধে হবে না তো?'

আমি ফুলকলির দিকে তাকালাম। ও তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। কিন্তু চোখ নামিয়ে নিল এমন ভাবে যেন, ও একটি যুগপৎ লজ্জিত ও অপরাধী মেয়ে। অতঃপরেও আমার বোঝার কিছু বাকী ছিল না। কিন্তু যে আকর্ষণের টানে যাচ্ছিলাম, ওর মধ্যে একটি মগ্নভাবনার বিষয় ছিল, যার অংশীদার কারোকে করতে চাইনি। এই না চাওয়াকে কেউ কেউ স্বার্থপরতা মনে করতে পারে। সে রকম কোনো স্বার্থপর চিন্তা আমার মধ্যে ছিল না।

ফুলকলি কোনো জবাব না পেয়ে, আবার চোখ তুলে তাকালো। এখন আর ওর চোখে লজ্জা বা অপরাধের ছায়া নেই, একটি ব্যগ্র করুণ আবেগ ফুটে উঠেছে। তথাপি ও বললো, 'মনটা খারাপ করে দিলাম না?'

আমি বললাম, 'না। তার চেয়ে বেশি তুমি আমাকে উদ্বিগ্ন করেছ।'

ফুলকলির চোখে জিজ্ঞাসা, কিন্তু স্পষ্ট না, এবং অস্ফুটে জিজ্ঞেস করলো, 'উদ্বিগ্ন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, উদ্বেগটা তোমার জন্যই।'

ফুলকলি তাকিয়ে ছিল আমার চোখের দিকেই। হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকলো। ওকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না, শ্বাসরুদ্ধ করে ও নিজেকে

সামলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারলো না, ওর বুক ফুলে উঠলো, তারপরে হাত ঢাকা মুখ নত হয়ে পড়লো। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপরে ওর মাথায় একটা হাত রাখলাম। ওর কান্নাটা আর চাপা থাকলো না।

কোনো রকমে হাত ঢাকা অবস্থাতেই উচ্চারণ করলো, 'থাক, যাব না।'

আমি বললাম, 'আমাকে ভুল বুঝো না।'

ফুলকলি জলভরা আরক্ত চোখ থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে অনায়াসে তাকালো এবং এই প্রথম সম্বোধনের পরিবর্তন করে বললো, 'ভুল বুঝব তোমাকে ? তা বুঝলে, অনেক আগে থেকেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতাম না। একটা সত্যি কথা বলবে ?'

আমি জবাব না দিয়ে ওর ভেজা আরক্ত চোখের দিকে তাকালাম।

ও বললো, 'যখন থেকে আমার চিঠি পেয়েছ, তখন থেকেই তো তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলে, সত্যি না ?'

এ রকম একটা নির্মম সত্যি কথা শোনার প্রত্যাশা ছিল না, খানিকটা বিস্মিত আবেগেই ওর নাম ধরে ডেকে উঠলাম, 'কলি !'

ফুলকলি বললো, 'আমাকে দেখার পর থেকে আরো উদ্বিগ্ন হয়েছ। উদ্বিগ্ন তুমি আজ এখুনি হওনি, এই যাবার আগের দিনটিতে।'

প্রবাদ আছে, নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কিন্তু সেই প্রবাদের বিপরীত হলো, একবার যদি মুখ ফোটে, তবে তার থেকে কঠিন ও বেদনাভরা সত্যি আর কিছু থাকে না। আজ এখন, ফুলকলির মুখ খুলেছে। ওর একটি কথাও মিথ্যা না। আমি নির্দ্বিধায় ওর একটি হাত ধরে বললাম, 'কলি, তুমি সত্যি বলেছ। আমার উদ্বেগ তোমাকে কি দুঃখ দিয়েছে, বা ছোট করেছে ?'

ফুলকলি জবাব দিতে গিয়েও পারলো না, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বারে বারে মাথা নাড়লো। আমার হাতটাই ওর দু'হাতে চেপে ধরে অস্ফুটে বললো, 'না না, আমি জানি কার জন্য তোমার মনে উদ্বেগ আসে। আমার সৌভাগ্য…।' কথা শেষ না করে ওর মাথাটা নেমে এলো, প্রায় আমার পায়ের কাছে। দু'হাতে ধরা আমার একটি হাত পাখির কোমল বুকে, হৃদপিণ্ডের ধুকধুকি সঞ্চারিত হচ্ছে আমার স্নায়ুতে। ওকে তোলবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নত হয়ে রইলো, শরীরের কম্পনকে রোধ করতে পারলো না।

জীবনের কতকগুলো মুহূর্ত আছে, মনের কতকগুলো অবস্থা, যখন কোনো-

রকমেই তার ওপর জোর চলে না, বাধা দেওয়া যায় না। ফুলকলির এখন সেই অবস্থা। আমি ওকে আর তোলবার চেষ্টা না করে স্থির হয়ে বসে রইলাম।

বাইরে তখন আরব সাগরের বাতাস, দ্বিপ্রহরের রোদকেও যেন কাঁপাতে চাইছে। নারকেল গাছের পাতার ঝাপটা কানে শুনতে পাচ্ছি। ফুলকলি ওর শেষ মুহূর্তের কথায়, আমাকে একেবারে নীরব করিয়ে দিয়েছে। ওর মনের গভীরতা বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এ গভীরতার পরিচয়টা নতুন। বুঝতে পারছি আমার অনেক আগে, আমার মনের সঙ্গে ওর একটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে।

ফুলকলি অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললো। দু'হাতে ধরা আমার হাতটা একবার দেখলো। ছেড়ে দিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে একটু হাসবার চেষ্টা করলো, বললো, 'আমি বলেই তোমার উদ্বেগ চলে যাবে না। কিন্তু যা সত্যি, তা কেমন করে মিথ্যা করব। সে ক্ষমতা আমার নেই।'

এমন অনায়াসে কোনো মেয়ে তার জীবনের একটি পরম সত্যকে প্রকাশ করতে পারলে সেখানে কোনো কথা বলা চলে না। তাই অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে।

ফুলকলি আবার বললো, 'বিষপান অনেক করেছ, এই দায়টুকু তোমার, আর কিছু না। তোমার মনের দরজা খোলা, পথও খোলা। দুঃখ আমার থাকবে না তা বলি না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানো, তার মধ্যে একটু সুখের ভাগও আছে। তা শুধু আমারই। তোমাকে ছোট করা আমার মহাপাপ, তা কখনো করিনি, করবও না। আর দুঃখ? তুমি তো জাদুকর, ও মূলধনটাকে কেমন করে কাজে লাগাতে হয়, আমার থেকে তুমি অনেক বেশি ভালো জানো। তবে আমি নিতান্ত মেয়ে তো তা-ই বলব, একটু মনে রেখ।'

কথা শেষ করতে গিয়ে ওর ঠোঁট কাঁপলো না, চোখ ভেসে গেল। জানতাম ফুলকলির আজ মুখ ফুটছে, এখন আমার শোনার সময়। তথাপি ভয় হয়, আমার চোখ দুটোও না ভেসে যায়।

ফুলকলি আবার বললো, 'ভয় নেই গো, আমি তোমার সঙ্গে অজন্তায় যাব না। একটু হাসো তোমার মতো করে।'

না হাসলে হয়তো অন্য কিছু করতে হয়, তাই হাসলাম।

ফুলকলিও হাসলো, বললো গানের কলিতে, 'না দেখা ছিল যে ভালো....।'

আমি আগের কলিটি বললাম, 'সে কেন দেখা দিল রে!' বুঝলে কলি, এখন বুঝতে পারছি তুমি সঙ্গে না গেলে আমার অজন্তা দেখা ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

ফুলকলি ভ্রূকুটি বিস্ময়ে ঘাড় তুলে বললো, 'কেন ?'

পরমুহূর্তেই জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'না না না, তুমি আমাকে আর যেতে বোলো না।'

আমি বললাম, 'কারণ তুমি না গেলে আমার সেখানে প্রবেশ নিষেধ।'

ও জিজ্ঞেস করলো, 'কে এই ফরমান জারি করলো ?'

বললাম, 'কালকূটের বিষের ভ্রূকুটি। আমাকে একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত কোরো না। আমি সব বুঝি, এমন অহংকার আমার নেই।'

ফুলকলি আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো, তারপরে হঠাৎ বললো, 'তোমাকে একটা অভিসম্পাত দেব ?'

বললাম, 'দাও !'

ফুলকলি চোখ বুজে বললো, 'পরের জন্মেও তুমি এই রূপেই এস।'

আমার বুকের মধ্যে একটা বিদ্যুতের কশাঘাত হেনে গেল। কারণ, আমি জানি, এ আমার প্রতি অভিসম্পাত না। ফুলকলি ওর জীবনের দুঃখকে পরের জন্মেও ফিরে পেতে চাইছে। জানি না, পরজন্ম বলে কিছু আছে কী না। বললাম, 'বেশ, আবার যদি ইচ্ছা করো, আবার আসি ফিরে।' ফুলকলি আমার হাত টেনে, নিজের মুখ ঢাকা দিল।

রাত্রে ফুলকলিকে বললাম, আমার পাগলা বন্ধু পুরন্দরকে সঙ্গে ডাকলে কেমন হয় ? ও জানালো, ওর কোনো অসুবিধে নেই, কারণ, লুকিয়ে ফেরার দায় ও ত্যাগ করেছে। তাই দু'জনেই হানা দিলাম, পুরন্দরের অফিসে। বাধ্য হয়ে পুরন্দরকে কাজের ব্যস্ততা ছেড়ে আমাদের দিকে মনোযোগ দিতে হলো। তারপরে প্রস্তাব শুনেই, লাফিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ইমপসিবল্ !'

পুরন্দরের চোখ মুখ দেখে মনে হলো, আমার থেকে পরম শত্রু ওর কেউ নেই। এমন কি, সে ফুলকলির উপস্থিতিও যেন ভুলে গেল। আমার প্রতিটি কথার প্রতিবাদে এমন হাঁক-ডাক চিৎকার করলো, যেন ওকে আমি হাতে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করতে এসেছি। চলে আসা ছাড়া উপায় রইলো না।

পরের দিন সকালে পুরন্দরের কাছ থেকে যখন বিদায় নিতে গেলাম, দেখলাম, কেমন তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করে আছে। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলো, 'অজন্তা কি ট্রেনে করে যাচ্ছো ?'

বললাম, 'ফুলকলির ইচ্ছে, ওর গাড়ি নিয়ে যায়। মন্দ না, নতুন অভিজ্ঞতা। একটা মেয়ে গাড়ি চালাবে, গল্প করতে করতে যাব।'

পুরন্দর শান্ত ভাবেই বললো, 'নতুন অভিজ্ঞতাটাই তোমার লাভ। তবে ফুলকলির গাড়িটা দূরের রাস্তায় তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয় বোধ হয়। আমার গাড়িটাই নিয়ে যাব ভাবছি।'

আমি প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মতো করে বললাম, 'তুমি যাবে?'

পুরন্দর সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললো, 'অবিশ্যি গাড়িটা আমিই চালাব। সামনে পাশাপাশি তিনজন বসা যাবে। কখন বেরোবে ঠিক করেছ?'

আমি তখনো বিস্ময়ের ঝলক কাটিয়ে উঠতে পারিনি, বললাম, 'যাত্রার জন্য তৈরি হয়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

পুরন্দর বললো, 'আমার তৈরি হতে আধ ঘণ্টা। এর মধ্যে তুমি ববকে নিয়ে ফুলকলির বাড়ি চলে যাও। মালপত্র সব আমার গাড়িতে তুলে, ফুলকলিকে নিয়ে চলে এসো।'

তারপরে আমার বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, ধমক দিয়ে বললো, 'কী হলো তোমার শালা!'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিছু না, যাচ্ছি।'

ফুলকলিদের বাড়ি যেতে যেতে, মনে মনে হাসলাম অনেক, কিন্তু নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হতে লাগলো।

ফুলকলি শুনে প্রথমটা খুব হাসলো। তারপরে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললো, 'পুরন্দরবাবু মানুষটি খুবই সরল।'

আমি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও কাছ থেকে চলে যেতে যেতে বললো, 'দেখি আবার নতুন করে আয়োজন করি।'

জীবনের সব প্রতিশ্রুতি পালন করতে পেরেছি, এ কথা কখনোই বলা যাবে না। তবু ফুলকলির মা এবং ভগ্নিদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম, আবার আসব। কুন্দকলিটা ছেলেমানুষের মতো কেঁদে, প্রায় আমাকেও ভাসিয়ে দিল।

যাত্রাটা শুভই বলতে হবে। কিন্তু একটু অসময়ে হলো, কারণ ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছুতেই দিন কাবার।

অজন্তা দর্শন, কেবল শিল্পের বিস্ময় না, বিস্ময় সময়ের, যে সময়টাকে কল্পনার অনুভূতি দিয়েও স্পর্শ করা যায় না। পদ্ধতি বা কারুমিতির সে সব আলোচনা-বিলোচনার সময়ও এটা না, বা আমি তার অধিকারীও নই। অধিকার বর্জিত যে মুগ্ধতা, যা প্রকৃতির মতো অমোঘ এবং অনিবার্য, তা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। ইলোরার অপরূপ ভাস্কর্য, যা অনেকটা অকপটে ধরা দেবার একটা মরীচিকা সৃষ্টি করে রেখেছে অথচ একেবারে অন্ধকারে ফেলে রাখে না, অজন্তার গুহাচিত্র, সেই অন্ধকারেই জিজ্ঞাসায় জেগে থাকে। গুহার অন্ধকারে, আলোর উদ্ভাবনের পদ্ধতিটা কী ছিল? জবাব অনেক আছে, মন তৃপ্ত হতে চায় না। আর প্রাণের ব্যাকুলতা যেটা, তা হলো, সেই সব শিল্পীরা কোথায়? তাঁরা কি সত্যি আমাদের মতো মানুষই ছিলেন, নাকি তাঁরা চিরকালের মায়াবী রূপকার?

পাহাড়ে গুহায় ফুলকলির দিকে যতোবারই তাকিয়েছি, দেখেছি, তন্ময়, অন্যমনস্ক। পুরন্দরকে মনে হয়েছে, ও যেন নিশির ঘোরে আচ্ছন্ন।

তথাপি এক সময় বিদায়ের ক্ষণ এল। আমি বুঝতে পারছিলাম, ক্ষণটি অতি কঠিন ও নির্মম। ঔরঙ্গাবাদের হোটেলের ঘরে ফুলকলিকে আমার গুহাচিত্রের মূর্তি বলেই মনে হয়েছে। কথা ওর শেষ হয়েছিল, দৃষ্টিতে চঞ্চল ব্যাকুলতাও ছিল না। বিদায়ের আগের দিন রাত্রে, পুরন্দরের সামনেই বললো, 'তোমার সঙ্গে এ দেখা হাওয়াটা দৈব বলে জানব। পত্রালাপটা রেখ।'

আমি হেসে বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

দেখলাম, সিগারেট ধরাতে গিয়ে, পুরন্দরের লাইটার জ্বালানো হাত কাঁপছে। বললো, 'বড় বাতাস এখানে।' বলে, উঠে চলে গেল।

সকালবেলা ঔরঙ্গাবাদ স্টেশনে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফুলকলি আর পুরন্দর বম্বে ফিরবে এটাই ঠিক ছিল। সকালবেলা বেরোবার আগে, ফুলকলি শান্ত মুখে কাছে এসে বললো, 'দৈব, দৈবই, এটা কিন্তু আমি মানি না। বজ্রাঘাতের মতো তা দাগ রেখে যায়।'

আমি কিছু বলতে যেতেই, ও আমার মুখে ওর ডান হাত দিয়ে চাপা দিল। বললো, 'তোমার বলার আর কিছু নেই।' বলে, নত হয়ে, পা স্পর্শ করলো। একটা পুরনো দিনের আবেগের ছবি, তবু মনে হয় একেবারে পুরনো হয়ে যায়নি। কারণ এই স্পর্শটার মধ্যে একটি নিবিড় আদান-প্রদান হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ালো, চোখের কোণ চিকচিক করছে। তবু হাসলো, আবার মুখ নামালো। আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখ তুলে ধরলাম। ও চোখ বুজলো। মুখ নামিয়ে ওর কপালে স্পর্শ করলাম।

ফুলকলি দু'হাত দিয়ে আমার কাঁধ স্পর্শ করলো। পিছনে জুতোর শব্দ শুনলাম। কিন্তু নড়তে পারলাম না। জুতোর শব্দ আবার ফিরে চলে গেল।

ফুলকলি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'চল।'

ওকে নিয়ে বাইরে এসে দেখলাম, গাড়ি প্রস্তুত। চালকের আসনে পুরন্দর বসে আছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে।'

ফুলকলিকে মাঝখানে রেখে আমিও সামনে উঠলাম। হোটেল থেকে স্টেশনের দূরত্ব খুব বেশি না।

গাড়িতে ওঠবার আগে পুরন্দরকে বললাম, 'তুই একেবারে চুপচাপ, কিছু বল্।'

পুরন্দর ভ্রূকুটি চোখে আমার দিকে তাকালো। পাশের ফুলকলির দিকে একবার দেখলো, তারপরে বললো, 'শত্রুর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না।...' বলতে বলতে ওর চোখ ভিজে উঠল। মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

গাড়ির ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি চলতে আরম্ভ করার পরে হঠাৎ ফুলকলি ছোটবার উদ্যোগ করলো। তার আগেই ওর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠতে দেখেছি। দেখলাম পুরন্দরও ফুলকলির সঙ্গে ছুটছে এবং এক সময়ে ফুলকলিকে দু'হাত দিয়ে টেনে ধরলো। যতক্ষণ চোখ ঝাপসা হলো না, ওদের একভাবে দেখতে পেলাম। ফুলকলির মাথা ওর নিজের বুকের কাছে নত। পুরন্দর আমার দিকে তাকিয়ে। শত্রুর সঙ্গে ও বাক্যালাপ করতে চায়নি।...

আমার দৃষ্টি একেবারে ঝাপসা হয়ে গেল। সবুজ প্রান্তর চিকচিক করতে লাগলো।

সেই যে সেই কবে, সে আমাকে থমকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, তারপর থেকে তাকে আর ভুলতে পারিনি। কতোকাল আগে? তা হবে পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে। শরতকালের জলপাইগুড়ি শহর। কদমতলা থেকে বেরিয়ে, কোন্ রাস্তা দিয়ে যেন হাঁটছিলাম, মনে নেই। মনে আছে, কমবয়সী কয়েক জন সঙ্গে। বলা কওয়া আর শোনা, সব একসঙ্গে। একে বলে, সবে শোনে, সে রকম না। যে যেমন বলে, যে যেমন শোনে। ঝকঝকে সকালটির গায়ে আলস্য মাখানো। বলা কওয়াও সেই রকম। অলস অলস কথা, অলস অলস চলা। মায় হাসিগুলোও আলসেমিতে ভরা। ওদের কারোর নাম বোধ হয় দেবেশ। কারোর বা মুকুন্দ বা কার্তিকও বা। জগদীশদা নামে সেই মানুষটিও ছিলেন নাকি, যাঁর সবটাই স্নেহে ভরা। মনে করতে পারি না।

মনে করতে পারি না, রাস্তাটা কোথায়। করলা নদীর ধারে, নাকি পিলখানা থেকে হাতী দেখে ফিরে আসার রাস্তাটা। সময়টা সকাল, শরতের আকাশ নীল। জলপাইগুড়ি শহরের নারকেল গাছের পাতায়, রোদের ঝিলিমিলিকে সত্যি কী না সোনালী দেখাচ্ছিল। এ কোনো পদ্যকারের কথা না। আর অলস চলা, অলস বলার মাঝখানে, আকাশের এক প্রান্তে চোখ পড়তেই, পায়ের নড়িতে ঠেক। কী ওটা? একটা কোন্ ইন্দ্রিয় যেন থরথরিয়ে উঠেছিল। ও কী, আকাশের বুকে। যাকে কখনো দেখিনি, অথচ মনে হয়েছিল, বহুদিনের চেনা। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, ওটা আমার মনের বিভ্রম। যাকে চোখে দেখিনি, তাকে চিনবো কেমন করে। তবু সে দূরের নীলে মাথা তুলে চুম্বকের মতো টেনে ধরেছিল। হাসছিল নাকি? না, কেমন যেন গম্ভীর স্তব্ধ, মহিমান্বিত রূপ।

'ও, ওইটা দেখছেন তো? ওই তো কাঞ্চনজংঘা।' কে যেন বলেছিল। দেবেশ বা মুকুন্দ বা কার্তিকই। কাঞ্চনজংঘা! সেই প্রথম দেখা। দূরত্বের কথা মনে হয়নি। যেন জলপাইগুড়ির আকাশে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

তারপরে আমার রকম সকম আলাদা। এগিয়ে পিছিয়ে ডাইনে বাঁয়ে, কতো-রকম ভাবে যে দেখেছিলাম। কিন্তু তার রকম সকম এক রকম, আর নিশ্চল। ইতিমধ্যে সে ডুব দিয়েছিল আমার আকাঙ্খার গভীরে। চোখ বুজেও তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

সেই প্রথম। আর সেই প্রথম বড় আশা। ছুঁতে না পাই, কাছে গিয়ে দেখতেও কি পারি না?

দেখেছিলাম তো। পাহাড়ে উঠে, মনে হয়েছিল স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছি। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের সেই শরতের সকালের দেখাটা কয়েক বছরের অতীত। কিন্তু পাহাড়ের যে অংশে যে স্থানে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে এসেছি, তা মনে হওয়া পর্যন্তই। মন মজেনি। অর্থাৎ কী না হৃদয়ে বাজেনি। পদ্য করে বললে, তবু ভরিল না চিত্ত।

চিত্ত কী ভরে? কে জানে। কিন্তু আশা যে মরে না, তা জানি। মরীচিকা কি মরে। মরলে আবার বারে বারে রানীর কাছে যাবো কেন। যে-অর্থে কুইনস্ অব্ দ্য হিমালয়, সেই অর্থে রানী। মিথ্যা না, রানীর মতোই সে সুন্দরী। রানীর মতোই তার সাজগোজ। সমতল থেকে উঠতে উঠতে, রূপে যে ভুলিনি তা না। জালা তো সেইখানে, রূপে ভুলেও মজে না প্রাণ। রূপে কী করে?

করে এইটুকু, ছুটিয়ে নিয়ে যায় বারে বারে। ছুটে ছুটে গিয়েছি তাই নানা ঋতুতে। কতোবার? গুণে দেখতে হয় তাহলে। ওইখানে আবার একটা ঠেক। আমি অঙ্কেতে নেই। সংখ্যা জাহির করবো তা কারোকে হিসাবনিকাশের তত্ত্ব বাতলাতে, মোটে আমার চাড় নেই। প্রাঙ্গণের দূর দিগন্তের আকাশ জুড়ে, খেলতো সে নানা রঙে। টার্কি মোরগের গলার ঝোলা আর ঝুঁটির মতো তার রঙের খেলা। সত্যি, ভাবলে অবাক লাগে। তুর্কী নামের সঙ্গে ঘাড় বাঁকানো ঔদ্ধত্যেরই তুলনা করে সবাই। কেন তা জানি না। তুর্কী মানেই তেজী নাকি? বিদ্রোহী? হবে বা। কিংবা ওটাও এক রকমের কথার কারসাজি না তো? সুবিধা বুঝে লাগসই একটা বিশেষণ জুড়ে দেওয়া? কিন্তু মোরগগুলো মোটেই সে রকম না। আকারে অবিশ্যি বড়। গলায় একটা মস্ত থলি, গলকম্বলের মতো। ঝুঁটিটিও বেশ বড় আর ঝাড়ালো। ভিতরে তার কী গুণের লীলা, পক্ষী বিশেষজ্ঞ জানতে পারে। আমি পারি কেবল, আ মরি কী চমৎকার চোখে চেয়ে থাকতে। গলার থলি আর ঝুঁটি, এই দেখা গেল লাল আর ধূসর। পর মুহূর্তেই দেখ সোনালী হলুদে আর সবুজে

মাখামাখি। আবার দেখ তার ক্ষণপরেই মেরুনে আর বেগ্‌নিতে কেমন গাঢ়। কেন রে পাখি, কোথা থেকে পেলি তুই এমন রঙবাহারের জাদু! আমার চোখে তো আর আঁটা নেই বর্ণালী বীক্ষণের যন্তর। তো?

ওই ওকেও আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করতো, আকাশের দিকে যার চিরতৃষ্ণার ঠোঁট বাড়ানো। যে কারণে সে আকাশচুম্বী। এত তোমার ক্ষণে ক্ষণে রঙের ছটা বদলায় কেমন করে। সূর্যালোক? সে তো অনেক কিছুর ওপরেই পড়ে। তোমার মতো এমন রঙ পাল্‌টায় কে?

জবাব কোনো দিন পাওয়া যায়নি। চিরমৌনতা যে তার মহিমা। তা. রূপে যা করে, ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে বারে বারে। দূর আকাশে সে খেলতো নানা রঙে, আর মানুষ খেলতো নানাভাবে। সেই মানুষের খেলাতেই আমার কিছু কিছু হিসাব আছে। যদিও তা পাকা হিসাব না। কিন্তু একটু অকপট হতে হয় যে?

হলেই বা, ক্ষতি কী? মনে রেখো, এই যে তোমার আত্মপ্রকাশ, লেখা-জোখা যাকে বলে, এইখানে তোমার অকপট জীবন সাধন। এই সহিতত্ব বাইরের না, ভিতরের। লেখাজোখার যদি কোনো মহত্ব থাকে, তবে তা সেইখানে, যেখানে সে তোমার সন্ধান করে। ওই কী বলে, জীবন সন্ধানী। কথাটা মনে রেখো। দান চালতে গিয়ে, জীবনের থেকে বড় দান ওকে দিতে পারো না। হলো তো?

হলো। তাহলে অকপটেই বলতে হয়, যদিও দফাওয়ারি সংখ্যাতত্ত্ব দিতে পারবো না। সেই একবার যখন সে আকাশের নীলে মাথা তুলে রঙে খেলছিল, তখনই সেই পাহাড়ী কন্যাটি, গৃহ প্রবেশের মুখে, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গৃহান্তরের নিরালা কোণে। তার দুই বাহুতে কী প্রাণের জোর। ঠোঁটে কী আবেগ! নিঃশ্বাসের উষ্ণতাই বা কী তীব্র। চুম্বনের গাঢ়তা যে কতো নিবিড় হতে পারে, আর নিটোল উদ্ধত বুকের স্পর্শ, সেই অনুভূতির ব্যাখ্যা করি, এমন কথার কারিগর আমি না।

ব্যাপারটা কোনো এক পক্ষের না। আমিও কি ভুলিনি? চাইনি? তবে ভোলা বা চাওয়ার, কোনোরই তেমন জোর ছিল না। থাকবে কেমন করে? পরিবার সমাজ লোক, সকলে আমাকে ঘিরে। ওকেও কি ঘিরে ছিল না? ছিল, কিন্তু ওর প্রাণের জোর সব কিছুর থেকে বেশি। আমার সংশয় আর বিস্ময় ওর কাছে তুচ্ছ। সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ ওর মায়ের আশ্রয়েই আমার বাস। ওর অন্যান্য ছোট বোনেরা আমার দিন যাপনের নানা

কাজের সহায়িকা। সমতলবাসী সীমিত সময়ের অতিথির মুগ্ধতাকে ও কেন রেয়াত করেছিল?

সমাজতাত্ত্বিক কালপ্যাঁচা সেবারে তখন পাহাড়ে। তাঁকে সব বলেছিলাম। বলতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম, আমার গলায় মেঘ, স্বর ঝাপসা, দৃষ্টি মেদুর। পর্বতকন্যা পার্বতীকে মনে মনে বলেছিলাম, অভাগী মেয়ে। সংসার তো চোখ বুজে থাকে না। ওর পাহাড়ী মা আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতো, তারপরে একটু হেসে মাথা নেড়ে বলতো, 'আমার বড় মেয়েটাকে নিয়ে যে কী করবো, বুঝি না।'

আহ্, এর থেকে স্পষ্ট করে আর কী বলা যায়? সেই রেখায় ভরা বিষণ্ন মুখ, উদ্বিগ্ন চোখের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছি। আকাশের নীলে, দূরে যে রঙ বদলাতো, তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'কেন এমন ঘটে?' জবাবে হয়তো দেখা যেতো, তুষার শাদা মুখে এক ঝলক রাঙা হাসি। তার দর্শন আর সান্নিধ্যের সূত্রেই এইসব ঘটনা। তার নানা রঙের খেলার সঙ্গে তাই মানুষের নানা খেলার কথা বলতে হয়। তবে বলতে হলে, অকপটে বলো।

সেই আর একেবারের কথা, দুরন্ত শীতে আশ্রয় পেয়েছিলাম, স্নেহময়ী অধ্যাপিকা দিদিটির। সমতল থেকে একটি চিঠি নিয়ে, তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দেবব্রত মুখার্জি শিল্পী তখন সেই বাড়িতে, ইজেলে ক্যানভাস খাটিয়ে, তাঁর নিজের চেহারা আর ছবির মতোই বলিষ্ঠ আঁচড় টেনে চলেছেন তুলি দিয়ে। আশ্রয় তো না, পক্ষীশাবকের পক্ষে একটি কোমল নীড়। রাত্রে দু' দুটো লেপ কম্বলের নিচে, গোটাতিনেক গরম জলের থলি। দেবুদার লাল পানির পাত্র যতো খালি হতো, ক্যানভাসের রঙ ততো ঝলকাতো। লাল পানির পাত্র এগিয়ে দিয়ে বলতেন, 'হারামজাদা এটা খা, সব কিছুর আসল রূপ যদি দেখতে চাস।'

ওই রকম কথা, তার সঙ্গে চুলের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দেওয়া। সেইখানে সরকারী দপ্তরের এক সাহেবের সঙ্গে চিন পরিচয় হতেই, তাঁর ভুরু বেঁকে উঠেছিল। এত অবাক, যেন হালে পানি নেই। ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন জলা-পাহাড়ের এক নিরিবিলি চূড়ায়। তারপরে সেই অভাগী মেয়েটির কাহিনী। আমার নাম নাকি ওর মুখেই তাঁর শোনা। তারপরে ঘটনা যা বলেছিলেন, অতি নিকৃষ্ট আর দুঃখের। কলকাতার এক অভিজাত দম্পতির স্বেচ্ছাচারিতার বলি হয়েছিল সেই অভাগী পাহাড়ী মেয়েটি। যে অভিজাত পুরুষটি তার বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে, সন্তানের জনক হতে পারেনি, কয়েক মাসের

মধ্যেই তার পিতৃত্ব ঘোষিত হয়েছিল পাহাড়ী মেয়েটির গর্ভে। একদিকে যখন পুরুষটির আত্মপরিচয়ের দর্পিত উপলব্ধি ঘটেছিল, অন্যদিকে তখন সমাজ ও সংসার। স্বামী-স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতার ফলে দাম্পত্য জীবনের আখেরি ফয়সালটাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পাহাড়ী মেয়ের সন্তানের পিতৃত্ব? তোবা তোবা। আভিজাত্য করার জন্য টাকা আছে কী করতে? টাকা অগতির গতি না? ত্রাণ তো হাতের মুঠোয়। তবুও দারাদরি করা হলো, টাকাকে ভালোবাসার ভাবনা। দেড় দু' হাজারেই মিটেছিল।

কিন্তু সরকারী দপ্তরের সাহেবের কাছে আমার নামটা উচ্চারিত হয়েছিল কেন? দপ্তরের সাহেব তাঁর কোটের পকেট থেকে লাল পানির বোতল বের করে গলায় কাঁচা ঢেলেছিলেন। লাল মুখ করে, অস্ত যাওয়া লাল স্বরে বলেছিলেন, অভাগী মেয়েটির অনুকম্পা দেখাতে গিয়ে অনুরাগ এসেছিল তাঁর মনে। প্রাণ খুলে তা প্রকাশ করতে পারেননি। কিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তখন কথায় কথায় পাহাড়ী কন্যা আমার কথা বলেছিল।

একটি সত্য কথা কাবুল করবো? অকপটে? সাহেবের কথাগুলো শুনে বুকের দমের ঘরে বড় টান লেগেছিল। আকাশের দূরে সে তখন দুই ভাঁজে দুই রঙে তাকিয়েছিল, শাদা আর ফটিক। কিন্তু সে যেন কেমন ঝাপসা হয়ে উঠছিল। কথা বলতে পারিনি। না, কষ্ট সাহেবের জন্য না। সাহেবের কাছে বলা, পার্বতীর কথা শুনে। নামে না, পর্বতকন্যার্থে পার্বতী। বলেছিল, 'সে চলে যাবার পরে আমার সবই যেন হারিয়ে গিয়েছিল। সে যখন আমার এই কথা শুনবে, বড় ঘৃণা করবে।

করেছিলাম নাকি? সাহেব লাল পানি পান করে আরো অনেক কথা বলেছিলেন। বলতে বলতে কথাগুলো আবছা নীল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার ঘৃণা? জলাপাহাড়ের নিরালা থেকে নেমে, সেই নিভৃত বাড়িটিতে গিয়েছিলাম। প্রথম দেখা একটি ছোট বোনের সঙ্গে, আগের তুলনায় একটু ডাগর। লাল গাল আর নাকের ডগা ঝলকানো দুটি পাহাড়ী চোখে অতল বিস্ময়। এক মুহূর্তের বেশি দাঁড়য়নি। ছুটে চলে গিয়েছিল। তারপরেই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল পাহাড়ী মা। অভ্যর্থনা আগে, তারপরে বার্তা চোখের জলে, সমাজের নির্দেশ, অভাগীকে ঘর ছেড়ে যেতে হয়েছে। কোথায়? বাজারের পিছনেই নিচের বস্তিতে। মারোয়াড়ির দোকান-ঘর ঝাড়-পোঁছ করে সাজায়, আরো নানা রকম ফাইফরমাস খাটে। নওকরি যাকে বলে।

খুঁজেছিলাম। দেখা পাইনি। অধ্যাপিকা দিদিকে সরকারী দপ্তরের

সাহেবই ঘটনাটি বলেছিলেন। দিদির কিশোরী কন্যাটিও শুনেছিল, ওর কৌতূহল হয়েছিল অগাধ। ক্যাভেণ্টারে দোতলায় খোলা ছাদের নিচে বসে ওর কৌতূহল মিটিয়েছিলাম। ও গম্ভীর মুখে তাকিয়ে ছিল, হিমালয়ের সেই আকাশে মাথা তোলা তুর্কী মোরগটার দিকে, রঙ যার ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছিল। তারপরে হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে সবুজ স্বরে কেঁদে উঠেছিল। অবাক হয়েছিলাম। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম কিশোরীর সবুজ ডালে একটি লাল কুঁড়ি ধরেছে। যখন দূরের আকাশে চিরমৌন মহিমময় ধ্বজের দিকে তাকালাম, তাকে অনেক—অনেক দূরে মনে হয়েছিল।

সে আমার আকাঙ্ক্ষার গভীরে ডুবেছিল। অনেকবারেই সে আমাকে ঘর-ছাড়া করে ওপরে নিয়ে গিয়েছে। সেই এক জায়গাতেই। সেবারে, হোটেল থেকে বেরিয়ে জুবিলি স্যানাটোরিয়ামের কটেজে যাচ্ছিলাম। নারাণদার (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) কটেজে, নিমন্ত্রণ আশা বউদির মাছ-ভাতের। রাস্তার আলো তখন জ্বলেছে। হাল্‌কা কুয়াশার নড়াচড়ায় কেমন একটা গড়িমসি ভাব। সবই দেখা যায়, আবার যায়ও না। গোটা দিনটাই প্রায় কুয়াশার কব্‌জায় ছিল। ভোরবেলা তাকে একবার দেখা গিয়েছিল, এক পলকের দেখা। তার গায়ে বিষণ্ণতার ছায়া ছিল।

সারাদিনে আর একবারো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। সন্ধ্যা নেমেছিল, একেবারে অন্ধকার নিয়েই। তার ওপরে হাল্‌কা কুয়াশা রাস্তার আলোগুলোকে তেমন ফুটতে দেয়নি। একটি মুখের দিকে চোখ পড়তেই, ঢালু পথে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। যার মুখ দেখেছিলাম, সেও থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে কাছাকাছি। প্রাণের জোরটা ওর বরাবরই বেশি তো। জনবহুল রাস্তায় অবলীলাক্রমে আমার একটা হাত চেপে ধরেছিল। মুখে এমন খুশির ছটা, কুয়াশা যেন উপে গিয়েছিল। একদমে কথা, 'তুমি? কবে এসেছো? কোথায় উঠেছো? আমাকে তোমার মনে আছে তো?'

সেই অভাগী পার্বতী। লোককে দোষ দিয়ে কী লাভ? দৃশ্যের আকর্ষণ কার নেই? মনে কৌতূহল? এটাই তো সংসারের প্রতি অনুরাগ। কে আর বৈরাগ্য সম্বল করে কোনো দিকে না তাকিয়ে চলেছে? কিন্তু সংসারের লোক বলেই, বাইরে এসেও আমার যে লজ্জা করে। হাতটা ছাড়িয়ে নিতেই হয়েছিল, বলেছিলাম, 'চলো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।'

আমার বলার, আমি বলেছিলাম। ওর অবস্থা কি বুঝতে পেরেছিলাম? ওর ভিতরে কি হচ্ছিল?

অসম্ভব। পেরেছি বললে মিথ্যা বলা হতো। ও হাত ছেড়েছিল স্পর্শ ছাড়েনি। ঢালু রাস্তার চলাটা স্বভাবতই কিছুটা দ্রুত ছিল। ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছিলাম ওর চেহারার শীর্ণতা। বিবর্ণতা সেই উজ্জ্বল মুখের। অন্ধকার সেই দ্যুতিময়ী চোখের। যদিও সাক্ষাৎমাত্র সবই ঝলকিয়ে উঠেছিল। শরীরের লাবণ্যে শ্যাওলার দাগ। জামাকাপড়ে পরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও দীনতা। চলতে চলতে কথা থামায়নি একবারও, 'তুমি তো আর নিশ্চয় পাহাড়ে আসোনি (অন্তত বার কয়েক উঠেছি) আমার একটা চিঠিরও জবাব দাওনি, (অতি সত্যি কথা) বোধ হয় পাওনি। পেলে নিশ্চয়ই জবাব দিতে। (আহ্!) দিতে না? ঠিকানা তো আমি লিখে রেখেছিলাম, ওতে আমার ভুল হয়নি। আসলে ডাকের গোলমাল, আমি জানি। চিঠি পেলে নিশ্চয় জবাব দিতে, তোমাকে আমি জানি। (কী ছলনা!) কিন্তু আমার সব কথা যদি জানতে, আর কখনো জবাব দিতে না, কখনো না।' ওর স্বর খাদে নামছিল, নামতে নামতে হঠাৎ যেন বরফের ফাটলে ডুবে গিয়েছিল।

আমি বলতে পারিনি, 'জানি।' তাই গ্লানি আমার। ও গ্লানিমুক্ত হয়েছিল, হচ্ছিল। ও আমার হাত ছেড়েছিল, স্পর্শ ছাড়েনি। গায়ে গা ঠেকিয়ে চলেছিল। দু'পাশে দোকান পসার। কেনা বেচা চলছিল ঢালু রাস্তার দু'ধারে। রাস্তাটা সাপের মতো বাঁক নিয়ে, ডাকঘর পেরিয়ে, আবার বাঁয়ের ঢালুতে। অনেকে আমাদের তাকিয়ে দেখেছিল। সমতলের এক পুরুষ, পাহাড়ের এক মেয়ে। ও খুব তাড়াতাড়ি শাড়ির কোমরবন্ধনী থেকে রুমাল খুলে চোখ মুছে নিয়েছিল। গ্লানি আমার, গরীব আমার প্রাণ। তাই লোকলজ্জায় আমার নজর আনচান। ওর স্বর আবার জেগেছিল, 'আমি আর সে বাড়িতে নেই, আমার মায়ের কাছে। আমি খারাপ হয়ে গেছি। তুমি হয় তো বুঝবে না, আমি কেমন করে খারাপ হয়ে গেলাম। কারণ আমি নিজেই তো বুঝতে পারিনি। (ওকে চুপ করতে বলতে ইচ্ছা করছিল, পারিনি) কিন্তু খারাপ খারাপই। আমি খারাপ হয়েছি একজন বাঙালীর সঙ্গেই, আহ্! একজন বাঙালীর সঙ্গে!' আবার ওর স্বর ডুবে গিয়েছিল।

রাস্তাটা তখন অধিকতর ঢালু। কেন যেন নির্জন ছিল। বোধ হয় দোকান পসার ছিল না। হাল্‌কা কুয়াশা, আর রাস্তার কমজোর আলো। ও আমার ডানা চেপে ধরেছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, কেন এই দুরন্ত আক্ষেপ, আহ্!

একজন বাঙালীর সঙ্গে! ওর স্বর আবার তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠেছিল, 'তার ছেলে আমি পেটে ধরেছি। কিন্তু সে তো আমারই ছেলে। ওর কোনো বাবা নেই। পঞ্চায়েত আমাকে এক ঘরে করে দিয়েছে। মা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। লোকটা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিল। তুমি আমাকে ঘৃণা করছো, না? আমি জানি।'

ওর স্বর আমার ডানায় ডুবে গিয়েছিল। হাতের ভার আমার কটিতে। আমি কি ওকে ঘৃণা করেছিলাম! সেই তো আবার বলতে হয়, গরীব আমার প্রাণ। ভোলার কথায়, যে জন প্রেমের ভাব জানে না/তার সঙ্গে কিসের লেনা দেনা? কেমন করে ঘৃণা করব ওকে। শাদা কালোর ধন্দে যে সব বাজে। শাদা নেই, কালো থাকে কেমন করে? ওকে আমি ঘৃণা করিনি। বলেও-ছিলাম, 'না না, আমি তোমাকে ঘৃণা করছি না।'

ওর স্বর ডুবে যাচ্ছিল, কিন্তু তুলে তুলে বলছিল, 'করছো না? হা, কী কপাল আমার! করো না কেন, একটু করো।'

আমি যেন শুনছিলাম, ভালোবাসো না কেন, একটু বাসো। ট্রাফিক পুলিস পেরিয়ে, প্রায় সমতলে। আমরা তখন রেললাইনের ধারে। তারপরে রাস্তা অতি ঢালু। স্যানাটোরিয়ামের অধীন পরিচ্ছন্ন রাস্তা। নির্জনতা নিবিড়। দু'পাশে ঘন গাছের সারি। গাছের ওপর পাতা থেকে নিচের পাতায় জলের ফোঁটার টপ টপ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর ঝিঁঝির ডাক। ও বলছিল, 'এখন আমাকে কেউ কেউ বিয়ে করতে চায়। যারা চায়, তারা খৃষ্টান। তাতেই বা কী? ভগবানের কোনো জাত নেই। সে সকলেরই। কিন্তু আমি জানি, আমাকে যারা চায়, তারা কখনোই আমার ছেলেকে চাইবে না। ওকে আমি পেটে ধরেছি, কেমন করে ছাড়বো? মায়ের কাছে রেখে দেবো? মাসে মাসে টাকা দেবো? সবই সমান। ওকে কেউ চায় না। আমিও চাইনি, তবুও আমার কাছে এসেছে। আমি ওকে ফেলতে পারিনি। একটা দোকানে আমি কাজ করি। তুমি কেন আর পাহাড়ে এলে না? কেন এলে না?' ওর ঘন নিশ্বাস আর রুদ্ধ স্বরে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

ঝরনার মতো সর্পিল আর দ্রুতগামী ঢালু পথের দু'ধারে, নির্বাক গাছেরা যেন ওর জিজ্ঞাসায় উৎকর্ণ হয়েছিল। মিথ্যের শেষ নেই, ছলনারও। বলে-ছিলাম, 'সময় পাইনি।'

নারায়ণদা আর আশা বউদির কুটির দেখা যাচ্ছিল। কুটিরের আলো জানালায়। গরীব প্রাণে সংকোচ জাগছিল। লোকলজ্জার ভয়, পরিচয়ের

শঙ্কা। ও বলেছিল, 'মনে থাকলে সময় পেতে। আমার যে দুর্ভাগ্য, একটা চিঠিও পাওনি। (আহ্! কোথায় বাজে?) পেলে মনে পড়তো। (ধিক! ধিক!) মনে পড়লে সময় পেতে। দাঁড়ালে কেন?'

নারায়ণদার কুটির সামনে এসে পড়েছিল। তিনি বা বউদি ব্যালকনিতে দাঁড়ালে আমাদের দেখতে পেতেন। হাত তুলে দেখিয়ে বলেছিলাম, 'ওখানে আমি যাবো।'

ও তাকিয়ে দেখেছিল। আমি ঢালুতে ও আমার কিঞ্চিৎ ওপরে। ওর পীত পার্বতী চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমার চোখে যেন কিছু খুঁজেছিল। নিরাশা ওর চোখে। শীর্ণ মুখে হাসি ফুটেছিল। তবু অনায়াসে দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। গ্রাসে নিয়েছিল ঠোঁট। ওর গায়ে ছিল সস্তা সাবানের গন্ধ। নিশ্বাসে ছিল দুঃখের খাদ্য পেঁয়াজের। উষ্ণ জিভ দিয়ে যেন খুঁজেছিল কোনো চেনা স্বাদ। ওর শিথিল শীর্ণ শরীরের নিবিড় স্পর্শ পাচ্ছিলাম। কতগুলো মুহূর্ত কেটেছিল জানি না। ও সহসা নিজেকে ছিন্ন করেছিল। আলিঙ্গন থেকে না। কী বিস্ময়! ও বলে উঠেছিল, 'তোমার সেই বইটা কি ছাপা হয়ে গেছে, যেটা আমাদের সেই বাড়িতে বসে লিখতে? নিশ্চয় বেরিয়ে গেছে, না?' জবাব যেন ওর জানা, এমনি ভাবেই প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছিল! 'মা'র সঙ্গে একবার দেখা কোরো, আর আমার বোনের সঙ্গে, কেমন? বাজারের পেছনে অনেক নিচুতে আমি থাকি। না না, সেখানে তোমাকে আমি যেতে বলবো না। আমি তোমাকে খুঁজে নেবো ঠিক। যেখানেই উঠে থাকো। একটু—সেই দিনগুলো—।'

ওর স্বরে ফুটেছিল উদ্বেলতা, ডুবতে ডুবতে থেমে গেলেও, শেষের কথা কয়টি যেন ডাক দেবার মতো। আমি এক পলক দেখে নিয়েছিলাম ব্যালকনির দিকে। গরীব আমার···। পর্বতের মেয়ের তপ্ত নিশ্বাসের ঝাপ্‌টা লেগেছিল আমার নাসারন্ধ্রে। আবার সেই গন্ধ, উষ্ণ জিভের দুরন্ত সন্ধান। কিন্তু ওহে! সেই দিনগুলো কোথায়? বইটা ছাপা হয়ে গিয়েছিল? গাছেরা স্থির। ঝিঁঝিরা ডাকছিল। ওপর পাতার জলের ফোঁটার শব্দ শোনা যাচ্ছিল নিচের পাতায়।

ও যেন চমকিয়ে উঠেছিল। ঝটিতি আর পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার এমন ভঙ্গি। ডুবন্ত স্বরে শুধু বলেছিল, 'বেশি রাত হলে এ রাস্তায় একলা যেও না, কেউ যেন রেললাইন পার করে দিয়ে আসে।' বলেই পিছন ফিরে, খাড়া চড়াইয়ের রাস্তায় এমন ভাবে ছুটে চলে গিয়েছিল, চমক তখন আমার মনে। আর ভয়।

গরীব আমার…। আমি উৎকণ্ঠিত চোখে, সামনে, পিছনে, আশেপাশে তাকিয়ে দেখেছিলাম।

কেউ কোথাও ছিল না। একটি খাদ্যান্বেষী অথবা আশ্রয়হীন পশুও না। ব্যালকনি শূন্য। পথের নিচের বাঁকের মুখে স্যানাটোরিয়ামের অফিসের সামনের আলোর রেখা। উৎরাইয়ের ঢালুতে আমি একা। ঝিঁঝিরা তেমনি ডাকছিল। পাতার কুয়াশার ফোঁটা পাতায় টপ টপ শব্দে ঝরঝিল আগের মতোই। খাড়াইয়ের পথটা শূন্য, বাঁকের মুখে গাছের আড়ালে আলো। স্যাণ্ডেলের পুরনো চামড়ার শব্দ আর শোনা যাচ্ছিল না।

সেই সে-প্রাঙ্গণের ধারে, যাকে তখন মনে করেছিলাম, স্বর্ণশিখরের প্রাঙ্গণ। পিছন ফিরে নেমে, কুটিরের দিকে যেতে গিয়ে ঠেক। কিসে আক্রান্ত হয়েছিলাম? বুঝতে পারিনি তৎক্ষণাৎ কুটিরে না গিয়ে, আস্তে আস্তে আরো নিচের দিকে নেমে গিয়েছিলাম। আমার নাম কালকূট, আমি লেখক? জুবিলি স্যানাটোরিয়ামের আলোগুলো আচমকাই কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।…

খাওয়াটা ভালোই হয়েছিল। সমতলের তিন-চার রকমের মাছ। আশা বউদির হাতের রান্না। পাব্‌দা মাছের ঝালটা এখনো মনে আছে। নারাণদা-ই নেমে এসে চৌকিদারকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওপরের রেললাইন থেকে দূরে, নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসতে। নিজের থেকেই বলেছিলেন, 'দার্জিলিং-এর পরিবেশটা আস্তে আস্তে কেমন খারাপ হয়ে উঠছে। আগে এ রকম টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেবার কথা শুনতাম না। আজকালই শুনছি, বিশেষ বিশেষ জায়গায় এমনটা ঘটছে।'…

আমার তখন মনে পড়ছিল আর একজনের কথা, 'বেশি রাত হলে এ রাস্তায়…।' রাত্রে হোটেলে শুয়ে স্বপ্ন দেখিনি। 'একটু—সেই দিনগুলো—' ডাক দেবার মতো সেই কথাগুলোর সঙ্গে মেলানো, সেই দিনগুলোর একটি ছবি। কাঞ্চনাভাময়ী পার্বতী, একটু উঁচু গালে রক্তাভা। পীতবর্ণ তার চোখ, কিন্তু একান্ত ছোট না। লাল জামা, নীল শাড়ি, নাকে একটি পাথর বসানো ছোট নাকচাবি। চোখের সঙ্গে নাকচাবিটির ঝিকিমিকির একটু মিল ছিল নাকি? ঘাড়ের দু'পাশে সাপিনী বেণী বক্ষচূড়ে দোলানো। পায়ে একজোড়া (দাম যা-ই হোক) লাল শৌখীন স্লিপার। তপ্ত কাঞ্চন রঙ, একটি হাতে একরাশ লাল বেলোয়ারি চুড়ি।

ইংরেজি মে মাসের সেই রাত্রে, শীতটা একটু অস্বাভাবিক লেগেছিল। ভোরেই অবিশ্যি স্বর্ণশিখর দর্শনের আশায় উন্মুখ হয়ে কাঁচের জানালায় মুখ

ঠেকিয়েছিলাম। চকিতের তরে একবার। একদিক রক্তিম, অপরাংশে গাঢ় ধূসর। একজনকেই, বোধ হয় শীর্ষতমকে। যেন মন্দিরের দরজা বন্ধের শেষ মুহূর্তে একবার চোখে চোখ।

সেই যে ওদের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দেখেছিলাম, আর তাই বারে বারেই ছুটে এসেছি, তারপর থেকে শিখরদের নাম পরিচয়গুলো জেনে নিয়েছিলাম। এখন তাই হলফ করে বলতে পারি, জলপাইগুড়ি থেকে যাকে দেখেছিলাম, সে নির্ঘাৎ সোনার খাজাঞ্চি (খাজাঞ্জি ?) খানা।

বারে বারে ছুটে এসে, কানে আমার কিঞ্চিৎ বাহার দিয়েছিল কী না। তারপর···সেই এক যে ছিল দেশ, তার নাম তিব্বত। পাঁচ-শিখরের চির-নিবাস সেইখানে। দেশের লোকেরা বলে, 'কাং-ছেন-দ্জাং-গা।' দক্ষিণের সম-তলের লোকেরা বলে, কাঞ্চনজংঘা। দেশের লোকের কাছে ওই শব্দগুলোর অর্থ হলো, 'বরফ-বড়-খাজাঞ্চিখানা-পাঁচ।' বলতে জানলে কী না হয়। বেলা যখন অস্ত যায়, শীর্ষতমের লালের কপালে তখন সোনার ছটা লাগে। তাই সে হলো সোনার খাজাঞ্চিখানা। এই হলো এক, কেমন ? তারপরে দুই, দক্ষিণের চূড়োটি সূর্যোদয়ের আগে ইস্তক ইস্পাত, যেমনি রোদের ঝলক লাগা, অমনি রূপোলী। তাই সে রূপোর খাজাঞ্চিখানা। এমনি করে, বাকিদের নাম হলো, রত্ন, শস্য, আর অস্ত্রের খাজাঞ্চিখানা। তারপরে আর কী চাই বলো ? সোনা রূপো রত্ন শস্য অস্ত্র। তো, সেই দেশের লোকেরা হলো, সেই পাঁচ চূড়োর বশংবদ প্রজা। সেই কারণে পুবদিকের চূড়োটির নাম রেখেছে 'পানদিম্।' যাকে বলে, রাজমন্ত্রী।

মিথ্যে বলবো না, স্বর্ণশিখর কথাখানির আমদানী সেইখান থেকেই। কিন্তু পথ বদলের কথাটা যে মনে আসেনি। এলেও, ছুটে যাবার বেগে ঝাঁপ। একটা টিকি তো কখনো কুচ্ করে দিতে পারিনি। টিকি যে জীবন ধারণ ! সেই রাধা কিষেণ আর কী ? সাধে কি আর কোনো কোনো ধার্মিককে ওই কথাটি শুনলে রেগে উঠতে দেখেছি ?

তারপরেও তাই ছুটে ছুটে উঠে এসেছি এই প্রাঙ্গণেই। বরফ-বড়-খাজাঞ্চিখানা-পাঁচ-কে দেখতে। সেই রকমই দেখা। লাজুক না সে, চোরি চোরি আঁখ মিচোলি। তার মধ্যেই ঋতুর হের ফেরে কম বেশি। আর হিসাবে ধরতে পারি না, কোন্ একবার যেন প্রাঙ্গণে এসে হাত ধরলেন রূপোলী পর্দার নায়িকা। নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর রাজকীয় পান্থশালার ঘরে। অতি

বড় সুন্দরী বলবো না লাবণ্যে ঢল ঢল। শালীনতায় সমালোচকদের মুখে তার চরণ। কৃতজ্ঞ ছিলাম তাঁর কাছে, বাংলা সাহিত্যের অন্তত গোটা দুই কাহিনী চিত্রে, তাঁর নায়িকা রূপিণী ভূমিকায়। কিংবা সেই কোমল বিলাসী যুবকটি যে তার পাহাড়ের অভিজাত আশ্রয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ওকে আমি দুর্ভাগা বলতে পারি না কোনো মতেই। সৌভাগ্যবান বলতে গেলেও ঠেক্ লাগে। বাপ-ঠাকুর্দার উপার্জনের বে-ওজনের ধন-সম্পদ। পাহাড়ের বাড়িটার চার ভাগের তিন ভাগই বন্ধ। দোতলার এক অংশে স্বয়ং বিবেকানন্দর বাস-কালের নানা স্মৃতিতে ভরা। আমি অতি তৃষ্ণার্ত চোখে দেখেছিলাম, কুলুপ আঁটা বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে। ওরে কয়েদগুলো, কেন রে তোরা কথা বলিস না?

না, ওরা আওয়াজ দিয়ে কথা বলে না। চোখে চোখে ধ্যান দেয়। কুলুপ আঁটা থাকলে, দীর্ঘশ্বাস শোনে। কিন্তু যুবকটিকে আমার মনে হয়েছিল, দুঃখও তার বিলাস। কে বা সেই নারী, কোন্ বা সেই সুরা, যাতে মন ভরে, সে তা জানে না। অথচ সন্ধান করে। হা! সন্ধানে কি সব মেলে? তার ঘরে বেজে যেতো বাজনা। সুরার ফোয়ারা ডিনার টেবিলে। নর অঙ্গে নারীশোভা, জোড়া জোড়া, নাচের ছন্দে কী বাহার বা! সে তখন খাটের বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে থাকতো। নয়তো বাইরে গিয়ে দেখতো, গাড়ির এঞ্জিন অয়েল ঠিক আছে কী না।

সেই প্রাঙ্গণে কতো মুখের কতো চেনা। হারিয়ে যায়, কিন্তু একেবারে হারায় না। আবার ভেসে ভেসে ওঠে এক এক সময়। কোন্ কোন্ সময়ে তাদের দেখেছি, মনে করে রাখতে পারি না। মন-নজরের টানটা যে সব সময়ে অন্যদিকে থাকতো। সেই এক দূরের আকাশের বুকে। তবু সেই লেখক মানুষটিকে আমার আরো অনেকের মতো ভালো লেগেছিল। সেই প্রাঙ্গণের ধারেই তিনি বরাবরের আশ্রয় নিয়েছিলেন। একটা বই লিখে রাতারাতি নাম। কিন্তু লেখকের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক দলের কী প্রচণ্ড রাগ আর বিদ্বেষ। অথচ সেই দলেরই খণ্ডিত কালের লোকসভার সদস্যকে দেখেছি, তাঁর পাহাড়ের ঘরে, প্রিয় অতিথিরূপে।

এই বৈপরীত্যের জিজ্ঞাসা, ছুরি হয়ে বেঁধা আমার বুকে। কেবল এই একটি ঘটনা না, সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই। সে-রক্তক্ষরণের কথা এখানে না, বারান্তরে। লেখকের মুখে তখন অকাল অস্তাভার ছায়া লেগেছিল। পদক্ষেপ ধীর, হাতে কম্পন। তাঁর দৃঢ়বদ্ধ রক্তরেখা ঠোঁটে অনেক দুরন্ত কথা শুনেছি।

প্রাঙ্গণের বিকালে একদিন শুনেছিলাম অন্য এক স্বর। ব্যাকুল না, উৎকণ্ঠিতও না। সে স্বর প্রার্থনার মতো, 'বাঁচতে বড় ইচ্ছা করছে, বড় ইচ্ছা করছে। ডেথ্ ইজ্ কলিং মী, স্টিল—সে আমাকে আসতে দিচ্ছে না।'

ওহে, এ আবার সাহিত্যের ভাষা না, এখনো কানে বাজছে। তারপরেই যখন আবার প্রাঙ্গণে গিয়েছিলাম, তার সিঁড়িতে পা দিতে কী দ্বিধা। ঘণ্টার শব্দে তাঁর স্ত্রী দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ডেকে বসিয়েছিলেন ঘরে। সেই ঘর। তাঁকে যে আর আসতে দেওয়া হয়নি, সে-কথা আগেই শুনেছিলাম। 'সে আমাকে আসতে দিচ্ছে না।'…জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। কেন যে তখন সোনার খাজাঞ্চিখানা আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, আজো বুঝতে পারিনি। ঘরটি অতিমাত্রায় নিঃশব্দ বোধ হচ্ছিল। সেই সব শোফা-সেট, বইয়ের আলমারি, আর একদিকে খাবার টেবিল। গতায়ু সাহিত্যিকের স্ত্রী বসে ছিলেন কোণের একটি সোফায়। আমাদের কারোরই কথা বলার কোনো দরকার ছিল না।

সেই নৈঃশব্দের মধ্যে পিছনে সামান্য একটি শব্দে ফিরে তাকিয়েছিলাম! দেখেছিলাম, বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাহাদুর—নেপালী যুবকটি। লেখকের সঙ্গে ওকে আমি এই প্রাঙ্গণের বাইরে কলকাতায়ও দেখেছি, তখন ও বালক ছিল। কলকাতা থেকে এই প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ থেকে কলকাতায়, ওকে অনেকবার দেখেছি। বুঝতে পারিনি, তবে ও ডাগরা জোয়ান হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একদিন কবে, নাক-চোখহীন একটি হাসিভরা মুখ করে ঘোষণা করেছিল, 'বাবু আমি বিয়ে করেছি।' বলতে বলতে কাঞ্চনবর্ণ মুখখানি লাল হয়ে উঠেছিল।

পিছন ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে, কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। পারিনি। ওর চোখ থেকে জল পড়ছিল। মনে পড়েছিল, প্রাঙ্গণের সেই ঘরটিতে বাহাদুর আমাদের কতো রকমের রান্না করে খাইয়েছে। কতো পানীয় পরিবেশন করেছে। লেখকের খুব আপত্তি ছিল ওর বিয়েতে। ওর পাহাড়ী বুকটা ছিল কমজোরি। ছেলের মতো দেখতেন। বলতেন, 'বিয়ে করলেই গুচ্ছের ছেলে-মেয়ে হবে, তাদের পুষতে গিয়ে আরো হয়রান হয়ে শরীরটা খারাপ করবি। বয়সের ধর্ম আছে জানি। চুটিয়ে প্রেম কর না।'…কিন্তু লেখকের সেই কথাটিও আমি ভুলতে পারিনি। আকাশের বুকে পাঁচ খাজাঞ্চিখানাকে ঢেকে, মেঘেরা তখন নানা রঙে শূন্যস্থান পূরণ করতে চেষ্টা করছিল। রক্তের আভাসটা ছিল বেশি। লেখকের মুখে অকাল অস্তাভার ছায়ার রেখাটি মাত্র দেখা

দিয়েছিল। কী প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন। একজন গর্ভবতী (স্পষ্টত) মহিলাকে ঘোড়ার পিঠে দেখে, আতঙ্কে উদ্বেগে প্রায় কেঁপে উঠে বলেছিলেন, 'লুক, হোয়াট এ ফুলিশ উয়োম্যান শী ইজ! পেট ভরা বাচ্চা, (এই রকমই বচন ভঙ্গি ছিল) দুলালী ঘোড়ায় চেপে বেড়াচ্ছে। স্বামীটিকে থাপ্পড় মারা দরকার। হাউ হি ডেয়ার্স টু অ্যালাউ হার কর রাইডিং ?'...তারপরে অন্যমনস্ক হয়ে বলেছিলেন, 'আছে হয়তো ঘরে একপাল।'

তাঁর ঘরে একটিও ছিল না। আমি বাহাদুরের চোখের জলে, বড় খাজাঞ্চিখানার সোনার ফোঁটা দেখেছিলাম। আমরা কেউ-ই কোনো কথা বলিনি। বাহাদুর অনেক রোগা হয়ে গিয়েছিল। ও আমার সামনে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়েছিল।

এ প্রাঙ্গণের অনেক কথা। আজ আর সব কথা বলতে মনে ভার চাপছে। কেন আমার এ সব কথা? আমি তো সেই তার দর্শনপ্রার্থী, জলপাইগুড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রথম যাকে দেখেছিলাম। তাকে দেখার কৌতূহলটা এমন এক আকাঙ্খায় পরিণত হয়েছিল, আরব সাগরের জল যে লোনা, তার বাখানি লিখতে উঠে গিয়েছিলাম সেই প্রাঙ্গণে। সমুদ্রের কথা পাহাড়ে বসে লেখা, সে হলো গিয়ে এক মন-গুণের কথা। সেবার আমার আশ্রয় জুবিলি স্যানাটোরিয়ামের তিনতলার ঘরে। এক পত্রিকার কর্তৃপক্ষের আমি অতিথি। কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিরা আশ্রয় নিয়েছিলেন অন্যত্র। বরফ-বড়-খাজাঞ্চিখানা-পাঁচ তেমনই অনুদার। তার সময় ভারি কম। কখন ঘণ্টা বেজে যেতো, টেরই পেতাম না এক একদিন। মাঝখান থেকে মন ভুলিয়েছিলেন, পশ্চিমী খানাঘরের বাঙালী স্টুয়ার্ড মহাশয়। গৃহিণী তাঁর পর্বতকন্যা। স্যানাটোরিয়ামের পিছনে তাঁর ছোট কুটির। কুটিরে মিষ্টি বউ। তার চেয়ে বেশি মিষ্টি খুকু। প্রায়ই খানাঘরের খানার বদলে তাঁর নিভৃত কুটিরে নিমন্ত্রণ জুটতো। সে সময়ে ওরাও কিছু খুশির ভাগ দিয়েছিল। বরেন-সমরেশরা।

সেবারের কথাটা আরো একটু বেশি মনে পড়ে, কারণ পথ বদলের সূচনা সেবারেই। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। চলেছিলাম সমতল ছায়া ঘেরা নিকুঞ্জ পথে, নাম যে কারণে ম্যাল্। হঠাৎ কানে এসেছিল, আমার নাম ধরে ডেকে ওঠার সম্বোধন। ফিরে তাকিয়েছিলাম। প্রায় মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি বেশেবাসে পুরোপুরি সাহেব। মাথার সামনে অনেকখানি চওড়া জায়গা কেশহীন, হাতে ছাতা। তাঁর এক পাশে সুশ্রী এক মহিলা। মেদের বাহুল্য নেই, প্রথম দর্শনে তরুণী বলেই মনে হয়েছিল। আর এক পাশে এক নবীনা

কিশোরী, তুই বেণী দোলানো ঘাড়ে। ওই সেই কী বলে, বেল বাট-এর সঙ্গে বেল্ট আঁটা জামা। সকলের মুখেই মিটিমিটি হাসি, কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা।

আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। মহাশয়টির মুখের হাসিতে কেমন দ্বিধা। কাছে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন?'

আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কয়েক পলক মাত্র। সহসা বহুদিনের ওপার থেকে একটি অতি চেনা চোখ আর হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল আমার স্মৃতিতে। বলে উঠেছিলাম, 'দত্ত? দত্ত না?'

তিনি পথের মধ্যেই আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন, বলেছিলেন, 'সত্যি, কী যে খুশি হলাম, আর কৃতজ্ঞ। কী করে আমাকে চিনলে?'

বলেছিলাম, 'সত্যি, চেনার কিছুই আর রাখোনি। বয়সের থেকে বাড়িয়ে ফেলেছো চেহারাটাকে। কথার ভাবভঙ্গি রীতিমতো রাশভারি। তোমাকে তুমি বলতেই ভয় করছে।'

দত্ত হা হা করে হেসে উঠেছিল। আবার তৎক্ষণাৎ থেমে বলেছিল, 'বাট রিমেমবার, আমি কিন্তু কখনোই তোমার বন্ধু ছিলাম না, তোমার বয়সীও আমি নই। আমি তোমার মেজদার বয়সী, ওরই বন্ধু।'

বলেছিলাম, 'কিন্তু মনে হয়, ছেলেবেলায় তোমাদের সঙ্গে আমাকেও খেলতে দিতে।'

সে হাসতে হাসতে আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিল, 'সত্যি।' বলেই সে মহিলা ও কিশোরীকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আমার স্ত্রী, আর কন্যা। সব থেকে অবাক কাণ্ড কী জানো? আমার স্ত্রী আর কন্যা তোমাকে চেনে—মানে, তুমিই যে সেই লেখক, তা জানে। বোধ হয় কেউ কখনো তোমাকে দেখিয়ে বলে থাকবে। আর এদের কাছেই শুনি, তুমি নাকি প্রায়ই এখানে আসো। এরা আমাকে বাড়িতে গিয়ে বলে, তোমার সেই বন্ধু লেখককে আবার দেখলাম। তোমার সঙ্গে দেখা হয় না? নাকি তোমাকে আর চিনতে পারেন না?' দত্ত ওর স্ত্রীর লজ্জিত হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলেছিল, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানো? তোমার কথা শুনে আমি যখন বলি, ও আমার ছেলেবেলার চেনা, বন্ধুই বলতে পারো, এরা আমাকে বিশ্বাস করতো না।'

কন্যা অমনি লজ্জায় ও সংকোচে, পলকে একবার আমাকে দেখে, পিতার কাঁধের কোটে মুখ চেপেছিল। বলে উঠেছিল, 'আহ্, বাবী!'

দত্তজায়া বলে উঠেছিলেন, 'আহ্, কী সব বাজে বাজে কথা বলছো।'

দত্ত বলেছিল, 'বাজে কথা? তাহলে শোনো ভাই, বলি। এই যে এখন

তুমি যাচ্ছিলে, আমি সত্যিই তোমাকে চিনতে পারিনি। কী করে চিনবো? তুমি তো চেহারায় এখনো যুবকটি রয়েছো। তা, আমার গিন্নি হঠাৎ তোমাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'ওই তো উনি যাচ্ছেন, সেই লেখক। তুমি যে বলো, তোমার ছেলেবেলার চেনা? একবার ডাকো না দেখি।' আমি সত্যিই খুব বিপদে পড়ে গেলাম। তোমাকে চিনি চিনি মনে হলেও, তুমি যদি আমাকে চিনতে না পারো, বউ মেয়ের কাছে প্রেস্টিজ একেবারে পাঙ্চার হয়ে যাবে! তারপরে যা থাকে বরাতে, এই ভেবে তোমাকে ডেকে বসলাম। ভাগ্যিস্ ডেকেছিলাম, আর তুমিও চিনতে পারলে।'

পথচারীদের চমকিয়ে দিয়ে, আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম। দত্ত তথাপি বারে বারে বলেছিল, 'না না, তোমাকে আমি ক্রেডিট না দিয়ে পারছি না। আমার ছেলেবেলার কেউ-ই আর আমাকে দেখলে এখন চিনতে পারে না। আমি একেবারে বুড়িয়ে গেছি।'

আমি সুশ্রী ও উজ্জ্বল দত্তজায়ার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তা হঠাৎ এমন বুড়িয়ে গেলেই বা কেন?'

দত্ত হতাশ হেসে বলেছিল, 'চাকরি, জীবন যাপন, সব মিলিয়েই বলতে পারো। তা ছাড়া আমি দেখতে কোনোকালে শ্রীকান্ত ছিলাম না।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এখন কোথায় চললে?'

দত্ত অবাক হয়ে বলেছিল, 'কোথায় আবার, বাড়ি? এই তো অফিস থেকে ফিরছি। ওরা এসেছিল ম্যাল-এ বেড়াতে, এদের নিয়ে ফিরছি।'

আসল কথাটা কল্পনাতেই আসেনি। সে যে চাকরির সূত্রে পাহাড়ে, ভাবিই নি। নিজেই আবার বলেছিল, 'আয়কর অফিসের চাকরি। তা প্রায় চার বছর এখানে আছি। প্রত্যেক বছরই শুনি, তুমি এখানে এসেছো।'

জেনেছিলাম, দত্ত তখন পাহাড়ের আয়কর অফিসার। ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তখনই। কন্যাটি তো কিছুতেই ছাড়বে না, আঙ্কল্কে বাড়ি নিয়ে যাবেই। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরের দিন সকালবেলা যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। গিয়েছিলামও। গিয়েই দেখেছিলাম সাজো সাজো রব। দু'দিন বাদেই দত্তকে যেতে হবে কালিম্পং। সেখানকারও আয়কর অফিসার সে। সেখানে তার ক্যাম্প বসবে। স্ত্রী কন্যারাও (জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে বাড়িতে দেখেছিলাম।) যাবে, তবে তারা থাকবে আলাদা হোটেলে। অফিসারের কাজের ফাঁকে, পরিবারেরও একটু ভ্রমণ। অতএব, 'আঙ্কল্, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে, কালিম্পং বেড়িয়ে আসবে।'

কিন্তু আমার যে সেবার টিকি মে রাধাকিষণ! আরব সাগর আমার সঙ্গে। পাহাড় থেকে তাকে নামিয়ে যেতে হবে তো। তা বললে কি চলে? প্রায় তখনই হাত ধরে টানাটানি। দত্তর ছোট ভাইও তখন সেখানে, উদ্দেশ্য পাহাড় ভ্রমণ। সেও তার ভাইঝিদের আর বউদি দাদার সঙ্গে দল পাকিয়ে ফেলে ছিল। এক সাড়া, 'চলো চলো, কালিম্পং চলো।' দত্ত বলেছিল, 'তাছাড়া তোমার মনের কথা শুনলাম, তুমি তো ভুল জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছো। তোমাকে যেতে হবে তিস্তার ধার ধরে, পাহাড়ের বুকে তার উৎস সন্ধানে। তোমার পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা তো সেখানেই। কালিম্পং তোমার পথ চলার সরাইখানা, সেখানে তোমাকে যেতেই হবে। সেখান থেকে গ্যাংটক। পাঁচ-খাজাঞ্চিখানার অনেকখানি কাছে পৌঁছে যাবে। অন্তত দেখার জন্য হা পিত্যেশ করে থাকতে হবে না। সারাটা দিন তারা তোমার চোখের সামনে জেগে থাকবে। তাছাড়া আরো কথা আছে।'

আরো কথা? তার কথা শুনতে শুনতে আমার ডানায় যে তখনই কাঁপন ধরেছিল! দু'চোখ ভরা ব্যগ্র জিজ্ঞাসা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

দত্ত বলেছিল, 'তাছাড়া, দার্জিলিং থেকে কালিম্পং-এর রাস্তটা যদি না দেখলে, তো দেখলেটা কী? আমি যে আমি, কেবল লোকের আয়ের খাতায় শ্যেন চক্ষু পেতে রেখেছি, এমন কি নাকে পর্যন্ত গোপন টাকার গন্ধ শুঁকি, সেই আমি ইস্তক রাস্তাটা দেখলে কবি হয়ে উঠি। তার বেশি, গায়ক পর্যন্ত।'

এমন রাস্তা? তারপরে আর আপত্তি চলে কী করে? বিশেষ করে, সে-রাস্তা যদি আবার পাঁচ খাজাঞ্চিখানার দিকেই নিয়ে যায়। অতএব, কলম বাওরে ত্বরা মাঝি, পার করো তোর আরব সাগরের লোনা পানি। আরব সাগরের পাণ্ডুলিপি তখনকার মতো অসমাপ্তই রাখতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলাম, 'নিচে নেমে গিয়ে সমাপ্তি টানবো। এখন আমার ডাক অন্যখানে।'

দত্ত পরিবারের সঙ্গে, আমার বহুদিনের প্রাঙ্গণটি ছেড়ে যাবার আগে, মনটা বারে বারেই খচ্ খচ্ করেছিল। যদিও ঘুরে আবারো এই প্রাঙ্গণে, পরে এসেছি। কিন্তু সেবারের খচ্খচানিটা যেন কেমনতরো। এ প্রাঙ্গণের অনেক স্মৃতি, অনেক মুখ, বার্চ আর পপ্লারের মতো, কচি ফার্ন আর অর্কিডের মতো, পাথরের গোলাপ আর প্রজাপতির মতো আমার হৃদয় জুড়ে ছিল। তার অনেকটাই নানা সুখে দুঃখে ভরা। কিন্তু কাঁটায় বেঁধা ব্যথার মতো অনুভূতিটা কিসের?

কালিম্পং-এর পথে, কোনো এক মনোরম জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। যেখানে একদিকে মৌন মহান উচ্চতার নিবিড় নীল সবুজ, আর একদিকের অতল গভীরে একটি সর্পিল নদীর ধারে ধারে পথ উধ্ব'গামী। কলকল কথায়, ঝরঝর হাসিতে সবাই ঝরনার মতো। আমি এক পাশে গভীর খাদের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রজাপতি উড়ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, 'তোমাকে আমি খুঁজে নেবো।'...যার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল স্যানাটোরিয়ামের নির্জন গভীর উৎরাইয়ে। সত্যি কি কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম? মিথ্যা কি এ তাই ভঙ্গুর নিজেকেও একটু চোট দেয় না? প্রাঙ্গণের ভ্রমণে বারে বারে সেই কথা মনে হয়েছে, আর জপ করেছি, 'যেন খুঁজে না পায়। খুঁজে না পায়...গরীব।' আমার...। নতুন পথের ঠিকানায় হঠাৎ কেনই বা যে কথাটা মনে পড়েছিল। তখন তো সুখের কাল, প্রত্যাশার পথে চলেছিলাম। তবু মনে পড়েছিল। আর নারাণদাকে, 'উপনিবেশ'-এর সেই ব্যালকনি। আমরা কেউ আর কারোর দেখা পাইনি।...

এমন না যে রাজার প্রসাদে গিয়ে উঠেছিলাম। কুইনস্ অব্ হিমালয়-এর হিসাবে। কালিম্পং সেই তুলনায় ঝলকায় কম। এক অর্থে যেন দরিদ্র। রাস্তা-ঘাটের প্রসার, চোখ ভোলানো পসারের বিস্তৃতি, কোনো কিছুই তেমন রানীর মতন না। সাজগোজ যাকে বলে। রানীর প্রাঙ্গণে পা দিয়েই যেমন চোখে ঝলক লেগেছিল, মন উঠেছিল ঝলমলিয়ে, কালিম্পং-এর অভ্যর্থনা সে রকম না। বাজার ছিল, ব্যস্ততাও ছিল। চড়াই উৎরাইয়ের রাস্তার মোড়ে ঝকঝকে ভ্রূকুটি পোশাক পরা পথের নিশানা দেখানোর পুলিশ ছিল। তবু কোথায় সেই রমরমা? ম্যাল কোথায়, সেই অশ্বরাহিনীই বা কোথায়, খোকা খুকু থেকে তাদের দাদা দিদি বাবা মায়েরাও যাদের পিঠে চেপে কতো না রঙ্গ করতো সেখানে? সেই সব ইস্কুল কলেজও নেই, ছাত্রছাত্রীরা যেখানে দল বেঁধে হৈচৈ করে বেড়ায়। সেও তো এক রঙের মেলা বটে।

তবু কী যেন আছে। কল্‌কল্ কলরব নেই। ঝকঝকে ঝলমল নেই। নেই তেমন চঞ্চল চপল গতি, হাসি উচ্চরবে। কিন্তু কোথায় যেন রয়েছে দুটি চোখের অপলক দৃষ্টি। গম্ভীর গম্ভীর মুখ, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসি। চুপচাপ শান্ত। পাথরের ফাটলে, শ্যাওলা ধরা গায়ে নানা বর্ণের ফুল। মনে করিয়ে দেয় অজস্র তারা ছিটানো আকাশ। প্রকাণ্ড আর আকাশ বেঁধা বনস্পতির সারা গায়েই যেন অর্কিডের ছড়াছড়ি। ছোটোখাটো, নামে শহরটির দাওয়ায় এসে ডানদিকে ঘুরে গেলেই এমন একখানি রাস্তা, ঠিক যেন বাংলা-

দেশের কোনো সমতলে এসে পড়েছি। এমন কি রাস্তাটার দু'পাশে সমতলের কিছু কিছু চেনা বৃক্ষও রয়েছে। এমন না যে, কোথায় যেন একটা রহস্য রয়েছে। বরং চুপচাপ শান্ত ভাবের মধ্যে, কোথাও রুদ্ধ হাসির কৌতুকের ছটা লেগে রয়েছে নাকি?

বুঝতে পারি না। বৈরাগ্যের ছায়া লেগে রয়েছে নাকি কোথাও? মন কেন বিবাগী হতে চায়। ছোটখাটোর মধ্যেই, কোথায় যেন অনেকগুলো পথের নিশানা রয়েছে। দূরান্তের পথ, অচেনা দুর্গম আর বিস্ময়কর। যার শেষেই রয়েছে এক সুগভীর স্তব্ধতা, মুগ্ধ আনন্দের ব্যাপ্তি কোনো শব্দকেই যেন উচ্চারিত হতে দেবে না। মানুষেরা সেই পাঁচ-চুড়োর মতো, রঙের খেলা তাদের মুখে। পশুরাও ভিন্ন চেহারার, যেন বাঁচবার তাগিদেই গা ভরে ঘন আর দীর্ঘ লোম গজিয়ে নিয়েছে।

এক বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফেলে আসা প্রাঙ্গণের থেকে এখানকার মানুষের চেহারা ভাবভঙ্গি আলাদা। পাহাড়ের মানুষের মধ্যেও যে কতো রকমের মুখ চোখ, তা বুঝতে সময় লাগে না। দাগ কেটে তফাত বোঝানো মুশকিল। পুরুষের চুলের বিনুনি আর দাড়ি, সেটা বেশবাসের বিষয়। রমণীদের পোশাকের বেলাতেও একই কথা। কিন্তু এই সব অমিলের সঙ্গে, আরো কিছু কিছু অমিল চোখে ঠেক লাগিয়ে যায়। গড়ন পিটন, লোমশ অলোমশ, চোখ চিবুক আর যাকে বলে কপোল। মনে মনে বলি গালের হনু। রঙের ক্ষেত্রেও তাই। ছেড়ে আসা প্রাঙ্গণে নানা রঙের মিশেলটা চোখে পড়তো। এখানে চোখে না পড়ার মতো।

ইতিমধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল যথারীতি। আয়কর অফিসার সাহেবের ব্যবস্থা আলাদা। পরিবারের নিজস্ব ব্যবস্থা আলাদা। যা করতে হবে, সব আইন মোতাবেক। খেলার মাঠের কাছাকাছি একটি দোতলা বাড়ি পরিবারের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আয়কর অফিসারের ব্যবস্থা সরকারী। তিনি তাঁর ক্যাম্পে। তা বলে এমন কোনো আইন নেই, তিনি পত্নী-কন্যা, ভ্রাতা-বন্ধুর সঙ্গে বাস করতে পারবেন না। তবে কী না, তিনি হলেন কাজের মানুষ। আমরা অকাজের। কিন্তু কাজের মানুষের সেই কথাটিতে কোনো ভুল ছিল না। কালিম্পং আসবার পথে সত্যি সত্যি তাঁকে আমি গান করতে দেখেছিলাম। কেমন গান, সে কথা আলাদা। সেই হলো আন্তর প্রকাশ। কথায় ভুল থাক, আর সুরে অমিল, তা-ও যে কতো সুন্দর হতে পারে, পথের প্রাণভোলানো রূপেই তার প্রমাণ মিলেছিল। তার ওপরে ছিল কবিতা আবৃত্তি।

হাততালি দিয়েছিল কন্যারা, বাবীর ভুল ধরিয়ে দিয়ে। বাবীর তাতে কিছুই এসে যায়নি। ভুলভাল্ যা-ই হোক, তিনি তো আর আমাদের শোনাবার জন্য ফুক্‌রে ওঠেননি। তিনি শোনাচ্ছিলেন তাঁর আত্মাকে। মদতদার হিমালয় পর্বত। দত্তজায়াকে কন্যাদের সঙ্গে আলাদা করা যায়নি। কপালে সিন্দুরবিন্দু নিয়েই তিনি বালিকা হয়ে উঠেছিলেন।

আসবার পথে, দু' একবার তিস্তাকে চোখে পড়েছিল। দূর থেকে। দার্জিলিং থেকে কালিম্পং তিস্তা সে পথের শরিক না। সমতল থেকে তার ঘরের পথ আলাদা। সমতলে সে প্রবাসিনী। নাকি অকূলের রণরঙ্গিণী? কী যে তার তন্ত্র, কে-ই বা জানে। কী তার নাড়া, কাদের সঙ্গেই বা তার মোর্চা, অদ্যপি কেউ নিরিখ দিতে পারলো না। কেবল একটা কথা মনে হলে মন ভারি হয়ে আসে। সেও এক পাহাড়ী মেয়ে—পার্বতী। দত্ত তাঁর নানান্ খুশির মধ্যে, দূর থেকে তিস্তাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ওর সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। তোমার এতদিনের আশা, ওর সঙ্গেই বাঁধা। আমার গতি বাংলা মুলুক পর্যন্ত, কিংবা বলতে পারো ভারত। তাই কালিম্পং পর্যন্ত আমি মদত দিতে পারি। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়েই তোমার সেই পাঁচ-চুড়োর সুলুক সন্ধান আমার জানা হয়ে গেছে। তিস্তার ঠিকানাই তাদের ঠিকানা!'

কথার মতো কথায় যে শিহরণ লাগে, তা দত্তর কথাতেই টের পেয়েছিলাম। অনেক দিনের একটা না-জানা ঠিকানা তাঁর মুখে শুনে, মন নেচে উঠলো। সকলেরই নাচে। যাকে খুঁজে বেড়িয়ে মরি, তার ঠিকানা পাওয়া যে কী, সে যে খোঁজে, সে-ই জানে। অবাক লেগেছিল, অথচ ঠিকানাটা এমন কিছু যখ দেওয়া ধন দৌলতের পথের মতো চোরা কৌশলের না। প্রমাণ একটা পেয়েছিলাম, প্রথম রাতটা কাটতেই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, কাঁচের জানালায় চোখ রাখতে গিয়ে, চোখে হাত চাপা দিতে হলো। সত্যি সত্যি চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মতোই। স্ফটিকের ওপর সূর্যছটা লাগলে, তার দিকে চোখ রাখা যায় না। সেই রকমই চোখে লেগেছিল। আকাশের গায়ে অমন বিরাট ধূসর উঠোনটা কিসের? মনে হলো যেন পাকাপোক্ত রাজমিস্তিরি, আকাশের কোলে মেপেজুপে এক উঠোন বানিয়েছে। শাদায় কিঞ্চিৎ তুঁতে মিশিয়ে, কর্ণিক দিয়ে পাথের মতন মেজেছে। আর তার বুকের ওপরেই তুলেছে বিরাট এক সাতমহল। তার ডাইনে বাঁয়ে নিচে মহলের পর মহল। রূপোলী লাল আর মেরুন রঙের ছড়াছড়ি।

দত্ত পিছন থেকে বলে উঠলেন, 'দেখছো তো? ওই তোমার পাঁচ খাজাঞ্চি—

খানার কিছু কিঞ্চিৎ। তুমি যাকে পাঁচ ধরে রেখেছো, তার যে আরো কতো পঞ্চাশ আছে, তার লেখাজোখা নেই। তবে হ্যাঁ, পাঁচই হলো আসল।'

জলপাইগুড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে, সেই প্রথম একজনকে দেখার কথা মনে পড়লো। অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছি, সন্দেহ নেই। আমার ভিতরের কোথায় যে থরথরিয়ে কাঁপছিল, তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারার ইচ্ছেও ছিল না। কারণ আকাশের গায়ে দ্রুত একটা আবরণ যেন কেউ টেনে দিচ্ছিল।

দত্তজায়া হাত বাড়িয়ে ধূমায়িত চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। হেসে বললেন, 'একেবারে মজেছেন দেখছি, চক্ষে হারাচ্ছেন? এখুনি রওনা দেবেন নাকি?'

আবার সেই, টিকি মে রাধাকিষণ। মন টাটিয়ে ওঠে। একটি নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'এ যাত্রায় নয়। নিচে থেকে ঘুরে আসতে হবে। এই হেমন্ত যাবে, সম্ভবত আগামী গ্রীষ্মে।'

দত্ত বললেন, 'তবে মনে রেখো, তিস্তাই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, আর কেউ নয়। আর একজন পারে, তবে সে-পথের ঠিকানা আলাদা। রাস্তাটাও একটু বেকায়দার। তিনি আবার পুরুষ, নাম ব্রহ্মপুত্র।'

দত্তজায়া হেসে বললেন, 'পুরুষের থেকে নারীই ভালো।'

দত্ত বললেন, 'লেখকের পক্ষে। আমাদের শাস্ত্রে তারা বিবর্জিত।'

দত্তজায়া তাঁর চোখের তারা ঘুরিয়ে বললেন, 'কেবল মুখে। কাজে না।'

দত্ত হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওরে বাবা, সময় নেই, সময় নেই। এখুনি অফিসে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি স্নানের গরম জল দিতে বলো।'

দত্তজায়া হেসে, একবার আমার দিকে দেখে চলে গেলেন। দত্তর রণে ভঙ্গটা শিশুর মতো দিব্য সুন্দর।

কালিম্পং-এর পথে আর ঘরে, ভ্রমণে আর নানা গল্পে, কখনো বা তাস খেলে কাটলো। অকাজ নিঃসন্দেহে। কিন্তু অকাজের মধ্যে আনন্দের ছটা, আকাশের বুকে কয়েকবার করেই ঝলকিয়ে উঠতে দেখেছি। কিন্তু এখন দু'দিন ধরে দেখছি, অঙ্গনের দুয়ার খুলে গিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের তফাতটা বোধ হয় এখানে। হেমন্ত যতো শীতের কোলের ঢলে, আমরা ততোই আবরিত হতে থাকি। কিন্তু আকাশের তখন ঘোমটা খোলার সময়। যেদিকেই তাকাই, সবখানেই দেখি রঙের খেলা। এমন কি, পাঁচ-চূড়োর আসল নকল চেনাই অনেক সময় মুশকিল হয়ে ওঠে।

এদিকে ঘণ্টা বাজছে। দত্তর ক্যাম্প পাততাড়ি গোটাবে কবে কে জানে।

দু'সপ্তাহের জায়গায় চার সপ্তাহও লাগতে পারে। তাঁর তো ছুটি কাটাবার সময় না। কাজের দিন। কন্যাদের ইস্কুল কলেজ আছে বটে। থাকবেই তো। এমন ছুটি কাটাবার অবকাশই বা ছাড়তে চায় কে। অতএব প্রজাপতি মেলে দাও তোমার ডানা। দত্তর অনুজের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। তার লক্ষ্য আবার একটু অন্য রকম। সে খুঁজে বেড়ায় তিব্বতের মানুষদের। তাদের কাছে থাকে পাথর আর সোনা। অনেক ক্ষেত্রেই তা নকল। তবু সন্ধানে কী না হয়। মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্য রতন।

অবাক চোখেই দেখেছি, রাস্তার ধারে, ময়লা একখানি (ময়লা কী না, জানি না, আমার চোখে তা-ই) ইয়াকের চামড়ায়, লাল এক খণ্ড কাপড় বিছিয়ে সোনার আর পাথরের অলংকারের পসার নিয়ে বসে আছে, পাথর-মুখো তিব্বতী। পাথরমুখো বলছি বটে, আসলে তুষারমুখো। নানা সময়ে সেই সব মুখে, নানা রঙ খেলে। কিন্তু পথের ধারে, পাহাড়ী ছাগলের চামড়ায়, সোনা আর মূল্যবান পাথরের পসার? কেন, ছিনতাই তস্করেরা কি লোপ পেয়েছে নাকি? পাথরগুলো যদি বা ঝুটা হয়, সোনা যে তা নয়, পরখ করে দেখেছি। তবে তুষারমুখো মানুষগুলো ভারি কারবারি। দু' পয়সা বেশি নেবে, আধ পয়সাটিও কম না। সে সাধারণ মানুষই হোক, আর সেই যে কী বলে, লামাই হোক। চীনাদের তাড়ায় এপারে এসেছে। কিন্তু জপের মালা গুনতে গুনতেও হিসাবের অঙ্ক একেবারে টায়ে টায়ে। তা না হলে, অনেক রেশমী বস্ত্র আর ধাতব বস্তুর দিকে নেকনজর আমারো কম পড়েনি।

মন বসতে দিলে চলবে না, নিচে নামতে হবে। মনের এমনি আনচান ভাব। একা একা আনমনে ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছি দত্তর অস্থায়ী অফিসে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার মুখেই নারী পুরুষ স্বরসঙ্গতে এমন হাসির রেলা কানে এলো, আয়কর অফিসকে মনে হলো, খুশদিলের দরিয়া উথল। ছত্রিশ গণ্ডা ছিদ্রের কথা জানি না, কিন্তু বাড়তি হিসাব পালাবার একটি ছিদ্রও যেখানে শ্যেন চোখে নজর করা হয়, সেখানে আবার হাসি কিসের? চোরের কথা আলাদা। সাধুও যেখানে ঘণ্টা বাজাতে ভুলে যায়, মন্দিরটিকে এমনই ভয়, সেখানে এত খুশ দিলের দরবার কারা বসিয়েছে।

সিঁড়ির ওপরে দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দত্ত বলে উঠলেন, 'আরে তুমি? এসো এসো। এই একটু আগে তোমার কথাই হচ্ছিল!'

আমার কথা? কাদের সঙ্গে? দত্তর টেবিলের সুমুখে মুখোমুখি যাঁদের দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের একজনের গায়ে জড়ানো ফিটফাট ফৌজী পোশাক।

জলপাইও না আবার হলুদ না, কিন্তু ফৌজী পশমী রঙ বেশ গাঢ়। নাভির নিচে, কটিতে চওড়া বেল্ট। কাঁধে কয় তরকা, কিসের চিহ্ন, সে সব বুঝতে পারছি না। কিন্তু পায়ের জুতো থেকে মাথার ছোট চুলের উল্টা টানেও শাল গাছের মতো লম্বা চওড়া চেহারার মানুষটি যে ফৌজী, কোনো সন্দেহ নেই। আর সন্দেহের মধ্যে যা নির্ঘাৎ মনে হলো, উনি একজন অফিসার। গোঁফ-দাড়ি কামানো, একটু লাল মুখ। মোটা ভুরুর নিচে মুখের থেকে বেশি লাল চোখে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

অফিসারের পাশের চেয়ারে—কী বলবো? কিছুদিন আগে এক বিশিষ্ট কবির মুখে শুনেছিলাম, 'পদ্যের ভঙ্গিতে গদ্য লেখা আমার মোটেই ভালো লাগে না।' সেই কবি আবার একজন স্বনামধন্য গদ্য লেখকও বটে। কিন্তু সত্যি বলছি, পাশের চেয়ারে মনে হলো, সব মিলিয়ে একরাশ ফুল, ফুলের মালা, নানা বর্ণে ছড়ানো। এই বর্ণনায় অন্তত একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট, পাশের আসনে যিনি, তিনি রমণী। মন খুঁত খুঁত করে। রমণী আবার মহিলা বা নারীর পরিচয়ের ভাষায়, অশালীন নয় তো?

কতো লোকে কতো কথা যে বলে এক এক সময় তার থৈ তল পাই না। খুঁজলেই কি পাওয়া যাবে? বোধ হয় না। যখন যে-কথাটি মনে আসে, তারেই লাগে ভালো। পাশের চেয়ারে যিনি বসে ছিলেন, দেখলাম তিনি একজন রমণী। রমণীয়ও নিঃসন্দেহে। শাড়িতে তিনি এক কথায় গোলাপবালা। কিন্তু রেশমী গোলাপে, এখনো অজস্র শিশিরবিন্দু। অন্যথায় কেন চিক চিক করে? কিন্তু রেশমী গোলাপ বড় উদাস। না হলে আঁচল কেন লুটায় আসনের নিচে মেঝেয়? রেশমী গোলাপ যদি উদাস, তবে ঢলঢল অঙ্গও উদাস। গোলাপের সঙ্গে মেশানো গোলাপি জামার চিহ্ন কেন খুঁজে পাই না? বড় সংক্ষিপ্ত। কেন, হেমন্তের কালিম্পং-এ কি শীত নেই? বিদায় নিয়েছে? কখন, কেমন করে?

সে-কথা আমার জানবার না, বে-এথ্‌তিয়ার জিজ্ঞাসা। তবু আঁচলবিহীন বুক কি বড় বেশি উদাস না? কপালকুণ্ডলার কালীর রক্তচক্ষের কথা মনে পড়িয়ে দেয় কেন? চোখের দোষ। মানলাম, টলটলে মুখখানিতে সোনার রঙে এত আগুনের মত লাল আভা কেন? ভুরু থাকতেও ভুরু আঁকা, সেটি প্রসাধনের মাহাত্ম্য, এমন কি চোখের কাজলও। তবু চোখের কালো তারা দুটির সরোবর অমন লাল টকটকে কেন?

ঠোঁট দুটি যে কেবল ওষ্ঠরঞ্জনী দিয়ে রাঙানো, তা আদপে না। রঙেতেই

জানিয়ে দিচ্ছে, এ লাল, সেই লাল, তাম্বুলরাগ। কালো চুলের এমন দশা কেন? না হয় তা পিঠ বেয়ে নামেনি, অমন আলুথালু কেন? কপালের সামনের দিকে এলানো, কাঁধে ছড়ানো। যেন একরাশ কালো কেশের মাঝখানে টুকটুকে লাল একখানি মুখ। তবু এত কথা বলেও একটি সার কথা না বলে পারা যাচ্ছে না, রমণীর মুখ যেন একটি শিশুর। কেন? রূপের এ সব ভিয়েন কে করে? মুখের সঙ্গে যেন অঙ্গের মিল নেই। অঙ্গের সঙ্গে ভঙ্গির। ঢলঢল অঙ্গে ঢুলুঢুলু দৃষ্টি কি মানায়! ঠোঁটের কোণে বিকচ হাসি? এত কেন কাঁপে নাসারন্ধ্র? ভুরুলতার বাঁকে জিজ্ঞাসার চিহ্নটা অবিশ্যি পড়তে পারি।

ফৌজী অফিসার আর রমণী, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি। সম্পর্কের কথা তারপরে আর বলে দেবার দরকার হয় না। অনুমান প্রথাসিদ্ধ হলেও বে-ওজর কী? কিন্তু এঁদের সঙ্গে আমার বিষয়ে কী কথা হচ্ছিল? দেখে তো মনে হয় আমরা দূর দূরের লোক। দূরলোকের মানুষ। আশেপাশের চেয়ারে আরো অনেকেই বসে আছেন। বাঙালী অবাঙালী চেনবার উপায় নেই। কিন্তু অসুবিধা নেই পাহাড়ী মানুষদের চিনতে। তাঁরাও আয় করেন, অতএব আয়কর অফিসে তাঁরাও এসেছেন। অস্থায়ী ক্যাম্প হলে কী হবে। কেরানী পিয়ন বেয়ারাও আছে। দত্ত সাহেবের কথা এবং ডাক শুনে কেবল যে ফৌজী অফিসার এবং অফিসারজায়া আমার দিকে ফিরে তাকালেন তা না। সকলেই আমার দিকে তাকালেন।

প্রবেশ মুখেই চোখ চালিয়ে দেখে নিয়েছি, হাস্যরসের কথা যা-ই হয়ে থাকুক, তার রঙ লেগেছে সমতল আর পাহাড়ী সব মানুষদেরই মুখেই। আয়করের দপ্তরে আয়কর অফিসারের সামনেই যে এ রকম হাসি-উচ্ছল আড্ডা জমবার অবকাশ থাকতে পারে, এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল, তার মানে কী? হাস্য কৌতুকের লক্ষ্য আমি নাকি?

দত্ত আমাকে ডাকলেন, 'এসো। এসো।' অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'বাহাদুর, মেজর সাবকো সামনে এক কুরশী লাগাও।'

নিজের এলেমকে বাহাদুরি দিতে হয়। ফৌজী সাহেব যে ভেবেছিলাম, তাতে ভুল নেই। আমি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাহাদুর কুরশী এনে বসাবার আগেই দত্ত বললেন, 'তুমি এসে না পড়লে, হয়তো ডেকেই পাঠাতে হতো। অবিশ্যি হোটেলে গিয়ে তো দেখা হতোই। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মেজর ঘোষাল, আর—।'

বাকীটা শোনাবার আগেই মেজর সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনের ভঙ্গিতে তাঁর চওড়া শক্ত ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। অগত্যা আমাকেও দিতে হয়। করমর্দনই বটে। তিনি আমার হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে খাঁটি কেতায় বললেন, 'হ্যালো! হাউ ড্যুয়ুডু? সত্যি সত্যি একটু আগে আপনার কথাই মিঃ দত্তর সঙ্গে হচ্ছিল। শুনে খুবই খুশি হলাম, আপনি ওঁর ফ্যামিলির সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছেন। ভাবলাম, তাহলে একজন গুণী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

খাঁটি কেতায় কথা শুরু করলেও মেজর ঘোষাল সাহেবের পরের বাক্য সবই খাঁটি বাংলা কেতায়। তিনি নিজেই আবার পার্শ্ববর্তিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে আবার ইংরেজিতে বললেন, 'মীট মাই সিস্টার মিসেস মুখার্জি, মিষ্টি—আই মীন কুন্দনন্দিনী মুখার্জি।'

এই আমার এলেম, আর প্রথাসিদ্ধ অনুমান? দে ধিক্কার! অনুমানের গলায় দড়ি। অনুমানের কর্তা-গিন্নী আসলে ভ্রাতা-ভগ্নী! কিন্তু আক্কেল গুড়ুম করা মুখ দেখিয়ে লাভ কী? এ ক্ষেত্রে মিসেস মুখার্জি কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। আমি প্রত্যুত্তর করলাম। মহিলাদের উঠে দাঁড়ানোটা প্রথা-সিদ্ধ না। তাঁর বিকচ হাসিটি এখন ঠোঁটের ফাঁকে, দাঁতের ঝিলিকে বিস্তৃত। বললেন, 'কুন্দটা কাটা গেছে অনেক দিনই, এখন কেবল নন্দিনী। বসুন আপনি।'

বাহাদুর ইতিমধ্যে কুরশী দিয়েছে। আমি বসলাম। মেজর ঘোষাল বললেন, 'আপনার কথা একটু আগে দত্তসাহেব বলছিলেন, অতএব আপনার পরিচয়টা আর নতুন করে আমাদের জানার দরকার নেই। তবে আপনিই ভালো বলতে পারবেন, আমার বোনের নামের বিষয়ে। কুন্দনন্দিনী নাকি বঙ্কিম যুগের আর কেবল নন্দিনী রবীন্দ্র যুগের, সেইজন্যই কুন্দ কাটা গেছে।'

নাম না বলে, আপাতত আমি মিসেস মুখার্জি বলেই চালাই। তিনি বললেন, 'বাজে কথা বলো না মেজদা, আমি মোটেও তা বলি না।'

মেজর ঘোষাল অবাক হবার ভাব করে বললেন, 'তোদের কারোর মুখেই একসপ্লানেশটা শুনে থাকবো। আমি ওসব ভাবতে যাবো কখন?

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'আসলে কুন্দনন্দিনী নামটা অনেক বড়, ডাকা-ডাকি করতে অসুবিধা, সেইজন্যই কুন্দ বাদ। তাও আমি দিইনি, ইস্কুল-কলেজে আমার বন্ধুরাই নামটা ছোট করে দিয়েছে। আপনার কী মনে হয়?

বলে তিনি তাঁর কিঞ্চিৎ রক্তিম চোখের ঢুলুঢুলু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

ইতিমধ্যে আমার ব্রাণ, মস্তিষ্কে একটা জিজ্ঞাসা বিঁধিয়ে দিয়েছিল। মিসেসের দিকে তাকিয়েও আমার মনে তখন আন চিন্তা। আন চিন্তার ওপার থেকে চমক খেয়ে বললাম, 'আমাকে বলছেন? আমি কী বলবো?'

দত্তসাহেব আর মেজর সাহেব হেসে বাজছেন। কিন্তু মিসেস মুখার্জির রক্তের আভা লাগা মুখ হঠাৎ আরো রক্তাভ হলো। শিশু মুখটি যেন লজ্জায় আরক্ত হলো। কেন যেন বক্ষের খসে পড়া আঁচল একটু টানলেন। কিন্তু বাতাস না থাক, রেশমী আঁচলের মর্জি অন্য রকম। টানলেও সে টানে থাকে না। ডোলে তার স্থিতি নেই। বললেন, আপনার মতামতটা জানতে চাইছি। কুন্দনন্দিনী না নন্দিনী, কোন্‌টা আপনার ভালো লাগে?'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'হ্যা সাহিত্যিকের মতামত পেয়ে যদি পালটে গেল মতটা হয়।'

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'দু' একজন সাহিত্যিকের মতামত ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কিন্তু তাতে আমার পালটে গেল মতটা কখনো হয়নি।'

দত্তসাহেব বললেন, 'তার আগে লেখককে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিতে চাই। তোমার মতে রবীন্দ্র যুগ কি এখনো আছে, না নেই। থাকলে মিসেস মুখার্জির নন্দিনী নাম ঠিক আছে। আর যুগটা যদি তোমাদের হয় তাহলে নামটা কী হওয়া উচিত। আরো ছাঁটকাট না টেনে লম্বা করা!'

এ যে দেখছি কাঠগোড়ায় তোলা! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়? আমি হাত জোড় করে বললাম, 'কলকাতার কচকচিটা এখানে না তোলাই ভালো। সেখানে যুগের লড়াই। কাগজে পত্রে সরাইখানায়। হাতাহাতি মারামারি হয় না বটে, কথার মারামারি থেকে সেটা ভালো। কেউ বলে রবীন্দ্র যুগ শেষ, কেউ বলে গত। কবিরা বলে রবীন্দ্রপ্রভাব গদ্যে এখনো পুরোপুরি। গদ্য লেখকরা বলে, পদ্য রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ভদ্রলোক মারা গেছেন তিন দশকের ওপরে। তাঁকে নিয়ে এখনো যখন এত মাথাব্যথা, তখন একটু কেমন কেমন মনে হয় না?'

আমার জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতেই বোধ হয় সবাই হাসলেন। দত্তসাহেব বললেন, 'তার মানে তুমি তাহলে স্বীকার করলে রবীন্দ্র যুগ এখনো আছে, তোমাদের ওপরেও তার প্রভাব আছে।'

আয়কর অফিসারের মতো কথাই বটে। একে বলে খাঁটি হিসাব কাঁড়িয়ে

নেওয়া। বললাম, 'প্রভাব কতোটা আছে জানি না, যুগটাও বা কী তাও যথার্থ বুঝি না। কিন্তু মহাশয়ের অবদানটা এতই বিশাল. ছেড়ে কথা কইতে পারি না।'

মেজর ঘোষাল বলে উঠলেন, 'অন্তত গানের ক্ষেত্রে তো বটেই।'

দত্ত সাহেব বললেন, 'তাহলে মিসেস মুখার্জির নামটা ঠিকই আছে। মানে যুগোপযোগী।'

আর সেখানেই আমার ঠেক। ঠেক বলেই আমার নজর চলে গেল মিসেস মুখার্জির দিকে। কী করে জানবো, এলানো চুলে, ঘাড় কাত করে তিনি আমার দিকেই দৃষ্টিপাত করে আছেন। আমি তাকানো মাত্র প্রায় তার কোকিল (না কি ময়না ?) স্বরে বললেন, 'বলুন। আমি কিন্তু তর্কে যাইনি, আপনার কথা শোনবার অপেক্ষায় আছি।'

লজ্জা পেয়ে গেলাম। বললাম, 'কী জানি কী মানে করবেন, কুন্দনন্দিনী নামটি আমার বেশি ভালো লাগে। ছাঁটতে যদি হয় তবে নন্দিনী নয় কেন ?'

দত্ত সাহেব বললেন, 'ওহ্ বাবা, তুমি তো দেখছি আরো পেছিয়ে আছো হে! সেই বঙ্কিম যুগে ?'

আমার এই ভালো লাগার দ্বারা কি প্রমাণ হয় ? হলেই বা কী করতে পারি। ভালো লাগে যে। মিসেস মুখার্জি বললেন, 'তার মানে আপনি বলছেন নন্দিনীর থেকে কুন্দ ভালো ? এটা কিন্তু কোনো সাহিত্যিক বলেননি। নন্দিনীতেই নাকি ধ্বনি আছে।'

কথায় যেন ধরতাই পেলাম, বললাম, 'তা যদি বলেন, ধ্বনিমাহাত্ম্য কুন্দ-নন্দিনীতেও কিছু কম নেই। লয়টা দীর্ঘ বটে, স্বরের মধ্যে একটা রাজকীয়তা আছে। তা ছাড়া—।' থমকে গেলাম। বচন একটু বেশির দিকে যাচ্ছে, এই সংকোচে।

মিসেস মুখার্জির ভুরুর বাঁকে ঔৎসুক্য! বললেন, 'বলুন।'

আমি দত্ত আর মেজর সাহেবের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে একবার দেখে হেসে বললাম, 'এটা নিতান্ত নিজের ইচ্ছের কথা। নন্দিনীর সংখ্যা এত বেশি, কুন্দ শুনলেই যেন শব্দে একটা মহিমা পাই। তবে সব মিলিয়ে কুন্দনন্দিনীই তো ভালো।'

দত্ত বলে উঠলেন, 'মানে তুমি দুয়েতেই রইলে। কুন্দ আরনন্দিনী। ভালো।'

সবাই হেসে উঠলেন। মেজর ঘোষাল বললেন, 'তবে ওকে আমরা মিষ্টি বলে ডাকি।'

মিসেস মুখার্জির ঘাড়ে ঝটকা লাগলো। ডান চোখ আর ভুরু প্রায় রেশমী নরম রুক্ষ চুলের আড়ালে পড়ে গেল। ইংরেজিতে বললেন, 'সেটা কোনো ব্যাপার নয়। মিষ্টি (সুইট) যে আমি নয়, সেটা সবাই জানে।' বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

দোহাই। তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা নাকি? তাঁকে আমি অম্ল ঝাল, কিছুই বলতে পারবো না।" তিনি তাঁর সারা অঙ্গে রঙ্গে, হাস্যে, লাস্যে, ভাবে, স্বরে, সুরে, প্রথম দর্শনে একান্তই মিষ্টি! তাঁর অমিষ্টত্ব যদি কোথাও থেকে থাকে, তার সন্ধান আমি জানি না। এমন মহিলার (রমণী বলো!) অমিষ্টত্বের সন্ধানে আমার দরকারই বা কী? তিনি তাঁর সবটুকুতে মিষ্টি থাকুন, আমার তাই প্রার্থনা।

'আপনার কাছে আমি তাহলে কুন্দনন্দিনীই থাকলাম।' মিসেস মুখার্জি ঘাড়ে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'মিষ্টি ফিষ্টি বাজে-নাম। তবে দেখলাম আপনার সঙ্গে মিলে গেল আমার ঠাকুর্দার সঙ্গে। তিনি আমাকে বিশেষ বিশেষ সময়ে নাটুকে ঢঙে লম্বা করে ডাক দিতেন, অয়ি কুন্দনন্দিনী!' বলে হেসে ঘাড় এলিয়ে দিলেন পিছনে, বাঁক রাখলেন বাঁয়ে, আমার দিকে।

মিষ্টির সঙ্গে 'ফিষ্টি' শব্দে বেশ একটি ঘরোয়া বাঙলার খেই পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি শেষটায় ঠাকুর্দার সঙ্গে তুলনীয় হলাম? কী আমার ভাগ্য। কুন্দনন্দিনীর (এখন থেকে তিনি আমার কাছে কুন্দ অথবা কুন্দনন্দিনী) নাসারন্ধ্র তেমনি কম্পিত। কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি, কেবল তাম্বুল রঞ্জিত না, ওষ্ঠরঞ্জনীও দাগানো তাঁর ঠোঁটে। হাসিটি আমার ঠোঁটের কোণে টিপে রাখা। বললেন, 'আর একজন আমাকে কুন্দনন্দিনী নামে ডাকতো। কলেজে যে ছেলেটির প্রেমে পড়েছিলাম।'

সাফ জবান। এর পরে যা ভাবতে হয় ভাবো গিয়ে। কুন্দনন্দিনী একবার তাকালেন তাঁর অগ্রজের দিকে। অগ্রজ হেসে রাজা মাপের একটি সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ছেলেটির যেন কী নাম? প্রণয়, হ্যাঁ তাই তো? নামটাই সেন্টিমেণ্টে ভরা। যদিও তোরা প্রেমটা করেছিলি চুটিয়ে, ঘোষালবাড়ির এক হাঁকানিতেই প্রেমের দফা একেবারে গয়া।' বলে তিনি ফৌজী স্বরে হা হা করে হেসে উঠলেন।

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'ও রকম করে বলো না। ঘোষালবাড়ির হাঁকানিতে এ পর্যন্ত এসেছি। এখন হাঁকানিটা মিনি পুশির থেকেও নরম হয়ে গেছে। কলেজে পড়বার সময়ও যদি ফিরে দাঁড়াতাম, ফলটা কী হতো, তা ভালোই

জানি।' কথাগুলো বলতে বলতে, তাঁর হাসি উধাও, মুখে রক্তাভা বড় চড়া হয়ে উঠলো।

মেজর ঘোষাল বলে উঠলেন, 'আরে মিষ্টি তুই সিরিয়স্ হয়ে যাচ্ছিস নাকি?'

কুন্দনন্দিনী তাঁর কাজল টানা চোখের পাতা কয়েক মুহূর্ত মুদ্রিত করে ঘাড় নাড়লেন তারপরে যেন দমকা নিশ্বাসের সঙ্গে হেসে উঠে বললেন, 'না না, সিরিয়স্ হবো কেন?'

ইতিমধ্যে মেজর সাহেবের প্যাকেট থেকে আমি একটা সিগারেট নিয়েছি। তিনি প্যাকেট বাড়িয়ে ধরলেন দত্ত সাহেবের দিকে। তিনিও একটি সিগারেট নিলেন। মেজর সাহেব ভগ্নীর দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিবি নাকি?'

কেতা-মাফিক এটা আগেই করা উচিত ছিল। এ অভিজ্ঞতাটা আমার আগেই হয়েছে। বাদশাহী আমলের চিত্রে দেখা, বেগম সাহেবের মুখে গড়গড়ার নল। রক্তাধরে ছোঁয়ানো নলটিকে অতঃপরে কোন্ পুরুষে হিংসা না করে পারে? নারীর ধূমপানে এখন আর আমার চোখের ফাঁদ বড় হয়ে ওঠে না। তবে অগ্রজের দান ভগ্নীকে, এই প্রথম দর্শন। এমনই অনায়াসে, ধমকাবার অবকাশও নেই। ইতিমধ্যেই আমার ঘ্রাণের থেকে যা মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়েছিল, তা এখন জিজ্ঞাসার অতীত। কুন্দনন্দিনীর অঙ্গরাগের ফুলেল সুবাসের থেকেও সুরার গন্ধ চড়া। তার ঝিলঝিকমিক রক্তছটা চোখে মুখেও ফুটেছিল। ভ্রাতা ভগ্নী উভয়েরই। এখন দামী সিগারেটের তামাকের গন্ধে সঞ্চারিত নয়া মোহ। উভয়ের সুরা পানের আসরটা কোথায় বসেছিল, আমার অজ্ঞাত। এই অস্থায়ী আয়কর অফিসের ক্যাম্পে যে না, সন্দেহ নেই। দত্তসাহেবকে এ ক'দিনে একবারো ও-পথে যেতে দেখিনি।

কুন্দনন্দিনী মাথা নেড়ে বললেন, 'ভালো লাগছে না, তুমি নাও।' বলে আমার দিকে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? অবিশ্যি তার আগে বলে রাখি, আমি আপনার খান চার-পাঁচেকের বেশি বই পড়িনি। নিন্দে শুনতে যদি লজ্জা না পান, তাহলে আপনার প্রথম বইয়ের নায়িকা শ্যামাকে ছাড়া, কোনো নায়িকাকেই আমার পছন্দ হয়নি।' বলে তিনি ময়না স্বরে কাঁপানো শিস্ দেবার মতো হাসলেন। তৎসঙ্গে অঙ্গরাগের ফুলেল সুবাস এবং সুরার বাসও ছাড়ালো। বললেন, 'তবে বাদ বাকি ঠিক আছে।'

বললাম, 'যদি অভয় দেন, তাহলে বলি, আমি নিজের ইচ্ছের কারোকে নায়িকা করিনি। চরিত্ররা তাদের নিজের মতোই এসেছেন গিয়েছেন।'

'যেমন এখন আমি কুন্দনন্দিনী।' বলে তিনি হাসতে গিয়ে, ঠোঁটের ওপর কয়েকটি আঙুল রাখলেন।

দেখলাম, নখে তাঁর শাড়ি জামার মতো গোলাপি রঙ, অনামিকায় নীল পাথরের, লাল চক্ষু ড্রাগনমুখো সোনার একটি মস্ত আংটি। আবার বললেন, 'এ সময়ের ঘটনা যদি আপনি লেখেন, নায়িকা হবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে?'

আমি তড়িঘড়ি বললাম, 'একশো ভাগ।'

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সবাই হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, 'এবার বলুন, আপনার এই কালকূট নামের কারণ কী? অবিশ্যি লেখার মধ্যে আপনি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু—।'

'কিন্তু এক্সকিউজ মী মিষ্টি।' মেজর ঘোষাল হাত তুলে বলে উঠলেন, 'মিঃ দত্তর কাজের কথাটা ভুলে যাস্ নে। আমরা ওঁর অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি। লোকজনও অনেকে বসে আছেন। আর ডিসটার্ব করা উচিত নয়।'

দত্ত সাহেব বললেন বটে, 'না না, কিন্তু ঢঙটা এতোই আল্‌গা বা স্খলিত, মেজর ঘোষালের কথাই সত্যি প্রমাণ করছে। আমি দত্ত সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অমায়িক হাসির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব। তিনি আশেপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। মেজর ঘোষাল আবার বললেন, 'আমি মিলিটারি ম্যান, আড্ডা দিতে জানি, সময়ে তা ভাঙতেও জানি। আমি বলছি, মিঃ দত্তর অফিস এখন ছেড়ে যাওয়া উচিত, ওঁকে কাজ করতে দেওয়া উচিত। আমরা বরং লেখক মশাইয়ের সঙ্গে বাইরে একটু গল্প করে নেবো। আমি তো অবিশ্যি আজই সন্ধেয় ফিরছি, আরো সময় পাবো।' বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

এক এক জনের উচ্চতা, সামনে দাঁড়াতে দেয় না। মেজর ঘোষালের উচ্চতা সেই রকম। মেদবর্জিত হাড়পুষ্ট ঋজু শরীর, নাভির নিচে মোটা বেল্ট জড়ানো। কুন্দনন্দিনীও উঠে দাঁড়ালেন, দত্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সরি, মিঃ দত্ত। কিন্তু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।'

দত্ত সাহেব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এতে আবার ধন্যবাদের কী আছে। ওর মেজদাই আমার আসল বন্ধু, সেই তুলনায় ও আমার থেকে

ছোট। তবে এখন আর তা বলা যাবে না। ও যে কবে কেমন করে লেখক হয়ে গেল, আর এ রকম একটা নামে, তাই জানতে পারিনি। সে যাই হোক, মিসেস মুখার্জি, আপনি একেবারে নেমে যাবার সময়ে অফিসে দেখা করে গেলেন, একবার আমাদের আস্তনায় যাওয়া হলো না।'

কুন্দনন্দিনী রেশমী আঁচল তুলে বক্ষে স্থাপিত করলেন। কিন্তু আঁচল বড় বেয়াড়া, বুকের ডৌলে ওর আড়ি। কুন্দনন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের নম্র বুকে একটা অনম্র ঔদ্ধত্য আছে। রেশমী আঁচলটা মাতাল না তো? যেন খোয়ারি না কাটাতে পেরে, বারেবারেই লুটিয়ে পড়ে যেতে চায়। অতএব, তাঁকে ধরে রাখতে হয় আঁচল, সেই সঙ্গে হাতের মুঠোয় ছাপ-কাটা একটি রেশমী রুমাল। বললেন, 'নিচে নামছি বলে ধরেই নিচ্ছেন কেন আর ওপরে উঠবো না?'

দত্ত সাহেব বললেন, 'তখন হয়তো আমার কালিম্পং-এর ক্যাম্প উঠে যাবে। তাহলে দার্জিলিং-এ আসবেন। মিঃ মুখার্জি আপনার জন্য শিলিগুড়িতে অপেক্ষা করছেন।'

'ভুল করলেন, আমার জন্য না।' কুন্দনন্দিনী বললেন আঁচল ধরা হাতটি বুকের ওপর ঠেকিয়ে, 'তিনি তাঁর কাজের জন্য এসেছিলেন নর্থ বেঙ্গলে, ট্রাংককলে সম্বন্ধীকে ডেকে বললেন, আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চান। আমি কারোর ইচ্ছে মেনে চলতে পারি না। তবু দাদা বলছেন যেতে, তাই যাচ্ছি। মগর নতিজা ক্যায়া হোগী, ও ম্যায় নহি জানতি।' বলে হেসে উঠলেন।

আবার সেই ফুলেল আর সুরার বাস। মেজর ঘোষাল দত্ত সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বিদায় নিলেন, বললেন, 'ফিরে এসে দেখা হবে, আরো ওপরে যাবার আগে। আপাতত বাইরে গিয়ে লেখক মশাইয়ের সঙ্গে আধ ঘণ্টা আলাপ করে যাবো।'

কুন্দনন্দিনী ইংরেজিতে বললেন, 'পৃথিবীতে বিস্ময়ের বিষয় কমই আছে, এটা জানবেন। চলি, নমস্কার।' কপালে হাত ঠেকাবার ভঙ্গি করে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

দত্ত সাহেব নমস্কারের জবাব দিয়ে আমাকে বললেন, 'তুমি ওঁদের সঙ্গে গল্প করে, হোটেলে ফিরে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করো, বিকালে দেখা হবে।'

আমি ভ্রাতাভগ্নীর সঙ্গে অফিসের বাইরে এলাম। কুন্দনন্দিনী আর যা-ই হোন, তাঁর মধ্যম অগ্রজের উচ্চতার ধারে কাছে ওঠেননি। সেটাই যা রক্ষে! কিন্তু মেদ কি তাঁকে আক্রমণ করেছে? পৃথুলা তাঁকে কোনো রকমেই বলতে পারি না। তাঁর ঢলঢল লাবণ্যে, মেদের প্রথম থাবাটা বোধ হয় পড়েছে। মেদের

প্রথম ধাবায় সর্বনাশের ইঙ্গিত থাকে। সেটা দু'রকম। আপাতত আকর্ষণের তীব্রতায়। ভবিষ্যতে মেদের পূর্ণ জয়, যা রমণীর সর্বনাশের শেষ ধাপ। বাইরে এসে মেজর ঘোষাল আমাকে বললেন, 'আসুন, কোথাও একটু নির্জনে গিয়ে বসা যাক।'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু আগের কথাবার্তায় মনে হলো, উভয়েই শিলিগুড়ির পথে নামতে চলেছেন। এখন নির্জনে গিয়ে বসাটা কী ইঙ্গিত করে, বুঝতে পারছি না। আমার বুঝে ওঠার আগেই, তিনি পথের ধারে পপলারের ছায়ায় দাঁড়ানো একটি ফৌজী জীপ গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাৎ ফৌজী এক তরুণ সর্দারজী লাফ দিয়ে নামলো জীপের ভিতর থেকে। দাঁড়ালো একেবারে কাঠের মূর্তির মতো। কেবল ঝকঝকে চোখের তারা দুটি ঘুরে গেল আমাদের ওপর দিয়ে।

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'মেজদা, এখানে এখন কোথায় আর বসবে? তার চেয়ে লেখককেই নিচে নিয়ে চলো না। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আসবার সময় তুমি যদি একলা ফেরো, উনি সঙ্গে থাকবেন, বোরড হবে না।'

মেজর সাহেব ভুরু কুঁচকে এক লহমা ভেবে বললেন, 'এটা তো মন্দ বলিসনি তুই। তা ছাড়া লেখক তো আর অফিসের কাজ নিয়ে আসেননি, বেড়াতেই এসেছেন। একটা দিন না হয় নামা ওঠাতেই কাটলো। কী বলেন? চলুন, শিলিগুড়ি থেকে ঘুরে আসবেন।'

এমন কিছু একটা আকাশ থেকে পড়ার মতো কথা না। তবু বিস্ময়ে ঠেক খেতে হয় বৈকি! আকস্মিকতা বলে একটা কথা আছে তো। বললাম, 'এখন শিলিগুড়ি নেমে, আবার ফিরে আসবো?'

'নয় কেন?' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আপত্তির কোনো কারণ দেখছি না তো। আপনার হোস্টকে ইনফরমেশান দিয়ে এলেই হয়। হোস্টেস্ নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না?'

দত্তজায়া? কেনই বা আপত্তি করবেন। কিন্তু এ যেন কেমন, নিয়মকানুনের বিধিনিষেধ ভেঙে, দলছাড়া ঘরছাড়ার মতো না? অবিশ্যি আমার ছুটে চলার বেগে যে একটা কম্পন অনুভব করছি না, তা বললে মিথ্যা হয়। কুন্দনন্দিনী আপত্তির কথা বললেন। আমি ভাবছি, ক্ষতি কী?

মেজর ঘোষাল বললেন, 'আমি দত্তসাহেবকে বলে আসছি।' বলেই তিনি আর কোনো কিছু শোনবার অপেক্ষা না করেই আবার খোলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ছুটে গেলেন।

কুন্দনন্দিনী হাসলেন, সেই সুবাস ছড়িয়ে বললেন, 'খুব বেকায়দায় পড়ে গেলেন, না?'

বললাম, 'এটাকে বেকায়দায় বলবো কেন? হঠাৎ করে ঘটেছে বলেই, একটু যা হকচকিয়ে যাচ্ছি। বেড়াতে আমার ভালোই লাগে।'

'একটুই যা অসুবিধে, আমরা আপনার কাছে নতুন মানুষ।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'ভাববেন না, খুব বিরক্ত করবো না। তবে আমাদের ভালো লাগবে কিনা, সেটা আপনার রুচি আর মেজাজের ব্যাপার। কিন্তু আপনি তো লেখক। না হয় আমাদের মতো মানুষকেও দু'দণ্ড দেখবেন।'

সত্যি কথাটা অনায়াসেই বললাম, 'লজ্জা দেবেন না। খারাপ লাগবার কোনো কারণ দেখছি না। আর যদি আপনাদের ভালো না লাগে সেটাও আমি টের পেতে দেবো না।'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'সেটা আপনার লেখাতেই দেখেছি। বেশ লাগসই মিথ্যা আর চাতুর্য আপনি বেশ কাজে লাগাতে পারেন।'

আমার হেসে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। রাগ করবো? কোনো কারণ নেই, আর সেই কথাটাই ঘাড় বাঁকিয়ে, ভুরু নাড়িয়ে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'রাগ করলেন না তো?'

বললাম, 'একটুও না। বরং ভয় পাচ্ছি, আপনি আমাকে বেশি চিনে ফেলবেন কী না।'

কুন্দনন্দিনী খিলখিল করে হাসলেন, সেই সঙ্গে সুবাস। বললেন, 'এটি আপনার আর একটি চাতুর্য।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি জানি না, দু'দণ্ডের সাহচর্যে, আমাকে আপনাদের ভালো লাগবে কি না।'

'বলে দেবো সেটা।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আমি আপনার মতো চাপাচাপি করতে পারবো না। যা মনে হবে, সব বলে দেবো। আর আমার মেজদা? ও হয়তো আপনার ওপর দিয়ে যায়। এক এক সময় এমন গ্রানাইট পাথরের মতো মুখ করে রাখে, কিছুই বোঝা যায় না। এমন কি হাসলেও বোঝা যায় না, রাগলেও বোঝা যায় না।'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'সে তো আরো মারাত্মক। তা উনি কি কালিম্পং-এ পোস্টেড?'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'না না, মেজদা আছে সিকিমে। আমরা গতকাল নেমে এসেছি এখানে। রাতটা কাটিয়ে আজ যাচ্ছি শিলিগুড়িতে। মিঃ দত্তর

সঙ্গে মেজদার জানাশোনা আগেই। উনি ক্যাম্প করেছেন শুনে, মেজদা একবার দেখা করতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে মিঃ দত্তর পরিচয় আজই প্রথম।'

মেজর ঘোষাল তাঁর ফৌজী পাদুকার কঠিন আর দ্রুত শব্দে এগিয়ে এসে বললেন, 'মঞ্জুর। তিনি টেলিফোন করে হোটেলে মিসেসকে জানিয়ে দিলেন।'

'মেজদা, তুমি সত্যি লক্ষ্মী ছেলে।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'কিন্তু তুমি আর একটু লক্ষ্মী হও। তোমার ওই বাহকটিকে কালিম্পং-এই রেখে যাও, তুমি নিজে ড্রাইভ করে চলো। ওর সামনে আমি যেন কেমন ঠিক ইজি হতে পারি না।'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'তোর অনুরোধ রাখতে পারি, কিন্তু তাহলে আর বেশি-খাবো-টাবো না। রাস্তাটা তো স্টিফ্।'

খাওয়ার কথা কেন আসছে, বুঝতে পারলাম না। কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আরে মেজর সাব, আপকো তো ম্যায় থোড়া বহুত জানতি। আপনি এখন বাহনটিকে ছুটি দিয়ে বলুন, খাও পিও মস্ত্ রহো। আমিই বরং ওকে কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছি।'

'বাজে কথা বলিস না।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'যা দেবার তা আমিই দেবো। কিন্তু আর দেরি করার উপায় নেই। তিস্তা ব্রিজ খোলবার সময় হয়ে এলো।' বলেই তিনি তরুণ সর্দারজীর কাছে গিয়ে কিছু বললেন। পকেট থেকে ব্যাগ বের করে টাকা দিলেন। আমাদের দিকে ফিরে ডাকলেন, 'চলে আসুন।'

কুন্দনন্দিনী ডাকলেন, 'আসুন।'

মেজর ঘোষাল বাঁদিকের চালকের আসনে বসলেন। ভগ্নী গিয়ে বসলেন অগ্রজের পাশে। অতএব আমাকে যেতে হয় পিছনে। কিন্তু কুন্দনন্দিনী ভ্রূকুটি করে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? সামনে আসুন। আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি কি পিছনে বসাবো বলে? দেখলেন ড্রাইভারকে হটালাম, নিজেরা একসঙ্গে যাবো বলে? উঠে আসুন।'

লজ্জা এবং কৃতজ্ঞতাবোধ দুটো একসঙ্গেই কাজ করলো। মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, 'আপনি তো মশায় আমাদের প্রায় ইনসাল্ট্ করতে যাচ্ছিলেন।'

আমি ভিতরে উঠতে উঠতে বললাম, 'সে সাহস আমার নেই। কিন্তু আমিই ধারে বসবো? আপনি মাঝখানে?'

কুন্দনন্দিনী কিছুটা বাঁয়ে হেলে বসে ছিলেন, আমাকে ঠিকমত বসতে

দেবার জন্য। আমি উঠে বসবার পরে, তিনি সোজা হলেন। এখন আর ঘন সান্নিধ্যের স্পর্শ বাঁচানো গেল না। বরং রেশমী আঁচল তার বুকে আড়ি দিয়ে, এলিয়ে পড়লো আমারই কোলে। তিনি বললেন, 'অতিথি সেবা করছি। শত হলেও বামুনের মেয়ে তো। আপনি বরং ইজি হয়ে বসুন। কাঠ হয়ে বসে থাকলে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

একেবারে যে ছিলাম না, তা না। কিন্তু কতোটা 'ইজি' হওয়া যেতে পারে? সামনের আসনে তিনজন বসতে গেলে, যতোখানি লাগালাগি ঠোকাঠুকি হওয়ার কথা, তাই হচ্ছে। যদিও, আমার আড়ষ্টতা এই মুহূর্তেই কাটবার না। অভিজ্ঞতার থেকে বললাম, 'এখন যদি বা কাঠ হয়ে থাকি, গাড়ি চললে তা আর থাকতে পারবো না।'

মেজর ঘোষাল ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়বার মুহূর্তে বাইরে তাকালেন। তরুণ সর্দার ফৌজী সেলাম দিল। মেজর বাঁ হাত নেড়ে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। কুন্দনন্দিনী বললেন, 'তার জন্য অপেক্ষা না করে আপনি এখনই ইজি হয়ে যান। আর বেশি ডাইনে সরে যাবেন না।' বলে তিনিই আর একটু ডাইনে এলেন।

কিন্তু আমার কোলের ওপর ছিঁচকে মাতাল আঁচলটার কী করা যায়? নিজের হাতে তো তুলে দিতে পারি না। কুন্দনন্দিনীর জামার ফাঁদটিও বুকের বা পিঠের দিকে অতি সংক্ষিপ্ত। শীত যে তাঁর নেই বুঝতেই পারছি। সেটা সম্ভবত অনেকখানি দ্রব্যগুণবশত। কিন্তু আমার চোখে কেন যে এত ছায়া। তার বক্ষের ডৌলে দৃষ্টিপাত মাত্র, মস্তিষ্কে যেন কী একটা বিঁধে যাচ্ছে। দৃষ্টি যায়ই বা কেন? কেন রে দৃষ্টি যাস্? চোখ কেন পুরুষের? কেন রে চোখ পুরুষের? মা কেন জন্ম দিয়েছিল? কেন রে মা জন্ম দিলি? ধর্ম-পালন করতে। নটে গাছটি এখানেই মুড়নো ভালো। তবু মনে জিজ্ঞাসা, চোখে না হয় রক্তের আঁচ লাগে। লাগে গালেও। দ্রব্যগুণে কি বক্ষও রক্তিম হয়ে ওঠে? তাই তো দেখছি। বক্ষান্তরের মাঝখানে অনেকখানি নিচে উপচে পড়ার মতো একটি স্রোতস্বিনী যেন। বাম বক্ষের ডৌলে তিলটি কি মিটিমিটি হাসে নাকি?

না, হায়া লাজ সব হারাতে বসেছি। নজর খাড়া রাখি না, নজর কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়। গাড়ি শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের নিরালায় এসে পড়লো। কুন্দনন্দিনী প্রায় আমার গায়ের ওপর দিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে নিচু হয়ে পিছন দিকে তাকালেন, বলে উঠলেন, 'ওহ্, ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। ভাবলাম ব্যাগটা বুঝি কালিম্পং-এই ফেলে এলাম।'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'তোর নিজের কাঁধের ব্যাগটা ভোটান হাউসেই ফেলে এসেছিলি। সেটা আমি হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম। তোর আসল ব্যাগটা তো তুই নিজের হাতেই তুলেছিলি।'

কুন্দনন্দিনী কিছু একটা নাড়াচাড়া করছেন। তাঁর দক্ষিণ বক্ষ আমাকে ছুঁয়ে, পিছনে কাঁচের বোতলের ঠুং ঠাং শুনতে পাচ্ছি। তাঁর রেশম-কোমল রুক্ষ চুলের গোছা স্পর্শ করছে আমার কান আর চোয়ালের কাছে। অস্বস্তি বোধ করছি এই কারণে না। তিনি যদি এমন কষ্ট না করে, আমাকে সাহায্য করতে অনুমতি করতেন, ভালো হতো। দ্বিধা করেও শেষ পর্যন্ত না বলে পারলাম না, 'আপনাকে কি আমি একটু সাহায্য করতে পারি?'

কুন্দনন্দিনীর স্বর শোনা গেল প্রায় আমার কানের কাছেই, 'পারতেন, কিন্তু ঠিক জিনিসটা চিনতে পারবেন না। আমি জল মেশানো বোতলটা খুঁজছি।' বলতে বলতে তিনি আবার সামনে ফিরে এলেন, বসলেন, নতুনের মধ্যে হাতে একটি বোতল।

বোতলের অনেকখানিই রক্তিম পানীয় ভরা। পাশ ফিরে নিচু হওয়ার জন্যই বোধ হয় তাঁর মুখ এখন অধিকতর লাল, কণ্ঠার নিচে বক্ষস্থলও। মাথা ঝাঁকিয়ে গালের চুল সরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সব জিনিসের সঙ্গে পরিচয়-টরিচয় আছে তো?'

অস্বীকার করলে মিথ্যা বলা হয়। বোতলের বস্তু যে রঙীন সুরা, নেহাতই সরবত না, তা বুঝতে পেরেছি। ভ্রাতাভগ্নীর নিশ্বাস-নির্গত ঘ্রাণ থেকে আগেই তা অনুমান করেছিলাম। ব্যর্থ হয়েছিলাম একটি বিষয়ে, উভয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। একেবারে ভেঙেই বললাম, 'মনে হচ্ছে রাম্।'

'হ্যাঁ, একেবারে সিকিমের খাঁটি কালো বেড়ালের রক্ত।' কুন্দনন্দিনী হেসে উঠে বললেন, 'তবে কিছু শাদা জল আর আধ বোতলটাক কোকস্ মেশানো আছে। স্বাদটা মুখরোচক হয়।'

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সিকিমের খাঁটি কালো বেড়ালের রক্ত নাকি? জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

'সিকিমের খাঁটি কালো বেড়ালের রক্তটা কী?'

ভ্রাতাভগ্নী উভয়েই হেসে উঠলেন। মেজর ঘোষাল বললেন, 'সিকিমে—মানে, গ্যাংটকে কখনো যাননি বুঝি?'

বললাম, 'এখনো সৌভাগ্য হয়নি।'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'তাহলে এখনই খানিকটা সৌভাগ্য লাভ করুন।

এ হচ্ছে সিকিমের ব্ল্যাক ক্যাট রাম্। আমার মতে জ্যামাইকা বা কিউবান রামের থেকে কোনো অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং ভালো।'

এতটা অভিজ্ঞতা আমার নেই। জ্যামাইকা কিউবা তো অনেক দূরের কথা, ভারতের তিন এক্‌স-এর পরে সিকিমের কালো বেড়াল দর্শন এই প্রথম। বললাম, 'তাই নাকি? আগে কখনো দেখিনি।'

'তাহলে একেবারে একটু চেখেই দেখুন।' কুন্দনন্দিনী আমার মুখের সামনে বোতলটা তুলে ধরলেন।

আমি হেসে বললাম, 'প্রথমেই অরসিকে কিছু অর্পণ করবেন না। কিন্তু গাড়িতে যেতে যেতেই শুরু করবেন নাকি?'

কুন্দনন্দিনী ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তারপরে মুখ ফিরিয়ে অগ্রজের দিকে। মেজর একটা পুরো ইংরেজি ইউ অক্ষর পাক দিয়ে নামতে নামতেও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। তৎসহ খিলখিল সঙ্গত ভগ্নীর। মেজর বললেন, 'মিষ্টি, তুই কি সবাইকে নিজেদের মতো ভাবিস?'

কুন্দনন্দিনী সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গাড়িতে যেতে বা হাঁটতে হাঁটতে বা আকাশে উড়তে উড়তে, এটার আবার সময় অসময়ই আছে নাকি?' ইংরেজিতে বললেন, 'তৃষ্ণা যেখানেই পাক, পানীয় থাকলে তা পান করবো না?'

এতখানি? তাহলে জিজ্ঞেস করা কসুর হয়েছে। কিন্তু নিচে নামছেন তো স্বামী সন্দর্শনে, স্বামী-সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে। এ অবস্থায় এতটা তৃষ্ণা মেটানো আমার কাছে যেন তেমন তালে বাজছে না। কেই-বা বাজতে বলছে? বললাম, 'তা ঠিক। যার যেমন।'

'কেন, আপনার কি এ সব পানীয় নিতে হলেই গদীতে বসে, তাকিয়ার হেলান দিতে হয় নাকি?'

কুন্দনন্দিনী নাক কুঁচকে একটু হাসি যেন টোকা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন। পরমুহূর্তেই ভুরু কাঁপিয়ে বললেন, 'তার সঙ্গে একটু গানবাজনা? মাইকেল?'

বিদ্রূপ না অপমান? নাকি নিতান্তই ঠাট্টা আর রঙ্গ? আমার শ্রেণী যাচিয়ে নিতে চাইছেন? নিজেই আবার দমকা নিশ্বাস ফেলে বললেন 'অতিথিকে বিদ্রূপ করবো না। তবে আমার গানই শুনতে হবে। একটু যদি আয়েস করতে চান, আমার কাঁধ আছে।' বলে তাঁর ডান কাঁধ একটু উঁচু করলেন।

আমি একবার মেজর ঘোষালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তিনি ঠোঁট টিপে হাসছেন, দৃষ্টি সামনে। অতি দুরূহ সর্পিল উৎরাই বেয়ে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন। পরিচয়টা সত্যি নতুন, সন্ত সন্ত। অগ্রজের সামনে ভগ্নীর মুখের কপাট এমন হাট করে খোলে কেমন করে? বোধ হয় নিতান্ত মুখের কপাট বলেই। বুকের কপাটের কথা আলাদা। হাট করে খোলা বুকের কপাটের বচন বাচন সবই আলাদা। অতএব, রঙ্গ নিশ্চয়ই। বললাম, 'যতোটা ঠাহর করেছেন, ততোটা না। তবে গদীতে বসতে ভালোবাসি, তাকিয়া হেলান দিতেও। গান? পাগলের মতো শুনতে ভালোবাসি। মাইফেল করাটা কখনো ঘটে ওঠেনি।'

'তবে একটা মিনি অ্যাণ্ড অটো মাইফেলই হোক।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'বস্তুটি আপনার কাছে নিষিদ্ধ নয় তো?'

বললাম, 'নিষিদ্ধ তো বটেই।'

কুন্দনন্দিনী যেন প্রায় আঁতকে উঠে শব্দ করলেন, 'অ্যাঁ?'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, আর সেইজন্যই আকর্ষণও বোধ করি।'

কুন্দনন্দিনী আমার কথা বুঝে ওঠার আগেই মেজর ঘোষাল হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'বিউটিফুল। যুদ্ধে কোথাও জয়লাভ করলে, শুধু এ কথার জন্যই আপনাকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা যা খুশি তাই লুঠ করতে দিতাম।'

আহ্, ফৌজী মেজাজের কী অভিরুচি, কমপ্লিমেণ্ট আর কাকে বলে। তবে প্রকৃত ফৌজী কমপ্লিমেণ্ট। কুন্দনন্দিনী আবার বোতলটা সামনে তুলে বললেন, 'তাহলে সংযম দেখাচ্ছেন কেন? নিন।'

বললাম, 'আকর্ষণটাকে একটু নিয়মে আর সময়ে বাঁধতে চাই।'

'কিন্তু আজ আপনার নিয়ম আর সময় সবই আমাদের হাতে।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'মানেন তো?'

'মানি।'

'তবে নিন।'

'শুরু করুন। নিয়ম আর সময়ের সীমা যখন আপনাদের হাতে, এটাও আপনাদের হাতেই। শুরুটা আপনাদের।'

'কিন্তু আমাদের আলাদা পাত্র নেই।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'এক পাত্রে ঠোঁট ছোঁয়াতে পারবেন তো? কারণ বোতলে মুখ ঠেকিয়েই সবাইকে খেতে হবে। আলগা করে গলায় ঢালার কোনো উপায় নেই, আমি তো পারি না।'

বলেই তিনি বোতলের সঙ্গে নিজের মুখটিও ঝুঁকিয়ে নিয়ে এলেন আমার দিকে। ঘাড় ঈষৎ কাত করে, অতি ঘন নিশ্বাসে অঙ্গরাগের ফ্লেল আর সুরার গন্ধ ছড়িয়ে বললেন, 'অবিশ্যি একটা গ্যারান্টি আপনাকে দিতে পারি, আমার কোনো খারাপ অসুখ নেই।' বলেই ময়না স্বরে খিলখিলিয়ে, মুখ নুইয়ে দিলেন প্রায় আমার কাঁধে।

সেই কথাটি আবার আমার মনে পড়লো, গরীব আমার প্রাণ। এ গরীবির কথা বলতে পারিনি এক পর্বতকন্যাকে। এখনো বলতে পারবো না এই সমতলের বধূকে। বুঝতে পারি তাঁর হৃদয় ধনী, তার সঙ্গে দ্রব্যগুণের লীলায় মাতোয়ারা। আমার গরীবি আড়ষ্ট হয়ে যায়। গরীব প্রাণটা পুরুষের কী না। কিন্তু আপাতত আমার ঠেক লেগেছে অন্যত্র। একজন যদি জানান দেন, তাঁর কোনো খারাপ ব্যাধি নেই, তাহলে আমাকেও ঘোষণা করতে হয়, আছে কি নেই? অন্যথায় তাঁর অভয়দানের মান যাবে না? তা-ই বা আমি যেতে দিই কেমন করে? এবার জিজ্ঞেস করি নিজেকে, খারাপ অসুখ কাকে বলে?

মেজর ঘোষাল বললেন, 'অ্যালকোহলের কাছে কোনো অসুখের ব্যাপার নেই। কাটা ছেঁড়ায় এ জিনিস অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে। বিষয়টি ভয়ের না, টেস্টের—মানে, রুচির। রুচিতে যদি না আটকায়, তাহলে সব ঠিক আছে।' বলে তিনি আমার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে হাসলেন।

গাড়ি এঁকেবেঁকে ক্রমেই নিম্নমুখী। পাহাড়ী চলনে, গাড়ি স্বভাবেই মাতাল। সততই সে ডাইনে বাঁয়ে টালমাটাল করে। কুন্দনন্দিনীকে গাড়ির ঝাঁকুনিই সহজ আসনে বসিয়ে দিল। তথাপি আমাকে ঘোষণা করতে হলো, 'অনেক রোগেই ভুগি, গ্যারান্টি দিতে ভরসা পাই না।'

কুন্দনন্দিনী তাঁর মাথা একটু পিছনে হেলিয়ে ভ্রূকুটি চোখে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর ফিরলেন অগ্রজের দিকে। অগ্রজ ঠোঁট টিপে হেসে মৃদু মৃদু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'লেখককে দোষ দিতে পারি না। তোর কথার জবাবে এ ছাড়া ওঁর আর কী বলার আছে? এর থেকে যা বোঝবার, তা বুঝে নে।'

কুন্দকিনী আবার ফিরলেন আমার দিকে। এখন আর ভ্রূকুটি নেই, রক্তিম চোখের ঢুলুঢুলু দৃষ্টিতে কেমন একটু হাসির কিরণ। বললেন, 'একে বুঝি কথাশিল্পীর জবাব বলে? আমার গ্যারান্টি দেওয়া তাহলে অন্যায় হয়েছে। এবার তাহলে মেজদার কথাটাই জিজ্ঞেস করি। রুচি হবে তো?'

হেসে বললাম, 'সেটা তো আমারো জিজ্ঞাসা।'

মেজর ঘোষাল আবার শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, 'ভাখ্ মিষ্টি, যাঁর সঙ্গে তুই কথা চালাচ্ছিস, তিনি কোনো সাহেব কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার নন, কোনো কর্নেল, মেজর, ক্যাপটেনও নন, যাঁরা তোর কথার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। মিসেস নন্দিনী মুখার্জি এখানে ক্যাপটিভ।'

'ক্যাপটিভ!' কুন্দনন্দিনী একবার অগ্রজের দিকে ফিরতে গিয়েও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। ঘাড়ের এই দ্রুত ঝাঁকুনিতে রেশমী-নরম কালো চুলের ঝাপটা ঢেকে দিল মুখের একাংশ।

অপরাধটা যেন আমারই। কুন্দনন্দিনীর মতো রমণী আমার কাছে বন্দী হবেন কেমন করে? সমস্যার উদ্ভাবকই হেসে জবাব দিলেন, 'অবিশ্যি ভাষার ক্ষেত্রে। তুই আমাদের অনেককে কথার ঘায়ে ঘায়েল করতে পারিস, তা বলে লেখককেও? অবিশ্যি ক্যাপটিভ না বলে পরাজয় বললেই ভালো হতো।'

কুন্দনন্দিনী হেসে বললেন, 'একশোবার মেনে নিচ্ছি।'

এবার কলিজায় বাড়ি আমার। তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, দয়া করে মেনে নেবেন না। মেজর ঘোষাল মোটেই ঠিক বলেননি। ওই যে উনি সব কাদের কথা বললেন, 'জেনারেল ম্যানেজার কর্নেল মেজরদের কথা, আমি তাঁদের তুলনায় কোনো অংশে শক্ত নই, কথার ঘায়ে আমিও চিরদিনই ঘায়েল।'

'মেনে নিলেন?' কুন্দনন্দিনী ঘাড় কাত করে বলেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তেমনি তাঁর ময়না স্বরে হেসে উঠলেন। তাঁর পশ্চাৎ গ্রীবা থেকে চুলের গোছা পড়ে গেল। রক্তাভা তাঁর সেই অঙ্গেও এবং ঘামে চিকচিক করছে।

আমার বিস্ময় সেটাই। এমনিতেই পশমী পোশাকে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। নভেম্বরের পাহাড়ী শীত আর যা-ই হোক, সমতলের তুল্য নয়। কুন্দনন্দিনীর অবিন্যস্ত রেশমী পোশাকের সংক্ষিপ্ততাতে দ্রব্যগুণের যুক্তি ছিল। কিন্তু স্বেদ? তাঁকে স্বেদসিক্ত একবারো মনে হয়নি। চোখেও পড়েনি।

ইতিমধ্যে মেজর ঘোষালও ভগ্নীর সঙ্গে হাস্যে তাল মিলিয়েছেন। কুন্দ-নন্দিনী মাথা তুলে আবার সোজা হয়ে বসলেন। সঘন নিশ্বাসের মধ্যে হাসিকে ডুবিয়ে রেখে বললেন, 'তাহলে আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দিই, আমার রুচিতে আটকাবে না। এবার তাহলে শুরু করুন।'

বললাম, 'আগেই বলেছি, আজ আমার নিয়ম আর সময়ের সীমা যখন আপনাদের হাতে, শুরুটা আপনারাই করুন।'

কুন্দনন্দিনী অগ্রজের দিকে বললেন, 'মেজদা, আমাদের শুরু তো হয়েছে অনেক আগেই। লেখকের সঙ্গে গাড়ির এই সেশনে তুমি আগে মুখ দাও।'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'কিন্তু তোকে আমি আগেই বলে নিয়েছি, গাড়ি চালাতে হলে আমি আর ড্রিংকস নেবো না। তুই বরং আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দে।' বলে তিনি তাঁর ফৌজী পশমের জামার বুক পকেট থেকে বাঁ হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে এগিয়ে দিলেন।

কাকেই বা শোনাবো দাদা ভগ্নীর এমন সহজ বচনাবচন। কেই-বা শুনেছে কবে? শুনে থাকলেও আমার কাছে নতুন। কুন্দনন্দিনী ডান হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার নিয়ে বোতলটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'জানি, এখন তোমার ড্রিংক করা ঠিক হবে না। আমি মরলেও লেখককে বেঘোরে মরতে দিতে পারি না পাহাড়ের খাদে।' বলে তিনি দ্রুত মুখ ফিরিয়ে একবার আমাকে দেখে নিয়ে আবার অগ্রজকে বললেন, 'তিস্তা আসতে এখনো একটু দেরি আছে। তোমাকে আর বলবো না একবারও। অন্তত লেখকের অনারে এক সিপ্।'

মেজর ঘোষাল ঘাড় ফিরিয়ে একবার আমার দিকে তাকালেন। হেসে বোতলটি বাঁ হাতে নিলেন ভগ্নীর হাত থেকে। বললেন, 'অনেক ড্রাইভার ড্রিংক না করেই পাহাড়ের খাদে হারিয়ে যায়, তিস্তায় ডুবে যেতেও দেখেছি চিরদিনের জন্য। কোনোটাতেই তফাত কিছু হয় না, তবে সাবধানের মার নেই। মিথ্যা অহংকারটা ভালো না।' বলে তিনি বোতলের মুখে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিলেন।

গাড়ি যদিও নেমে চলেছে অজগরের গা বেয়ে। মনে মনে ভাবি অশুভ কথার দরকার কী? আমার প্রাণ যে সত্যি বড় গরীব। কুন্দনন্দিনী একটি রাজা মাপের সিগারেট তাঁর রক্তিম ঠোঁটে চেপে ধরলেন। সিগারেটটা থরথর করে কাঁপছে কেন? গাড়ির ঝাঁকুনিতে না কি ঠোঁটের কম্পনে? বার কয়েকের চেষ্টায় যন্ত্রের ম্যাচ্‌বাতি জ্বললো কিন্তু হাতের আঙুলে এতো অস্থিরতা কিসের? সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। ভ্রাতা ভগ্নীতে দেওয়া নেওয়া হলো বোতল আর সিগারেট। কুন্দনন্দিনীর ডান হাতে বোতল বাঁ হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। বাঁ হাত বাড়িয়ে আমাকে দিয়ে বললেন, 'ধরুন একটু। বাঁ হাতে দিলাম। অ্যাণ্ড উইথ য়োর পারমিশন—।' বলে বোতলের মুখে মুখ ঠেকিয়ে চুমুক দিলেন। চুমুক? তার অর্থ কি শোষণ? তাহলে বলি শোষণ করলেন। দীর্ঘ শোষণ। মাথা তাঁর পিছনে হেলানো। সংক্ষিপ্ত রেশমী জামা, বক্ষান্তর অধর হলো, যেন বিস্তৃতি সীমা মানতে চায় না। আমি যেন দেখলাম সুরা তাঁর গলার ভিতর দিয়ে নেমে

বুকের দিকে বরষার স্রোতে নামছে। মুখ থেকে বুক পর্যন্ত আছড়ে পড়ছে রক্ত, যার ছটা তাঁর কোমল ত্বকে ঝলক দিচ্ছে।

'মিষ্টি!' মেজর ঘোষাল নিচু স্বরে ডাকলেন প্রায় ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে।

কুন্দনন্দিনী মুখ থেকে বোতল বিচ্ছিন্ন করে শব্দ করলেন, 'উঁম?' তারপরে ঢোঁক গিলে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটে আস্তে চাপ দিলেন। নাসারন্ধ্র স্ফীত বড় নিশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকালেন। এ লাল মুখকে কোন্ লালের সঙ্গে তুলনা করবো? বনের কুসুম দেখেছি, রক্তকুসুম। যেন আকাশে মেলে দেওয়া আগুনের শিখা। এ মুখ দেখে তা মনে হলো না, দেখছি অতি জ্বলন্ত অঙ্গার। এখন তাঁর চোখ ময়নার মতো না, কোকিলের মতো লাল। কোকিলের চোখ কেন লাল? হায়, এ জিজ্ঞাসাটাও এখনই আমার মনে জাগলো। ঠোঁট ফেটে কি রক্ত বেরোবে? তাম্বুলের রাগরঞ্জন বা ওষ্ঠরঞ্জনী সবই যেন এখন ভুল মনে হচ্ছে। স্বেদবিন্দু তাঁর গলায়। পান তো করলেন না, যেন সুধা খেলেন জয় কালী বলে। কিন্তু সত্যিই সুধা পান করলেন কী? তাহলে স্ফীত কম্পিত নাসারন্ধ্র কুঁচকে কুঁচকে উঠছে কেন? আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বোতলটি এগিয়ে দিলেন।

এখন আর কোন যুক্তি নেই, সেটা হবে ছলনা। নিয়ম সময় সবই যে দিয়েছি। অতএব তুলে নিই বোতল নিজের হাতে। তিনি কিছু না বলেই আমার হাত থেকে নিলেন সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। তাঁর হাত কাঁপছে। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। পরিবেশ মগজ ধোলাই করে। আমি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'লাইটারটা আমাকে দিন, ধরিয়ে দিচ্ছি।'

'খুব ভালো লাগলো মশাই, আশা করিনি। দিন।' কুন্দনন্দিনী আমার হাতে লাইটার দিয়ে ঠোঁটে সিগারেট চেপে আমার দিকে ঝুঁকে এলেন। আহ্ গরীব প্রাণকে বলি চোখ টেনে রাখ্ রমণীর দীপ্ত কোমল রমণীয়তা থেকে। চোখের মাথা খাই, তবু কী অবাধ্য এই চোখ। সে কেবলই আমার গরীবি হটায়। লাইটার শিখা জ্বালিয়ে সিগারেটের অগ্রে ধরি। কুন্দনন্দিনী টান দেন। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে আমারই মুখে। তাঁর কোমল কেশেও। গতির ঝাপটায় উড়ে যায় ক্ষণপরেই। কিন্তু আশা করেননি আমি তাঁর সিগারেট ধরিয়ে দেবো? আমি তো তাঁর হাতের কম্পন শৈথিল্য দেখেছি। তা ছাড়া পরিবেশ, পাত্রপাত্রীর প্রভাব বলে একটা কথা আছে। জীবনে আর কোনো রমণীকে

যে ইতিপূর্বে আর ধূমপানে সাহায্য করিনি, সেটি তো বলতে পারবো না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করলো না।

কুন্দনন্দিনী সিগারেটটা ঠোঁট থেকে হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হলো, বোতল মুখে দিতে রুচিতে বাধছে?'

হেসে তাড়াতাড়ি বোতল মুখের কাছে তুলে নিয়ে বললাম, 'না। আচ্ছা কুন্দনন্দিনী দেবী—।'

'বলুন, দেবতা।' বলেই ময়না স্বরে খিলখিলিয়ে উঠলেন। মাথা দিলেন লুটিয়ে আমার দিকে, হাত দিয়ে আলতো করে চাপড় মারলেন আমার হাঁটুর কাছে, যেখানে তাঁর আঁচল লুটিয়ে আছে।

এবার ঠেক্‌টা খেলাম বেশ লাগসই। মেজর ঘোষাল হেসে উঠলেন, হাসলাম আমিও। কিন্তু আমার মুখের ভাবসাব যে মোটেই সুবিধার না, তাও বুঝতে পারছি। আসলে ঘায়েল হয়েছি। এখন আমার ঘায়েল মানুষের মুখ। ভালো কথায় কি বিভ্রান্ত বলে? চলতি তবে ভ্যাবাচাকা, না তো বোকা।

কুন্দনন্দিনী মাথা তুলে চোখের লাল সায়রে কালো মানিক জোড়া ঘুরিয়ে বললেন, 'কী বলবো বলুন? আমাকে দেবী বললে দেবতাই বলতে হয় আমাকে।'

'পারফেক্‌টলি রাইট মিষ্টি।' অগ্রজ বাহবা দেন ভগ্নীকে এবং আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'কুন্দনন্দিনী নামটা আপনি পছন্দ করেছেন। মিসেস মুখার্জির থেকেও নিশ্চয়ই বেশি পছন্দ করেছেন।'

অসত্য না। এখন আমি না জেনে বিষ করেছি পান। কুন্দনন্দিনীকে নাম ধরে ডাকতে হবে নাকি?

বললাম, 'তা করেছি, কিন্তু একজন মহিলাকে—।'

'তুমি বা তুই তোকারি করবেন না তা বলে।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'নামেতেই আপনি করুন না।'

ফৌজী দাদার বোন হলেও কথাটি ঠিক কইতে জানেন। বললাম, 'হ্যাঁ অন্তত দেবতা শুনে কানে কালা হওয়ার থেকে সেটা অনেক ভালো।'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'এবার বলুন কী বলছিলেন। তাড়াতাড়ি বলুন, আমার আসল কথাটা এখনো মিঃ দত্তর ওখান থেকেই থমকে রয়েছে।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। কুন্দনন্দিনী যেন প্রায় কাঁধে কাঁধে ধাক্কা দেবার ভঙ্গি করে বললেন, 'বলুন বলুন, আগে আপনার কথাটা শুনে নিই।'

বললাম, 'রাগ করবেন না যেন, জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম এত খাচ্ছেন কেন? সকাল থেকেই?'

কুন্দনন্দিনী আবার ভ্রূকুটি করে আমার দিকে দেখে অগ্রজের দিকে ফিরলেন। মেজর সাহেব হাসলেন। কুন্দনন্দিনী আবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি কোনো মহিলাকে এ সব কথা জিজ্ঞেস করতে আছে? আপনি এত বড় একটা লেখক, এটা জানেন না?'

তাড়াতাড়ি দু'হাতে বোতল ধরে হাত জোড়ের ভঙ্গি করে বলি, 'আর যে-কথাতেই ঘায়েল করুন, বড় লেখক বলে আমাকে প্রাণে মারবেন না।'

'ও কথা বললে আপনি মরেন নাকি?' কুন্দনন্দিনীর ভুরু লতিয়ে উঠলো।

বললাম, 'অন্তত এ বিষয়ে এখনো মিথ্যে বলতে পারি না। তবে আমার জিজ্ঞাসাটা যদি আপনাকে দুঃখিত করে থাকে মার্জনা চাইছি। আমি সে রকম কিছু ভেবে বলিনি।'

কুন্দনন্দিনী আবার আমার হাঁটুর ওপরে তাঁরই স্খলিত রেশমী গোলাপি আঁচলে আস্তে চাপড় মেরে বললেন, 'তা জানি। কোনো কোনো বিষয়ে আপনি এখনো মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। কিন্তু মুখের ভাবটি খুব পারেন।' বলে হাসিতে নিশ্বাসে মিলিয়ে একটি শব্দ করে আবার বললেন, 'আমিও কিছু না ভেবেই বলছি, আমার ড্রিংক করতে ভালো লাগে। এখন আমার শখের প্রাণ গড়ের মাঠ। দাদার অতিথি, শীতের পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন আমার সময়ও নেই, নিয়মও নেই। যতোক্ষণ ভালো লাগছে ততোক্ষণই খেয়ে যাচ্ছি। শুনে কি খুশি হলেন?'

হবো না আবার! জিজ্ঞেস করেই ক্যাসাদে পড়েছি এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। বললাম, 'বুঝেছি। ছুটির মেজাজে আছেন।'

'ছুটির মেজাজ?' কুন্দনন্দিনী যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, চোখ অতিমাত্রায় ঢুলে উঠলো। হাত উলটিয়ে ভঙ্গি করে বললেন, 'তা হবে, ছুটির মেজাজই বলতে পারেন। নয় তো পালিয়ে বেড়াবার মেজাজ।' বলেই ফিক্ করে হেসে উঠলেন।

আমি মেজর ঘোষালের দিকে দেখলাম। গম্ভীর নন, কিন্তু হাসি নেই তাঁর মুখে। দৃষ্টি সামনের দিকে। সহসাই যেন গাড়ি নেমে এসেছে উৎরাইয়ের ঘন বনের নিবিড় ছায়ায়। এতক্ষণের প্রায় অনেকটা পথই ছায়াহীন ন্যাড়া পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমেছে। এখন সামনে আরো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। পিছনেও গাড়ির ঘন ঘন নির্ঘোষ আর শব্দের সংকেত।

'দেখি দিন ওটা।' কুন্দনন্দিনী ঝটিতি অতি নিবিড় সান্নিধ্যে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বোতলের গলা চেপে ধরে বললেন, 'আপনি হাঁ করুন, আমি আলগা করে আপনার গলায় ঢেলে দেবার চেষ্টা করছি। এটাতে মুখ লাগাতে আপনার বাধছে।'

ফুলেল সুবাস, সুরার গন্ধ, নিশ্বাসে স্পর্শ করলো আমার চিবুক আর গলা। অন্য স্পর্শের কথা কী বলবো? আগুনের স্পর্শ? কিন্তু পুণ্যের ছোঁয়া যে বোধ করি না। শরীর জুড়ে কুণ্ঠা জাগে। তথাপি হায়, গরীব আমার প্রাণ। মহাপ্রাণের কোন্ সীমায় ঝংকৃত হয়। কিন্তু তাকে ভুল বুঝতে দিতে চাই না। তাড়াতাড়ি মুখের কাছে বোতল তুলে বললাম, 'আমার রুচিকে সন্দেহ করবেন না। সংসারে যাদের আস্তাকুড়ের মানুষ বলা হয়, আমি সেখানকার লোক। অনেক মুখেই আমার মুখ ছোঁয়ানো।' বলেই আমি বোতলের মুখ নিজের মুখে ঠেকিয়ে পান করলাম।

খাঁটি পানীয়র মাত্রা যতোটা কম ভেবেছিলাম, আদৌ তা না। গলা থেকে সোজা অন্ত্রে গিয়ে তা জানান দিল। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর মুখে এক বিষণ্ণ বিস্ময়ের আলোছায়া। তাঁর আরক্ত চোখেও। বললেন, 'ওই কথাটা আমাকে লিখে দেবেন। অনেকের মুখে আমার মুখ ছোঁয়ানো। আস্তাকুড়ের পরিচয়ে আমার দরকার নেই। দিন।' তিনি ডান হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে বোতল নিলেন। বাঁ হাতে জ্বলছে সিগারেট। হঠাৎ সেইটি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

এখন এ সব বিষয়ে অবাক না হওয়া ভালো। কারণ অবাক হবার কিছু নেই। সিগারেটটা আমাকে ধরতে দিলেন, না কি ধূমপানের নির্দেশ? জিজ্ঞাটা জিজ্ঞাসাই থাক। কথা কইলে কথা বাড়ে। লক্ষ্মণের ফল ধরে থাকি। কুন্দনন্দিনী বোতল তুলে ঠোঁটে ঠেকিয়ে মাথা হেলিয়ে চুমুক দিলেন।

কিন্তু একটি জিজ্ঞাসা মনে দেগে রইলো। আস্তাকুড়ের পরিচয় জানতে তাঁর অরুচি কেন? ঘৃণা? নাকি মানে লাগে? তাহলে যে আবার আমার মনে চাকুকু বেঁধে। জ্বালা করে। যদিও তা বলতে ঠেক লাগে।

কুন্দনন্দিনী ঠোঁট থেকে বোতল আলাদা করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। শিরায় ফেরা রক্তের আর দোষ কী? চোখের তারা থেকে সর্বাঙ্গে ঝলক না দিয়ে তার উপায় কী? সুরার আর এক নাম লাল পানি কি এমনি এমনি হয়েছে। কিন্তু নিশ্বাস ফেলেই তিনি যেন আমার আঁতের জ্বালা টের পেয়ে জুড়িয়ে দিলেন। চোখ বুজে বললেন, 'আস্তাকুড়টা আপনার থেকে

আমি কম চিনি না। আমিও সেখানকার মানুষ। আপনার থেকে বেশি।' বলে চোখ খুলে আমার দিকে লাল ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে হাসলেন।

ভুল দেখলাম নাকি? একে কি হাসি বলে? মনে তো হয় না। কান্না? উঁহু। তবে কি ঘৃণা না বিদ্বেষ? ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু এ হাসি সে-হাসি না। কুন্দনন্দিনী যে কারণে অন্য নামে মিষ্টি, বা বলা ভালো তাঁর চোখের কোণে ধনুক ঠোঁটে কৌতুক ঝরানো রঙ্গের হাসি। হাসিটির পিছনেই যেন কী এক উষ্ণ তারল্যের টলটলানি। কথাটি বলেই তিনি আবার বোতল ঠোঁটে মিলিয়ে চুমুক দিলেন। তাঁর ঠোঁট আগ্রাসে সুঁচালো, স্বভাবতই গালে টোল খেয়েছে। মেজর ঘোষাল একবার ফিরে ভগ্নীকে দেখলেন, তারপরে আমার দিকে। আবার সামনের দিকে মুখ করে একটু নড়েচড়ে বসলেন। প্রতিক্রিয়াটা উদ্বেগের বুঝতে পারি। ফৌজী কেতায় যদিও তা মুখের চেহারায় অপ্রকাশ্য।

কুন্দনন্দিনী বোতল নামালেন। বাঁ হাতের উলটো পিঠে ঠোঁট মুছলেন। এখন আর তাঁর ওষ্ঠরঞ্জনীতে খেয়াল নেই। হাতের পিঠে ঠোঁটের রঙ লেগে গেল। একেবারে সরাসরি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার আস্তাকুড়ের চেহারাটা কেমন জানি না। আমারটা দুর্গন্ধে ভরা। কিন্তু এটা কী বলুন তো। এটা কি আপনাকে আমি পাঁচ আঙুল দিয়ে ভোগের কলার মতো ধরে রাখতে বলেছি?' বলেই হেসে উঠলেন। হাসলো তাঁর গোটা শরীর। সিগারেটটা নিজের বাঁ হাতে নিয়ে বোতল দিলেন আমার কোলের কাছে বাড়িয়ে। আমি সেটা ধরলাম। তিনি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন 'সিগারেট যখন, তখন তা পুড়বেই। কিন্তু কিছু মৌজ তো লুটে নিতে হবে।'

কথাটা যেন কেমন শ্রবণ থেকে গভীরে গিয়ে বাজে। পুড়তেই যার সৃষ্টি, সে পুড়বেই। কিন্তু তার থেকে কিছু স্বত্ব তো তুলে নিতে হবে। এও কি চর্যাপদের সন্ধ্যাভাষা নাকি? শুনতে শোনায় এক রকম, বাজে অন্য অর্থে! সিগারেটটি আবার আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নেহাতই সিগারেট, মহাদেবের প্রসাদ নেই।' বলে হেসে উঠে আবার বললেন, 'একটা টান দিন। অনেক মুখেই তো আপনার মুখ ছোঁয়ানো।'

আমার নিজের কথা দিয়ে বেড়াজাল বাঁধা। অতএব, সিগারেট নিয়ে রঙ লাগা ফিলটার টিপ্-এ ঠোঁট চেপে টান দিলাম। তাকালাম মেজর ঘোষালের দিকে। তিনি তাকালেন না, কিন্তু তাঁর ঠোঁটে টেপা হাসি। কুন্দনন্দিনী আবার ডান দিকে ঝুঁকে আসনের পিছনে ডান হাত বাড়ালেন, বললেন, 'আমার পানের ঠোঙাটা আছে তো? আর আমার ব্যাগ?'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'সবাই আছে, কিন্তু তুই কি নিতে পারবি ? এখন তো দেখছি সোজা হয়ে বসতে পারছিস না, অর্ধেকের বেশি শরীর চাপিয়ে দিয়েছিস লেখক বেচারীর ঘাড়ে।'

'সত্যি নাকি ?' কুন্দনন্দিনী আমার দিকে মুখ তুলতে গিয়ে তাঁর এলো-মেলো কালো রেশমী মাথা দিয়ে আমারই গালে ঠোকা দিলেন।

মাথার আর দোষ কী। সে যে কখন কোন্ দিকে টলে মাথার মালকাইনের এখন আর তা জানবার উপায় নেই। মেজর ঘোষালের কথা শুনে আড়ষ্ট হলাম আমিই। তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনার কোনো অসুবিধা করবেন না।'

'আপনার অসুবিধা হলেও।' কুন্দনন্দিনী মুখ একটু সরিয়ে বললেন। চোখ নামিয়ে নিজের বক্ষোপরি নজর করলেন। যে অবিচ্ছেদ্য সংলগ্নতাকে মেপে নিলেন। তারপরে নাক কুঁচকে এমন ভঙ্গি করলেন বিষয়টি অতি অকিঞ্চিৎকর। বললেন, 'কী আসে যায় ? আপনি তো মশাই কালকূট।' বলেই আবার আসনের পিছন দিকে কাত্ হয়ে হেলে পড়লেন।

কী অর্থ এ কথার ? কালকূট বলে কি চিরকালের পুরুষটাকে কোথাও থুয়ে এসেছি নাকি ? নাকি তিনি আমার অসুবিধার বোঝা বহনের কথা বলছেন ? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসাতে নেই। শুনতে পেলাম, 'পেয়েছি।'

কুন্দনন্দিনী সোজা হয়ে বসলেন। দেখলাম রূপোয় পাথর বাঁধানো ড্রাগন-মুখো একটি ছোট তুলতুলে ছোট ব্যাগ তাঁর হাতে। সঙ্গে একটি ভেজা ভেজা পাতার ঠোঙা। ব্যাগটি রাখলেন ডান দিকে। সেটা আসন স্পর্শ করলো না। দু'জনের কোমরের মাঝখানে ঠেকে রইলো। পাতার ঠোঙা খুলে বের করলেন টাটকা পানের খিলি। একটি খিলি আমার দিকে তুলে বললেন, 'চলবে ?'

বললাম, 'চলবে।' সিগারেটের শেষ অংশ ফেলে দিয়ে পানের খিলিটি নেবার জন্য হাত বাড়ালাম।

কুন্দনন্দিনী হঠাৎ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেবো ? নাকি ঠোঙা থেকে তুলে নেবেন ?'

নব রহস্য। দেখছি তাঁর কোকিল চোখে কৌতুকের ছটা। কিন্তু কথার অর্থ কি ? বললাম, 'আপনার যেমন ইচ্ছা।'

কুন্দনন্দিনী ঘাড়ে একটি ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'হাতেই দিই। যদিও বলে পানের খিলি হাতে করে স্বামীর হাতে ছাড়া পরপুরুষের হাতে দিতে নেই। নিন।' হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তাহলে কেমন করে নিই? এ ক্ষেত্রে আমার পরিচয় তো পরপুরুষই। স্বামীর অধিকারে ভাগ বসাবো কোন্ সাহসে? নিয়ম নীতি বলেও একটা কথা আছে তো। একবার যখন কানে শুনেছি। বললাম, 'তাহলে ঠোঙা থেকেই নিতে দিন। কিন্তু রহস্যটা জানা নেই।'

কুন্দনন্দিনী ময়নাম্বরে হেসে তাকালেন অগ্রজের দিকে। অগ্রজ হেসে একবার দেখলেন আমার দিকে। মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আপনার দেশ কোথায় ছিল? ইস্টবেঙ্গলে?'

অধুনা যার নাম বাঙলাদেশ। ডিসেম্বরের হিসাবে ধরলে, এই নভেম্বরে পুরোপুরি বারো মাস, বাঙলাদেশ-এর জন্ম। বললাম, 'ঢাকা।'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'সে জন্যই। বাঙালরা এ রহস্য জানে, না এসব হলো আমাদের ঘটি-রহস্য।' বলে আবার হেসে বললেন, 'পানটা আগে নিন। ভয় নেই মশাই, আপনাকে আমার স্বামী করবো না।' বলেই আবার খিলখিলিয়ে উঠলেন। হাত তুলে আনলেন প্রায় মুখের কাছে।

আমি পানের খিলি তাঁর হাত থেকে নিলাম। তিনি বললেন, 'খুলে খান।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, এর ভেতরে কি আছে?'

কুন্দনন্দিনীর আরক্ত চোখে মুখে এবং সারা শরীরেই যেন একটা রুদ্ধ হাসি থমথমিয়ে রয়েছে। বললেন, 'ভেতরে যা থাকে তা-ই আছে। লবঙ্গের কুলুপ কাঠিটা খুলে নিয়ে খান।'

এই কথা! কিন্তু এই কথাই কী? এও তো শোনাচ্ছে যেন সন্ধ্যার ভাষার মতো আবছা। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠছে। লবঙ্গের কুলুপ কাঠি! স্বামীর অধিকার। সবই যেন কেমন কেমন না? কিন্তু আমি না পাচ খাজাঞ্চি-খানার প্রেমিক? ঘরেতে আমার মন নেই। পাহাড়ের সেই খাজাঞ্চিখানার ডাকে আমি চড়াই উৎরাই ভাঙছি। কে আমাকে মাথার দিব্বি দিয়েছে পথ চলাতে এত দায় ঠেক মানতে? আমি লবঙ্গটি খুলে নিয়ে পানের খিলি মুখে দিলাম।

কুন্দনন্দিনী তৎক্ষণাৎ হেসে উঠে নিজের কোলের ওপরেই ঝুঁকে পড়লেন। বিভ্রান্তি আমার। অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। মেজর ঘোষাল বললেন, 'কী পাগলের মতো হাসছিস? লেখক একজন গ্রোন আপ রসিক মানুষ। নতুন করে তো আর পাকাতে পারবি না।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'পানের খিলির আকারটা একটা প্রতীক।'

আমার সজাগ ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের মূলে, অতি লজ্জার কাঁটা বিঁধে গেল। এই রকম একটি অনুমানই করেছিলাম। এখন মুখের তাম্বূল চিবোতে পর্যন্ত লজ্জা। কিন্তু আর উপায় নেই, একবার যখন মুখে নিয়েছি। কুন্দনন্দিনী আস্তে আস্তে তাঁর ঝুঁকিয়ে রাখা মাথা তুললেন। চুলে তাঁর অতি রক্তাভ মুখ প্রায় সবখানিই ঢাকা। ফাঁকে ফাঁকে ঢুলুঢুলু চোখ উঁকি দিচ্ছে। তিনি এবার নিজে একখানি পানের খিলি মুখে দিলেন। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। কিন্তু ঝংকার বলে একটা কথা আছে। ইংরেজিতে কি তাকে ভাইব্রেশন বলে? প্রতীকের ঝংকারটা এত সহজে মস্তিষ্ক থেকে যাবার না। একেবারে অজানা নেই, এই সব প্রতীক আকার ইঙ্গিতের বিষয়গুলো। জাদু থেকে মন্ত্রতন্ত্রে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অনেক প্রতীক আকার ইঙ্গিত। কিন্তু এটা যেমন নিত্যকার ঘরোয়া তেমনি খোলাখুলি। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয়ে এ পরিহাস অনেকখানি জমতে পারতো।

'এই যে কালকূট মশাই, আপনার কি এ বস্তু চলবে?' কুন্দনন্দিনী ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, তাঁর ড্রাগনমুখো ব্যাগ থেকে বের করেছেন জর্দার কৌটো। গন্ধটা তাঁর অঙ্গরাগের ফুলেল থেকে কিছু কম না। কিন্তু আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গন্ধে না, বস্তুটির ধক সামলাতে পারি না। বললাম, 'ওটা পারি না, বুকে আটকে যায়।'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'সে কি, কালকূটের বুকে আবার কিছু আটকায় নাকি?' বলে তিনি নিজেই চিমটি দিয়ে জর্দা নিয়ে মুখে দিলেন।

বললাম, 'রপ্ত করতে পারিনি। আপনার দেখছি অনেক কিছুই চলে। কিন্তু মেজর ঘোষাল পান খেলেন না?'

মেজর ঘোষাল মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি পানই খেতে পারি না।'

'আর আমার কথা যদি বলেন, প্রায় সব নেশাই করতে পারি।' কুন্দনন্দিনী তাঁর ব্যাগ বন্ধ করলেন, 'আপিম কোকেনটা এখনো টেস্ট করিনি, আর চণ্ডু চরস। আর বাকি কিছু রাখিনি।'

অতঃপর আর কোনো কথা চলে না। কুন্দনন্দিনী তাঁর ব্যাগ আর পানের ঠোঙা আবার ডান দিকে কাত হয়ে পিছনে রাখলেন। কিন্তু পুরোপুরি সোজা হলেন না, বললেন, 'যে কথাটা সেই দত্ত সাহেবের ঘর থেকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করা হয়নি, সেটাই করি। লিখতে গেলে সবাই দেখি ভালো ভালো ছদ্মনাম রাখেন। আপনার এই নামের মানেটা কী?' কুন্দনন্দিনী আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। তাঁর চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, রাজ্যের ঘুম নেমে

আসছে। অনেকটা জোর করেই তাকিয়ে আছেন। কিন্তু এ যে আর এক ঠেক! বললাম, 'ওই নামটাই হঠাৎ মনে এসেছিল।'

'ও তো এড়িয়ে যাওয়া কথা।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'হঠাৎ কিছু হয় বলে, বিশ্বাস করি না। এ তো আর চোর ধরা বা জলে পড়া না। মনের কথা বলুন।' তিনি তাঁর আধবোজা স্থির চোখ রাখলেন আমার চোখে।

বললাম, 'নিজেকে আমার যা মনে হয়েছিল, তেমন একটা নামই নিয়েছি।'

'আর তা কালকূট।' কুন্দনন্দিনীর একটা নিশ্বাস পড়লো, সেই সঙ্গে হাসি, বললেন, 'বেশ। প্রাণঘাতিনী বিষ। আপনি তো আবার ঘাতক।' বলে তিনি আবার একটু হাসলেন। তাঁর মাথা এলিয়ে পড়লো অনেকখানি ডাইনে আমার কাঁধের কাছে, কিন্তু ঢুলুঢুলু দৃষ্টিটা অন্য দিকে। বললেন, 'আমার একটা এ রকম নাম দিতে পারেন? লেখবার জন্য না, পরিচয় দেবার জন্য।' বলেও যেন জবাবের প্রত্যাশা তাঁর নেই। আবার বললেন, 'নিচে নামতে নামতেই যদি কিছু মনে আসে বলবেন।'

আমি মেজর ঘোষালের দিকে তাকালাম। তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, 'আমাদের ভাগ্যটা ভালো, তিস্তা ব্রিজ ডাউনে এখনো খোলা আছে। ভেবেছিলাম খোলা পাবো না, দেরি হয়ে গেছে!' বলে তিনি ঘন ঘন কয়েকবার হর্ন বাজালেন।

যেন কোন সংকেত পাঠালেন। হঠাৎ আমার হাতের ওপর হাত পড়তেই অবাক চোখে তাকালাম। না, আমার হাতের সন্ধান করছেন না কেউ। কুন্দ-নন্দিনী আমার হাতে ধরা বোতলটা টেনে নিতে নিতে, প্রায় ঘুম জড়ানো স্বরে বললেন, 'আপনি তো কেবল ফাঁকি দিচ্ছেন, আমিই আর একটু নিই।'

মেজর ঘোষাল ভগ্নীর দিকে চকিতে একবার তাকালেন। গাড়ি এখন তিস্তা নদীর সেতুর ওপর দিয়ে চলেছে। কুন্দনন্দিনী বোতল ঠোঁটে চেপে চুমুক দিলেন। মেজর ঘোষাল ডাকলেন, 'মিষ্টি!' পাহাড়ের কোলবাহিনী রূপে তিস্তাকে আমার ওই প্রথম দেখা। কিন্তু দেখার মতো করে দেখতে পারছি না। কুন্দনন্দিনীর হাত বোতলসুদ্ধ নেমে এলো আমার কোলের ওপরে। তাঁর হাতের শৈথিল্য প্রমাণ করছে, বোতল ধারণে অক্ষম। আমি বোতলটা হাত দিয়ে ধরলাম। তাঁর হাত এলিয়ে পড়লো আমার কোলের ওপর। মাথা গড়িয়ে পড়লো কাঁধের পাশে। আমি তাকালাম মেজর ঘোষালের দিকে। তিনিও বারেক তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, 'থাকতে দিন, না হলে আবার

খেতে চাইবে। একটু ঘুমিয়ে নিলে, নিচে গিয়ে সুস্থভাবে কথা বলতে পারবে। আপনার একটু অসুবিধা হবে।'

অসুবিধা? আমার গরীব প্রাণের কথা আর ভাবতে পারছি কই। সেবা আমার দ্বারা হয় না। কিন্তু অসুস্থকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না। এ রমণী আমার সদ্য পরিচিতা। কিছুই তাঁর জানি না। তবু তাঁর এই সকল রমণীয়তার মধ্যে, কোথায় যেন বেসুর বাজছে। আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, দিল্লির রঞ্জিতা রিজ্‌ভির কথা। আর একজন বোম্বাইগামী রেলগাড়ির কামরায়, জেসমিন নামে এক মহিলা। দৈবক্রমে তাঁরা দু'জনেই মুসলিম। রঞ্জিতা রিজ্‌ভি সিন্ধি মেয়ে, ধর্মান্তরিতা ছিল। দু'জনের কেউ আজ বেঁচে নেই। জেসমিন আত্মহত্যা করেছিলেন সেই রেলগাড়ির নিচে। রঞ্জিতা রিজ্‌ভি ওর সকল জ্বালা নিয়ে বোম্বের আরব সাগরের জলে।

'আপনি বরং বোতলটা আমার হাতে দিন, আমি রেখে দিচ্ছি।' মেজর ঘোষাল বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাত বাড়ালেন, 'আপনি একটু ভালো ভাবে বসতে পারবেন।'

মিথ্যা না। আমি বোতলটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

পাহাড়ের ধার বহে, তিস্তার ঢল নেমে চলেছে নিচে। আমরা নামছি তিস্তার কূল ধরে। শব্দ তার নিরন্তর। জীপের ডানদিকে বসে, কিছুটা চক্ষে হারাচ্ছি। তিস্তা চলেছে বাঁয়ে। উৎরাইয়ের পথ যতোটা সর্পিল না তার থেকে বেশি বিপজ্জনক ধসের পিছল আর অনিশ্চয়তা। সময়টা বর্ষার না, হেমন্তের। সেটা একটা ভরসা। তথাপি দেখতে দেখতে যাচ্ছি, প্রায় জায়গাতেই পথ সারানোর কাজ করছে নারী পুরুষ শ্রমিকরা। হেমন্তের তিস্তায় তেমন নীল ঝলক নেই। মৃত্তিকার রঙ দুরন্ত ঢলের স্রোতে।

কুন্দনন্দিনীর মাথা এখন আমার কাঁধে ন্যস্ত। দক্ষিণ শরীরের অধিকাংশ আমার ওপরেই। মেজর ঘোষাল বললেন, 'দত্ত সাহেবের মুখে আপনার কাঞ্চনজংঘার মোহের কথা শুনছিলাম।'

মোহ। শব্দটা ছাঁকা নির্যাসের মতো মনে হলো। কাঞ্চনজংঘার মোহ। আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। তিনি আবার বললেন, 'তবে দত্তসাহেব আপনাকে ঠিক পথই বাতলেছেন। আপনি এতদিন ভুল ঠিকানায় ঘুরছিলেন। কাঞ্চনজংঘা হলো সিকিমের আপন দেশ। পূর্ব সীমান্ত।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সিকিমের? আমার ধারণা ছিল কাঞ্চনজংঘা তিব্বতে।'

মেজর ঘোষাল মাথা নেড়ে বললেন, 'না। তবে তিব্বতের দক্ষিণ অংশে কাঞ্চনজংঘার সীমানা। সিকিমের পুবে হলো কাঞ্চনজংঘা। তবে সিকিমীদের উচ্চারণটা একটু আলাদা। ওরা বলে খান-চেন-জো-ঙ্গা।'

আমার জ্ঞানে যে আবার একটু রোশনাই লেগেছে। আমি সেই স্বর্ণ-শিখরের তিব্বতীদের বরফ-বড়-পাঁচ-খাজাঞ্চিখানার কথা তাঁকে বললাম। মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, 'আপনার কথাও ঠিক। তিব্বতীদের সঙ্গে সিকিমের মানুষের অনেক বিষয়ে অনেক মিল। ধর্মের বিষয়ে তো কোনো কথাই নেই। দুই দেশই ধর্মে বৌদ্ধ। তিব্বতে যেমন দলাই লামাকে মনে করা হয় গড কিং বা লিভিং গড, ছোগিয়ালও তাই। অর্থের দিক থেকে তিনিও দলাই লামার মতোই জীবিত ঈশ্বর। আর কাঞ্চনজংঘা নিয়ে তিব্বতীদের যে বিশ্বাসের কথা বললেন, প্রায় একই বিশ্বাস সিকিমের মানুষদেরও। কাঞ্চনজংঘা তাদের কাছেও রক্ষাকর্তা ভগবান—প্রোটেকটিং ডেইটি।'

এবার বুঝি জ্ঞানের রোশনাইয়ে খামতি কোথায়। বললাম, 'আমার এ সব একেবারেই জানা নেই, অথচ উত্তরের তিব্বত থেকে সিকিম আমার অনেক কাছে।'

'আপনার সীমানার মধ্যে।' মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, 'আসল কাঞ্চন-জংঘার দেশ। তবে একদিক থেকে কাঞ্চনজংঘা দুই দেশেরই। একজনের পূর্ব আর একজনের দক্ষিণ সীমান্ত। তিব্বত আর সিকিমের রয়েল ফ্যামিলির মধ্যে বিয়ে-থাও ঘটেছে। কাঞ্চনজংঘার ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে দুই দেশের সমান বিশ্বাস। আপনি ব্রিটিশ মাউণ্টেনিয়ার চার্লস এভানস্-এর কথা নিশ্চয় শুনেছেন?'

চার্লস এভানস্? এ ব্যাপারে আমি অজ পাড়াগেঁয়ে। হিলারি আর তেনজিং-এর নামটা কেমন করে মনে রেখেছি সেটাও তাজ্জব। নিজেকে পুছ্ করার বিষয়। কৌতূহলিত জিজ্ঞাসায় কবুল করলাম, 'না তো। তিনি কি কোনো পর্বত জয় করেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, আপনার জানা পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা।' মেজর ঘোষাল বললেন।

আমি অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি মুখ না ফিরিয়ে চোখের কোণে আমাকে একবার দেখলেন, বললেন, 'খবরের কাগজে তো বেরিয়েছিল। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি হবে। আমি অবিশ্যি তখন এখানে আসিনি।

দেরাদুনে শিক্ষানবিশী করছি। কিন্তু কাগজে একটা ডিসপিউটের খবর বেরিয়েছিল। এখন যিনি সিকিমের রাজা, নামগিয়েল তখন রাজকুমার। তাঁর একটা প্রতিবাদ কাগজে বেরিয়েছিল, চার্লস এভানস্ নাকি তাঁর কথা রাখেননি, তিনি নাকি কাঞ্চনজংঘার উচ্চতম চূড়ায় উঠেছিলেন। কিন্তু রাজ-পরিবারের সঙ্গে এভানস্-এর শর্ত ছিল সেই পবিত্র চূড়া তিনি কখনোই স্পর্শ করবেন না, অপবিত্র করবেন না।'

আমার কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা মাত্রাছাড়া হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'এভানস্ সাহেব তা করেছিলেন নাকি?'

সেটা প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব নয় কী?' মেজর ঘোষাল হেসে উঠে বললেন, 'এখানে আসার পরে শুনেছি এভানস্ সাহেব নাকি নামগিয়েলকে কিছু ফটো দেখিয়েছিলেন, যার কোনোটার মধ্যেই সেই পবিত্র চূড়া দেখা যায়নি।'

আমি আমার সাধারণ বুদ্ধিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু সাহেব যে সব ফটোই নামগিয়েলকে দেখিয়েছিলেন তার প্রমাণ কি?'

মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, 'একই জিজ্ঞাসা তো আমারো। সম্ভবত নামগিয়েলেরও সেই সন্দেহ ছিল। কারণ, শুনেছি এভানস্-এর কৈফিয়তে তিনি খুশি হতে পারেননি। কিন্তু আর করবারই বা কী ছিল? বুঝতেই পারছেন একজনের কাছে যা আবিষ্কার আর বিজ্ঞান চর্চা, আর একজনের কাছে তা স্বয়ং ঈশ্বরকে নিয়ে টানাটানি। নামগিয়েল হয়তো মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন।'

যা অজানা মন টানে সে। যা অচেনা তাকে চিনতেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। বিজ্ঞানচর্চাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ধ্যানের মহিমাকেই কি করা যায়? তবু মনে পড়ে যায়, কোথায় যেন পড়েছিলাম। কোন্ এক পর্বতারোহীকে নাকি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেন তিনি অমুক পর্বত চূড়ায় উঠতে গিয়েছিলেন? তাঁর জবাব, 'কারণ ওটা এখানে আছে।' আছে, অথচ তার স্বরূপ দেখলাম না, এ কৌতূহল দুর্নিবার। তবু বিশ্বাস?

মেজর ঘোষাল আবার বললেন, 'সিকিমের দেশের লোকদের একটা বড় উৎসব তুষার পূজা।'

তুষার পূজা! এমন পূজার কথা আর কখনো শুনিনি। ভারতের তীর্থ আছে তুষারের প্রাঙ্গণে, কেদারবদরী। তুষার দেবতা অমরনাথ। কিন্তু তিনিও নামধারী একজন দেবতা। তাকে তুষার পূজা কখনোই বলা যায় না। বললাম, 'তুষার পূজার কথা কক্ষনো শুনিনি!'

'ওয়ারশিপ্ অব্ স্নো রেঞ্জ।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'সিকিমীদের বড় উৎসব, নাচের উৎসব হয় প্রাসাদের মন্দিরের উঠোনে। আসলে সেই স্নো রেঞ্জের আড়ালে যিনি আছেন, সিকিমীরা তাঁকে বলে তুষার সিংহ।'

আমার যেন একটা মুগ্ধ ভয়ের অনুভূতি হলো, বললাম, 'তুষার সিংহ?'

'হ্যাঁ। স্নো লায়ন। সিকিমীদের এটাও একটা বিশ্বাস। কাঞ্চনজংঘা তাদের ধনদাতা, সৌভাগ্যদাতা, তাদের মোক্ষদাতা। আর তা চিরকাল সজাগ লক্ষ্য রাখছেন তুষার সিংহ, তাঁর পান্না সবুজ কেশর ফুলিয়ে।'

'পান্না সবুজ কেশর?' আমার জিজ্ঞাসা ছিটকে এলো বিভ্রান্ত প্রাণ থেকে।

মেজর ঘোষাল মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সিকিমীদের তাই বিশ্বাস। বোধ হয় সর্ব্বোচ্চ চূড়ার এক পাশে তুষারের রঙ পান্না সবুজই দেখায়। সব সময় দেখায় বলে আমার মনে হয় না। সূর্যের আলোয় নিশ্চয় তার রঙ বদলায়। কিন্তু সিকিমের মানুষের কাছে সেই তুষার সিংহের কেশরের রঙ পন্নার মত সবুজ। সেই হিসাবে বলতে পারেন সিকিম হলো তুষার সিংহের দেশ।'

আহ্! তাই কি বলে জ্ঞানের রোশনাই। আমার জ্ঞানেতে রোশনাই লাগছে কী না জানি না। টান লাগছে আমার প্রাণ-ধনুকের ছিলায়। মন-তীর ছুটে যেতে চায় সেই তুষার সিংহের পদতলে। আমি আমার বয়স ভুলে যাই। জিজ্ঞেস করি, 'গেছেন নাকি কখনো?'

'কোথায়?' মেজর ঘোষাল অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'সেই তুষার সিংহের কাছাকাছি?'

'মাথা খারপ নাকি আপনার মশাই?' মেজর সাহেব অবাক হেসে বললেন, 'প্রথমত ওখানে যাওয়াটাই তো একটা চ্যালেঞ্জ। তুষার সিংহের কাছে যাবো কী? শুনলেন না এভানস্-কে নিয়েই কী ঝামেলা হয়ে গেছলো। তারপরে তুষার সিংহের কামড় কি আমি সহ্য করতে পারবো নাকি? কেশর ফুলিয়ে এমন হিম্ দাঁতের কামড় বসাবে, তাতেই অক্কা পেয়ে যাবো।'

এবার হেসে বেজে উঠলাম আমিই। আমার জ্ঞানেতে রোশনাইয়ের কী ছিরি! নিজের মনের সাধে ভেবে বসলাম, সেই দুরধিগম্য উচ্চতায় যেন ইচ্ছা করলেই ওঠা যায়। মেজর ঘোষাল আবার বললেন, 'তারপরের বিপদ চুম্‌বি উপত্যকা। চীনাদের বন্দুকের একটি গুলি এসে বুকে বিঁধলেই হলো। ড্রাগনের নিশ্বাসের আগুনের এক হালকাতেই জান খতম।'

জ্ঞানেতে আমার কী রোশনাই। ইতিহাস রাজনীতি আর ভৌগোলিক

ভাবনা আসে। চুম্বি উপত্যকা! জায়গাটার নাম শোনা শোনা লাগছে। বললাম, 'জায়গাটার নাম বোধ হয় খবরের কাগজে পড়েছি।'

'পড়েছেন বৈকি।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'চুম্বি ছিল সিকিমের সীমান্ত। চীনারা ছিনিয়ে নিয়ে তা এখন তিব্বতের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য, চুম্বি কখনোই তিব্বতের অংশ ছিল না। আর চুম্বি উপত্যকার অধিবাসীরাও নিজেদের ইচ্ছায় কখনো তিব্বতের অংশ হতে চায়নি।'

এই একটি ব্যাপার আমার মাথার দিব্বি। উহাতে আমি নাই, নাম যার রাজনীতি। যদিও জানি, আমার চাওয়া না-চাওয়াতে সে নেই। আমাকে চাইয়ে ছাড়ে আমার দৈনন্দিন জীবনে। আমি ছাড়লেও, সে আমাকে ছাড়বে না। রাজনীতিতে নীতি কথাটা আছে, সে নীতির অর্থ আমি বুঝি না। কী-ই বা কারকিত্ সেই নীতির। পরাক্রম বোধ হয় তার একটা নীতি। না হলে চুম্বি উপত্যকা কেন তিব্বতে চলে যায়? বললাম, 'চুম্বি উপত্যকা কি দেখা যায়?'

'সীমান্তে গেলেই দেখা যায়।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'তবে এতদূর থেকে, কিছুই বোঝা যায় না। দূরবীন চোখে লাগিয়ে আন্দাজ করা যায়। চীনা সশস্ত্র সৈন্যরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। শুনেছি উপত্যকাটি মনোরম। এক সময়ে সিকিমের সীমান্তের হেড কোয়ার্টার ছিল। কর্তাব্যক্তিরা গ্রীষ্মকালে সেখানে কিছুদিন কাটাতে যেতেন।

নেপোয় দই মারে, এমনিতে কথাটার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। এ রকম কথা শুনলে, অর্থটা যেন কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো পান্না সবুজ রঙের কেশর ফোলানো তুষার সিংহ, যে সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখছে সিকিমের আত্মাকে। মেজর ঘোষাল আমার মন পাগল করলেন। আমার সেই চিরদিনের ঘর ছাড়ার মন। কবে একটু সেই তুষার সিংহের কাছে যেতে পারবো, কে জানে। পাবার আগেই আমার মন চলে যায় সেখানে। যায় অচেনা পথ খুঁজতে খুঁজতে।

সেভক সেতুর কাছে নেমে, তিস্তার ঢল নেমে গিয়েছে বাঁদিকে। মুহূর্তেই তার বুকের পাটায় সমুদ্রের বিস্তার। স্পষ্ট চোখে পড়ে, পূর্ব-দক্ষিণের সুদীর্ঘ বাঁকে বিশাল বনভূমির ভাঙন। দূর থেকেও দেখা যায় বিশাল মহীরুহের কঙ্কালরা পড়ে আছে।

মেজর ঘোষালের জীপের গতি বেড়েছে। সেভক করোনেশন সেতু, তিস্তার ওপর দিয়ে যানবাহন, মানুষ চলাচলের সুদৃঢ় পথ। আরো নেমে এসে সমতলে, রেল সেতু। মেজর ঘোষাল দমকা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাক, ক্রসিং লেভেল গেটটাও খোলা আছে। তিস্তার সেই ঝোলানো ব্রিজ, আর এই ক্রসিং লেভেল, প্রায়ই দাঁড় করিয়ে দেয় অবশ্য সেই সঙ্গে পাহাড়ী পথের গাড়ির কনভয়ও সময়ে সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে দেয়। আপনার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে?' বলে তিনি নিজেই কবজির ঘড়ি দেখে বললেন, 'বেলা আড়াইটা বাজে।'

তাও তো বটে। খিদের কথাটা এতক্ষণ মনে পড়েনি। কথাটা শোনা মাত্র মহাপ্রাণীটি যেন শরীরের ভিতর নড়েচড়ে উঠলেন। কিন্তু আমাকে ভদ্রতা করে কিছুই বলতে হলো না। মেজর সাহেব নিজেই বললেন, 'তবে আর বেশি দেরি হবে না, এবার ঝড়ের বেগে পৌঁছুবো।'

ঝড়ের বেগেই চললেন। একবার মুখ ফিরিয়ে চোখের পলকে দেখে নিলেন ভগ্নীকে। মহাশয়া সেই যে নয়ন মুদেছেন, তারপরে আর চোখ খোলেননি। কেবল তাঁর অবস্থানের ভঙ্গি কিছু বদলিয়েছে। সেটা অনিবার্য। পাহাড়ের একটানা উৎরাইয়ে, অনেক দুরন্ত সর্পিলতা ছিল। অন্তিম বক্রতা থেকে, মেয়েদের মাথার চুলের কাঁটার মতো নানাবিধ বাঁক, বাঁকচোরা পথ। অতএব কুন্দনন্দিনী গড়িয়ে গিয়েছেন আরো খানিকটা নিচে। তাঁর স্লিপার খোলা চরণযুগল এলিয়ে পড়ে আছে যন্ত্র দেওয়ালের গায়ে। ডান হাত আমার কোলের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে ডাইনের নিচে। মাথা আমার বাম বক্ষে ন্যস্ত। তাঁর কেশরাশি পাহাড়ে যতো উড়েছে, এখন তার থেকে বেশি উড়ছে। আমার নিজের মুখ সামলানো দায়। আর অঙ্গ থেকে কেশ, সকল ফুলেল গন্ধ আমার ঘ্রাণের ভিতর দিয়ে, ঘ্রাণ নামক ইন্দ্রিয়টিকে অবশ করে রেখেছে।

'এবার ওকে তুলে দেওয়া দরকার, আমাদের পৌঁছুতে আর দেরি নেই।' মেজর ঘোষাল বললেন, এবং আর একবার ভগ্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর সেই দৃষ্টিতে একটি দ্বিধা আর স্নেহ কি যুগপৎ ফুটলো। তিনি বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে, ডান হাত দিয়ে ভগ্নীর এলানো বাঁ হাত ধরে টেনে ডাকলেন, 'মিষ্টি, এই মিষ্টি, উঠে পড়, শিলিগুড়ি এসে গেছে।'

কুন্দনন্দিনী তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন না। তাঁর কাঁধে একটা ঝাঁক লাগানো। মেজর ঘোষাল জোরে হাত টেনে, কুন্দনন্দিনীকে প্রায় সোজা করে দিলেন।

হৃদয় কি বাঁ দিকে থাকে? তাহলে এতক্ষণ আমার সেই অঙ্গটি অবশ হয়ে ছিল। হঠাৎ মুক্তি পেয়ে সাড় ফিরে এলো। কুন্দনন্দিনী মাথা নাড়িয়ে ঝাঁকালেন। ভুরু কুঁচকে অর্ধ নেত্রে তাকালেন। ধীরে ধীরে পূর্ণ নেত্রের উন্মীলন। আগে তবু কোকিলের চোখ বলেছিলাম? এখন প্রকৃত রক্তচক্ষু। সহসা তাকিয়ে থাকতে পারলেন না, আলোর ঝলক তাঁর দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিল। কিন্তু চোখ বুজেই সোজা হয়ে বসলেন, চরণ যুগল টেনে আনলেন। তারপরে আবার তাকালেন সামনের রাস্তার দিকে। তাঁর সদ্য ঘুমভাঙা রক্তাভ চোখে যেন একটি অন্যমনস্কতা। বোধ হয় গম্ভীরও হয়ে উঠছেন আস্তে আস্তে। রঙ্গ রহস্যের কোনো ঝলক নেই। এ মানুষ সেই মানুষটি আর নেই।

ঝড়ের গতিতে জীপ শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে প্রবেশ করলো। মেজর ঘোষাল কয়েকবারই ভগ্নীর দিকে তাকালেন। কুন্দনন্দিনী দু'পাশের কোনো দিকেই তাকালেন না। ডানদিকে নিচে চোখ নামিয়ে দেখলেন। তাঁর স্খলিত রেশমী আঁচল তুলে নিলেন আমার কোল থেকে। বুকের কাছে টেনে, জামার ফাঁকে গুঁজে দিলেন। দু'হাতে, মুখের দু'পাশ থেকে চুল টেনে টেনে সরিয়ে দিলেন পিছনে। তারপরে খুব সহজ ভাবে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'পেছন থেকে আমার ব্যাগটা একটু দেবেন?'

একে বলে সাড়। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে ঝুঁকে পড়াটা এখন তাঁর নিজের কাছেই হয়তো অস্বস্তিকর ঠেকছে। তা ঠেকুক, কিন্তু সেই হাসি কোথায়? রঙ্গ রহস্যের প্রয়োজন নেই। তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে, আমিই যে আড়ষ্ট বোধ করছি। পিছন থেকে তাঁর ড্রাগনমুখো কারুকার্য করা ব্যাগটা তুলে দিলাম। তিনি ব্যাগের মুখ খুলে ভিতর থেকে বের করলেন বিরাট মাপের চোখের ঢাকনা। সানগ্লাস যার নাম। চোখে পরার পর মনে হলো, মুখে মখোশ এঁটে নিলেন। রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে যদিও তাঁর চোখ দুটি আবছা দৃশ্যমান, চোখের রঙ বোঝবার কোন উপায় নেই। তারপরে বের করলেন, ছোট একটি রঙীন কার্ডে রবারের সুতোয় আটকানো ছোটতর শিশি। ক্ষুদ্রতম ছিপিটি খুলতেই, মহার্ঘ ফুলেল গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। রঙীন কার্ডের গায়ে বিদেশের এক শৌখীন শহরের নাম লেখা। আতরের শিশির মতো দেখাচ্ছে। আঙুলে নিয়ে নিয়ে নিজের গলায় কানের পিঠে নানা স্থানে স্পর্শ করলেন। গন্ধটা দত্ত সাহেবের কালিম্পং-এর অস্থায়ী অফিস ঘর থেকেই পেয়েছি। এখন আমার পোশাকেও মাখানো।

কুন্দনন্দিনী শিশিটি ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে গিয়ে, আমার দিকে তাকালেন।

মুখোশ পরা চোখে ঈষৎ হাসি যেন শুকনো ফুলের মতো দেখালো। ময়না-স্বর মোটা শোনালো। 'একটু লাগাবেন নাকি? অবিশ্যি আপনার নিশ্বাসে রাম্-এর গন্ধ তেমন নেই নিশ্চয়।'

ফুলেল গন্ধের একটা প্রয়োজন কি সেই জন্য? একটু ব্যস্তভাবেই বললাম, 'না না, আমার দরকার হবে না।'

কুন্দনন্দিনী আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না। শিশির কার্ড ব্যাগের মধ্যে রেখে, মুখ বন্ধ করলেন। শহরের এক প্রান্তে, মহানন্দার সেতু পেরিয়ে, নিরিবিলি ঢালুতে কতকগুলো বাড়ি। তারই একটি বাড়ির খোলা গেট দিয়ে ঢুকে, পাথরের কুচি ছড়ানো উঠোনে, জীপ দাঁড়ালো। বাড়ির সামনে ঢাকা বারান্দায় ঝকঝকে কয়েকটা বেতের শোফা। সামনেই ঘরের কাঁচের দরজা খোলা, কিন্তু মোটা পর্দা ঢাকা। বাড়িটা দোতলা। উঠোনের এক পাশে, একটি মোটরগাড়ি। মেজর ঘোষাল আমার দিকে ফিরে বললেন, 'নামা যাক।' বলে তিনিই আগে নামলেন।

আমি না নামলে কুন্দনন্দিনী নামতে পারবেন না। নেমেই দেখলাম, ঘরের পর্দা সরিয়ে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। প্রথম দর্শনে মনে হলো, তিনি এক-জন টেনিস খেলোয়াড় হবেন বা। যেন খেলা ছেড়ে এলেন। অন্তত পোশাক দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। সাদা শর্ট আর সাদা তোয়ালের মতো মোটা কলার তোলা গোঞ্জি তাঁর অঙ্গে। পায়ে রবারের স্যাণ্ডেল। অনতিদীর্ঘ শক্ত পেশী-শরীর। মাথার চুল ছোট, স্বল্পও বটে, সামনের দিকে টেনে দেওয়া। তথাপি কপালের সামনে অনেকটাই চওড়া। ডান হাতের মোটা কব্জিতে ঘড়ি। মুখটি হাড়পুষ্ট চওড়া, খাঁজ ভাঁজ বেশ আছে। গোঁফ-দাড়ি নেই। ছোট চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মোটা ভুরু। মুখে কিঞ্চিৎ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলেন। তার মধ্যেই একবার আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখে নিলেন। মেজর ঘোষালের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনাদের দেরি হচ্ছিল দেখে, এইমাত্র ভাবছিলাম কালিম্পং-এ একটা ট্রাংককল করবো কী না।'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'খুব দেরি হয়নি তো? তুমি খেয়ে নিয়েছ?'

মহাশয় বললেন, 'না না, খেয়ে নেবো কী, আমি আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, আসুন। এসো।' বলে তিনি কুন্দনন্দিনীর দিকে তাকালেন।

মেজর ঘোষাল আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' বলে তিনি আমার নাম পরিচয় দিলেন, এবং মহাশয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এ হচ্ছে আমার ভগ্নিপতি—মানে, মিষ্টির বর বরেন মুখার্জি, গ্রেট

জেনারেল ম্যানেজার অব এ গ্রেট ইণ্ডো-ফরেন কোম্পানি।' এবং নিজে বোধ হয় গ্রেট করেই হাসলেন।

বরেন মুখার্জি—অর্থাৎ মিঃ মুখার্জি হাসলেন। আমার নমস্কারের জবাবে তিনি পুরোপুরি বিলিতি কেতায় 'হ্যালো' করলেন। হাইফাই গোছের হাউড্যুয়োড্যু, এবং 'প্লিজ কাম্ ইন্।' বলে বারান্দায় উঠতে উঠতে কুন্দ-নন্দিনীর কোমরে হাত স্পর্শ করলেন।'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'শোনো বরেন, এক মুহূর্ত বসতে পারবো না, পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। তার ওপরে লেখককে ধরে এনেছি। ওঁরও একই অবস্থা।'

কুন্দনন্দিনী পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। মিঃ মুখার্জি হেসে বললেন, 'খাবার রেডি, আপনারা বসলেই হয়। তার আগে এক আধ বোতল ঠাণ্ডা বীয়র ?'

'রক্ষা করো বাবা, ও সবে আর নেই।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'আমাকে আবার লেখককে নিয়ে এখুনি পাহাড়ে উঠতে হবে।'

মিঃ মুখার্জি পর্দা তুলে ধরলেন। আমি মেজর ঘোষালের পিছনে পিছনে ঢুকলাম। রীতিমতো হোটেলের বৃহৎ লাউঞ্জের মতো সাজানো ঘর। রিসেপশন কাউণ্টার অবিশ্যি নেই। মুখার্জি বললেন, 'একেবারে ওপরে চলুন।'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'মিষ্টির স্যুটকেশ-ট্যুটকেশ সব জীপে রয়েছে।'

'সব তুলে আনা হবে। ভাববেন না।' মুখার্জি বললেন।

কুন্দনন্দিনীকে দেখতে পেলাম না। ওপরে এসেও না। বরের ঘরে এসেই বউটি ডুব দিয়েছেন। এই না হলে আর বর বউ! দোতলায় মস্ত ড্রয়িংরুম, পাশেই বিরাট ডাইনিং রুম। একে খাবার ঘর বললে, ঘরের অমর্যাদা করা হয়। সামনেই দোতলার ব্যালকনি। ড্রয়িংরুমের গায়েই, দুটি দরজা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভেতরে শোবার বা থাকবার ঘর রয়েছে। মেজর ঘোষাল বললেন, 'এ বাড়িটা হচ্ছে বরেনদের কোম্পানির গেস্ট হাউস। সব রাজকীয় ব্যাপার। শোবার ঘর দুটোই এয়ার কণ্ডিশণ্ড। অবিশ্যি এই নভেম্বরে আরামটা ভোগ করা যাবে না। আমাদের সময়ও নেই শুয়ে বিশ্রাম করবার।'

'একটু বিশ্রাম করে যেতে দোষ কী ?' মুখার্জি বললেন।

মেজর ঘোষাল বললেন, 'অসম্ভব। পাহাড়ের পথে আমি বেশি রাত করতে চাই না। এ ভদ্রলোককে পৌঁছুতে হবে ওঁর হোস্টের কাছে। তোমাদের কলকাতায় ফেরা কবে ? টিকেট বুক করা হয়েছে ?'

মুখার্জি বললেন, 'নিশ্চয়ই। আজকের দার্জিলিং মেলেই আমরা যাবো।

গতকালই যেতে পারতাম, আপনার বোনের জন্য একদিন থাকতে হলো। আমার নর্থ-বেঙ্গলের কাজ গত পরশুই শেষ হয়েছে। আপনারা বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিন। আমি বেয়ারাকে খাবার দিতে বলছি।'

মুখার্জি ডাইনিংরুমের শেষ দরজায় অদৃশ্য হলেন। মেজর ঘোষাল আমার দিকে ফিরে বললেন, 'একটু বসে তারপরে বাথরুমে যাবেন নাকি ?'

বললাম, 'বসে তো ছিলাম এতক্ষণ। আপনার পরিশ্রম হয়েছে, একটু বিশ্রাম দরকার।'

'আমরা মশায় ফৌজী মানুষ, এত সহজে কাবু হই না।' মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, 'তাহলে হাত মুখ ধুয়ে আগে ডান হাতের কাজটা সেরে নেওয়া যাক। আপনি আগে বাথরুম ঘুরে আসুন।'

আমি এক পায়ে খাড়া। মেজর ঘোষাল আমাকে বাথরুম দেখিয়ে দিলেন। নিঃসন্দেহে রাজকীয় ব্যবস্থা। আয়নায় নিজেকে দর্শন করে বুঝতে পারলাম, অগোছালো উসকোখুসকো হয়েছি। যতোটা সম্ভব গোছালো হয়ে নিলাম। নতুন মোড়কে মোড়া সাবান, পাট ভাঙা তোয়ালে রয়েছে। সময় থাকলে এমন গোসলখানায় গোসলটাও করে নেওয়া যেতো। সে সময় নেই। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে কারোকেই দেখতে পেলাম না। দুজন ভৃত্যশ্রেণীর লোককে দেখলাম, খানাঘরের টেবিলে খানা সাজাচ্ছে। রান্নার গন্ধটা মহাপ্রাণীকে ব্যাকুল করে তুললো। আয়োজনটা রাজকীয় বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

বেশিক্ষণ বসতে হলো না। মেজর ঘোষাল সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি বাথরুমের কাজ সেরে এসেছেন। মুখার্জিও বেরিয়ে এলেন। কিন্তু কারোর মুখেই হাসিখুশির ভাব নেই। একজন চিন্তিত, আর একজন গম্ভীর। চিন্তিত মেজর ঘোষাল আমাকে ডেকে বললেন, 'আসুন, বসে পড়া যাক। মিষ্টি, আয় একসঙ্গে খেয়ে নিই।'

তাঁর গলা চড়িয়ে ডাক শেষ হবার আগেই, কুন্দনন্দিনী ভিতর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পোশাক বদলাননি, কিন্তু মুখের প্রসাধন ধোয়া মোছা। রেশমী কোমল কেশ, গুছিয়ে আঁচড়ানো। চেহারাটা যেন কেমন বদলিয়ে গিয়েছে। আবার সেই একই কথা, এ মানুষে সেই মানুষটি ঠিক ঠিক নেই। তিনি বেরিয়ে আমার দিকে ফিরে, ঈষৎ হেসে বললেন, 'আসুন।'

মেজর ঘোষাল খাবার টেবিলে বসতে বসতে বললেন, 'লেখক এখন তোর অতিথি, ভালো করে খাওয়া।'

কুন্দনন্দিনী ছাড়া আমরা সবাই বসলাম। আমিই তাঁকে বললাম, 'বসুন।'

কুন্দনন্দিনীর সেই ময়না স্বর নেই, বললেন, 'হ্যাঁ বসছি। আপনাদের একটু দিয়ে নিই।'

মুখার্জি বললেন, 'তুমি বসো না, ওরাই দেবে। তুমি বলে দাও।'

কুন্দনন্দিনী কোনো জবাব দিলেন না। পরিবেশন শুরু করলেন, আমাকে প্রথম দিয়ে। ভাত, ডাল, ভাজা, মাছ এবং মাংস দুই-ই বর্তমান। রান্নাও উপাদেয়। আয়োজনও কম না। আমাদের অর্ধেক খাবার পথে কুন্দনন্দিনী বসলেন। কিন্তু কোথায় যেন ঠেক লাগছে। একটা ধন্দের মতো। সেই হাসি পরিহাস নেই। সকলেই অতি স্বল্পবাক হয়ে গিয়েছেন। তালটা কাটলো কোথায়? নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছে। কুন্দনন্দিনীর আহারে তেমন গা নেই যেন। অল্প খাদ্য নিয়ে নাড়াচড়া করছেন মাত্র।

এ অবস্থাতেই খাওয়ার পর্ব শেষ হলো। মেজর ঘোষাল ঘোষণা করলেন, 'আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। শোফাতেই একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক।'

মিঃ মুখার্জি এবং কুন্দনন্দিনী—অর্থাৎ বর বধূ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। আমরা ধূমপান করলাম। মেজর ঘোষাল সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'সিকিমে কবে আসছেন বলুন। আমি থাকতে থাকতেই আসুন। আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবো।'

তৎক্ষণাৎ আমার ডানায় কাঁপন জাগলো। লোভীর মতো তাঁর দিকে তাকালাম। পরমুহূর্তেই হতাশ হয়ে বললাম, 'যতো শীগ্‌গির পারি। তুষার সিংহের দেশের কথা বলে আপনি আমাকে পাগল করেছেন।'

'সত্যি?' মেজর ঘোষাল বললেন, 'এটা একটা কম ক্ষমতা নয়, একজন লেখক লোককে পাগল করতে পারা।'

কেমন করে বলি, পাগল আমি হয়েই আছি। সেই পাগলকে তিনি সাঁকো নাড়া দিতে বলেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, এই তিস্তা নদী কোথা থেকে আসছে?'

'উত্তর সিকিম থেকে।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'বলতে গেলে তুষার সিংহের পায়ের নিচে থেকেই। আপনি যদি কখনো আসেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে।'

আমি প্রায় ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন করে যাবো?'

মেজর ঘোষাল হেসে উঠে বললেন, 'গাড়িতেই যাবেন। অবিশ্যি এটা ঠিক,

যে কোনো গাড়ি সে পথে উঠতে পারবে না। জোংগা গাড়িতেই যেতে হবে, আর সেটা আর্মির হাতেই আছে। তা ছাড়া আরো কিছু ঝামেলা আছে। উত্তর সিকিমে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, এমন কি স্থানীয় অধিবাসীদেরও। গ্যাংটকের অধিবাসীদের উত্তর সিকিমে যেতে হলে বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন। অনুমতি দেওয়াই হয় না প্রায়।'

আমি হতাশ বিস্ময়ে বললাম, 'নিজ ভূমে পরবাসী? সেই নিষিদ্ধ দেশে তাহলে আমি যাবো কেমন করে?'

মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, 'গ্যাংটকে ভারতীয় পলিটিকাল অফিসারের একটি ছাড়পত্র পেতে হবে আপনাকে। সেটা ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি তো আর রাজনীতি করতে যাচ্ছেন না, বেড়াতে যাবেন। আর নর্থ সিকিমে সাধারণের যাওয়া নিষেধ, তার কারণটা সামরিক। যেমন সিকিমের নাথুলা পাস্। সিকিমের পূর্ব সীমান্ত। উত্তর সিকিমে যতোই যাবেন, ততোই আপনি আর এক সীমান্তের কাছাকাছি। সীমান্ত রক্ষার সিকিউ-রিটির জন্যই সাধারণের যাতায়াত নিষেধ। তা বলে মনে করবেন না, উত্তর সিকিমে লোকজন নেই।' বলে তিনি হেসে উঠলেন, 'সেখানকার অধিবাসীরা সেখানেই থাকে। পথঘাট অবিশ্যি খুবই দুর্গম। মনে হবে তুষার ঢাকা পাহাড়ের বেড়াজালের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।'

আমি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর তিস্তাও সেখানে আছে?'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'নিশ্চয়ই। একটি সুতোর মতো ধারা অনেক নিচে দেখতে পাবেন।'

আহ্, আমার মন পাগল হইল রে! তুষার সিংহের পায়ের তলায়, সুতোর মতো তিস্তা। সমতলে যে এলোকেশী রণরঙ্গিনী। বন জনপদ ডুবানি ভাসানি। শুনেছি, হস্তীযূথকে আছড়ে তলিয়ে নিয়ে যায়। কোন্‌খানে সে আপন ঘরে শান্ত থাকে? তুষার সিংহের পায়ের নিচে?

কুন্দনন্দিনী বেরিয়ে এলেন ঘরের দরজা খুলে। হাতে তাঁর ড্রাগনমুখো ব্যাগ। মুখে এখন আবার রক্তের ছটা কেন? মেজর ঘোষাল ঘড়ি দেখে বললেন, 'মিষ্টি, এবার আমরা যাবো।'

'আমিও তোমার সঙ্গে ফিরে যাবো।' কুন্দনন্দিনী বললেন শান্ত গম্ভীর স্বরে।

মেজর ঘোষাল ভ্রূকুটি অবাক চোখে ভগ্নীর মুখের দিকে তাকালেন। মুখার্জি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন,

'আপনার বোন, আপনার সঙ্গেই ব্যাক করছে। ট্রেনের টিকেট ছিঁড়ে বাথরুমের কমোডের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

মেজর ঘোষাল তীব্র অস্বস্তিতে বলে উঠলেন, 'আহ্ মিষ্টি কী ছেলেমানুষি যে তোরা করিস্।'

কুন্দনন্দিনীর মুখের রক্তের ছটা চড়া হলো। বললেন, 'একে যে ছেলেমানুষি বলে, তা আমি জানি না। তাহলে অনেক কথা বলতে হয়, যা আমি এখন বলতে চাই না। ও যদি তোমাকে কিছু বলতে চায় বলুক।' বলেই তিনি সিঁড়ির দিকে হেঁটেই চলে গেলেন।

তিস্তা ছোটে নাকি বেগে? কেঁপে যাই যে! মেজর ঘোষাল বিভ্রান্ত বিস্ময়ে মুখার্জির মুখের দিকে তাকালেন। মুখার্জি বললেন, 'আমার কিছু বলবার নেই। ও না যেতে চাইলে, ওকে আমি নিয়ে যেতে পারি না, আপনি তা ভালোই জানেন। ওর যখন ইচ্ছা হবে, তখন কলকাতায় ফিরবে। অবিশ্যি আপনার অসুবিধে হবে।'

'সেটা কোনো কথাই না।' মেজর ঘোষাল রীতিমত উষ্মার স্বরে বললেন, 'আমার অসুবিধের কথা না ভেবে, নিজেদের ভবিষ্যতের কথাটা ভাবো। ভুলে যেও না, তোমাদের একটি সন্তান আছে, তারো ভবিষ্যৎ আছে।'

মুখার্জি যেন একটু বিব্রত হলেন। আমার দিকে একবার দেখে বললেন, 'আমি পরে আপনার সঙ্গে কথা বলবো।'

মেজর ঘোষালও একবার আমাকে চকিতে দেখে নিয়ে বললেন, 'জানি না, কী আর তোমাদের বলার আছে। আমাকে বলবার কিছুই নেই, যা বলাবলি, তা তোমাদেরই করতে হবে। আসুন।' বলে আমাকে ডেকে তিনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

আমার নিজেকে বিভ্রান্ত বললেও ঠিক বলা হয় না। এমন কি অবাক অপ্রস্তুতও না। অতিকায় একটি প্রাণীর মতো নিজেকে মনে হচ্ছে, যাকে বোধ হয় উল্লুক বলে। কী দুর্বিপাক! এ সব ঘটনার মধ্যে নিজের এই উপস্থিতিকে নিজেরই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে। কোনো কথা না বলে, মেজর ঘোষালকে অনুসরণ করলাম। উপায়হীন, আমাকে তো কালিম্পং ফিরে যেতেই হবে।

নিচে এসে দেখলাম, কুন্দনন্দিনী জীপের মধ্যে তাঁর আসনে বসে আছেন। চোখে ইতিমধ্যে পরে নিয়েছেন সেই মুখোশের মতো মস্ত ঠুলি। মুখার্জিও আমাদের সঙ্গে নিচে এলেন। আমি তাঁর দিকে ফিরে কোনো রকমে কপালে

হাত ঠেকালাম। তিনি ঈষৎ মাথা ঝাঁকালেন। মেজর ঘোষাল কোনো কথা না বলেই চালকের আসনে বসে আমাকে ডেকে বললেন, 'আসুন, উঠে পড়ুন।'

তা ছাড়া উপায় বা কী? উঠে বসলাম। মেজর ঘোষাল গাড়ির এঞ্জিন চালু করে, হাত তুলে মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলি।' বলেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রীতিমত বেগেই গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কারোর মুখেই কোনো কথা নেই। গাড়ি উঁচু রাস্তায় উঠে, মহানন্দা সেতু পার হয়ে শহরে ঢুকলো। তারপরে ডাইনে মোড় নিয়ে ছুটলো। আমার অস্বস্তি ক্রমাগত বাড়ছে। এসেছিলাম এক রকম ভাবে, যেন তিস্তার ঢলের কলকলানিতে। অনেক হাসি ঠাট্টার মধ্যে হয়তো কথনো একটু অন্য সুর বেজে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সময় গিয়েছে। সে সুরকে এখন আর বেসুর মনে হচ্ছে না। সুরেরই এক অঙ্গ। বরং নিচে নেমে, কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কারণে মনে যে কিঞ্চিৎ ছায়া ঘনায়নি, এমন মিথ্যা বলবো না। মানুষ তো। ওইখানে নিজেকে কদাপি অতিক্রম করতে পারিনি। সাময়িক হলেও, অনায়াস মেলামেশায় একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিচ্ছেদে মনে ছায়া ঘনাবে, সেটা বাস্তব। সেই বিচ্ছেদের মধ্যেই ছিল একটি আনন্দ, যা অন্তরের স্মৃতি হয়ে থাকবার কথা। এ বিপরীত ঘটনায়, প্রাণের ঘরে হাওয়া বন্ধ। গুমোটে গুম্‌সে মরি। অস্বস্তিতে মন ভরে উঠছে। এঁদের সঙ্গে নিজের উপস্থিতিটা বারে বারে কাঁটার মতো বিঁধছে।

স্বাভাবিক। স্বামী-স্ত্রী এবং অগ্রজ, ঘটনা তাঁদের মধ্যে। ঘরোয়া ব্যাপার। আমি তার মাঝখানে বাইরের মানুষ, মূর্তিমান আপদ। একটি অচলায়তন বাধা। অগ্রজ আর ভগ্নীর মধ্যে কোনো লেনা দেনা নেই। বাইরের লোকের সামনে ঘরের কথা কে বা মুখ ফুটে বলতে যায়? একটু আধটু যা হয়ে গিয়েছে, যথেষ্ট। স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ, অমন হয়েই থাকে। পথ চলতে অনেক অচেনা দম্পতীকেই কিছু কিঞ্চিৎ বিবাদ খুনসুটি করতে দেখা যায়। তার চেহারা আলাদা। এখানে একজন সামনে তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন। আর একজন মুখোশ পরা মুখ নিয়ে, কাষ্ঠ পুত্তলিকার মতো বসে আছেন। ভাবাই যায় না। তাঁর শাড়ি ওড়ে, চুল ওড়ে, কিন্তু কী সাব্যস্ত! পুরনো ছবিটাকে অবিশ্বাস্য মনে হয়। ইচ্ছা করে, গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে নামি।

'আমি বোধ হয় তিতুর কাছে দার্জিলিং-এ চলে গেলেই পারতাম।' কুন্দনন্দিনী এতক্ষণে একটি কথা বললেন।

মেজর ঘোষাল বললেন, 'ছাখ্ মিষ্টি, বিরক্ত করিস্ না, কেন মিছিমিছি একজন লেখকের সামনে বকুনি খেয়ে মরবি? তিতুর কাছে গেলেই সব সমস্তার সমাধান হয়ে যাবে, না?'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'সমাধানের কথা বলছি না।'

'জানি, আমার খারাপ লাগার জন্য বলছিস।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'কিন্তু তিতুর কাছে গেলে, আরো খারাপ হবে। ছেলেমানুষ বেচারি, তোকে হঠাৎ ওর কাছে গিয়ে উঠতে দেখলে, মনে মনে ভয় পাবে। কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে, অন্য জায়গা থেকে চারদিকে ট্রাংককল করতে আরম্ভ করবে। কেন বাজে কথা বলছিস্?'

কুন্দনন্দিনী বাঁদিকে ফিরে বললো, 'কিন্তু তুমি মুখটা ওরকম করে থাকলে আমার খারাপ লাগে না?'

'না, তোরা যা খুশি তাই করবি, আর তাই দেখে আমাকে দাঁত বের করে হাসতে হবে।' যাকে বলে খেঁকিয়ে ওঠার স্বরে কথাটি বলেই, মেজর ঘোষাল আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলেন।

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'মেজদা, তুমি তো সেই লেখকের সামনেই আমাকে দাঁত খিচিয়ে বকুনি দিচ্ছ!'

'বেশ করছি, দিচ্ছি।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'এর পরে আরো কিছু করতে পারি। ভুলে যাসনে, তুই আমার থেকে আট বছরের ছোট।'

'মারবে?' কুন্দনন্দিনী তাঁর চোখ থেকে মুখোশের মতো ঠুলিটা খুলে ফেললেন।

মেজর ঘোষাল শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ মারবো।' বলে বাঁ দিকের বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বাঁ হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'লেখককে একটা সিগারেট দে, আমাকে একটা ধরিয়ে দে। মাঝখান থেকে এ ভদ্রলোকের কী অবস্থা বল্ দেখি? এ ভাবে কেউ নতুন চেনা মানুষদের সঙ্গে থাকতে পারে?'

প্রাণের কথা বললেন। তবে যে মনে করতাম, ফৌজী মানুষরা মনের ধার ধারে না? তারা বোঝে শুধু যুদ্ধবিগ্রহ, পান থেকে চুণ খসার ত্রুটি পর্যন্ত মানতে চায় না। সব কিছুর ওপরে নিয়ম নিগড় শৃঙ্খলা। আমি বিব্রত হেসে বললাম, 'ঠিক তা না, তবে আমার মনে হচ্ছে, আমি আপনাদের অসুবিধা ঘটাচ্ছি।'

'কী রকম?' কুন্দনন্দিনী ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালেন, 'আপনি আবার কী অসুবিধা ঘটাবেন? আমাদের যা ঘটবার, তা তো ঘটলোই।'

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'তা ঘটলো, তারপরেও তো কিছু থেকে যায়। আমি না থাকলে, আপনারা হয় তো একটু সহজ হতে পারতেন।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে, আমরা অসহজ হয়ে রয়েছি?' কুন্দনন্দিনী চোখের কোণে তাকিয়ে বললেন।

এমনি করে বললে, জবাব দেওয়া কঠিন। ঠিক এ মুহূর্তে তাঁদের আর অসহজ বলতে পারবো না। অগ্রজ নিজেই ভগ্নীকে আবার সিগারেট ধরিয়ে দিতে বলছেন। ধমক বকুনিও দিচ্ছেন, এবং হাসছেন। আমি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললাম, 'আমার অবস্থাটা একটু ইয়ে—মানে—।'

'বুঝেছি মশায়, বুঝেছি।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আপনার সামনে যা ঘটে গেছে, সেজন্য মাফ্ চাইছি, হলো তো?'

একেই বলে গানের উতোর চাপান, চিতেন দান। উল্‌টি গঙ্গা বহে! তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, মাফ চাইবেন কেন? সেটা আরও অসুবিধাজনক।'

কুন্দনন্দিনী মৃদু ঝংকারে ঈষৎ হেসে বললেন, 'তবে নিন, এখন একটা সিগারেট ধরান।'

আমি তাঁর হাতের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিলাম। তিনি আমার হাতে লাইটারটা ধরিয়ে দিয়ে, নিজেও একটি সিগারেট, রঙহীন ঠোঁটে চেপে ধরলেন। অতএব লাইটার জ্বালিয়ে আগুন দেবার কাজটা আমাকেই করতে হলো। কুন্দনন্দিনী সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আপনার সামনে যদি সহজ না থাকতাম, তাহলে আপনাকে কিছু বুঝতেই দিতাম না, যা ঘটবার তা ঘটে যেতো আড়ালেই। বুঝতে পারছেন, আমি কলকাতায় ফিরবো বলেই নেমে এসেছিলাম, তা না হলে মেজদাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতাম না।'

'দয়া করে আমার কষ্টের কথা পরে ভাবিস।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'কিন্তু সিগারেটটা তোর না, আমার জন্য ধরাতে বলেছি।'

কুন্দনন্দিনী চমকে ফিরলেন অগ্রজের দিকে, বললেন, 'ও মা, সত্যিই তো! আমি দিব্যি টেনে যাচ্ছি।' জলন্ত সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন।

মেজর ঘোষাল সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চেপেই বললেন, 'তা তো যাবিই। যতো রাজ্যের বাজে কাজগুলো সব রপ্ত করেছিস।'

কুন্দনন্দিনী ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা অবিশ্যি ঠিক। মেজদা, কাজের কাজ তো আমার দ্বারা কিছুই হলো না।'

মেজর ঘোষাল ভ্রূকুটি চোখে ভগ্নীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেন। বলে উঠলেন, 'মিষ্টি, ও রকম করে কথা বলিস না। তাহলে আমি গাড়ি-ফাড়ি চালাতে পারবো না।'

যদি ঠিক দেখে থাকি, তবে কাজলবিহীন চোখ দুটি যেন ছলছলানো। কুন্দনন্দিনী অগ্রজের হাঁটুর কাছে হাত রাখলেন। মেজর ঘোষাল স্টিয়ারিং থেকে ডান হাত নামিয়ে ভগ্নীর হাতের ওপর মৃদু চাপ দিলেন। বললেন, 'সবই বুঝি মিষ্টি। কিন্তু কষ্ট তো হয়। কষ্ট হয় বলেই বলি।'

'জানি মেজদা।' কুন্দনন্দিনী বললেন।

মেজর ঘোষাল দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরে বললেন, 'তোকে আমি দোষ দিই না। বরেনের দায়িত্ব কী, তা আমি বুঝি। ওকে তা পালন করতেই হবে। জেদাজেদি করলে চলবে না। তা না হলে, একটা কোনো ফাইনাল ডিসিশানে আসতেই হবে। মিনির কথা ভুললে তো চলবে না।'

কুন্দনন্দিনী কোনো জবাব দিলেন না, বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আবার আমার প্রাণের হাওয়ায় ঠেক। আমি এখন না নিজের ঘরেতে। না থাকতে চাই পরের ঘরে। আমি এখন পথের। কিন্তু থাকতে পারছি না যে। এখন আমি অন্য আকাশ তলে। তার রোদের কিরণ, মেঘের ছায়া, বর্ষার জলকে আমি এড়াবো কেমন করে? অতএব আমিও সামনের দিকে তাকিয়ে ধূমপান করি।

মেজর ঘোষালের গাড়ির গতি বেশ কম না। প্রায় দেখতে দেখতেই চলে এলাম তিস্তার কাছে। কূলনাশিনী এখন আমার ডাইনে। বেলা এখন ঢলের দিকে। হেমন্তে জলোচ্ছ্বাস না থাকলেও, বালুচরের বিস্তার দেখে প্লাবন অনুমান করা যায়। বালুচরের দিগন্ত বিস্তৃত শাদার মাঝে, দুই তিন নীল স্রোতধারা! রৌদ্রকিরণে সব চিক চিক করছে। তিস্তার দেখা পেলেই, পাহাড়ের দেখা। সামনেই অরণ্য ঘন নীল পাহাড়। দুরন্ত বেগে গাড়ি পাহাড়ের চড়াই ধরলো। তিস্তা আমার ডাইনে। যতোক্ষণ দিনের আলো থাকবে, ততোক্ষণই সে আমার সঙ্গে সঙ্গে। সেই ঝুলন্ত সেতু পার না হওয়া পর্যন্ত। কোথা থেকে আসছো তুমি? কোথায় তোমার জন্মভূমি? তুষার সিংহের পায়ের তলায়। কবে তোমার সেই আঁতুড় ঘরখানি দেখতে পাবো? পাবো কি কখনো?

'মনে হচ্ছে, মনটাকে আর ফেরাতে পারছেন না।' কুন্দনন্দিনী বললেন। তাঁর মন্দ্রস্বরে শীত ঋতুর ম্লানতা।

আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকেই।

এটা আবার উল্‌টো গাওনা। তাঁদের ভ্রাতা ভগ্নীর মাঝখানে মন কেরাই কেমন করে? তার চেয়ে এই তো আমার ভালো। তিস্তার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে যাই। জলের ধারায় তাকিয়ে মনে হয়, কী গভীর রহস্য তার স্রোতে। কতো কী কথা যেন বলে চলেছে। যার বচন বৈয়াকরণ কিছুই জানা নেই। বিব্রত হেসে বললাম, 'আপনাদের কথাই শুনছিলাম।'

'আর সেই কথা থেকেই বারে বারে সরে যেতে চাইছেন।' কুন্দনন্দিনী বললেন।

সেটাই কি স্বাভাবিক না? অধিকারের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, অস্বস্তি তো যাবার না। পরের কথায় কেন বা কান দেবো? সে কথা বলা যায় না।

কুন্দনন্দিনী আবার বললেন, 'কিন্তু আপনি তো মশাই আস্তাকুড় ঘাঁটা মানুষ। এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে আপনার কী যায় আসে?'

কিছুই না। যেখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই, করার নেই কিছু, সে ক্ষেত্রে আমার যায় আসে না কিছুই। কিন্তু চিরদিনই চেয়েছি, আমার চলার পথ যেন পা টেনে না ধরে। মনকে না করে পিছনমুখী। কোনো দায়ে না বদ্ধ করে। আমি পেরিয়ে এসেছি অনেক আস্তাকুড়? তাতেই বা কী? এক্ষেত্রে সে কথাই বা কেন? বললাম, 'আস্তাকুড়ের কথা কেন বলছেন?'

'কারণ, আস্তাকুড়ের ঘটনা বলে।' কুন্দনন্দিনী বললেন।

মেজর ঘোষাল বললেন, 'মিষ্টি, কেন ভদ্রলোকের মন খারাপ করছিস্? অন্য কথা বল্।'

'বলবো তো।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'উনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে বলি কেমন করে?'

দূরে কোথায়? তিনি তো বসে আছেন, প্রায় আমার গা ছুঁয়েই। হেসে বললাম, 'দূরে নেই, কাছেই আছি।'

'সত্যি?' কুন্দনন্দিনী ঘাড় কাত করে, আমার দিকে তাকালেন এবং অপাঙে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বললেন, 'কেমন করে বুঝি বলুন তো? আপনার যে-কটা লেখা পড়েছি, সেখানে যেমন আপনাকে বোঝা যায়, সেই রকম বুঝবো?' তাঁর কাজলবিহীন চোখে এবার ঝিলিক হানলো। রঙহীন ঠোঁটে হাসি।

সে আবার কেমন বোঝা তা তো জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কেমন বলুন তো?'

কুন্দনন্দিনীর চোখের পাতা নিবিড় হলো, কালো তারায় ছটা। বললেন,

'মেয়েরা ছলনা করলে, তাদের একটা ইতর বিশেষণ দেওয়া হয়, অবিশ্যি খুবই গ্রাম্য। আপনাকে তো আমি তা বলতে পারবো না।'

কী সেই ইতর গ্রাম্য বিশেষণ? বাঙালী পুরুষকে এত ভাবতে হয় না। বিশেষণটা নিরুচ্চারিত থেকেই আমার কান ঝাঁজিয়ে দিল। আমি কিছু না বলে মুখ টিপে হাসলাম।

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'ভয় নেই, বলবো না। তবে আপনার ছলনার অন্ত নেই। রাগের মুখে দিব্যি হাসতে পারেন। মিথ্যে কথা বলতে পারেন অনায়াসে।'

হায় কালকূট কী তোমার চরিত্রের ব্যাখ্যা! আমি ছলনাকারী, আমি মিথ্যুক। তবু তো সেই গ্রাম্য বিশেষণটি উচ্চারণ করেননি। তাহলে একেবারে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে যেতো। কুন্দনন্দিনী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তাঁর শরীর এলিয়ে হেলে পড়লো আসনের পিছনে। বললেন, 'এখন যদি নিজের মুখটা একেবারে দেখতেন কালকূট মশাই, নিজেই অবাক হতেন।'

'বলিস তো রিয়ার ভিউ ফাইণ্ডারটা ওঁর দিকে ঘুরিয়ে দিই।' মেজর ঘোষাল হেসে বলে উঠলেন।

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'তা দিতে হবে না, উনি নিজেই ভালো জানেন, সত্যি কথাগুলো শুনে, তাঁর মুখের চেহারা কী দাঁড়িয়েছে।'

আমি বিব্রত ভাবে বললাম, 'হ্যাঁ, নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগছে।'

'মাই গড!' কুন্দনন্দিনী যেন প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠেই, আরো জোরে খিলখিলিয়ে উঠলেন। হাসিটি এখন ঋতুর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, যথার্থ ময়না-স্বরে। অনায়াসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'সেটাও জানেন, আপনাকে বোকা বোকা লাগছে। গুরু, পায়ের ধুলো দিন, এমন চতুরালি কমই দেখেছি।'

এবার শোনো বচন কাহারে কয়। 'সখী ভাবনা কাহারে বলে, যাতনা কাহারে বলে।' কিন্তু কুন্দনন্দিনী কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে যে ভাবে নিচের দিকে ঝুঁকলেন, আঁতকে উঠলাম। প্রায় তাঁর হাত ধরতে উদ্যত হয়ে বললাম, 'দোহাই, অমন কাজটি করবেন না।'

এবার ভ্রাতা ভগ্নী রীতিমত সুর বেঁধে সমবেত হেসে উঠলেন। তিস্তার খলখল হাসিও তাতে ডুবে গেল। হাসি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে, কুন্দনন্দিনী বললেন, 'তাহলে আর কখনো ও রকম কথা বলবেন না, দূরে নেই, কাছেই আছি। আপনি আদৌ কারোর কাছেই নেই, সেটা ঘরেই বলুন, আর বাইরেই বলুন। লিখি না বলে, আমরা কি কিছুই বুঝি না?'

বললাম, 'তা না হলে আর লেখা কেন?'

'জানি জানি, আপনি খুব মন যুগিয়ে কথা বলতে পারেন।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আসলে সব ঝুটা।' বলে আমার মুখের কাছে হাত তুলে আঙুল নাড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'মনে মনে ভাবেন, কেউ কিছুই বোঝে না, সবাইকে দিব্যি মন ভুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।'

কাতর হেসে বললাম, 'এতটা বলবেন না।'

'তাহলে একটু শুনুন।' কুন্দনন্দিনী হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

কিন্তু আর কোথায় যাবো? আছি তো তাঁর মুখের বন্দুক-নলের মুখেই। উনি তো কল টিপেই যাচ্ছেন। তবু একটু ঝুঁকে বললাম, 'বলুন।'

কুন্দনন্দিনী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েদের আপনি পোশাকী সম্মান দেখাতে চান, দেখান। ওসব নিয়ে যারা ভুলে থাকতে চায়, থাকুক। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। লেখক হলেও আপনি পুরুষ। আর পুরুষদের আমরাই ভালো চিনি।'

সত্যি মিথ্যা যাচাই করতে যাবো না। কিন্তু এ কথার অর্থ কী? আমার পুরুষত্বের কোন্ দিকটাকে তিনি চিনলেন?

'ঠিক কথা না।' মেজর ঘোষাল বলে উঠলেন, 'অনেক মেয়েকেও দেখেছি পুরুষের কুহকে পড়তে।'

কুন্দনন্দিনী অগ্রজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা দেখবে না কেন। সেটা হলো ডিফারেণ্ট, বিশেষ ক্ষেত্রে। মেয়েরা তখন অন্ধ হয়ে যায়। ও রকম পুরুষরাও অনেক মেয়ের কুহকে পড়ে। আমি মেয়েদের প্রবৃত্তির কথা বলছি। পুরুষকে চেনাটা মেয়েদের ইনস্টিংক্ট।'

বললাম, 'আমি মানলাম আপনার কথা। কিন্তু আমাকে কী চিনলেন, একটু বলুন।'

কুন্দনন্দিনী কালো চোখে দ্যুতি ফুটিয়ে বললেন, 'অমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন কেন? আপনি যা, ঠিক তাই চিনেছি। বলেই তো দিয়েছি আপনি আদৌ কায়োর কাছের মানুষ নন। আরো বলব? আপনি এখন ভাবছেন, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।'

এবার আমিই হাসিতে চড়া আওয়াজ দিলাম। না দিয়েই বা কী উপায়? তবু বললাম, 'বিশ্বাস করুন, এতটা অসহনীয় আমার মনে হয়নি যে আপনাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করবে।'

'থাক, আপনি আর কুহকী হয়ে উঠবেন না।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আপনার অনেক কুহক জানা আছে, আমি জানি।'

'আমি এক মত।' মেজর ঘোষাল বলে, আমার দিকে একবার দেখলেন।

মেজর ঘোষাল অল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছেন। ভ্রাতা ভগ্নীতে বেশ মিল আছে।

কুন্দনন্দিনী। বললেন, 'হয়েছে অনেক। এবার পেছন থেকে পানের ঠোঙাটা দিন তো।'

পেছনে হাত বাড়িয়ে, বড় খোলা ব্যাগের ভিতর থেকে পানের ঠোঙা এগিয়ে দিলাম। কুন্দনন্দিনী সেটি নিয়ে বললেন, 'বোতলটা কোথায়?'

'ওটি তুমি এখন পাবে না।' মেজর ঘোষাল বললেন।

কুন্দনন্দিনী আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। একটি পানের খিলি দেখিয়ে বললেন, 'চলবে?'

বললাম, 'ইচ্ছে নেই, তেমন অভ্যাস নেই।'

তিনি নিজেই একটি পান মুখে দিলেন। তিস্তার ওপারে ঝুলন্ত সেতুর দেখা পাওয়া গেল। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া নেমে এসেছে। গাড়ির বাতি জ্বলছে এখন। পাহাড়ের আশেপাশে উঁচুতে নিচুতেও আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। গাড়ি আরো উঁচুতে উঠছে। এখন তার গর্জন বেশি।

পরের দিন সকাল আটটায় যখন আবার মেজর ঘোষালের ফৌজী জীপে বসলাম, তখন নিজেরই অবাক লাগলো। তার সঙ্গে কিছুটা দ্বিধাও। এমন করে হঠাৎ একেবারে বিপরীত কাজটা করা ঠিক হচ্ছে কী না, এখনো মনে জেগে রয়েছে সেই জিজ্ঞাসাটা। দত্তসাহেব সপরিবারে দাঁড়িয়ে ছিলেন জীপের পাশে। বিদায় দেবার জন্য।

দত্তজায়া বললেন, 'এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়ে গেল।'

মায়ের সঙ্গে কন্যারাও তাল দিল। একজন বললো, 'সত্যি, এটা ঠিক হচ্ছে না। আঙ্কল মেজরই যতো গোলমাল করলেন।'

দত্ত তাঁর কন্যাদের দিকে ফিরে হেসে ধমক দিলেন, 'আরে, তোরা এ সব কী বলছিস। বেড়াবার এমন একটা সুযোগ পেলে কি ছাড়তে আছে। আমি নেহাত সরকারের চাকরিতে এখানে এসেছি। তা না হলে আমিও পাড়ি জমাতাম। নিন মেজর ঘোষাল, আপনারা যাত্রা করুন। বেলা দুটো তিনটের মধ্যে আপনারা পৌছতে পারলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বলতে হবে।' বলে আমার

দিকে ফিরে বললেন, 'একেবারে ভুলে যেও না হে। কলকাতায় ফিরে একটু যোগাযোগ রেখো।'

মেজর ঘোষাল গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলেন। একবার পিছন ফিরে দেখলেন, ফৌজী তরুণ সর্দারজী ড্রাইভারটি উঠেছে কী না। গাড়ি ছাড়বার আগে, দত্ত পরিবারের উদ্দেশে আর একবার হাত তুলে বিদায় নিলেন। তাঁর ডান পাশ থেকে কুন্দনন্দিনীও দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন। গাড়ি গ্যাংটকের রাস্তায় এগিয়ে চললো। থুড়ি, আমার ভুল বলা হলো, তুষার সিংহের দেশে। রাজধানীর নাম গ্যাংটক। গতকাল রাত্রে মেজর ঘোষাল বলেছিলেন, আমাদের উচ্চারণের গ্যাংটক, সিকিম অধিবাসীদের মুখে গ্যাংতো।

আমার ক্ষেত্রে এই অবিশ্বাস্য যাত্রাপর্বটা স্থির হয়েছে গতকাল রাত্রি দশটায়। মেজর ঘোষাল আমাকে দত্ত সাহেবের হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিলেন তখন প্রায় আটটা। মেজর সাহেবের ব্যবস্থা কিছু থাকলেও, দত্ত সাহেব আর তাঁর ভগ্নীকে তাঁর ওখানেই খেয়ে যেতে বলেছিলেন, দত্তজায়াও জোর দিয়েছিলেন। সেই খাবার আসরেই সিকিমের কথা উঠেছিল। কুন্দনন্দিনী আমাকে বলেছিলেন, এতই যখন আপনার সে-দেশ দেখার ইচ্ছে, তবে আর দেরি কেন? আমাদের সঙ্গে কালই চলুন না।'

মেজর ঘোষাল তাল দিয়েছিলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম। আজই আপনাকে বলেছিলাম, আমি থাকতে আপনি সিকিমে এলে আমি খুশি হবো। কয়েকদিন তো কালিম্পং-এ কাটবেই। তার সঙ্গে না হয় আরো কয়েকটা দিন বাড়িয়ে নতুন জায়গা বেড়িয়ে আসবেন।'

কাকে যে কী বলছিলেন। আদেখ্‌লেকে কলা দেখাচ্ছিলেন। পাগলকে বলছিলেন সাঁকো নাড়া দিতে। তুষার সিংহের পায়ের তলায় তিস্তার সেই জন্মস্থান। শুনেই তো মন পাগল হয়েছিল! কিন্তু সেই যে আমার টিকিমে রাধাকিষণ? কলকাতায় না ফেরবার অসুবিধের কথা তুলেছিলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে দত্ত বলেছিলেন, 'আরে রাখো তো তোমার কলকাতা। দরকার হলে, ট্রাংককলে জানিয়ে দিও, ফিরতে দু-একদিন দেরি হবে। লেখা পাঠাতে হবে? পাঠিয়ে দিও শিলিগুড়িতে, চলে যাবে এয়ার লাইনস্-এর প্যাকেটে, নয় তো এয়ার ক্যারিং-এর। মেজর ঘোষালের সঙ্গে গেলে তোমার অনেক সুবিধা। সেটা কেবল আরামে থাকার কথা বলছি না। যেসব জায়গায় যেতে তোমার নানা বিধিনিষেধের মধ্যে পড়তে হবে, সেসব উনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

'সানন্দে।' মেজর ঘোষাল বলেছিলেন, 'আমি তো এ সুযোগটাই চাইছিলাম।'

মন করে আমার খাজনা খাজনা, কে করবে আমার হরি ভজনা। আমি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দত্তজায়া বলেছিলেন, 'তাহলে বেরিয়েই পড়ুন।'

কুন্দনন্দিনী বলে উঠেছিল, 'বাস্, হোস্টেসের অনুমতি পেয়ে গেছেন। এবার তাওয়া গরম থাকতে থাকতে রুটি সেঁকে ফেলুন। আমাদের সঙ্গে কাল সকালেই আপনি যাচ্ছেন।'

তাঁর ভাষায় আর কথায় সবাই হেসে উঠেছিলেন। আর একবার সাধিলেই খাইব, আমার সে অবস্থা না। এখন না সাধিতেই খাইতে রাজি। তবু কেমন ঠেক লেগে যাচ্ছিল। মেজর ঘোষাল বলেছিলেন, 'আপনাকে নিয়ে আমি কাঞ্চনজংঘায় উঠতে পারবো না, কিন্তু নিয়ে যাবো পাহাড়ের গভীরে।'

আর থাকতে পারিনি, আমার পাথায় লেগেছিল দুরন্ত কম্পন। চলো মন তুষার সিংহের দেশে। বলেছিলাম, 'চলুন।'

'কথা খসেছে।' কুন্দনন্দিনী বলে উঠেছিলেন, 'এবার তাহলে মিঃ আর মিসেস দত্তর অনুমতি নিয়ে একটু পান করা যাক।'

অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। দত্ত কিঞ্চিৎ সঙ্গদানও করেছিলেন। মেজর ঘোষাল ঘোষণা করেছিলেন, 'মিষ্টি, মনে রাখিস স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল আটটায় আমাদের বেরোতেই হবে।'

কুন্দনন্দিনী আবার চুমুকে চুমুকে রাঙা হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'দেখে নিও।'

এই সেই যাত্রা। মেজর ঘোষাল পোশাক বদলাননি। গতকালের পোশাকই আজ তাঁর অঙ্গে। আমারো তাই। ঠাণ্ডার সঙ্গে ধুতির পাল্লা চলে না। পাতলুনের ওপরে গলাবন্ধ উলের সোয়েটার। কিন্তু কুন্দনন্দিনী রমণী। রমণীয়তা তাঁর ধর্ম। স্নান করে তিনি লাল জামার ওপরে লাল পাড় গরদের শাড়ি পরেছেন। চিকন কালো কেশ বলতে পারবো না। রেশমী কোমল কেশের মাঝখানে সামান্য একটি রেখায় সিঁদুর পরেছেন, কপালে একটি সদ্যোদিত সূর্যের মতো লাল ফোঁটা। চোখে ঠোঁটে যথাযথ রঙ বোলাতে ভোলেননি। নানা অঙ্গরাগের ফুলেল সুবাসও ছড়াচ্ছেন। গায়ে না রেখে, কোলের ওপর ফেলে রেখেছেন লাল টকটকে পশমী শাল, ভালো রেশমী সুতোর কাজ করা। তবু গতকালের সঙ্গে কোথায় যেন একটা তফাত ঘটে গিয়েছে।

তফাতটা যে কোথায়, তাও জানি। যতো যা-ই বলি না কেন, লাল পাড় শাড়ি আর কপালের লাল টিপের প্রতি বাঙালী মাত্রেরই কি একটি মুগ্ধতা আছে? আমারও যে আছে, তার সন্দেহ কী? এখন দেখলে কি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, এ রমণী সুরা পানে যেমন মত্ত, তাঁর ধূমপানের ধূমও তেমনি। তবু তো বলতে পারবো না, এটি তাঁর ছদ্মবেশ। ছদ্মবেশ ধারণের দরকারই বা কী? তিনি তো কোনো কিছুর অন্তরাল রাখেননি।

আমি সঙ্গে আছি বলেই তরুণ সর্দার ড্রাইভারকে পিছনে বসানো হয়েছে। অন্যথায় সামনে তিনজনের জায়গা হতো না। এ কথাও আগেই হয়েছিল। কুন্দনন্দিনী কেন শিলিগুড়ি থেকে ফিরে এসেছেন, দত্ত পরিবারে সে বিস্মিত প্রশ্নও উঠেছিল। মেজর ঘোষাল কেবল বলেছিলেন, 'যে যার মর্জিতে চলছে।'

অতঃপর কেউ আর কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেননি।

'মেজদা, লেখককে প্রায় লুট করে নিয়ে আসা হলো, তাই না?' কুন্দ-নন্দিনী হেসে তাকালেন আমার দিকে।

মেজর ঘোষাল বললেন, 'মাঝে মাঝে এ রকম লুট না করলে আমাদেরই বা চলে কী করে। চিরকালটা কি দেশের সীমান্ত পাহারা দিয়েই কাটবে? মাঝে মধ্যে তাই এ রকম লুটপাটও করতে হবে।'

কুন্দনন্দিনী হাততালি দিয়ে ইংরেজিতে বলে উঠলেন, 'খুব ভালো বলেছো মেজদা। তোমার সঙ্গে থেকে লুটের ভাগ আমিও কিছু পেলাম।'

এমন করেই যদি বলতে হয়, তাহলে লুট না বলে হরণ করা বলাই ভালো। কিন্তু আমাকে কি লুট করা হয়েছে। নিজেই যে লুট হতে চেয়েছি। একবার যখন চেয়েছি তখন তো আমার সেই গান, 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।'...একবার যখন পিছনটাকে ছাড়তে পেরেছি, এখন কেবল সামনে। এখন মেজর ঘোষাল, কুন্দনন্দিনী মুখোপাধ্যায় কেবল নিমিত্ত মাত্র। এখন মন চলো তুষার সিংহের দেশে। বললাম, 'লুট হতে এত আনন্দ কাল রাত্রেও তা বুঝতে পারিনি।'

'ও মেজদা, শোনো!' কুন্দনন্দিনী তাঁর দুই চোখের তারা আর মধ্য নয়ন সিন্দুরের টিপ কাঁপিয়ে বললেন।

আমি বললাম, 'এখন আমাকে যা-ই বলুন, এ যাত্রায় এমনি লুট হতেই সাধ।'

'চমৎকার মশাই!' কুন্দনন্দিনী একরাশ ফুলেল গন্ধ ছড়িয়ে, তাঁর মুখ আমার দিকে ঝুঁকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'কাল রাত্রে তো মনে হচ্ছিল একটা বাচ্চা মেয়েকে জোর করে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

মেজর ঘোষালের সঙ্গে আমিও হেসে উঠলাম। বললাম, 'এতটা বলবেন না। আসলে পেছনের টানটা ছাড়ানো বড় কঠিন।'

'লেখকদের আবার পেছন টান কিসের?' কুন্দনন্দিনী ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি হেসে বললাম, 'বোধ হয় লেখক বলেই বিশেষ করে। স্বাধীনতা কথাটার যথার্থ অর্থ তো আজ পর্যন্ত বুঝলাম না।'

কুন্দনন্দিনী যেন অবাক হলেন, ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর মুখে একটি ছায়া নেমে এলো, বললেন, 'আপনিও এ কথা বলছেন।'

'সকলেই এ কথাই বলবেন মিষ্টি।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'শর্তহীন স্বাধীনতা বলে কিছু নেই।

কুন্দনন্দিনী চুলের ঝাপটা দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অগ্রজের দিকে তাকালেন। মেজর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'দেখিস বাপু, তোকে কিন্তু আমি কিছু বলিনি। তুই যেন তা ভেবে আমার ওপর আবার রেগে যাস নে।'

কুন্দনন্দিনী সামনের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসলেন, বললেন, 'ও সব স্বাধীনতার কথা জানি না। কিন্তু আমি আর জীবনে কোনো শর্তই মানতে রাজী নই। কার শর্ত, কে মানে?'

মেজর ঘোষাল কোনো জবাব দিলেন না। আমি আবার অস্বস্তি বোধ করলাম। গতকাল শিলিগুড়ি থেকে ফেরার কথা আমার মনে পড়লো। যা আমি সঠিক জানি না, সে বিষয়ে মন্তব্য অনুচিত। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর কোনো কোনো আচরণে আর কথায় মনে হচ্ছে কোথায় যেন তাঁর বুকের একটা তার অতি বন্ধনে টান হয়ে আছে। সেখানে স্পর্শ লাগলেই বেজে উঠছে তীব্র ঝংকারে। এই মুহূর্তে তাঁকে আমার কেমন যুগপৎ বিদ্রোহিনী এবং অপরিণত বালিকার মতো লাগছে। তবু এ আবহাওয়াটা ভালো না।

আমরা যে খুব একটা উঁচু চড়াইয়ের সর্পিল পথে চলেছি তা বলা যায় না। কালিম্পং থেকে অনেকটাই যেন সমতলের ওপর দিয়ে চলেছি। সামান্য চড়াই উৎরাই। দুরন্ত বাঁক অবিশ্যি আছে। চড়াই টের পাওয়া গেল কিছু দূর আসার পরে, ডাইনের খাদের দিকে তাকিয়ে। সবুজ আর নীল থেকে রৌদ্রের রঙ আলাদা করা যাচ্ছে না। সর্বত্রই চোখে পড়ছে কিছু না কিছু সবুজ চাষ। সবুজ ধানের খেত চিনতে বাঙালী চোখের কোথাও ভুল হয় না। অনেক নিচে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে নীল তিস্তাকে দেখতে পাচ্ছি। এখনই

যেন তাকে আর চেনা যাচ্ছে না, সমতলের সেই সর্বনাশীকে। আমাদের ঋতুর হিসাবে এখন এমনিতেই হেমন্ত।

সমতলের সর্বনাশী একলা তিস্তা না, আরো অনেক। তারা কেউ কেউ সর্বনাশীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সর্বনেশে। এখন তারা সকলেই সমতলের রূপে বিভোর শান্ত অলস আর যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। এখন এই হিমালয়ের কোলে সবুজ অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে তিস্তা নীলে ঝলক দিচ্ছে। অধিবাসী নারী পুরুষ শিশু যারা পথের দু'ধারে দেখা দেয়, তাদের সেই একই পাহাড়ী রূপ। কোথাও আলাদা করতে পারি না। আর এই পাহাড়ী পথের ধারে ধারে কি বারো মাসই কাজ হয়? শিলিগুড়ি যাওয়ার সময় কেবল না, আসবার সময় অন্ধকারে আলো জেলেও শ্রমিক মেয়ে পুরুষদের কাজ করতে দেখেছি। এখন এই সকালে গ্যাংটকের পথেও সেই রকম দেখছি। কিছু অন্তর অন্তরই পথের কাজ চলছে।

মেজর ঘোষালের কাছে শুনেছি এর নাম মেনটেনেন্স। পাহাড়ের জনপদ সর্বত্র দুর্গম না, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাকে সুগম করে রাখার কাজ চলছে। সমতলের আলস্য এখানে টেঁকে না। নিশ্চল পাহাড় প্রকৃত নিশ্চল না। আর একটু মন ডুবে যদি কবুল করতে হয় তবে বলি, পথের কাজে ব্যস্ত স্বাস্থ্যবতী পাহাড়ী বালারা বারেবারেই চোখ টেনে নিয়ে যায়। হয়তো আমাদের মতো শত শত যাত্রী ওরা রোজ দেখে। তবু ওদের ছোট ছোট কালো মানিক চোখে এত কৌতূহলের ছটা কেন? কেন বা রাঙা গালে চকিতে ঝিলিক দিয়ে যায় হাসি?

'মিষ্টি, এটা ঠিক হচ্ছে না।' মেজর ঘোষাল সামনে দৃষ্টি রেখে বললেন, 'লেখককে নিয়ে এলি, লুটের মালটাকে ভোগ কর।' তিনি হাসলেন।

কুন্দনন্দিনী চমকিয়ে উঠে ইংরেজিতে বললেন, 'দুঃখিত।' তাড়াতাড়ি নড়েচড়ে বসতে গিয়ে লালপাড় আঁচলখানি দিলেন নিচে গড়িয়ে। গাড়ি বাঁ-দিকে চুলের কাঁটার বাঁক নিতে গিয়ে বাতাসের ঠাণ্ডা ঝাপ্টায় এলোমেলো করে দিল তাঁর চুল। তিনি শব্দ করলেন, 'আহ্!' তারপরে মুখ থেকে রেশমী চুলের গোছা সরিয়ে, বললেন, 'একটা কথাই খালি জিজ্ঞেস করবো, আপনিও কি শর্তবাদী?'

আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনিও কি তা নন?'

'না।'

'তাহলে দিন না আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে!'

কুন্দনন্দিনী ধাক্কা খাবার মতোই চমকিয়ে উঠে বললেন, 'কেন?'

মেজর ঘোষাল হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'ওয়েল সেড, ওয়েল সেড।'

কুন্দনন্দিনী ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে একবার অগ্রজকে, আর একবার আমাকে দেখলেন, বললেন, 'তার মানে কী?'

'তার মানে হলো, স্বাধীনতা শর্তসাপেক্ষ।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'তুই কি ইচ্ছা করলেই লেখককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারিস? নাকি যা ইচ্ছে তা বলতে পারিস?'

কুন্দনন্দিনীর মুখে অবাক অপরিসীম হলো, বললেন, 'কিন্তু আমি তা করতে যাবো কেন?'

'তোর স্বাধীনতা! পাগলেরও তো স্বাধীনতা আছে।' মেজর ঘোষাল বললেন।

কুন্দনন্দিনী রীতিমতো ঠোঁট ফুলিয়ে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'তার মানে আমি পাগল?'

আমি তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বললাম, 'দোহাই, আমি তা বলিনি। আসলে আমি একটা তুলনা দিয়ে বলতে চেয়েছিলাম, আপনিও শর্ত মেনে চলেন। আপনি পরের ক্ষতি করে কি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা খাটাতে পারেন?'

'না।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'কিন্তু নিজের ক্ষতি করবার স্বাধীনতা আমার নিশ্চয়ই আছে? আমার নিজের জীবন নিয়ে আমি নিশ্চয়ই যা খুশি করতে পারি?'

মেজর ঘোষাল একবার আমার দিকে দেখলেন। আমি বললাম, 'না, আপনি তা-ও পারেন না। তাতেও হয়তো কারোর ক্ষতি হতে পারে।'

'কারোর ক্ষতি হবার নেই।' কুন্দনন্দিনী বললেন।

আমি চুপ করে যাবো ভেবেও পারলাম না, বললাম, 'কারো না হোক, তাহলে আপনার নিজেরই। আপনি যদি অস্তিত্ববাদী হন, তাহলেও। আমার অন্যায় হলে মাফ করবেন, আপনার এই শর্ত মানতে না চাওয়া বোধ হয় কোনো গভীর যন্ত্রণা থেকেই। দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না বলেই আপনার যন্ত্রণা। আসলে আমি মানুষের ইটারনিটিতে বিশ্বাসী।'

কুন্দনন্দিনী যেন রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সেই মানুষের ইটারনিটি?'

বললাম, 'দুঃখকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কি? মানুষের মন আর হৃদয় আছে, সংসারের সুখ দুঃখের সে ভাগীদার। তাকে তার মধ্য দিয়েই চলতে হয়, তাই না কি?'

কুন্দনন্দিনী কোনো জবাব না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি হেসে বললাম, 'এ রকম বলতে আমার খুব লজ্জা করে। আসলে অনেক দুঃখ হতাশার মধ্যেও সেই গানের কলিটার কথাই মনে হয়, 'এমন মানব জমিন রইলো পতিত/আবাদ করলে ফলতো সোনা।'…

কুন্দনন্দিনীর চোখের কাজল কি একটু বেশি চিকচিক করে উঠলো? তিনি মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালেন।

মেজর ঘোষাল বলে উঠলেন, 'বড় ভালো লাগলো ভাই আপনার কথা।'

তিনি আমার দিকে তাকালেন না। আমি বললাম, 'আমার কথা কিন্তু নয়।'

'তাও জানি। পরের কথাই বা নিজের করতে পারি কই? মানুষ আসলে বোধ হয় সবাই এক।'

আমি তাঁর কথার কোনো জবাব দিলাম না। কুন্দনন্দিনী তাঁর হাতের পিঠ দিয়ে চোখে আলতো করে ছোঁয়ালেন। আমি বললাম, 'তবে মিসেস মুখার্জি—।'

'কী? মিসেস মুখার্জি?' কুন্দনন্দিনী ঝটিতি আমার দিকে ফিরলেন। তাঁর ভ্রূকুটি চোখ ঈষৎ লাল। বললেন, 'চুক্তি অমান্য করছেন কেন?'

বললাম, 'দুঃখিত। কুন্দনন্দিনী।'

'কিন্তু কী বলছিলেন যেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'আপনার প্রসন্ন মুখটি দেখতে ভালো লাগে।'

কুন্দনন্দিনী তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকালেন। চোখের তারায় ঝিলিক। বললেন, 'সত্যি?'

আমি চমকিয়েই উঠলাম। কুন্দনন্দিনী হেসে বললেন, 'তাহলে তাই হবে। আমার প্রসন্ন মুখ কেউ তো দেখতে চায় না।'

'বাজে কথা একটিও না।' মেজর ঘোষাল বেশ রাশভারি গলায় বলে চোখ পাকিয়ে তাকালেন।

কুন্দনন্দিনী খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বাঁ হাতে অগ্রজের ডানায় চাঁটি মেরে বললেন, 'ইস্, খুব শাসন হচ্ছে। কালো বেড়ালটা বের করো না।'

'নো কালো বেড়াল, রংপোর আগে কিছু নয়।' মেজর ঘোষাল গম্ভীর স্বরেই বললেন।

কুন্দনন্দিনী অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'রংপোতে গিয়ে কিনতে হবে নাকি? কিন্তু একটা আস্ত কালো বেড়াল যে ব্যাগের মধ্যে ছিল!'

'সে আছে, তবে আস্ত নেই।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'ভুলে যেও না, গত রাত্রে মিঃ দত্তর ওখানে নতুন কালো বেড়ালের মুখ খোলা হয়েছিল। তোমার পান ঠোঙা ভরতি করে নিয়েছি, এখন ওই দিয়েই চালাও।'

মেজর ঘোষালের কথা বলার ভঙ্গি এখন রীতিমত রাশভারী ফৌজী সাহেবের। কালো বেড়াল হলো সিকিমের সেই সুখ্যাত লাল পানি, ব্ল্যাক ক্যাট যার নাম।

কুন্দনন্দিনী ঠোঁট ফুলিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ভালো হবে না মেজদা বলে দিচ্ছি। খুব শাসন হচ্ছে, না?'

মেজর ঘোষাল কটমট করে একবার তাকালেন। আমার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা নাচালেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'প্রসন্ন মুখ রাখো।'

কুন্দনন্দিনী এবার সত্যিই অগ্রজের কাঁধে আবার একটি মৃদু চাপড় মারলেন। যেন দোতারার তারে আঘাত লাগলো, ঝংকারে বেজে উঠলো। মেজর ঘোষাল হেসে উঠলেন। দেখে শান্তি, মনটাও শরীফ লাগে। ভ্রাতা-ভগ্নীর খুনসুটি আর কপট শাসনে আসরটি জমজমাট। মেজর বললেন, 'না মিষ্টি, এখন ভাই ড্রিংক করিস না। সাংগ্রিলার দেশেই তো যাচ্চিস, এখন একটু গল্প কর।'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'ঠিক আছে, তবে পানই খাই। নেশা ছাড়া থাকতে পারবো না।'

কী কথা! কইতে জানলে হয়, কথা ষোল ধারায় বয়। নেশা ছাড়া থাকতে পারেন না। এ কি কেবল দ্রব্যজাত নেশা আর নেশাখোরদেরই কথা? না কি তাবত মানুষই কিছু নেশা করেন? নেশা কি কেবল খেয়ে পিয়েই হয়, না কি আরো নানাভাবে, কীর্তি কর্মে ও মনে মনে? কুন্দনন্দিনী আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দিন তো একটু পেছন থেকে পানের ঠোঙাটা। কিছু মনে করছেন না তো?'

বললাম, 'করছি।'

'করছেন? কী করছেন?'

'মনে মনে আপনাদের জয়গান করছি।'

মেজর ঘোষাল হেসে উঠলেন। কুন্দনন্দিনী হুস্ করে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবু রক্ষে। লেখকদের কথা ধরা মুশকিল।'

আমি পানের ঠোঙা পিছনে হাত বাড়িয়ে তুলে এনে দিলাম। কিন্তু পানের খিলির সেই প্রতীকের কথা মনে করে ভিতরে ভিতরে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

'সামনে রংপো, এই ব্রিজটার ওপারে।' মেজর ঘোষাল ঘোষণা করলেন।

রংপো একটি বাজার। তারপরে সিংতাম নামে একটি বাজার অঞ্চলও পেরিয়ে গেলাম। সর্বত্রই শীতের তরি-তরকারির ছড়াছড়ি। সর্বত্রই ভারতীয় আর সিকিমী সশস্ত্র পুলিশের চৌকি। মেজর ঘোষাল বললেন, 'সিংতাম থেকে তিস্তার সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি। তিস্তা এখান থেকে সরে গেছে পশ্চিম দিকে।'

সর্বনাশ! চির বিচ্ছেদ নাকি? আমি যে সর্বনাশীর আঁতুড়ঘর দেখবো বলে ছুটেছি। হতাশ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'গ্যাংটকে গিয়ে দেখতে পাবো না?'

'না স্যার, গংতোর বেশ খানিকটা পশ্চিম উত্তর দিয়ে তিস্তা নেমে আসছে।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'তিস্তা সিংতাম থেকে গেছে দিকছুর দিকে। অবিশ্যি গংতোয় পাহাড় ভেঙে কিছুটা গেলেই তিস্তার গর্জন আপনি শুনতে পাবেন। নিচে নেমে গেলে দেখতেও পাবেন, সেটা পরিশ্রম আর সময়সাপেক্ষ। তিস্তাকে কাছে থেকে আবার দেখা যাবে উত্তর সিকিমে। কী ব্যাপার, হতাশ হয়ে গেলেন নাকি?'

বললাম, 'কিছুটা তো বটেই।'

মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, 'হতাশ হবেন না, তিস্তাকে আপনি পাবেন। মনে রাখবেন, তিস্তা আপনার সঙ্গেই আছে, একটু দূরে দূরে এই যা। আর এখন থেকে, আপনার বাঁদিকে, মানে আমার দিকের জানলায় একটু নজর রাখবেন। আপনার সেই পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা প্রায়ই আপনাকে দেখা দেবে। আমরা এখন উঁচুতে উঠছি। এর পরে গংতো যতো এগিয়ে আসবে, আমরা ততোই নিচে নামবো।'

বাঁদিকে পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা, কথাটা যেন সুইচের ছিদ্রে প্লাগ পরিয়ে দেবার মতো। আমার ভিতরে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হতে লাগলো। মেজর ঘোষাল আবার বললেন, 'আপনি নাথুলা পাসের নাম শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'যে রংপো আমরা পেছনে ফেলে এলাম, সেখান থেকে নাথুলা যাবার একটা রাস্তা গেছে। পুবদিকের সেই রাস্তা সাধারণের জন্য না, একমাত্র

মিলিটারি যেতে পারে। রংপো থেকে রংলি, তারপরে কুলুপ থেকে নাথুলা, সিকিমের একটা সীমান্ত। ওই পথেই ভূটান যাওয়া যেতো আগে, এখন চীনাদের বন্দুক বেয়নেট পথ আটকে রেখেছে। জহরলাল নেহরু যখন শ্রীমতী গান্ধীকে নিয়ে এসেছিলেন—পঞ্চাশ দশকে, তখন তিনি গ্যাংটক থেকে ঘোড়া আর ইয়াকের পিঠে চেপে, ওই পথ দিয়েই ভূটান গিয়েছিলেন। তখনো রাজনৈতিক আবহাওয়া এখনকার মতো তিক্ত হয়ে ওঠেনি।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শুনেছি ভূটান যাবার অন্য রাস্তাও আছে, তরাইয়ের হাসিমারা অঞ্চল দিয়ে, মোটরগাড়ির রাস্তা।'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'সে তো আছেই, কিন্তু জহরলাল নেহরুর কথা ভুলে যাবেন না। অমন নায়কোচিত রোমান্টিক প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষ বোধ হয় আর কখনো পাবে না। ভাবতে পারেন, ওই বয়সে তেরো হাজার ফিটেরও ওপর, বরফের ওপর দিয়ে দিব্যি তিনি মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে ইয়াকের পিঠে চেপে পাড়ি দিয়েছিলেন! আমাদেরই মনে হয়, অক্সিজেনের অভাব বোধ করছি। কিংডম অব ড্রাগনও খুব অবাক হয়েছিল।'

'কিংডম অব ড্রাগনটা কী?'

'ভূটানকে তাই বলা হয়। কিংডম অব ড্রাগন। আর সে রাজ্যের অধিবাসীদের বলা হয় ড্রুপ্‌কা। সেই হিসাবে সিকিম রাজকে বলা যায় কিংডম অব ডেন্‌জং। ডেন্‌জং মানে হলো, ভ্যালি অব রাইস—মানে সিকিম। আপনি এখন থেকেই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, সিকিম সত্যি ভ্যালি অব রাইস।'

মিথ্যা না, ইতিমধ্যেই আমার চোখে তা পড়েছে। ধানের চাষ সর্বত্র, গভীর সবুজ আর নিবিড়। আমার জ্ঞানেতে রোশনাই লাগছে। মেজর ঘোষাল নিতান্ত ফৌজী আদমী নন, তাঁর ভাণ্ডারে ইতিহাস আর সংস্কৃতির মজুদও আছে। ফৌজী মানুষদের কাছে এ সব আমরা আশা করি না। আমি বললাম, 'এখন তো আর সিকিমে কিংডম অব ডেন্‌জং-এর রাজত্ব নেই, জনপ্রতিনিধিরা আইনসভায় নিজেদের ক্ষমতা লাভ করেছে।'

'হ্যাঁ, ওটা হলো রাজনীতির বিষয়। আপনি কি খুব ইন্টারেস্টেড?'

'একেবারেই না। আপনি কি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গোলমালের সময় ছিলেন?'

'নিশ্চয়ই। যে-কোনো দুর্ঘটনাকে রোধ করার জন্য আমাদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। সিকিমের সপ্তমবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত বহু টাকা ব্যয়

করেছে, এখনো করছে। সীমান্তের প্রশ্ন আছে। আমরা আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না।'

'আচ্ছা মেজর ঘোষাল, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'নিশ্চয়। একটা কেন, একশোটা করুন।'

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই নতুন পরিবর্তনে (বর্তমান সময় সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবার আগের ঘটনা।) সিকিমের অধিবাসীরা কী বলেন?'

মেজর ঘোষাল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। দেখছি, কুন্দনন্দিনীও আমার মতোই কৌতূহলী শ্রোতা হয়ে উঠেছেন। সম্ভবত অগ্রজের সঙ্গে এ সব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আগে কোনো আলোচনা হয়নি। মেজর বললেন, 'দেখুন, এই সিকিম বলুন, আর ভুটানই বলুন, দুটো পাহাড়ী রাজত্বের স্রষ্টাই তিব্বতের সাহসী অভিযাত্রী। সেভেনটিনথ্ সেঞ্চুরির কোনো সময় কিছু আগে পরে তিব্বতের কোনো কোনো বীর এসে এখানে তাদের রাজত্ব স্থাপন করেছিল। আমরা যাদের ভোটিয়া বলি, তারা কিন্তু কেউ ভুটানের অধিবাসী নয়। তিব্বত থেকে যারা সিকিমে বা ভুটানে বা ভারতেও এসে থেকেছে, তাদেরই ভোটিয়া বলা হয়। সিকিম হলো লেপচা আর ভোটিয়াদের দেশ, ওদের মিশ্রিত কালচারই হলো এখানকার কালচার। এদের সঙ্গে বিয়ে-শাদী চলে। কিন্তু যে নেপালীরা আজ সিকিমে সংখ্যাগরিষ্ঠ, এরা সকলেই এসেছে বাইরে থেকে। এরাও এখন এই সয়েলেরই সন্তান। এখানে চাষবাস কাজ ব্যবসায়ে তাদের অবদান কোনো অংশেই কম না। তারাও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী তো করবেই। রাজ্যশাসন যদি সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বিবাদও ইনএভিটেবল। ঘটেছেও তাই।'

চমৎকার ব্যাখ্যা। আমি প্রায় মুগ্ধ চোখেই মেজর ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি কথা বলছেন, সামনের পথের দিকে তাকিয়ে। যতোই এগিয়ে চলেছি, রাস্তার দুস্তর সর্পিলতা বাড়ছে। মেজর ঘোষাল চালক হিসাবেও সতর্ক, দ্রুতগামী, কিন্তু কথাও সমানেই বলে চলেছেন। আমি তাঁর চোখে মুখে একটি অন্যমনস্ক তন্ময়তা লক্ষ্য করছি। তিনি আবার বললেন, 'এই পাহাড়ী রাজত্বের ইতিহাস সত্যি রোমান্টিক। রূপকথার মতো আমি ভালোবাসি।'

এই একটি কথাতেই যেন সব বলা হয়ে গেল, 'আমি ভালোবাসি।' তাঁর মুখের তন্ময়তায় আসলে সেই ভালোবাসা। আর ভালোবাসাই কি শেষ কথা?

বোধ হয়। ভালোবাসা মানব জমিনকে পতিত থাকতে দেয় না। ওরে মন, কৃষিকাজ জানো গিয়ে।

'মেজদা, আমাকে তো তুমি কোনোদিন এ সব কথা বলোনি!' কুন্দনন্দিনীর স্বরে আবদারের অভিযোগ।

মেজর হেসে বললেন, 'তুই কি কোনোদিন শুনতে চেয়েছিস? বেশ, এবার থেকে তোকে এ দেশের অনেক কথা বলবো।'

সত্যিই তো, রংপো ছাড়িয়ে, সিংতামও ত্যাগ করে এসেছি অনেকক্ষণ। এখন রীতিমত দুরন্ত চড়াই ভাঙছি। কিন্তু কুন্দনন্দিনী তাঁর কালো বেড়ালের কথা ভুলে গিয়েছেন। মন থাকে সেই মনের ভিতরে। নতুন কথায় মন টেনে নিয়ে গিয়েছে, লাল পানির কথা আর মনে নেই। যদিও তাম্বুল রঞ্জিত তাঁর ঠোঁট আর ফুলেল জরদার রস কিছু কিঞ্চিৎ চোখে এবং গালে ছটা দিয়েছে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠা, উর্ধ্ববক্ষ এখন লাল না, দ্বিপ্রহরের রোদের মতো রঙ। লাল জামায় দীপ্তিটা চড়া। শাড়ির আঁচল? সে বুকের খোয়ারি কাটাতে নিচেই এলানো।

আমি হঠাৎ বাঁদিকে তাকিয়ে শিশুর মতো চিৎকার করে উঠলাম, 'ওটা কী, ওই যে?'

কুন্দনন্দিনীও ঝুঁকে পড়লেন বাঁয়ে। মেজর ঘোষাল গাড়ি প্রায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'আপনি মশাই আমাকে ভীষণ চমকে দিয়েছেন। ওই তো আপনার পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা।'

আহ্‌, বরফ-বড়-পাঁচ-খাজাঞ্চিখানা। আমি যেন অতি নিকটে দেখতে পাচ্ছি, সুবিস্তৃত এক তুষার শাদা উঠোন। তার ওপরে বিচিত্র রূপ কয়েকটি শৃঙ্গ, ধূসর আর সবুজ তাদের রঙ। কারোর শীর্ষই তীক্ষ্ণ না, যেন উঁচু বাড়ির মতো। স্পষ্টই তাদের ছায়া পড়েছে শাদা উঠোনের ওপর। আমি ওই উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, কল্পনা মাত্র একটা শিহরণ অনুভব করলাম। এমন রূপে এঁকে আমি আর কোথাও থেকে দেখিনি। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে, জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই একটি শীর্ষকে দেখা। এখন যে তার আপন মহিমায়, আবরণহীন বিশাল। চোখ ফেরাতে পারলাম না।

'ওইখানেই সে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। পান্না সবুজ কেশর ঝোলানো তুষার সিংহ।' মেজর ঘোষাল বললেন।

কোথায়? কোথায় সেই তুষার সিংহ। আমি অপলক অনুসন্ধিৎসু চোখে

তাকিয়ে রইলাম। আমি ভুলে গেলাম সহযাত্রীদের। গাড়ি চলেছে, খেয়াল নেই। আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো দীপ্ত এক তুষার সিংহ। প্রকৃতই তার পান্না রঙের কেশর ঝোলানো। দুটি গাঢ় নীল গোলক চক্ষু। দৃষ্টি এদিকেই।

আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে একটি ঢেউ খেলানো কালো পর্দা ভেসে উঠলো। পর্দা উড়ছে। তার ফাঁক দিয়ে ভেসে উঠলো দুটি কালো উজ্জ্বল তারা, রক্তিম দুটি ঠোঁট। সিংহের পদতলে সর্বনাশীর চোখ নাকি? ঠোঁট দুটি কাঁপলো। কিসফিস স্বর শুনতে পেলাম, 'ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন নাকি?'

মুখ পিছনে নিয়ে গেলাম। কুন্দনন্দিনী ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। লজ্জা পেলাম না। বললাম, 'বলতে পারেন। আমি যেন একটা মহানুভবতার ছোঁয়া পাচ্ছি।'

'আমাকে একটু দিন না।' কুন্দনন্দিনী তেমনি কিসফিস করে বললেন।

বললাম, 'যা আমার নয়, তা কেমন করে দেবো বলুন?'

কুন্দনন্দিনী অনায়াসে তাঁর একটি রৌদ্র রঙ হাত আমার বুকে রাখলেন, বললেন, 'ঠিক। কিন্তু আমি যে কৃষিকাজ জানি না।' তাঁর চোখের কাজল আবার চিক চিক করে উঠলো। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সেই মহানুভবতা, আমাকে একটু বলুন।'

আমার ভিতরে দ্বিধা আর সঙ্কোচ জাগলো, কিন্তু আবেগের আধিক্যটাই বেশি। বললাম, 'তুষার চূড়ার এই বিরাটত্ব আর তার মহিমা আমার কাছে এক অপার রহস্যের মতো মনে হয়। ঈশ্বরের অনুভূতি কী, আমি জানি না। কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে মনে হয়, ওই বিশালত্বের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক পাতাতে চাই। অথচ কেমন করে, তা জানি না। খুব আনন্দ পাচ্ছি, তবু কোথায় যেন একটা-একটা কী বাজে। আসলে, আমি বোধ হয় ওই পাহাড়কে কেবল পাহাড় ভাবতে পারি না, আরো কিছু। হয়তো কল্পনা, কিন্তু মনকে ধুয়ে দেয়।'

'মনের কী ধুয়ে দেয়?' কুন্দনন্দিনীর স্বর রুদ্ধ শোনালো।

বললাম, 'নিশ্চয়ই গ্লানি।'

'গ্লানি? কিসের গ্লানি?'

'কপটতা, ফাঁকি, তুচ্ছতা। এক কথায় বোধ হয়, ভিতরের অন্ধকার।'

'আপনার?' কুন্দনন্দিনীর রুদ্ধ স্বরে বিস্ময়, 'আপনার ভেতরে অন্ধকার?'

আমি বললাম, 'পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।'

কুন্দনন্দিনীর চোখের কাজল জলে ভাসছে। বললেন, 'আহ্ তাহলে আমি কী বলবো! এ সব কি মনের কুষি কাজ!'

'মেটক-ছার্প, মেটক-ছার্প!' মেজর ঘোষাল খুশির স্বরে বলে উঠলেন।

কুন্দনন্দিনী আমার বুক থেকে হাত নামিয়ে নিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তার মানে কী?'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'রোদের বুকে বৃষ্টি নামলে, আপনারা তাকে কী বলেন?'

আমি বললাম, 'আমরা ভাবি শেয়ালের বিয়ে হচ্ছে।'

'সিকিমে আলাদা কথা বলে।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'কথাটা যদিও তিব্বতী, সিকিমীরাও তা-ই বলে। রোদের বুকে যদি বৃষ্টি হয় আর আপনি তখন যদি সিকিমে প্রবেশ করেন তাকে বলে শুভ প্রবেশ। আপনি সুখী হবেন। আমরা সিকিমের রাজধানীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কিন্তু রোদ আছে, বৃষ্টি তো নেই?'

মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, 'আকাশে নেই, চোখে তো আছে। সেও বৃষ্টিই!' বলে চোখের কোণে ভগ্নীর দিকে দেখলেন।

কুন্দনন্দিনীর তৎক্ষণাৎ তার মুখ অগ্রজের কাঁধের কাছে গুঁজে দিয়ে রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'মেজদা।'

মেজর ঘোষাল বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে, ডান হাতে ভগ্নীর মাথায় হাত দিলেন। আমার চোখটাও যেন ঝাপসা হয়ে উঠলো।

'সেদিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই হয় নাই।' আজ কী আর সেই কথাটি বলতে পারবে? কদাচ নহে। এখন আমার সময় নাই রে নাই। ব্যবস্থা সব পাকাপোক্ত। আইনের বেড়াজাল ছিদ্র করা গিয়েছে, এবার রওনা। যাত্রা উত্তর সিকিম।

ইতিমধ্যে গ্যাংটকে কেটেছে তিন দিন। মেজর ঘোষালের পরিবারটি একটি স্বর্গ বিশেষ। ফৌজী কর্তার গিন্নী যে এমন নিরভিমান শান্ত আর একান্ত গৃহস্থ বধূরূপে প্রবাস যাপন করছেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বারো মাসে তাঁর তেরো পার্বণ। বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা এবং সারাদিন উপবাস। ধান দূর্বার সংগ্রহ তো আছে বটেই। উলুধ্বনিও বাদ নেই। ননদের সিঁথায় সিঁদুর না পরিয়ে ছাড়েন না। এমন কি পায়ে আলতাও। মেজর সাহেব দেখি

মুখ টিপে হাসেন আর গৃহিণীর দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখেন। আর ছেলেমেয়ে দুটিকে তো আমি পাহাড়ী ভেবেছিলাম। অমন তুলতুলে রাঙা গাল আর ঠোঁট, কালো মানিক চোখ, মাথা ভরতি চুল। ওদের গায়ে না মাখলে প্রাণ খাঁ খাঁ করে। নন্দ কুন্দনন্দিনীর ভারি অসুবিধে। লাল পানিতে চুমুক দিলেই বউদির শাসন শুরু হয়ে যায়। মাত্রা ছাড়াবার উপায় নেই। বেশ টিট্।

ইতিমধ্যে যাতনা যাহারে কয়, লোক পরিচয়। তবে নিছক যাতনা বলবো না, অনেককেই ভালো লেগেছে। স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার বাঙালী ম্যানেজার এবং তাঁর পরিবার। বাঙালী একজন সাংবাদিকের ছোট নিবিড় সংসার। মনে একটা ধন্দ আর ঠেক লেগেছিল একদিন সকালে।

গ্যাংটকের বাজার এলাকা থেকে মেজর ঘোষালের ফৌজী আবাস কিছু দূরে। গাড়ি আছে, অতএব যাতায়াতে অসুবিধা নেই। রোজই দু'বেলা বাজার আর দোকানপাট এলাকায় গিয়েছি। মাড়োয়াড়ি নেই কোথায়? সোনাচাঁদির দোকান থেকে কাপড় ফটো মায় তরিতরকারি মুদীখানা, সব কিছুতেই তারা আছে। তিব্বতী মুসলমানের সাক্ষাৎ এখানেই পেলাম। তার আগে কলকাতায় পেয়েছি, দুটি ছাত্রী তরুণী, নার্গিস আর হাসিনা। মেজর ঘোষাল একদিন সকালে সেই তিব্বতী মুসলমান ভদ্রলোকের হোটেলে প্রাতরাশ খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। মোমো আর গরম চা। মোমো একটি উপাদেয় তিব্বতী খাদ্য। বলা যায় মাংসের পুর দেওয়া পিঠে। গন্ধ আর স্বাদ আমার কাছে চীনা চীনা। খাদ্যের যোগাযোগ তো এদেশে ওদেশে আছেই।

মেজর ঘোষাল, আমি আর কুন্দনন্দিনী গিয়েছিলাম। মুসলমান ভদ্রলোক লম্বা সেলাম ঠুকলেন মেজরকে। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন আমায়। শুনেই ভদ্রলোক আমাকে থ বানিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমার দুই মেয়ে কলকাতায় পড়াশোনা করছে। নার্গিস আর হাসিনা।'

বোঝ এবার, কোথাকার জল কোথায়। আমি সানন্দে ঘোষণা করলাম, তাঁর কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওতেই হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ গিন্নী এসে দ্রুত ভাষায় অনেক কিছু বলে গেলেন। তার মধ্যে আমি উদ্ধার করতে পারলাম, এঁদের ছয়টি কন্যা, পুত্র নেই। নার্গিস আর হাসিনা কলকাতায় শর্টহ্যাণ্ড থেকে সেক্রেটারিশিপ্ সব কিছু রপ্ত করছে। এবার আরো দু মেয়ে যাবে।

সবই ভালো। কিন্তু অন্য এক টেবিল থেকে অনেকক্ষণ ধরেই দুজন

আমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন। তাদের মধ্যে একজন খাঁটি পাহাড়ী। কো বা বক্কু সিকিমদের জাতীয় পোশাক, সেই গাউন পরা সে নয়। খাঁটি বিলিতি পোশাক, মাথার টুপিটা অবিশ্যি পাহাড়ী। তার পাশে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। গোঁফ দাড়ি কামানো স্যুটেড বুটেড ঝকমকে চেহারা। মাথায় ক্যাপ। সমতলের লোক নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁর চোখ একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। চশমার আড়ালে বাঁ চোখটি অতিকায়, ডান চোখটি স্বাভাবিক, তাও কাঁচটা কিঞ্চিৎ ঘষা। বিভীষিকা মনে হতো না, তিনি যদি না বারে বারেই আমার দিকে তাকিয়ে দেখতেন।

কুন্দনন্দিনী তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'সিকিমে আসবার আগেই সিকিমের নার্গিস হাসিনাকে পেয়েছিলেন?'

পাওয়া বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। বলেছিলাম, 'নিতান্তই ঘটনাচক্রে আলাপ।'

'সেই ঘটনাচক্রের সোর্সটাই শোনবার ইচ্ছা রইলো।' কুন্দনন্দিনী একটু চোখের পাতা কাঁপিয়ে বলেছিলেন, 'মেয়েদের একটা ব্যাপার আছে জানেন তো? নিজেদের নিয়ে বড় সজাগ। এখন আপনি কোন্ নার্গিস হাসিনার চিন্তায় মশগুল থাকবেন সেটা আমার মোটেই সহ্য হবে না।'

বলেছিলাম, 'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি এখন একজনকে নিয়েই মশগুল আছি।'

কুন্দনন্দিনী ঘাড় একটু হেলিয়ে চোখের পাতা নিবিড় করে বলেছিলেন, 'আমার এত সৌভাগ্য?'

আমি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করতে উদ্যত হতেই আমাকে হাত তুলে নিরস্ত করে বলেছিলেন, 'জানি জানি, আপনি আমাকে নিয়ে মশগুল নন। বলেই একটু সুখ পেতে চেয়েছিলাম। আপনি এখন তুষার সিংহ নিয়ে মশগুল আছেন, এই তো?'

'এবং এক সর্বনাশীকে নিয়ে।' আমি ঠোঁট টিপে হেসে বলেছিলাম।

কুন্দনন্দিনী ভ্রূকুটি অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সর্বনাশী সে কে?'

বলেছিলাম, 'তিস্তা।'

'ওহ্, তাই বলুন।' কুন্দনন্দিনী নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'ভয়ীণ ভক্ষ ধরিয়ে দিয়েছিলেন।'

আমি না বলে পারিনি, 'অবিশ্যি আর একজনকেও মাঝে মাঝে আমার

সর্বনাশী মনে হয়েছে। তবে তাঁর মধ্যে আমি আত্মসংহারের ছায়া দেখেছি, আমি ভয় পেয়েছি।'

কুন্দনন্দিনী আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'আত্মসংহার? কিন্তু তার আত্মনাশ অনেক আগেই হয়ে গেছে।'

আমি বলেছিলাম, 'যিনি নিজে বলেন, তাঁর আত্মনাশ হয়ে গেছে, সেখানে একটু সন্দেহ থেকে যায়। যার আত্মনাশ হয়ে যায়, সে কি তা জানতে পারে?'

কুন্দনন্দিনী বলেছিলেন, 'পারে বই কি। আত্মা যদি আমার ইহকাল আর পরকাল হয়, তবে ও দুটোই আমি খেয়ে বসে আছি।'

তাঁর কথার মধ্যে বিদ্রূপের কষাঘাত ছিল, কিন্তু যন্ত্রণার জ্বালাটুকু একেবারে অধরা থাকেনি।

বলেছিলাম, 'কোনো কোনো মতে, আত্মা অবিনাশী। তার কোনো ক্ষয় নেই।'

'ঘুরে ফিরে সেই আপনার ইটারনিটি।' কুন্দনন্দিনী হেসে উঠে বলেছিলেন, 'তারপরে নিশ্চয়ই বলবেন, এমন মানব জমিন রইল পতিত।'

বলেছিলাম 'ওগুলো ঠিক বলবার কথা না, কিছু কিছু বিশ্বাসের কথা। আর মানব জমিনের কথা যেটা, সেটা তো খেদের কথা। কেন যেন মনে হয়, ওটা আপনারও আছে।'

'নেই নেই নেই।' কুন্দনন্দিনী মাথা নেড়ে বলে উঠেছিলেন, 'আমার যদি খেদ থাকতো, তাহলে আপনার মতো আমিও ভাবতাম। কেন খেদ, কিসের খেদ? আমি জানি না। আপনাদের ওই সব আত্মা-টাত্মা যদি অবিনাশীও হয়, তাহলে আমার সেই আত্মার মেরামতির আর কোনো উপায় নেই। অক্ষয় হলেও, সেটা এখন তাল তোবড়া পচা একটা জিনিস।' কথাগুলো বলতে বলতে কুন্দনন্দিনীর সকালের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তাঁর নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। চোখে যন্ত্রণার আভাস।

আমি দেখছিলাম, হোটেল 'সবুজ আবাস'-এর ডাইনিং হলের আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছিল। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলেছিলাম, 'সেই আত্মাটিকে সন্ধান করে দেখবো। আপাতত আপনি ওই ভদ্রলোককে দেখুন, উনি কেন আমার দিকে বারে বারে তাকাচ্ছেন। ওঁকে চেনেন?'

কুন্দনন্দিনী সেই দু'রকম চোখ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়েছিলেন। ভদ্রলোক তখন নিজের টেবিল থেকে মেজর ঘোষালকে দু-একটা কথা বলছিলেন।

মেজর ঘোষাল অনেকের সঙ্গেই দু-একটা কথার জবাব দিচ্ছিলেন। কুন্দনন্দিনী বলেছিলেন, 'বোধ হয় চিনি, মেজদার সঙ্গে পরিচয় আছে। উনি সি বি আই-এর লোক।'

সি বি আই! সর্বনাশ। সেই জন্যই কি তাঁর একটি চোখ অতিকায় আর একটি তুলনায় রীতিমত ছোট আর ঝাপ্‌সা? কিন্তু উনি আমার দিকে এমন ঘন ঘন তাকিয়ে দেখছিলেন কেন? এই কথা ভাববার মুহূর্তেই পাহাড়ী যুবকটি তার মাথার টুপি খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমার চোখের ওপর থেকে যেন একটা পর্দা ঝটিতি সরে গিয়েছিল। এ কি, এ যে অত্যন্ত চেনা মুখ? টুপির জন্য চেনা যাচ্ছিল না। সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিলাম, 'টোম্‌বে! তুমি এখানে?'

টোম্‌বে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল। আমার হাত ধরেছিল। পুরো কেতায় মাথা ঝুঁকিয়ে মেজর আর কুন্দনন্দিনীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলেছিল, 'দেখছিলাম চিনতে পারো কী না। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে এলে?'

এই টোম্‌বের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আগের বছর শিলিগুড়িতে। আমার এক বন্ধু বাদলরাজ সিন্‌হা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দুজনেই এক সময়ে সিকিমে নতুন রাস্তা তৈরির সামরিক কণ্ট্রাক্টর ছিল। টোম্‌বে আমাকে প্রথম তার দেশে বেড়াতে আসতে বলেছিল। সে একজন লেপ্‌চা। সে বলেছিল, 'তুমি আমাকে চিনতে পারোনি, আমি কিন্তু তোমাকে প্রথম দর্শনেই চিনেছিলাম।'

বলা বাহুল্য, কথাবার্তা ইংরেজিতেই চলছিল। আমি বলেছিলাম, 'তোমার মাথার টুপির জন্য চিনতে পারিনি।'

টোম্‌বে বলেছিল, 'তুমি তাহলে উত্তর সিকিম যাচ্ছো?'

'তুমি কী করে জানলে?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

টোম্‌বে হেসে ওর টেবিলের দিকে ইশারা করে বলেছিল, 'মিঃ বসুর কাছে শুনছিলাম। উনি একজন সি বি আই অফিসার, এখানে একটা তদন্তে এসেছেন। এসো না একবার আমাদের টেবিলে, উনি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।'

আমার সঙ্গে? সি বি আই অফিসার? কেন? বাঘে ছুঁলে তো আঠারো ঘা শুনেছি। এঁরা ছুঁলে কতো ঘা? আমি মেজর ঘোষালের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, 'যান না, শুনে আসুন কী বলছেন? তবে আপনার নর্থ সিকিমে যাবার ব্যাপারটা উনি বোধ হয় পলেটিকাল অফিসারের অফিসে শুনে থাকবেন।'

তবু তো সেই কিন্তু থেকেই যাচ্ছিল। কুন্দনন্দিনী বলেছিলেন, 'সে রকম কিছু হলে আপনাকে আমি ছিনিয়ে নিয়ে আসবো।'

আমি টোম্‌বের সঙ্গে তার টেবিলে গিয়েছিলাম। মিঃ বসু, সি বি আই অফিসার মাথা থেকে টুপি খুলতেই একটি সুচিক্কণ টাক বেরিয়ে পড়েছিল। বলেছিলেন, 'বসুন। আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম বোধ হয়।'

কিছুমাত্র না, বরং আতঙ্কিত করেছেন। তাড়াতাড়ি যা বলবার বলুন। আমি বসে বলেছিলাম, 'না না, বিরক্ত কিসের?'

'একজন সুন্দর মহিলার পাশ থেকে তুলে নিয়ে এলাম।' মিঃ বসু হেসে বলেছিলেন, 'আপনাকে কিন্তু আমি চিনি।'

চেনেন। কোন্ সূত্রে? রক্ষা করো হে তুষার সিংহ। জয় কান-ছেন-জোং-গা! বলেছিলাম, 'তাই নাকি? কী ভাবে বলুন তো?'

'আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আপনার মফস্বল শহরের থানার অফিসারের মাধ্যমে।' মিঃ বসু বলেছিলেন। তারপর তিনি আমার আসল ঠিকানা মফস্বল শহরের নামটিও বলেছিলেন।

থানার অফিসারের মাধ্যমে? ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সূত্রটা কী? মিঃ বসু বলেছিলেন, 'আপনারা লেখক মানুষ, খুবই ব্যস্ত, তাই মনে করতে পারছেন না। আমি আপনাদের থানায় মাস ছয়েক ছিলাম। আপনাকে অনেকবারই দেখেছি। গতকাল শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন। তাই ভাবলাম, একটু আলাপ করা যাক।'

আলাপ! শুধু আলাপই তো? সেটাই রক্ষে। আসলে মিঃ বসু মানুষটি বিশেষ সদাশয় ভদ্র। আলাপ করে বুঝেছিলাম। রসিকও বটেন। বিপত্নীক। কন্যার বিয়ে দিয়েছেন। একটিমাত্র ছেলে কলেজে পড়ছে। আর এক কন্যা বিবাহযোগ্যা। নিতান্ত, ঘরোয়া কথাবার্তা বলেছিলেন। জানাতে ভোলেননি, মেজর ঘোষালের উদ্যোগ না হলে নিষিদ্ধ উত্তর সিকিমে আমার যাওয়া হতো না।

আরো একটি জায়গার কথা না বললে, উত্তর সিকিমের কথা বলা যাবে না। তা হলো ভারতীয় সামরিক ব্যারাক স্বস্তিক। স্বস্তিকের অফিসারস্ মেস্-এ গিয়েছিলাম মেজর ঘোষালের সঙ্গে। আলাপ হয়েছিল অনেকের

সঙ্গে। ক্যাপটেন বাসু একজন উজ্জ্বল যুবক, অবিবাহিত। অফিসারস্ মেস্-এর তিনিই তত্ত্বাবধায়ক। থাকেনও মেস্-এর পাশেই একটি ঘরে। আসলে তিনি স্বস্তিক সামরিক বাহিনীরই একজন ক্যাপটেন।

স্বস্তিক মেস্‌টি একটি পাহাড়ের চূড়ায়। ওঠবার আর নামবার সময় ইষ্টনাম জপ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এমন খাড়া আর ন্যাড়া আর সরু মৃত্যুবাঁক পাহাড় চূড়ায় আগে কখনো উঠিনি। ওঠবার আগে মেজর ঘোষাল জোঙার ড্রাইভারের মুখ শুঁকে দেখে নিতেন, মদ্যপান করেছে কী না। নেমে এসে ড্রাইভারকে আস্ত একটি মদের পাঁইট পুরস্কার দিতেন।

কুন্দনন্দিনীকে দেখেছিলাম, তিনি স্বস্তিকের অফিসারস্ মেসের ক্লাব রুমে মহারাণী। যুবক অফিসারদের চোখের মণি। মধুপায়ী ভ্রমরের মতো সকলেরই তাঁর চারপাশে গুঞ্জন করতো। তিনিও যথাযথ ভূমিকা পালন করতেন। ক্লাবে খাদ্য যা-ই মিলুক, পানীয় যেন তিস্তার স্রোতকেও হার মানায়। কুন্দনন্দিনীর হাত থেকে পানপাত্র নামতে দেখিনি। মহিলা আরো ছিলেন, সকলেই ফৌজী গিন্নী। কম বেশি পানীয় সকলেরই চলে। দিগন্তে ছড়িয়ে যাওয়া স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ারের বাজনার সঙ্গে নৃত্যের আসর রোজই জমতো সন্ধ্যের পরে। কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। তাঁরই ক্লান্তি ছিল না। তিনি নৃত্যপটিয়সীও বটেন। যাহার নাম পাশ্চাত্যের নৃত্য-কলা। তিনি আমাকে রেহাই দিতে চাননি। কিন্তু ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস। যেটুকু বা আয়ত্তে ছিল, প্রকাশ করবার মতো সাহস ছিল না। উপভোগ করেছি।

কুন্দনন্দিনী আমাকে বলেছিলেন, 'ইচ্ছা করে নিজেকে এদের কাছে বিলিয়ে দিই, কিন্তু কী আছে আমার বিলিয়ে দেবার? কিছু নেই।'

তবু দেখছি এক অর্থে তিনি বিলিয়েছেন। বাজনার ঝংকার, সুরার ফোয়ারা, উদ্দাম নাচ, স্বস্তিকের সেই পাহাড় শীর্ষে যেন এক আদিম রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো। আদিমতা প্রচণ্ড হয়ে উঠতো সকলের রক্তে রক্তে। গাঢ় আলিঙ্গনের নিবিড় ঘনত্বে, চুম্বন একটি সামান্য হিল্লোল মাত্র। কুন্দ-নন্দিনী ক্লাব ঘরের কাঁচের দরজা জানালা ঝনঝনিয়ে তুলতেন হাসির কল-রোলে। আমার মনে হতো, তিস্তার ঢল নামার গর্জন শুনতে পাচ্ছি। তাঁর আরক্ত চোখের দৃষ্টি থাকতো চঞ্চল অস্থির। মাঝে মাঝে আমাকে অদ্ভুত প্রশ্ন করতেন, 'লেখক, মৃত্যুর রূপ কেমন আপনি জানেন?' অথবা, 'আপনি কিছুই জানেন না। আপনার লেখায় মৃত্যুতে কেবল শোক। সুখের কথা

নেই।' কখনো বা, 'কী আপনার সেই ইটারনিটি? মান্ধাতা আমলের মানব জমিনের পতিত উদ্ধার? আসুন আমার সঙ্গে কৃষিকাজ করবেন। আপনি তো মশাই আসল কৃষিকাজই জানেন না।'...যখন সেখান থেকে মেজরের কোয়ার্টারে নেমে আসা হতো, তখন তিনি সম্পূর্ণ অচৈতন্য, স্খলিত তাঁর বসন, অঙ্গরাগে সুরার গ্লানি। মেজর ঘোষাল আর তাঁর স্ত্রী ধরাধরি করে শুইয়ে দিতেন। খাওয়ানো যেতো না। মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, 'যাবো না যাবো না, কখনো না।' কাঁদতেও দেখেছি। কাঁদতে কাঁদতে নিজের আঁচলে চুম্বন করতেন। কাকে সেই চুম্বন, কার উদ্দেশে? নিজের গায়ের আঁচল টেনে সেই চুম্বন কি নিজের সন্তানকে, যে আছে সর্বক্ষণ তাঁর অবচেতন জুড়ে।

মেজর ঘোষালের কাছে ইতিমধ্যে যেটুকু শুনেছিলাম, তা হলো এক পুরনো কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে আপস্টার্ট, সেই সমাজের একটি অনিবার্য করুণ সমাচার। শ্রীযুক্ত মুখার্জির ভুঁইফোড় আত্মপ্রকাশের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃসহ ভূমিকা। কুন্দনন্দিনী প্রথমে যা খেলা বলে খেলেছিলেন, খেলতে খেলতেই একদিন তা তাঁর গলার ফাঁস হয়ে উঠেছিল। সেটা অনুভূতির বিষয়। কারণ, কোনো কোনো খেলা যে গলার ফাঁস, এ অনুভূতিটা অনেকের চিতার শেষ শয্যায় শুয়েও ঘটে না। আমার নিজেরই কি সম্যক ঘটে? নিজের প্রতি তেমন ভরসা নেই। যে আচরণই করি, যা-ই বলি, নিজের ভিতরের পতিত জমির নিষ্ফল বিড়ম্বনার আভাস মাঝে মাঝে পাই। সেই তুলনায় কুন্দনন্দিনীর অনুভূতি অনেক বেশি খাঁটি। তীব্রতার জ্বালাও, অতএব অনেক প্রখর। তাঁর আচরণগুলো, এই প্রাণেরই প্রতিচ্ছবি। যে বয়স্করা পাগলকে ঢিল ছোঁড়ে, তারা কুন্দনন্দিনীকে দুর্নীতির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। সমালোচকরা কোনোদিনই তাদের চোখের পিচুটি দেখতে পায় না।

কিন্তু থাক এ সব বিশ্লেষণ। আমি মেজর ঘোষালের কথা থেকে কুন্দনন্দিনীকে যতোটুকু বুঝেছি, তা হলো, সেই মর্মান্তিক অনুভূতি সত্ত্বেও তিনি অনেকখানি নিচে গড়িয়ে নেমে এসেছিলেন। এখন একদিকে যেমন বিদ্রোহ, অন্য দিকে তেমনি প্রচণ্ড প্লাবনের মুখে, ভয়ংকর আবর্ত। শ্রীযুক্ত মুখার্জি তাঁর নিজের অধিকারকে আর প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না, কুন্দনন্দিনীর দরজা বন্ধ। মাঝে একটি সেতু—একটি শিশু। কুন্দনন্দিনীর মাতৃত্বও কঠিন জটিলতার আবর্তে অসুস্থ।

মেজর ঘোষাল আমাকে বলেছেন, 'আমাদের পাঁচ ভাইয়ের ও একটি মাত্র বোন। দার্জিলিং-এ ও যার কাছে যেতে চেয়েছিল, সে আমাদের ছোট ভাই।

গোলমাল কোথায় জানেন? বরেন (মিঃ মুখার্জি) একদিকে নির্বিচারে নিজের উন্নতি সাধন করে গেছে, অন্য দিকে মিষ্টিকে ছাড়া ওর আর কেউ নেই।'

মেজর গিন্নীর ঘোরতর প্রতিবাদ, 'এ সব মিথ্যা। বরেনের ওটা একটা ধোঁকা। আসলে ঠাকুরঝিকে তার চাই-ই চাই। কিন্তু এ ভাবে আর ঠাকুরঝির জীবন নষ্ট করতে দেওয়া যায় না।'

আমি কোনো মন্তব্যই করতে পারিনি। করা সম্ভবও ছিল না। কুন্দনন্দিনীর আস্তাকুড়ের কথা আমার মনে হয়েছিল। তাঁকে যেন আমি কিঞ্চিৎ চিনতে পেরেছিলাম।

দুয়ারে দাঁড়ায়ে গাড়ি, নাম জোঙা জীপ। যাত্রীর তালিকায় কর্নেল সিপ্‌পি, শ্রীমতী সিপ্‌পি। কর্নেল এসেছেন শিলিগুড়ি থেকে, উদ্দেশ্য বেড়ানো। সুযোগটা ছাড়লেন না। ড্রাইভার ছাড়া আমরা তিনজন। কর্নেল এবং তাঁর স্ত্রীকে সামনের আসন ছেড়ে দেওয়া হলো। কর্নেলের চেহারা রোগা আর কিছুটা যেন রক্তশূন্য। দৃষ্টি অসুখী। মিসেস সিপ্‌পি তাঁর বিপরীত। ঋজু আর স্বাস্থ্যবতী মহিলা। রূপ আর স্বাস্থ্য দুই-ই কিছুটা উগ্র। নাকছাবির বদলে পরেছেন নথ, এটাই হালের চাল। কিন্তু প্রথম থেকেই কুন্দনন্দিনীন প্রতি তাঁর দৃষ্টিতে বিরাগ। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বেশি বাক্য বিনিময়েও যেন অরুচি।

কেন? দেবাঃ ন জানন্তি, আমি তো কোন্ ছার। সঙ্গে খাদ্যও কিছু উঠলো, সবই শুকনো। জীবন্ত কেবল গোটাকয়েক মুরগী। কেন, খাদ্য-বর্জিত দেশে চলেছি নাকি? মেজরের মুখে শুনেছি কোথাও প্রায় বাজার নেই। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছেও কিছু পাওয়া যাবে না। সংগ্রহ রাখতেই হয়। আর পানীয়? বোতলের সংখ্যা আমি গুণিনি। তবে বেশ কিছু কালো বেড়াল আর সবুজ হলুদ সিংহের বোতল উঠেছে। ব্র্যাণ্ডি পানিও বাদ যায়নি। আর কিছু ওষুধ। যাত্রার কথা ছিল সকাল সাতটায়। বাজলো আটটা। জোঙা জীপের হর্স পাওয়ার অনেক বেশি শুনেছি। আমার প্রাণের গতির থেকেও বেশি কী? বোধ হয় না। আমি যে আর বইতে নারি। মেজর গিন্নীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করলেই তো আর হয় না। কুন্দনন্দিনী এখনো ফুটে উঠতে পারেননি। মেজর ঘোষালকে কয়েকবার ডাকাডাকি করতে হলো। ভ্রাতৃবধূও কয়েকবার তাড়া দিলেন।

বিলম্ব মাত্র দশ মিনিট। কুন্দনন্দিনী ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন। নীল-সুনীল গাছে হলুদ রাঙা কুন্দনন্দিনী। মাথার চুলকে শাসন করার জন্যই বোধ হয় একটি নীল রেশমী রুমাল জড়িয়ে বেঁধেছেন। হাতে রাখা আঁচল লুটোচ্ছে। একটি ব্যাগও আছে বেশ বড়সড়ই। কী আছে ব্যাগে? ভেজা কাপড়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে শতাধিক পানের খিলি, সেটা আগেই দেখেছি। আর এমন চোখ ধাঁধানো সাজ কিসের? যাচ্ছি তো দূরের উঁচু পাহাড়ে। সেখানে কার প্রাণে দাগা দেবার দরকার আছে? বেরিয়ে এসে বললেন, 'মেজ বউদি, সেই পিংকি?'

বউদি তাড়াতাড়ি বাগানে নেমে গিয়ে গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ কুঁড়ি তুলে এনে দিলেন। কুন্দনন্দিনী সেটি নিয়ে বললেন, 'যাই।'

'যাই নয়, এসো।' বউদি বললেন, 'একটা কি দুটো রাত তো, একটু ভালো হয়ে থেকো।'

কুন্দনন্দিনী তার কোনো জবাব না দিয়ে খোলা গেটের নিচে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। মেজর ঘোষাল গাড়ির ওপর থেকেই পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ধর, দেখিস মাথা ঠোকে না যেন।' বলে ভগ্নীকে তুলে নিলেন।

কুন্দনন্দিনী একবার সামনের দিকে দেখে বললেন, 'আমরা ওখানটা পেলাম না?'

মেজর চোখ ইশারা করে বললেন, 'আমাদের ব্যাপারটা বুঝিস তো। ওটা মেনে চলতে হয়। আমাদের আসর আমরা এখানেই জমিয়ে তুলবো। কী বলেন?' বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, 'নিশ্চয়।' মনে মনে বললাম, ওগো তোমরা ত্বরায় চলো, ত্বরায় চলো।

কুন্দনন্দিনী চালকের আসনের পিছনেই আমার পাশে বসলেন। কর্নেল সিপ্‌পি মুখ ফিরিয়ে হেসে মুগ্ধ চোখে দেখলেন, ইংরেজিতে বললেন, 'তা হলে আপনি আসতে পারলেন?'

কুন্দনন্দিনী হাসলেন। মিসেস সিপ্‌পিও ভদ্রতা করে একটু হাসলেন এবং কুন্দনন্দিনীর সাজখানি দেখে নিলেন অপাঙ্গে। ভদ্রতার দরকার আছে। শত হলেও মেজরের বাড়িতে এক টেবিলেই সবাইকে প্রাতঃরাশ খেতে হয়েছে। মেজর স্ত্রীর দিকে একবার হাত নেড়ে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রোশেনলাল, স্টার্ট।'

জোঙা গর্জন করে উঠলো। চলতে আরম্ভ করলো। কুন্দনন্দিনী বললেন, "দেখি, একটু এদিকে ফিরুন।'

আমাকেই বললেন। ওঁর দিকে ফিরে তাকালাম। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কোট গায়ে দেননি কেন? আজও সেই গলাবন্ধ সোয়েটার পরে বেরোলেন? ফুলটা গুঁজবো কোথায়?'

গোলাপ কুঁড়িটির কী রঙ? ফ্যাকাশে লাল না বলে গোলাপী বলাই বোধ হয় সঙ্গত। ইংরেজিতে পিংক্। কুন্দনন্দিনী আদর করে বলেছিলেন, পিংকি। তখন বুঝতে পারিনি, তিনি গোলাপ কুঁড়িটির কথা বলছেন। আর মেজর ঘোষালের পিংকিরা এক ঘণ্টা আগেই ইস্কুলে চলে গিয়েছে। কিন্তু এই পিংকি কি আমার জন্য? মোটা গোছের সোয়েটার পরবার পরামর্শ আমাকে মেজর ঘোষালই দিয়েছিলেন। উনি নিজে চাপিয়েছেন এক ফৌজী ধোকড়া জামা। উলের ওপর ওয়াটারপ্রুফ রবারের পলেস্তারায় সবুজ খাকি নানান্ রঙ। বলেছেন, দরকার হলে পরে আমাকেও ওরকম একটি দেবেন। কুন্দ-নন্দিনীকে বললাম, 'আমাকে আবার এ সব কেন?'

'অতিথির বিশেষ অভ্যর্থনা। আপনার স্বাস্থ্য আর মন যেন চিরদিন এমনি পিংক থাকে।' বলে তিনি আমার মোটা পশমী আবরণে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করে, কুঁড়িটি গুঁজে দিলেন বাঁদিকের বুকে।

আমি মেজর ঘোষালের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। গোলাপি থাকবে আমার মন আর স্বাস্থ্য? কালকূটের? তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ খুলে গো। মিসেস সিপ্‌পি একবার তাকিয়ে দেখে, ঠোঁট টিপে হাসলেন। ঝলক তাঁর নাকের নথে। ইচ্ছা করলো অভ্যর্থনার কথাটা ওঁকেই পাল্টে দিই। কিন্তু কথা বাড়াবো না। একটাই অবাক লাগছে, দুই রমণীই পশমী পোশাক পরেননি। মেজর ঘোষাল বাইরের দিকে তাকিয়ে এক একটা জায়গার নাম বলছিলেন, মনে করে রাখা সম্ভব না। প্রত্যেকটি নামের মধ্যে এত বেশি অনুস্বার আর ঙ-জাতীয় শব্দ, মনে হলো প্রায় চীন দেশের ওপর দিয়ে চলেছি। অবিশ্যি আগেই শোনা আছে এই ডেংজুরাজ প্রতিষ্ঠাতা একজন তিব্বতী ছিলেন। চীন আর কতো দূর। কেবল দেখতে পাচ্ছি না তিস্তাকে। পথ একটানা চড়াই উঠছে না, মাঝে মাঝে উৎরাই। কোনো গ্রামই চোখে পড়ছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঢালু ধানখেতের পাশের দু-একটি কুটির।

সিকিম যে প্রকৃত সুখ, ধন আর মোক্ষদাতা খাজাঞ্চিখানার দেশ, গ্যাংটকে তা সারাদিন চোখ ভরে দেখেছি। সবটুকু না, যতোখানি পেয়েছিলাম কালিম্পং

থেকে আসবার পথে। গ্যাংটকে সারা দিন দেখেছি তার দুটি চূড়া। তুষার ধবলে, নানা বেলায় নানা রঙের খেলা। কেন জানি না, উচ্চতম চূড়াটিকে কেবলই আমার মনে হয়েছে সদাজাগ্রত সতর্ক চক্ষু তুষার সিংহ। তাঁর একদিকে কতকগুলো খাঁজ কাটা। সেই কি তাঁর কেশর?

পিছনে বসে মনটা যে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ না হচ্ছে, তা বলতে পারি না। যা দেখছি সবই পিছনের দৃশ্য। সামনের দৃশ্য দেখার অনুভূতি আর এক রকম। অন্তত সেই সিংহের মূর্তি কিছুটা দেখতে পেতাম। এখন মনে হচ্ছে কেবল চড়াই উঠছি। চড়াইয়ের সঙ্গে চুলের-কাঁটা বাঁক ছাড়াও সুগোল নখের পাকও কম নেই। জোড়ার এঞ্জিনের গর্জন যেন পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

মেজর ঘোষাল এক সময়ে ঘোষণা করলেন, 'আমরা এখন বেশ উঁচুতে, এ জায়গার নাম মোরান্‌গাং। এখান থেকে উৎরাই নেমে আমরা তিস্তার কাছাকাছি যাবো। আর একটা কথা মনে রাখবেন, এটা হলো সিকিমের মহারাণীর খাসমহল।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রানীর খাসমহল মানে কী? এটা কি রাজার রাজত্ব না?'

'সেই হিসাবে সিকিম এখন জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত দেশ।' মেজর ঘোষাল হেসে বললেন, 'তবে আসলে এটা রানীর খাসমহল। প্রায় গোটা উত্তর সিকিম। রানীরাও এখানে যৌতুক পান, এ রাজত্বটি তাঁর বিয়ের যৌতুক। ছোগিয়াল নামগিয়েলের রানী তিব্বতের রয়েল ফ্যামিলির মেয়ে। রয়েল ফ্যামিলি বলতে বোঝায়, কোনো দলাই লামার পরিবারের মেয়ে। কারণ তাঁরাই লিভিং গড বা গড কিং।'

কুন্দনন্দিনী আমার হাঁটুর কাছে আঙুল দিয়ে ঈষৎ খোঁচা দিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা যদি বুঝে থাকেন তবে এখন থেকেই সেবা শুরু করুন। আমাকে এক খিলি পান দিন।'

কিন্তু বোঝবার ব্যাপারটা কী? মেজর ঘোষাল বড় একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ থেকে জলে ভেজানো কাপড়ের পুঁটলি বের করলেন। কাপড়ের মোড়কের ভিতরে রীতিমত সবুজ পদ্মপাতার মোড়ক সুতো দিয়ে বাঁধা। সুতো খোলার পরে, মনোরম পানের খিলি। মেজর আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমার বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'নিন, পান দিন। বুঝলেন না, এটা রানীর খাসমহল। অতএব রানীর জাতের সেবা করুন।'

একে বলে রহস্য। কী বা পানের তরিবৎ। সেবায় তো লাগতেই চাই। পিংকির অভ্যর্থনার জবাব চাই না? একটি পানের খিলি হাতে তুলে নিতেই কুন্দনন্দিনী বলে উঠলেন, 'দয়া করে লবঙ্গটি খুলে দিন।'

নেহাত আমার রঙ কালো, অন্যথায় লালিয়ে যেতাম। তবে আমিও রানীর সেবকের মতোই, বাঁ হাতে ডান হাত ধরে লবঙ্গটি খুলে নিয়ে পানের খিলিটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। কুন্দনন্দিনী বললেন, 'জয় হোক।' বলেই হেসে উঠলেন, পান নিলেন। তারপরে যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'ও কি, আমার লবঙ্গ আমাকে দিন, ওটিতে আমারই একমাত্র অধিকার।'

আমি আর একবার প্রাণের ভিতরে বেগুনী হলাম। লবঙ্গটি বাড়িয়ে দিলাম তাঁর দিকে। তিনি সেটি নিয়ে মুঠোয় করে রাখলেন। মেজর ঘোষাল 'মিষ্টি' বলে ডেকে, পানের খিলি দেখিয়ে সামনের আসনের দিকে ইশারা করে দেখালেন। কুন্দনন্দিনী তৎক্ষণাৎ ইংরেজিতে বললেন, 'কর্নেল সিপ্পি, মিসেস সিপ্পি, আপনাদের কি পান চলবে?'

সিপ্পি দম্পতী উভয়েই মোলায়েম করে ধন্যবাদ জানিয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি কর্নেল একবারো সিগারেট খাননি। মেজর ঘোষাল অফার করেছিলেন, তিনি জানিয়েছিলেন, ধূমপান করেন না। এমন ফৌজী অফিসার কম দেখা যায়। কুন্দনন্দিনী তাঁর নিজের ব্যাগ থেকে জরদার কৌটো বের করে, এক চিমটি মুখে দিলেন। গাড়ি ইতিমধ্যে নিচের দিকেই এঁকেবেঁকে নামতে আরম্ভ করেছে।

কর্নেল পিছন ফিরে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি কোথাও নামা যাবে?'

মেজর বললেন, 'নিশ্চয়ই। এ জায়গার নাম সান্‌গম্। রোশেনলাল, জেরা ঠারনা।'

গাড়ি দাঁড়ালো বাঁদিক ঘেঁষে। প্রথম সুযোগেই নামলাম। পথ চলে গিয়েছে পুব-উত্তরে। পশ্চিম-উত্তরে তাকিয়ে আমি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে গেলাম। চোখ ফেরাতে পারলাম না। মনে হলো আকাশের বুকে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই সব পবিত্র চূড়া। সামনের রঙ নীল, উত্তর পাশে শাদা। সামনে বিশাল তুষার প্রাঙ্গণ, যেন ঠাকুরদালানের উঠোন। এ আর এক নতুন রূপ। জগৎস্রষ্টা কে, জানি না। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, এমন বাসনা যদি দিয়েছিলে তবে দু'খানি পাখা কেন আমাকে দাওনি? সেই গানের মতো বলতে ইচ্ছা করে, পাখি যদি হইতাম সখী, উড়ালে যাইতাম নাগর কে লে।

কিন্তু আমার সামনে যিনি বা যাঁরা, তাঁরা কেউ আমার সখী নন। তাঁরা আমার অনুভবের সুখ, হৃদয়ের সম্পদ, প্রাণের মোক্ষ। কেন ব্যথা বাজে প্রাণে, তবু হাসিতে ভরে উঠছে মন। আমার দু'হাত উঠে এলো বুকের কাছে। নত আমার প্রাণ। কে যেন ভিতর থেকে নমস্কার করছে বারংবার। একে যদি তোমরা আত্মসম্মোহন বলতে চাও, বলো। আমি শৃঙ্গজয়ী না। আমি প্রতিমা দর্শন করছি। এ রূপের আর এক নাম অনির্বচনীয়।

'শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?' আমার পাশ থেকে মেজর বলে উঠলেন।

আমি চমকিয়ে তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ শব্দ পেলাম, যেন দূর সমুদ্রের কলরোল ভেসে আসছে। কিসের শব্দ, কোথা থেকে আসে? মেজর হাত দিয়ে দেখালেন, 'ওই দেখুন তিস্তা।'

তাঁর হাতের লক্ষ্যে তাকিয়ে দেখি, বহু নিচে একটি ক্ষীণ রেখা পূর্ব বাঁকের আড়ালে চলে গিয়েছে। সিংতামের পরে, এই আমার প্রথম দেখা। গভীর নিচে তো বটেই, দূরত্ব নিশ্চয় কয়েক মাইল। কিন্তু শব্দ বাজছে যেন আমার শ্রবণের অতি নিকটে। মেজর বললেন, 'তিস্তা আমাদের সঙ্গেই আছে, দূরে দূরে। যতো এগিয়ে যাবো, সে আমাদের কাছে আসবে।'

যতো এগিয়ে যাবো, ততোই তাঁর আঁতুড়ঘরের দিকে। এখনই দেখে মনে হচ্ছে, তুষার সিংহের পদতলে সে বইছে। কুন্দনন্দিনী আমার এক পাশে এসে দাঁড়ালেন। মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এমন মুগ্ধ চোখে কী দেখছেন?'

বললাম, 'বলে বোঝাতে পারবো না।'

'লেখক হয়ে?' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আপনাদের তো কথাশিল্পী বলে।'

আমি বললাম, 'কথাও কোনো কোনো সময় হারায়, কথার যেখানে শেষ।'

'তা ঠিক।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আমার দিকে কেউ এমন করে তাকালে তাকে আর কিছু বলতে হতো না। কথা তখন শেষ।' বলে তিনি একটু হাসলেন।

আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমার চোখের দিকে তাকালেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। তাঁর মুখে কি রক্তের ঝলক লাগলো? তিনি আবার চোখ ফিরিয়ে আমার বুকের পিংকিটি দেখলেন, হাত বাড়িয়ে ফুলটি আর একটু ভিতরে গুঁজে দিলেন। তাঁর ভাষার আবছায়ার মধ্যে প্রকৃত কথাটি পড়তে আমার অসুবিধা হয়নি। মুগ্ধকে তিনি বর দিতেন হয় তো, যা কথা নয়। কথার অধিক রমণীর সকল রমণীয়তা। তাঁর রমণীয়তা শরীরের ভাঙে

নানাভাবে পল্লবিত। সম্ভবত সকল পুরুষেরই আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঘিরে আছে। কিন্তু গরীব আমার প্রাণ। আমি অন্য সুধায় ফিরি।

কর্নেল ডাকলেন, 'এবার চলা যাক।'

আমরা সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমি পিছনের একেবারে ধারে গিয়ে মাথার ওপরে লোহার রড ধরে ঝুঁকে পড়ে সেই বিশাল ঠাকুরদালানের প্রাঙ্গণকে দেখতে লাগলাম। যার অকোশখোলা দালানে বিগ্রহরা দাঁড়িয়ে আছেন নিশ্চল হয়ে।

'আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখবো নাকি?' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'বড় ভয় লাগছে। পড়ে যান যদি?'

বললাম, 'পড়বো না।'

কিন্তু একটা বড় আর মৃত্যুবাঁক নিতেই ঠাকুরদালান হারিয়ে গেল। চোখের সামনে নিবিড় বন পাহাড়। কুন্দনন্দিনী বড় ব্যাগ খুলে তার ভিতর থেকে বের করলেন ঝকঝকে কালো বেড়ালের লাল বোতল। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনই?'

'হাত পা এলিয়ে আসছে।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'গেলাসগুলো আর জলের বোতল বের করে দাও।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলো। আমরা পেছন থেকে চমকে সামনের দিকে তাকালাম। দেখলাম, কর্নেল সিপ্‌পি গাড়ির বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন। পিছন থেকে তাঁর পিঠে হাত দিয়ে আছেন মিসেস। কর্নেলের সমস্ত শরীরে ঢেউ দিল, গলায় বিকৃত শব্দ। তিনি বমি করছেন। মেজর তৎক্ষণাৎ নেমে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে স্যার।'

কর্নেল বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মেজরের হাত ধরে নিচে নামলেন। মিসেস সিপ্‌পিও নেমে গেলেন। কুন্দনন্দিনী নিচু স্বরে বললেন, 'মন্দ বড় তেজী। কর্নেল মানুষ এত অল্পেতেই কাবু?'

বললাম, 'পাহাড়ী পথে চালাটা বোধ হয় সহ্য হয় না।'

'সেটা আমার আপনার বলা চলে, একজন কর্নেলের কি বলা চলে?'

'কোনো কারণে হয়তো পেটের গেলমাল ছিল, তার জন্যও হতে পারে।'

'তবু নেহাত যুদ্ধক্ষেত্রে না, এই যা।' বলে তিনি হেসে উঠতে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিলেন।

বললাম, 'আমি অসুস্থ হলে যেন এ রকম হাসবেন না।'

'কোলে শুইয়ে রেখে সেবা করবো।' কুন্দনন্দিনী বললেন; 'আপনি আমাদের অতিথি, তায় আবার কালকূট।'

তা বলে কোলে করে? বিদ্রূপ নাকি? গরীবকে এত হেনস্থা কেন? বললাম, 'এতটা দাবী নেই।'

'আপনার কথা কে বলছে। আমি আমার দাবীর কথা বলছি।' বলেই তিনি বোতলের ছিপি খুলে গলায় ঢাললেন।

আমি চমকিয়ে উঠলাম। কালো বেড়ালের কাঁচা রক্ত। জল বা অন্য কিছু না মিশিয়েই? কখনই বা ছিপিটি খুললেন। বাইরে তখন কর্নেল সশব্দে বমন করে চলেছেন। আমারো একবার নামা উচিত। বললাম, 'একেবারে এ ভাবে খাচ্ছেন?'

'সত্যিকারের স্বাদটা পাওয়া যায়।' কুন্দনন্দিনী কয়েকবার ঢোক গিলে বললেন, 'কোথা দিয়ে কেমন করে নামছে, সেটাও টের পাওয়া যায়। গলায় আর বুকে যে জ্বালাটা লাগে, সেটা একটা বাড়তি সুখ। চেষ্টা করে দেখুন না।' বলে বোতলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

জ্বালা হলো বাড়তি সুখ। তাঁর জীবন বৃত্তান্তের সামান্য দু-একটি কথা আমার মনে পড়লো। এ ক'দিনের অবসরে মেজর ঘোষালের কাছ থেকে যা শুনেছি। কেমন করে অস্বীকার করবো আপাতদৃষ্টিতে যে রমণীকে দেখছি রঙ্গিণী, সত্যিকারের ক্লাবে প্রায় স্বৈরিণী, বেশভূষা অঙ্গরাগে আর প্রসাধনে বিলাসিনী, হাস্যে লাস্যে মদিরেক্ষণা, তার জন্য আমার প্রাণে কোথায় যেন একটা মমতাবোধ জেগে উঠেছে। স্বৈরিণীর কি কোনো অনুশোচনার জ্বালা থাকে? কুন্দনন্দিনীর জ্বালাও আমি অনুভব করেছি, তাঁর কোনো কোনো কথায়, মত্ত ঘোরের ভাষায়।

আমি তাঁর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বললাম, 'পথ চলার জন্য বেশ কিছু জলের বোতল আনা হয়েছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিচে থেকে এসে আপনাকে নিজের হাতে গেলাসে ঢেলে দেবো।'

'রানীর সেবা করবেন?' কুন্দনন্দিনী হেসে উঠে বললেন, 'কিন্তু নিচে যাবেন কেন?'

বললাম, 'যাওয়া দরকার, নইলে একটু দৃষ্টিকটু দেখায়।'

'সুভদ্রা সিপ্‌পির চোখে?' কুন্দনন্দিনী ভুরু লতিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'আদৌ না। আমরা সহযাত্রী তো।' বলে আমি বোতলটা ব্যাগের

মধ্যে রাখলাম। নামতে উদ্যত হতেই শুনতে পেলাম, 'ভাইনীর হাতে ছেলে সঁপে দিয়ে গেলেন? বোতল রেখে যাচ্ছেন?'

গাড়ির পিছন দিয়ে নেমে বললাম, জননীকেই দিয়ে গেলাম। ছেলে তো একটা নেই, আরো আছে।' বলে আমি হেসে এগিয়ে গেলাম।

কর্নেল রাস্তার ধারে পাহাড়ের গায়ে হাত দিয়ে, মাথা নামিয়ে তখনো বমি করছেন। মিসেস সিপ্‌পি তাঁকে ধরে আছেন। মেজরের মুখ বিমর্ষ, বললেন, 'ব্যাপারটা সুবিধার বুঝছি না। এর পরে আরো উঁচুতে উঠতে হবে, কর্নেল সামলাতে পারলে হয়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, ওঁর কি ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছে?'

'না, মাথা রিল্ করছে।' মেজর বললেন, 'কিন্তু ওঁর রক্তচাপের অবস্থা তো আমার জানা নেই। তা ছাড়া গাড়ি চললেই ওঁর ভমিটিং টেণ্ডেন্সি হবে। এর জন্য আমি ওষুধ নিয়ে এসেছি। এখন তা দেবো। কিন্তু ফারদার হাইটে ওঁর বোধ হয় যাওয়া হবে না।'

কর্নেলকে ধরে মিসেস একদিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এক জায়গায় পাথরের কাটল দিয়ে জলের ধারা গড়াচ্ছে। সেখানে জল দিয়ে কর্নেল মুখ ধুলেন, মাথায় ঘাড়ে গলায় দিলেন। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, আপনি কি আরো এগোতে চান?'

'চাই মেজর ঘোষাল, যতোটা পারা যায়।' কর্নেল বললেন, 'তবে আমি পেছনে শুয়ে যেতে পারলে ভালো হয়।'

মেজর বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমার বোন আর অতিথি সামনে বসবেন, আপনি আসুন। আপনাকে আমি সাময়িক রিলিফের জন্য ওষুধ দিচ্ছি। এখান থেকে আরো কিছুটা গেলে মাংগান বলে একটি জায়গা আছে, সেখানে একটা ডিসপেনসারি আছে।'

মিসেস সিপ্‌পি শুকনো গলায় বললেন, 'অন্তত সেই পর্যন্ত যাওয়া যাক।'

মেজরের নির্দেশ মতো, আমি আর কুন্দনন্দিনী সামনের আসনে গেলাম। মেজর আগেই বলে দিলেন, কুন্দনন্দিনী যেন ধারের দিকে না বসেন। কুন্দনন্দিনী সে নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু বোতল গেলাসের ভারি ব্যাগটি সামনে নিয়ে এলেন। কর্নেল লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। গাড়ি আবার ছাড়লো।

মাংগানে আমাদের দাঁড়াতে হয়নি। কর্নেল ঘুমোচ্ছিলেন। সিংধিক নামে এক জায়গায় মেজর গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। ঘড়ির কাঁটা দেখে বললেন,

"সাড়ে এগারোটা। এখানে একটা বাংলো আছে, রান্না করবার লোকজনও আছে। দুপুরের খাওয়াটা এখানেই শেষ করে নেওয়া যাক। বেলা দুটো নাগাদ আবার বেরুনো যাবে।'

কর্নেল এখন জেগেছেন। বললেন, 'তাই করো মেজর। কিন্তু আমি শুনেছি, সিংঘিকের বাংলো নাকি ভূত বাংলো।' বলে হাসলেন, 'তোমার কাছে অস্ত্র আছে তো।'

মেজর তাঁর ঢোকড়া জামার বুকের বোতাম খুলে দেখালেন। তাঁর জামার মধ্যে কাঁধের বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো রিভলবার। আর ডানদিকের কোমরে গোঁজা একটি খাপে ঢাকা ছুরি। আমিও অবাক কম হলাম না। মেজর ঘোষাল যে খাঁটি ফৌজী লোক তা যেন এখন আরো বেশি করে বুঝলাম। তিনি প্রস্তুত হয়েই পথে বেরিয়েছেন।

কর্নেল হাসলেন মাথা ঝাঁকিয়ে। মেজরের নির্দেশ মতো ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে দিল ডাইনের একটি খাড়া উঁচু সরু বাঁকে। কুন্দনন্দিনী আমার কথা শোনেননি। অবিশ্যি স্বয়ং মেজর সাহেবও বোনকে কিছুটা সঙ্গ দিয়েছেন। কিন্তু গেলাসে জল মিশিয়ে। কুন্দনন্দিনী কালো বেড়ালের রক্ত কাঁচাই পান করেছেন। তাঁর আর সেই সোনারাঙা রৌদ্র রঙ নেই, লালে ঝলক দিচ্ছেন। এখনো গায়ে পশমী কিছু চাপাননি। আমি দু-একবার প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলেন, 'আপনার লেখার সময় কলম ধরে রাখলে কেমন লাগে?'

বলেছিলাম, 'অসহ্য।'

'তবে আর আমাকে বাধা দেবেন না।' কুন্দনন্দিনী বলেছিলেন, 'আমায় নিজেকে খুঁজে পেতে দিন।'

এ কি 'সুধা খাই জয় কালী বলে।' সুরায় নিজেকে খুঁজে পাওয়াটা কেমন আমি জানি না। ভক্ত রামপ্রসাদ হয়তো জানতেন। আমি অসহায় হয়ে তাঁর বোতল মুখে ঠেকিয়ে পান করা দেখতে দেখতে এলাম। উনি আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছেন, 'রাগ করছেন?'

বলেছি, 'না, ভয় পাচ্ছি।'

কুন্দনন্দিনী খিলখিল করে হেসেছেন। মুখে বোতল ঢালতে গিয়ে, রাম-এর লাল পানি গড়িয়ে পড়েছে রেশমী নীলে। আঁচল খসা বুকে, বুক থেকে বক্ষান্তরে বিন্দু বিন্দু ফোঁটা। তার সঙ্গে প্রায়ই সমানেই পানের খিলি, জরদাসহ। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে মেজরের দিকে তাকিয়েছি। মেজর মৃদু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি লক্ষ্য রাখছেন। আমিও বাদ যাইনি।

মেজর নিয়েই আমাকে জল গেলাস দিয়ে সাহায্য করেছেন। লাল পানি ঢেলেছেন কুন্দনন্দিনী।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো একটি বাংলোর চত্বরে। ভূত আছে কী না জানি না, কিন্তু দেখলেই মনে হয় ভূত বাংলো। দু'জন বেয়ারা গোছের পাহাড়ী লোক এসে দাঁড়ালো। সেলাম করলো। মেজর ঘোষাল কর্নেল আর মিসেসকে নিয়ে নামলেন। আমাদের নামতে বললেন। পাহাড়ী লোক দুটো ছুটোছুটি করে সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার কয়েকটা পেতে দিল। আমি নামতে উদ্যত হতেই সোয়েটারের কাঁধে টান পড়লো। ফিরে তাকালাম। কুন্দনন্দিনীর কোকিল চোখ ঢুলুঢুলু। ঠোঁটে ফিকে হাসি। স্বর নামিয়ে বললেন, 'এত তাড়া কিসের মশাই? সুভদ্রা সিপ্‌পির জন্য নাকি?'

হেসে বললাম, 'না। ওটা মাথায় রাখবেন না।'

'আমার হাত ধরুন।'

আমি তাঁর হাত ধরে নামালাম। দুটো কুকুর কোথা থেকে ছুটে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। আমাকে অবাক আর নির্ভয় করে দিয়ে কুন্দনন্দিনী সহজ ভাবেই হেঁটে বারান্দায় উঠলেন। কিন্তু বারান্দায় বসলেন না, খোলা দরজা দিয়ে বাংলোর ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমি শুনতে পাচ্ছি সেই দূর সমুদ্রের কলরোল। কিন্তু তিস্তা কোথায়? আমার সুমুখে বিরাট উঁচু পাহাড়, যার রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ পাহাড় ধাপের পর ধাপে উঁচুতে ওঠেনি, যেন শৃঙ্গগুলো গায়ে গায়ে পাশ ফিরে রয়েছে। উঁচু দিকে তার ঢেউ না, পাশে পাশে ঢেউয়ের সারি। তার প্রতিটি খাঁজে খাঁজে তুষার শাদা নালি নিচের দিকে নেমেছে। পশ্চিমে তুষারের ঢেউ আকাশে মিশেছে। তুষার শৃঙ্গমালা উত্তরে। কিন্তু সিংহের সেই রূপ দেখছি না। চারদিকে পাহাড়, বরফ। জমাট তুষারের নালাগুলো রোদে চিকচিক করছে। মনে হলো আমি পাহাড়ের কোলে বন্দী। কোথাও মুক্তির পথ নেই। কিন্তু শব্দ কিসের? এই ভয়ংকর স্তব্ধতার মধ্যে দূর কলরোলের শব্দ কি সমতলের সর্বনাশীর? দেখতে পাই না। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেজর ঘোষাল, এই যে শব্দটা আসছে—।'

'তিস্তার।' আমার কথা শেষের আগেই তিনি জবাব দিলেন, 'চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, এখান থেকে কয়েক হাজার ফুট নিচে। শব্দটা আসছে উত্তরের বাতাসে, নিচে থেকে না। উত্তর দিকে যে স্নো রেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন, স্নো লায়ন তার পিছনে আছে। আমরা কিছু নিচে আছি বলে, সে ঢাকা পড়ে

গেছে।' বলতে বলতে তিনি সাংগ্রিলার বোতল থেকে পানীয় ঢেলে গেলাসে জল মিশিয়ে মিসেস সিপ্‌পিকে দিলেন।

পাহাড়ের এমন গভীরে আমি আর কোথাও যাইনি। হিমালয়ের অভ্যন্তরে সুদীর্ঘ হ্রদ বিস্তীর্ণ কাশ্মীরে গিয়েছি। কাশ্মীরের সোনেমার্গ বা গুলমার্গ হয়তো নয়ন ভোলানো মনোহর। কিন্তু হিমালয়ের এই সুদূর গভীরে এই মহিমার বিশালত্বে কোথায় যেন একটা ভ্রূকুটি-ভয়াল ছায়া রয়েছে। নিজেকে ভীষণ একাকী মনে হচ্ছে। আমার পিছনেও একটি কল্‌-কল্‌ জলের ধারার শব্দ। বাঁদিকেই একটি ছোট ঝরনা গড়িয়ে যাচ্ছে। যার ওপর দিয়ে দু' খণ্ড কাঠ পাতা। নালার ওপারে যাবার জন্য। আমার পিছনেও পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে কিছু গাছপালার ভিড়।

মেজর ডাকলেন, 'আসুন। উঠে আসুন।'

আমি ওপরে গেলাম। মিসেস সিপ্‌পি গেলাস তুলে আমাকে যাকে বলে 'উইশ্‌' তাই করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার গেলাস কোথায়? মিসেস মুখার্জি ভিতরে নিয়ে গেলেন নাকি?'

মেজর বললেন, 'না, ওঁর গেলাস গাড়িতেই আছে, আমি নিয়ে আসছি।' বলেই তিনি গাড়ির দিকে নেমে গেলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আমিই আনছি।'

'বসুন বসুন। আমাকে খাবার-দাবারগুলোও নামাতে হবে।' বলে তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'বয়, ইধর আও।'

তৎক্ষণাৎ দু'জনে ছুটে গেল। কর্নেল আমাকে বললেন, 'অত্যন্ত দুঃখিত, আমার জন্য আপনাদের হয়তো অসুবিধা হলো।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিছুমাত্র না।'

'আমার শরীরটা কিছুদিন ভালো নেই।' কর্নেল বললেন, 'তা না হলে এ রকম হয় না। আর আমি খালি হাতে বসে আছি, আমার স্ত্রী পান করছেন।' বলে মিসেসের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

সুভদ্রাও হাসলেন। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর পানপাত্র শূন্য। জয় হে তুষার সিংহ। কেউ কারোর থেকে কম যান না। এখন আবার নিজেই হুইস্কি ঢেলে নিচ্ছেন। মিঠে সরবত নাকি? তাঁর নাকের নথে ঝলক দিচ্ছে। মেজর এলেন খাবার-দাবার গরম করতে পাঠিয়ে, আমার গেলাস নিয়ে। আমার আর তাঁর গেলাসে নতুন কালো বেড়ালের ছিপি খুলে লাল পানি ঢালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা খোলা বোতল তো ছিল?'

মেজর বললেন, 'ওটা বোধ হয় মিষ্টি ভেতরে নিয়ে গেছে। আপনি বরং দয়া করে একটু দেখুন, ও কী করছে।'

তাঁর ইঙ্গিতটা বড় স্পষ্ট।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। কিন্তু ঘরের ভিতরে একজন মহিলা দেখতে যাই কেমন করে? বদনা হাতে গলা খাঁকারি দিতে দিতে? সুভদ্রা সিপ্ পি আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছিলেন। ইনিও দেখছি রঙের ছোঁয়া পেয়েছেন। দৃষ্টিটা বড় বিঁধছে। আমি গেলাস নিয়ে ভিতরে গেলাম। প্রথম ঘরটাই বেশ বড় ডাইনিং আর ড্রয়িংরুম। শোফা সেট পাতা একদিকে। আর একদিকে লম্বা খাবার টেবিল ঘিরে কতগুলো চেয়ার। দেওয়ালের নানান্ জায়গায় ফাটল, আলকাতরার পোছড়া টানা। আসবাবপত্রগুলোতে যেন অনেক কালের জীর্ণতার ছাপ। সব থেকেও যেন ফাঁকা ফাঁকা। ভিতর ঘরের দিকে যাবার দরজা আধ ভেজানো। আমি নিচু স্বরে ডাকলাম, 'কুন্দনন্দিনী কি ভেতরে আছেন?'

কোনো সাড়া পেলাম না। দরজা একটু ঠেলে ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিলাম। খাটের বিছানায় বসে আছেন কুন্দনন্দিনী। শূন্য বোতলটা বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে দেখে চমকে উঠলাম। খতম! কুন্দনন্দিনী আমার দিকে ফিরে হাতের ইশারায় ডাকলেন। কাছে গেলাম। তিনি তাঁর পাশেই জায়গা দেখিয়ে ইশারায় বসতে বললেন। রহস্যটা কী? আমি বসলাম। তিনি বাথরুমের দরজার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ভূত।'

ভূত! আমার আদ্যিকালের শিশু প্রাণটা চমকে উঠলো। ভূত বাংলোতে সত্যি ভূত? তাকালাম। দরজা আধ ভেজানো, একটু যেন কাঁপছে। তারপরে যেন ভিতরে থেকে কেউ আস্তে আস্তে খুলে দিল। ভিতরে জলের ফোঁটার টপ্ টপ্ শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয় বাতাসের ব্যাপার। কিন্তু দরজাটা আবার আস্তে আস্তে বন্ধ হতে লাগলো। ঠিক যেন কেউ ভিতর থেকে পাল্লা দুটো ঠেলে দিচ্ছে। দিতে দিতে প্রায় পুরোটাই সশব্দে বন্ধ হলো। আমি কুন্দনন্দিনীর দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকালাম। তিনি ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করলেন। হঠাৎ ক্যাঁচ্ করে শব্দ হলো। দরজা আবার খুলতে লাগলো।

কুন্দনন্দিনী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'ভূতটা সামনে আসতে চাইছে না, খুবই লাজুক বোধ হয়। দেখি একটু।' বলে তিনি খাট থেকে উঠে দরজা ঠেলে বাথরুমে ঢুকলেন। বললেন, 'চমৎকার। স্নান করতে ইচ্ছা করছে।' বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে।

সত্যি স্নান করবেন নাকি? এই ঠাণ্ডায়? ভিতরে জলের শব্দ হলো। তারপরেই সহসা উচ্ছ্বসিত খিলখিল হাসি। আমি স্বস্তি বোধ করলাম না। কিন্তু কিছু করবারও নেই। হাসি থামছে না, বরং বেপরোয়া হয়ে উঠছে। হঠাৎ মনে হলো ঘরের পিছনে কোনো গাছের ডাল মট্ করে ভেঙে পড়লো। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। মেজরকে কী ডেকে পাঠাবো? ভাবতে ভাবতেই আমি কুন্দনন্দিনীর গলার স্বর শুনতে পেলাম, 'হু আর য়ু? তুম কৌন্ হ্যায়?'

জবাবে একটি গোঙানো মোটা পুরুষের গলা শুনতে পেলাম, যার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না।

অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। আমি তুষার সিংহের পদতলে যাচ্ছি, সর্বনাশীর ঘরের খোঁজে। কিন্তু আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কুন্দনন্দিনী আবার হেসে উঠলেন। এবার তার সঙ্গে পুরুষের শ্লেষ্মা জড়ানো হাসি, এবং দুর্বোধ্য ভাষায় কোনো কথা। আমি বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে ডেকে উঠলাম 'কুন্দনন্দিনী, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?'

জবাবে তাঁর হাসি আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। শুনতে পেলাম তাঁর স্বর, 'ভাগো, জল্‌দি ভাগো।'

জবাবে পুরুষ গলায় কিছু শুনতে পেলাম। আমি স্বর চড়িয়ে ডাকলাম, 'কুন্দনন্দিনী! মিসেস মুখার্জি।'

দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। কুন্দনন্দিনীর আঁচল মেঝেয় লুটাচ্ছে। উল্‌টো দিকের খোলা জানলা দেখিয়ে বললেন, 'ওই দেখুন ভূত।'

আমি দেখলাম এবং ভূতই। জানলার বাইরে একটি রেখাবহুল রক্তাভ মুখ। মাথার ধূসর চুলে বেণী বাঁধা। করুণচেরা চোখ। পাতলা এক জোড়া গোঁফ আর থুতনিতে একগোছা দাড়ি ঝুলে পড়েছে। গলায় একরাশ নানা রঙের পাথরের মালা। গায়ে ছেঁড়া ময়লা বক্কু। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ও?'

'জানি না।' কুন্দনন্দিনী হাসতে হাসতে বললেন, 'দরজা বন্ধ করে দেখি জানলাটা খোলা। উঁকি দিতেই একে দেখতে পেলাম। খালি বলছে, লেপ্‌চা লেপ্‌চা। আর ভঙ্গি করে দেখাচ্ছে, বোতলে চুমুক দেওয়া।' বলে খিলখিল করে হাসতে লাগলেন।

আমি লোকটার দিকে তাকাতেই সে আমার হাতের গেলাসটা দেখিয়ে অনেকগুলো হলুদ দাঁত বের করে হাসলো। পানীয় চাইছে। কিছু বললো। নিজের ভাষা ছাড়া কিছুই জানে না বোধ হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ এলো কোথা থেকে?'

'কে জানে? আহা, দিন বেচারিকে একটু।' বলেই কুন্দনন্দিনী গেলাসটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললেন, 'হাঁ করো বাবা, গলায় ঢেলে দিচ্ছি। তোমার ও মুখে গেলাস ছোঁয়াতে দিতে পারবো না।'

লোকটা যেন সবই বুঝলো, তৎক্ষণাৎ মাথা পিছনে করে হাঁ করলো। কুন্দনন্দিনী গেলাসের পানীয় ঢাললেন। লোকটা একটুও না থেমে, ঢক ঢক করে গেলাসটি শূন্য করলো। একটা ঢেঁকুর তুলে মাথা দুলিয়ে গভীর আনন্দ প্রকাশ করলো। ডান হাত তুলে উঁচুতে দেখিয়ে বললো, 'মনাস্টি-মনাস্টি। রিম্‌পোসে, রিম্‌পোসে।'

কিছুই বোঝা গেল না। কুন্দনন্দিনী বললেন, 'এবার এসো বাবা লেপ্‌চা।' বলে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন।

আমার কৌতূহল তখনো মেটেনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'দরজা খোলা বন্ধটা ও করছিল নাকি?'

কুন্দনন্দিনী পাগলের মতো হেসে উঠে আমার কাঁধে একটা চাপড় মারলেন, বললেন, 'দূর মশাই। ওটা হাওয়ার ব্যাপার। জানলাটা খোলা ছিল যে! ওদিক থেকে বাতাস, এদিক থেকে বাতাস, দুইয়ের চাপে এই কাণ্ড। মাতাল হননি তো?'

বাতাসের কথাটা তো আমিও আগে ভেবেছিলাম। কিন্তু খোলা জানলার বাতাসের কথা কী করে জানবো। আমার অবস্থা তো মাতালের থেকেও বেশি। অন্যথায় এমন সহজ কথাটা মাথায় আসেনি কেন? আর কে আমাকে মাতাল বলছেন? কুন্দনন্দিনী মুখোপাধ্যায়। এই কি তাঁর নিজেকে খুঁজে পাওয়া? তিনি বললেন, 'চলুন আপনার গেলাসটা ভরতি করে দিই।'

বললাম, 'আমার আর দরকার নেই। আপনিও তো দেখছি বোতলটা শেষ করেছেন। আর নেবেন না।'

'কেন?' প্রায় ফণা তোলার মতোই কুন্দনন্দিনী ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে আমার দিকে তাকালেন, 'কেন নেবো না, বলতে পারেন?' তাঁর রক্ত চোখের দৃষ্টি কঠিন, আরক্ত ঠোঁট দুটো শক্ত।

আমি বিব্রত হয়ে উঠলাম। একটা শংকিত লজ্জাও বোধ করলাম। কুন্দনন্দিনী আবার বললেন, 'আপনার সেই ইটারনিটি, মন তুমি কৃষিকাজ জানো না? জানি না, জানি না, আমি ও সব জানি না। কোথায় আবাদ করলে কী সোনা ফলতো, ওসব রাবিশ কথাবার্তা আমি জানি না, মানি না।' বলেই তিনি তর্জনী দিয়ে আমার বুকে খোঁচা দিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে

উঠলেন, 'তুমি মশাই কালকূট, আমাকে আস্তাকুড়ের কথা শুনিয়েছিলে। কী আস্তাকুড় তুমি দেখেছো? আস্তাকুড়। আমি তোমাকে আমার সব জামা কাপড় খুলে দেখাতে পারি, একটা প্রকাণ্ড আস্তাকুড়। তুমি আমার ভালো করার চেষ্টা করো না। কিছু চাও তো আস্তাকুড় ঘেঁটে নিতে পারো।' বলেই ঘাড়ে আবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঝটিতি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো এক মুহূর্তেই কুন্দনন্দিনী আমার কাছে অচেনা হয়ে গেলেন। ক'দিন ধরে যাঁকে দেখে ভেবেছিলাম চিনতে পারছি, আমার সে ভুল ভেঙে গেল। তিনি কি মাতাল হয়ে গিয়েছেন? মনে হচ্ছে না। যার বায়ুর বিষয়ে এত বাস্তব আর সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে, তিনি মাতাল হননি। তিনি কি আমার প্রতি বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হলেন? অসম্ভব না। হয়তো অনধিকার চর্চা করেছি। মেজর ঘোষালের কথাগুলো আস্তে আস্তে আমার মনে পড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে, 'আমি আর আত্মসংহার কী করবো, আত্মনাশই হয়ে গেছে।'......

আমি দরজা দিয়ে ড্রয়িংরুমে গেলাম। দেখলাম কর্নেল সিপ্‌পি একটি বড় শোফায় অধেশোয়া হয়ে রয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেজর ঘোষাল কোথায় গেলেন?'

কর্নেল আমার দিকে যেন একটু জিজ্ঞাসু কৌতূহলিত চোখে তাকালেন, বললেন, 'মেজর আর মিসেস সিপ্‌পি আশেপাশেই ঘুরছেন। মিসেস মুখার্জিকে দেখলাম, বাইরে বেরিয়ে গেলেন।'

আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। কারোকেই দেখতে পেলাম না। বারান্দায় ব্যাগ পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে বোতলগুলো দেখা যাচ্ছে। আমি বারান্দা থেকে নিচে নামলাম। মেজর বা সুভদ্রা সিপ্‌পির গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি না। কুন্দনন্দিনীই বা কোথায় গেলেন। আমি নিচের পথের দিকে তাকালাম। পাশেই একটি কুটির, বাংলোর চৌকিদারের ঘর বোধ হয়। সেই দূর সমুদ্রের কলরোল শুনেছি। আর তুষার শৃঙ্গরাজি নানা রঙে খেলছে। কিন্তু মনে অস্বস্তি বোধ করছি। কুন্দনন্দিনীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। সকলেই কি নিচের রাস্তায় নেমে গেলেন?

সহসা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো সেই জানলার মূর্তি। ময়লা বক্কু গায়ে লেপ্‌চা। সে আমাকে পিছনের পাহাড়ের দিকে হাত তুলে দেখালো,

হাত নেড়ে ভঙ্গি করলো। আমি কৌতূহলিত হয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও পথে কেউ গেছে?'

সে আমার একটা হাত ধরে টানলো। ঠাণ্ডা কনকনে হাত। নালার ওপরে হাত দিয়ে দেখিয়ে সে তার নিজের ভাষায় কিছু বললো এবং ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার পিছনের পাহাড়ের দিকে দেখালো। দেখিয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। আমি প্রতিরোধ করলাম। সে আবার ঘরের দিকে দেখিয়ে ওপরের দিকে দেখালো। আহ্, ভাষা কি দুরূহ বাধা। ও কি কুন্দনন্দিনীর কথা বলছে? আমি ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে অনুসরণ করলাম। সাবধানে নালা পার হয়ে কাঁচা কাদা মাটি আর পাথর ছড়ানো সরু রাস্তা দিয়ে উঁচুতে উঠতে লাগলাম। কিন্তু আমার জুতো পিছলে যাচ্ছে। লেপ্‌চা আমার হাত ধরে টেনে তুলতে সাহায্য করলো। আমি ঘামতে আরম্ভ করলাম। ক্রমাগতই সে আমাকে উঁচুতে নিয়ে চলেছে। দু'পাশে পাহাড়ী জঙ্গলী ঝোপ।

আমি ফিরে যাবো কী না ভেবে দাঁড়াতেই ডানদিকের উঁচুতে কয়েকটি পবিত্র ধ্বজা দেখতে পেলাম। লেপ্‌চা আমাকে সেদিকে হাত দিয়ে পথে যাওয়ার ইশারা করলো। হঠাৎ কয়েকটা ছোট ছোট লাফ দিল মাথা নিচু করে, আবার উঁচুতে হাত দেখালো। কী তার মানে? ওপরে কেউ ছুটে গিয়েছে? আমি আবার লেপ্‌চাকে অনুসরণ করলাম। উঁচুতে উঠে এবার আমার চোখে পড়লো একটি প্যাগোডার মতো মঠ। বৌদ্ধ মঠ নিঃসন্দেহে। মনে পড়লো লেপ্‌চার কথা, 'মনাস্টি মনাস্টি।' সে মনাস্ট্রি বলতে চেয়েছিল।

আমি মঠের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বন্ধ মঠ, লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। মঠের গড়ন অনেকটা তরাই অঞ্চলের কাঠের বাড়ির মতো। কাঠের থামের ওপর, উঁচু কাঠের মেঝে। নিচে ফাঁকা।

লেপ্‌চা আমাকে আরো উঁচুতে হাত তুলে দেখালো। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম টিনের চাল দেখা যাচ্ছে। লেপ্‌চা ঘাড় ঝাঁকিয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো ওপরে। আমার ভিতরে এখন ঘামের স্রোত বইছে। উঠতে উঠতে একটি সমতল জমিতে এসে পড়লাম। সামনেই একটি বাড়ি মঠের মতোই গঠন। ওপরের কাঠের বারান্দায় তিন চারটি ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে অবাক কৌতূহলে দেখছে। একটি কাঠের সিঁড়ি রয়েছে ওপরে ওঠবার। লেপ্‌চা আমাকে সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে টেনে নিয়ে গেল।

বাচ্চা কয়টি কল্‌কল্‌ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। ঘরের প্রায় মাঝখানে আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। তার পাশেই একটি উনোন জ্বলছে। তার ওপরে হাঁড়িতে কিছু ফুটছে। একটি পাহাড়ী মেয়ে সেই আগুনের সামনে বসে রয়েছে। হলুদ রাঙা তার শরীর। বুকের ওপর কোনো আবরণ নেই। কোলে একটি শিশু, তার কচি হাত মেয়েটির অনতিশিথিল বুকে খেলা করছে। রমণী পাহাড়ী কোনো সন্দেহ নেই। তাকে ঘিরে বসে আছে দু'জন পাহাড়ী পুরুষ, যাদের মাথায় বড় বড় চুল, পরনে বক্কু, গলায় পাথরের মালা। তারা সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

ঘরের আর একপাশে এক কোণে একটি কালো পশুর চামড়ার ওপরে বসে আছে একজন উজ্জ্বল পাহাড়ী পুরুষ। তারও মাথার চুল বড়। জোড়াসন করে বসে আছে। সামনে চওড়া একটি বাঁশের চোঙা, ভিতরে ঢোকানো একটি কঞ্চির নল। কিন্তু আমার বিস্ময় সেখানে না। মানুষটির অদূরেই কালো লোমশ চামড়ার ওপর বসে আছেন কুন্দনন্দিনী। তাঁর সামনেও একটি বাঁশের চোঙা, ভিতরে ঢোকানো একটি কঞ্চির নল। তিনি আমাকে দেখে অবাক হলেন না, হেসে বললেন, 'বসে পড়ুন, একটু তুম্‌বা খান।'

মনে পড়ে গেল এই বাঁশের চোঙায় তুম্‌বা পানীয় থাকে, কঞ্চির নল দিয়ে টেনে চুমুক দিতে হয়। ক্ষুদ্র সরষের মতো শস্যজাতীয় বস্তু ঢুকিয়ে তার মধ্যে গরম জল ঢেলে দেওয়া হয়। গ্যাংটকে দেখেছি। খাদ্য এবং নেশার পানীয় উভয় বস্তুই এতে আছে। এদেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে অনেক গরীব শুধু এই খেয়েই নাকি একটা দিন কাটিয়ে দিতে পারে।

লেপ্‌চার ইশারা আর সংকেতের কথা বুঝতে পারলাম। সে আমাকে কুন্দনন্দিনীর কথাই বলছিল। উজ্জ্বল পুরুষটির কাঁধের ওপর চাদরের মতো রয়েছে একটি চামড়া। বাকি গা খালি। সে আমাকে বললো, 'সিট ডাউন, সিট ডাউন, ওয়াণ্ট তুম্‌বা?'

পুরুষটির ইংরেজি শুনে অবাক হলাম। কুন্দনন্দিনী ইংরেজিতে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে এক পাত্র তুম্‌বা দিন।' আমাকে বললেন, 'আসুন, বসুন। উনি হচ্ছেন একজন প্রেসাস্‌ জুয়েল, মানে লামা। তিব্বতী লামা। আর ওই পুরুষ দু'জন ওঁর ভাই। আরো এক ভাই আছে। তিন ভাইয়ের একটিই বউ। আমি তো শুনেই মুগ্ধ। পুরোপুরি দ্রৌপদী।'

উজ্জ্বল পুরুষটি মুখ ফিরিয়ে কিছু বললেন। একটি বছর আটেকের মেয়ে

ঘরের বাইরে গেল। পাশেও একটি ঘর আছে। সেখান থেকে এক পাত্র তুম্বা এনে কুন্দনন্দিনীর পাশে বসিয়ে দিল। অবাক লাগছে, কুন্দনন্দিনী এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। আমি জুতো খুলতে উদ্যত হতেই উজ্জ্বল পুরুষ ভাঙা আর ভুল ইংরেজিতে বললেন, 'কোনো দরকার নেই, বসে পড়ো।'

কুন্দনন্দিনীর চোখ লাল, টকটকে লাল। মাথায় রুমাল নেই। আঁচল বুকের জামায় গোঁজা। আমি তাঁর আসনের একপাশে গিয়ে বসলাম। তিনি উজ্জ্বল পুরুষটিকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনার তিন ভাই তাদের এক বউকে নিয়ে ঝগড়া করে না?'

প্রেসাস্ জুয়েল কুন্দনন্দিনীর কথা যথার্থ বুঝতে পারলেন, তাঁর নরুণ চেরা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন। কুন্দনন্দিনী তাঁর প্রশ্নটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে আবার উচ্চারণ করলেন। তাঁর নিজের মতো ইংরেজিতে লামা মাথা নেড়ে হেসে বললেন, 'কেন ঝগড়া করবে? তারা তাদের এক বউকে নিয়েই সুখী। অন্য একটি বউ এলে, যা কিছু সম্পত্তি আছে ভাগাভাগি হয়ে যেতে পারে। তাই তো হয়। তিব্বতে এ নিয়মটা আছে। ভাইয়েরা এককাট্টা হয়ে থাকতে চায়। একটার বেশি বউ হলে তা হয় না।'

কুন্দনন্দিনী বললেন, 'এই সব ফুটফুটে ছেলেমেয়েদের বাবাও কি তিনজন?'

'নিশ্চয়ই।' উজ্জ্বল পুরুষ বললেন।

কুন্দনন্দিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ভাইয়ের বউটি এ ব্যাপারকে কী চোখে দেখেন?'

'খুবই স্বাভাবিক চোখে দেখেন। সে তার স্বামীদের সঙ্গে ঠিক মতো বোঝাপড়া করে নেয়।'

কুন্দনন্দিনী তিব্বতী বধূটির দিকে তাকিয়ে বাঙলায় বললেন, 'ওগো তোমার শ্রীচরণে কোটি প্রণাম, তুমি ভগবতী।'

আমার চোখের সামনে ভাসছিল, পঞ্চ পাণ্ডব আর দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থানের ছবি। কোনো কোনো পণ্ডিতের সন্দেহ পঞ্চপাণ্ডব ভারতে এসেছিলেন তিব্বত থেকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ফিরে গিয়েছিলেন সেখানেই। স্বর্গের দুর্গম পথে, যুধিষ্ঠির ছাড়া সকলেই পথে দেহত্যাগ করেছিলেন। জানি না তার সত্যাসত্য। কিন্তু তিন ভাইয়ের এক স্ত্রীর এই সুখী পরিবার যেন পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদীর কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি কি এখন সেই দুর্গম পথেই

রয়েছি? মহাভারতের আমলে বোধ হয় এ রকম রাস্তা আর জোঙা জীপ ছিল না।

'কী হলো মশাই, তুম্‌বা টান্থন।' কুন্দনন্দিনী বাংলায় বললেন, 'বউটির ইতিমধ্যেই পাঁচটি সন্তান হয়েছে। দেখেছেন, শরীরটা একটুও টসকায়নি, আশ্চর্য! আর কী হাসিখুশি। আহা, আমার যদি এমন হতো।' বলে তিনি উঠে আগুনের সামনে বধূটির পাশে গিয়ে বসলেন।

তিব্বতী রমণীকে দেখে, আমিও পাঁচ সন্তানের জননী ভাবতে পারিনি। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর ভাষা লজ্জা দিল, আবার রমণীর দিকে তাকাতে গিয়ে সংকোচ বোধ করলাম। উজ্জ্বল পুরুষটি ছাড়া কেউ কারোর ভাষা বোঝে না। লেপ্‌চা লোকটি ঘরের বাইরে দরজার কাছে গুটিশুটি বসে আছে। সেই বছর আটেকের মেয়েটি আর এক পাত্র তুম্‌বা এনে কুন্দনন্দিনীর পাশে বসিয়ে দিল। তিনি নিচু হয়ে নলে চুমুক দিলেন, আর বধূটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তিব্বতী বধূও হাসলো। তারপর দুই রমণী চোখে চোখে কী কথা বললেন কে জানে, দু'জনেই খিলখিল করে হাসতে লাগলেন।

আমি লামার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি প্রেসাস্ জুয়েল?'

লামা ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে উচ্চারণ করলেন, 'রিম্‌পোসে।'

শব্দটা লেপচার মুখে আগেই শুনেছিলাম। কথাটার মানে কি তাই? জিজ্ঞেস করলাম। লামা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি তিব্বত থেকে এসেছেন?'

লামা মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত তুলে বললেন, 'ইয়েস, চায়না চায়না—।'

এর বেশি তাঁর ভাষায় যোগালো না। অনুমান করলাম, চীনা অধিকারের সময় তিনি দলাই লামার দলের সঙ্গে চলে এসেছেন। আবার বললেন, 'নাঙ্গিয়েত্‌রেস্থাং—পোতালা।' কিছুই বুঝলাম না। পোতালা নিশ্চয়ই পোটালা প্যালেস্। ইতিমধ্যে কুন্দনন্দিনী তিব্বতী রমণীর সঙ্গে হেসেই চলেছেন।

আমি ডাকলাম, 'কুন্দনন্দিনী।'

'না মশাই, আমি আমার নতুন নাম রেখেছি কালকূটি।'

আমি বিষণ্ন হেসে বললাম, 'কালকূটি নাম হয় না।'

'গ্রামারে হয় না, আমার হয়।'

'বেশ, তবে তাই। আমি বলছিলাম, মেজর খুব ভাবছেন, চলুন ফেরা যাক।'

'আপনাকে কে বললো, আমি এখানে এসেছি?'

'লেপচা। ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

কুন্দনন্দিনী আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমি বললাম, 'আপনাকে আমি না বুঝে বিরক্ত করেছি, মাফ করবেন।'

'বিরক্ত? ক্ষমা?' কুন্দনন্দিনী ভ্রূকুটি বিস্ময়ে বললেন, তারপরে মুখ ফিরিয়ে বারেবারে মাথা নাচাতে লাগলেন।

আমি মেজর ঘোষালের কথাই ভাবছিলাম। এ পরিবেশটি আমারো ভালো লেগেছে। কিন্তু সময় নেই।

আমি আবার ডাকলাম, 'কুন্দনন্দিনী।'

কুন্দনন্দিনী বধূটির গায়ে একবার হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসলেন ঘাড় কাত করে। বলে উঠলেন, 'কী নির্মল! সব কিছুই মানুষের মনে, যেখানে তার সমাজ সংস্কারে মন ভরে আছে।' বলে তিনি উজ্জ্বল পুরুষকে ইংরেজিতে বললেন, 'আপনার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ, বিদায়।' বলে আমার দিকে তাকিয়েই তুম্বার পাত্রের দিকে অবাক চোখে দেখলেন, বললেন, 'ও কি, একটাও চুমুক দেননি? আপনি তো ওদের অসম্মান করছেন।'

আমি তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে তুম্বার নলে চুমুক দিলাম। ঈষৎ অম্ল, অনেকটা আমাদের আমানি পান্তার জলের মতো স্বাদ। গন্ধটা ভিন্ন। উজ্জ্বল পুরুষটি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পুরুষটি কি আপনার স্বামী?'

তুম্বার রস আমার গলায় ঠেকে গেল। কুন্দনন্দিনী হেসে উঠলেন, বললেন, 'দেখুন প্রেসাস জুয়েল, আমার কোনো স্বামীই নেই। তবে বিয়ে একটা আমার হয়েছে।' বলে তিনি দরজার দিকে প্রায় টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। উজ্জ্বল পুরুষটির হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বিদায় নিলাম। ছোট ছেলেমেয়েরা পুত্তলিকাবৎ আমাদের দেখছিল। ঘরের বাইরে পা দিয়ে দেখলাম, কুন্দনন্দিনী সিঁড়ির মুখে থাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, মাথা ঝুঁকে পড়েছে, বললেন, 'আমাকে একটু ধরবেন? আমি পা ঠিক রেখে চলতে পারছি না।'

'নিশ্চয়ই।' বলে আমি একটি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

তিনি আমার হাত ধরলেন না, ডান হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। বাঁ হাত দিয়ে নিজেই পিছন থেকে আমার বাঁ হাত টেনে তাঁর কটির পাশ দিয়ে মুঠি পাকিয়ে ধরলেন। সিঁড়িতে পা বাড়ালেন। পতন ঘটলে

উভয়েরই ঘটবে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে পিছন ফিরে তাকালাম। তিব্বতী দ্রৌপদী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। আবরণহীন বুকে তার শিশু সন্তানটি। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'আসলে তো আমার ওপরেই আপনার বিরক্ত হবার কথা।' কুন্দনন্দিনী বললেন, 'আমি হঠাৎ কতকগুলো কথা বলে ফেলে লজ্জায় পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমারই ক্ষমা চাইবার কথা, আপনার নয়।'

আমরা নেমে এলাম মঠের কাছে। কুন্দনন্দিনীর শরীরের সকল ভার প্রায় আমার ওপরে। আমি ঘামছি। বললাম, 'আমি আর কখনো আপনাকে ড্রিংক করতে বারণ করবো না।'

বলা মাত্রই কুন্দনন্দিনী আমার গলা থেকে হাত নামিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গেলেন। তাঁর চোখে আবার সেই কঠিন দৃষ্টি, ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে উঠলেন, 'এই বুঝি আপনার আসল কথা? কেন এই মিথ্যা? আমি জানি আমি মদ খেলেও আপনার কিছু যায় আসে না, না খেলেও না। আপনি আমাকে দয়া করে এই ভদ্রলোকী নিরপেক্ষ হৃদয়হীনতা দেখাবেন না।' বলে তিনি নিজেই টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন।

মনে হলো কোথায় একটা সজোরে আঘাত লাগলো আমার ভিতরে। নিরপেক্ষ হৃদয়হীনতা! আমার জীবনে এমন একটি কথা এই নতুন। হিমালয়ের গভীরতর অভ্যন্তরে এ কথা যেন এক সমসাময়িক কালের সকল মহত্বের পালিশে চাবুকের মতো বাজলো। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নিজেই কুন্দনন্দিনীর হাত টেনে ধরলাম। কুন্দনন্দিনী প্রায় চোখ বুজে হাসলেন, মাথা নেড়ে বললেন, 'কালকূট, আপনি কালকূট, আপনি তো আমার কিছুই জানেন না। আপনাকে আমি কী করে বোঝাবো।'

জানি, কিছু কিঞ্চিৎ কিন্তু তা বলতে পারবো না। তার বিশদ কিছু আমি তাঁর মুখ থেকে শুনতে চাই না। তিনি নিজেই আলগা ভাবে একটি হাত আমার কাঁধে রেখে বললেন, 'আপনার সেই ইটারনিটি, মন তুমি কৃষিকাজ জানো না। আপনার প্রাণে কি পতিত জমির উপর কোনো কৃপা হয় না? কৃষিকাজে একটু ভালবাসা নেই বুঝি? খালি উপদেশ? এই কোরো না, সেই কোরো না। কেন?'

বলেই কুন্দনন্দিনী দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর কোকিল চোখের তারা আমার চোখের প্রতি। নাসারন্ধ্র কাঁপছে।

আমি নিশ্বাসে তাঁর সুরা আর ফুলের সুবাস পাচ্ছি। তিনি ফিসফিস

করে আবার বললেন, 'কেন, কেন?' তাঁর রক্তিম চোখের কোণে জলের ফোঁটা টলটলিয়ে উঠলো। তিনি দু' হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, উদ্গত কান্নাকেই যেন আমার দুই ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলেন।

আমার চোখের সামনে তুষার শৃঙ্গ, আকাশের গায়ে এখন নীল সবুজ খেলছে। কোথাও বা তার হালকা লালের স্পর্শ। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়ছে। আমার ঠোঁটের কষে চুঁইয়ে ঢুকলো লবণাক্ত স্বাদ। তপ্ত কোমল ঠোঁট আমার জিভের প্রতিটি স্পর্শে অনুভব করছি একটা আকূতি আর যন্ত্রণা। দ্বিধা আমাকে গ্রাস করেনি। ব্যথাই আমাকে ব্যকুল করলো। এই যদি মহাপ্রস্থানের পথ হয়, তবে পিছনে রইলো আমার ইন্দ্রপ্রস্থ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামী ময়দান। আমি কুন্দনন্দিনীকে দু'হাতে আলিঙ্গন করলাম।

সিংঘিক থেকে আমাদের যাত্রাটা অশুভ হয়নি, কিন্তু দিনের আলো থাকতে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারলাম না। টুং নামক জায়গায় প্রথম আর এক সেতু পেলাম। ঝুলন্ত সেতু আমাদের তিস্তার অপর পারে নিয়ে গেল। সুগভীর নিচে তিস্তা তোড়ে নামছে না, অনেকটা ঝরনার মতো ধাপ ভেঙে ভেঙে নামছে। এ রূপটি নতুন। আমরা টুং সেতু হেঁটে পার হয়েছি। মনে হয়েছে শূন্যের ওপর দিয়ে ঢেউ খেতে খেতে চলেছি। সেতুর দুই পারে বেয়নেট ঝলকানো রাইফেল হাতে ভারতীয় জওয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে। টুং অতিক্রম করে, তাসিপাইক নামক জায়গায় আমাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য থামতে হলো। ওপর থেকে এগিয়ে এসেছে শতাধিক গাধা আর অশ্বতর বাহিনীর ক্যারাভান। ওপরের দিকে এগিয়ে উঠেছে সুদীর্ঘ এক 'শক্তিমান' ট্রাক কনভয়। আমাদের জোঙাকে অতএব, কনভয়ের পিছনে এক পাশে ঠাঁই নিতে হলো।

মেজর ঘোষালকে নামতেই হলো। শুনলাম, এ পথে এ রকম প্রায়ই হয়। গাধা আর অশ্বতর ক্যারাভান পাহাড়ীদের। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে নেমে আসছে। ভারতীয় জওয়ান বাহিনী চলেছে উত্তরের আরো অভ্যন্তরে। পথ এতই সরু, উভয় দলের পক্ষে পাশাপাশি যাওয়া আসা অসম্ভব। সর্বনাশীর গভীর খাদ পাতালে নেমে গিয়েছে। 'শক্তিমান' ট্রাক কনভয় নিশ্চল। চেষ্টা চললো, পশুগুলোকে একটি একটি করে সন্তর্পণে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে নিয়ে যাবার। প্রত্যেকটি পশুর পিঠেই মালের বোঝা।

চেষ্টা যখন সার্থক হলো, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। এখানে গাড়ির

হেডলাইট জ্বালানো নিষেধ। সীমান্তের ওপরে সদাসতর্ক চোখ এদিকে লক্ষ্য রাখছে। মাঝে মাঝে টর্চলাইট জেলে দেখে নিতে হচ্ছে। ফলে আমাদের গতি গেল অনেক কমে। অন্ধকারে শুনতে পাচ্ছি কেবল সর্বনাশীর প্রবল শব্দ। টুং-এর পরে সে সর্বদাই আমাদের পাশে পাশে। সামান্য একটু ফসকালেই তার গর্ভে।

অন্ধকারে আর একবার আমাদের জোড়া একটি ঝুলন্ত সেতু পার হলো। মেজর ঘোষাল ঘোষণা করলেন, 'এসে গিয়েছি। রাস্তার বাঁদিকেই বাংলো।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ জায়গার কী নাম?'

'ৎসুন্থান্। অনেকে উনথাংও বলে।' মেজর ঘোষাল বললেন, 'রোশেনলাল, গাড়ি জেরা খাড়া করো জী, টর্চ চমককে দেখ্ লেঙ্গে বাংলোকে নিশানা।'

গাড়ি দাঁড়ালো। মেজর পেছন দিয়ে নেমে জোনাকির মতো টিপ্ টিপ্ করে টর্চলাইট জ্বাললেন।

আমি বলে উঠলাম, 'ওই তো একটা বাড়ি, ওটাই কী?'

টর্চের আলো এক মুহূর্তের জন্য সেই বাড়ির ওপর পড়লো। মেজর ঘোষাল রোশেনলালকে বললেন, 'মেরা পিছা কর, ধীরে সে।'

বাংলোর চত্বরে গাড়ি দাঁড়াতেই দু-তিনজন লোক এগিয়ে এলো। ঘরের ভিতর হ্যারিকেনের আলো জেলে দিল। আমার কোলের ওপরেই কুন্দনন্দিনী অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে জাগিয়ে তুলে নামলাম। দুঃসহ শীত, দাঁতে দাঁত ঠকঠক করছে। আর পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপছে। তিস্তা এখানে কোথায় দেখতে পাচ্ছি না, শব্দ বাজছে যেন বিশাল এক জলপ্রপাতের।

মেজর ঘোষাল বললেন, 'আজ আর কিছু দেখতে পাবেন না, কাল সকালে দেখবেন। আজ এখন খেয়েই শুয়ে পড়া। যতোক্ষণ রান্না না হয় ততোক্ষণ একটু গা গরম করতে হবে।'

ব্যবস্থাও হলো। শোবার ঘর মাত্র একটি, খাটে দু'জন শোয়া যায়। ড্রয়িং রুমটা অবিশ্যি বড়, শোফাসেটও আছে। স্থির হলো কুন্দনন্দিনী আর মিসেস সিপ্পি খাটে শোবেন। আমরা সবাই কম্বল মুড়ি দিয়ে শোফার ওপরে। কর্নেলের অবস্থা মোটেই ভালো না। তিনি তারপরেও অনেকবার বমি করেছেন।

একটি মাত্র টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো ঘরের মধ্যে একটি লালচে আভায় ছড়িয়ে আছে। ফায়ার প্লেসের আগুনের শিখা ঘরের দেওয়ালে এবং আমাদের গায়ে কাঁপছে। আমাদের অতিকায় ছায়াগুলোর আকৃতি কিস্তৃত। কিছুক্ষ

হ্যারিকেনের আলো থেকে আগুনের আলোই বেশি। মেজর ঘোষালের গা গরম করা কেবল আগুনে না, বোতলের তরল আগুনেও বটে। আমার কাছেও এখন আর কালো বেড়ালকে নিতান্ত নেশার দ্রব্য মনে হলো না। ক্লান্তি আর শীত, দুয়ের জন্যই দরকার।

আমরা ড্রয়িংরুমে আগুন ঘিরে বসলেও, কর্নেল সমস্ত ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিয়ে, শোবার ঘরের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। শোবার ঘরেও ফায়ার প্লেস ছিল, আগুন দেওয়া হয়েছিল সেখানেও। কর্নেল সাহেবকে বলার কিছু নেই। চোখের কোল বসে, তাঁর মুখের চেহারা অবর্ণনীয়। মিসেস সিপ্‌পি গাংগ্রিলায় চুমুক দিয়ে, আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু সলজ্জ হাসলেন, বললেন, 'কর্নেল তো আগেই বিছানা নিয়ে নিলেন।'

মেজর ঘোষাল বললেন, 'আপনিও ও ঘরেই শোবেন। আমরা তিনজন এ ঘরে ব্যবস্থা করে নেবো।'

মিসেস সিপ্‌পি কুন্দনন্দিনীর দিকে তাকালেন। কুন্দনন্দিনী সোফার পিঠে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজেছিলেন। আমি তাঁর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর পানের মাত্রা এখন কম। তিনি ক্লান্ত, না কালো বেড়ালের থাবাগ্রস্ত, বুঝতে পারছি না। অথবা ক্ষুধায় কাতর? এখন বরং মিসেস সিপ্‌পি তাঁর পানের মাত্রা বাড়িয়েছেন। কুন্দনন্দিনীর দিক থেকে তিনি আমার দিকে মুখ ফেরালেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি, নাকের অলংকার চিক্‌চিক্ করছে। তারপরে মেজরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা তিনজন কেমন করে এ ঘরে শোবেন?'

মেজর বললেন, 'একটা রাত্রের তো ব্যাপার। কেটে যাবে।'

মিসেস সিপ্‌পি বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমার তো খুব থ্রিলিং লাগছে। কর্নেলই সব মাটি করলেন।' বলে হেসে উঠলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কি এই বাংলো ছাড়া, আর কোনো বসতি নেই?'

মেজর বললেন, 'আছে। তিব্বতী রিফিউজিদের একটা মনাস্ট্রি আছে, আর সামান্য কয়েক ঘরের বাস। এখানকার মনাস্ট্রিতে দশ বারো বছরের বালক লামাও আছে। ভগবান বুদ্ধের কাছে যারা জীবন উৎসর্গ করেছে।'

মেজর মিসেস সিপ্‌পির জন্যই ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। মিসেস সিপ্‌পি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা যখন বড় হবে, তখন কি বিয়ে করতে পারবে?'

মেজর বললেন, 'সম্ভবত না। তবে এই সব মঠে সমকামীতা একটা সাধারণ ব্যাপার। তেমন গোপনীয়তা নেই।'

মিসেস সিপ্‌পি হেসে উঠে খাস ভাষায় বলে উঠলেন, 'লণ্ডাবাজী?'

মেজর বললেন, 'একেবারেই না। আমাদের সভ্যতায় সেটা যেমন সেজে-গুজে ব্যবসার বিষয়, এখানে সে রকম মোটেই না। এর জন্য কেউ তাদের দাড়ি কামায় না, গালে রঙও মাথে না, আর তা নিয়ে কোনো রকম খারাপ আলোচনাও হয় না। কেউ তার জন্য লজ্জিতও না।'

এই সময়ে কুন্দনন্দিনী হঠাৎ মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এখন শুতে চাই।'

দেখলাম, তাঁর চোখ আরক্ত, মুখে ও কথার স্বরে বিরক্তি ও অসন্তোষ। আমাকেই কথাটা বলার জন্য অবাক হলাম। মেজর তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, 'আমি এখুনি দেখে আসছি, খাবার হলো কী না।' বলে তিনি বন্ধ দরজা খুলে বাইরে গেলেন।

কুন্দনন্দিনীর মুখ একপাশে এলিয়ে পড়লো, কিন্তু চোখের কোণে তিনি আমার দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি অস্বস্তি বোধ করে, মুখ ফেরাবার আগেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মহাভারত পড়েছ?'

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক, আমি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। তিনি আবার বলে উঠলেন, 'তোমার কোনো ধর্মবোধ নেই, যতোই তোমার ইটারনিটির মন থাকুক।' বলেই তিনি সোফার পিঠে মুখ গুঁজে দিলেন।

আমি বিভ্রান্ত চোখ তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে, মিসেস সিপ্‌পির দিকে তাকালাম। তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি কী বুঝেছেন, জানি না, তেমনিই ঠোঁটের কোণে হাসলেন। আর এই মুহূর্তেই হ্যারিকেনটা দপ্‌ দপ্‌ করে নিভে গেল। আগুনের শিখাও এখন কম। ঘরের মধ্যে একটা তাম্রাভ অন্ধকার নেমে এলো। মেজর ঘোষালও এই সময়েই বলতে বলতে ঢুকলেন, 'খাবার রেডি। কী হলো? হ্যারিকেনটা নিভে গেল?'

বলে তিনি নিজেই ডাইনিং টেবলের ওপরে রাখা হ্যারিকেন ধরে ঝাঁকুনি দিলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম, তাই, তেল শেষ।'

আমি বললাম, 'তেল ভরতে হবে।'

'কেরোসিন তেল কোথায় মশাই?' মেজর বললেন, 'কেরোসিন এ সব অঞ্চলে সোনার চেয়ে দামী। কেউ ব্যবহার করতে পারে না। ইয়াকের চর্বির তেল ছাড়া, কেউ বাতি জ্বালে না। মন্দিরেই হোক, আর ঘরেই হোক। এবার

আমাদেরও সেই চর্বীর প্রদীপ জ্বালাতে হবে।' তিনি আবার দরজার কাছে গিয়ে, পাল্লা খুলে চিৎকার করে কিছু বললেন। একটু পরেই চর্বির প্রদীপ এসে গেল, যার গন্ধ আলাদা। খাবারও এসে গেল। গরম ভাত আর মুরগীর মাংস। মাংস রান্না না বলে, এক রকম সিদ্ধ বলা যায়। কিন্তু কুন্দনন্দিনীকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। তিনি কম্বল চেয়ে নিয়ে, লম্বা শোফার ওপর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

মিথ্যা বলবো না, কুন্দনন্দিনির জন্য, ক্ষুধার খাদ্য আমি পূর্ণ ভোগ করতে পারলাম না। বারেবারেই মনে পড়তে লাগলো, 'তোমার কোনো ধর্মবোধ নেই।' কথাটা হেসে বললে, আমার কিছু মনে হতো না। কিন্তু তিনি অনেকটা ধিক্কারের স্বরে গম্ভীর ভাবে কথাটা বলেছেন।

খাবার পরে, ডাইনিং টেবল পরিষ্কার করে, তার ওপরে মেজর কম্বল মুড়ি দিলেন। মিসেস সিপ্‌পি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। আমি দুটো শোফা জোড়া লাগিয়ে, কম্বলের মধ্যে নিজেকে কেন্নোর মতো পাকিয়ে ফেললাম।

আমার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন অন্ধকার। আগুন নিভে গিয়েছে। দুটো কম্বল ও সোয়েটার গায়ে থাকা সত্ত্বেও শীত বোধ করছি। কিন্তু আমি পা নামাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। মনে হলো পায়ের কাছেই কেউ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আমি নিচু হয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই আমার হাতে রুক্ষ নরম চুলের গোছা ঠেকলো। কুন্দনন্দিনী! কার্পেট পাতা আছে বটে, তা বলে এই মেঝেয়? আমি তাঁকে ঠেলে আস্তে ডাকলাম, 'কুন্দনন্দিনী।'

কুন্দনন্দিনী একটি হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুর কাছে চেপে ধরলেন, এবং পরিপূর্ণ জাগ্রত স্বরে বললেন, 'নন্দিনী তো নয়, কুন্দ বলেছ তুমি আমাকে।'

'কিন্তু এটা ঠিক হয়নি। শোফায় ওঠা উচিত।'

'এই বেশ আছি। তুমি বরং আমার কাছে এসো।'

আমি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি জেগেছিলেন?'

তিনি বললেন, 'ঘুম আসছে না।'

তাঁর ধর্মবোধের কথা আমার আবার মনে পড়লো।

আমি অন্ধকার ঘরে ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকালাম। মেজরের ঘুমন্ত নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে। আমি শোফা থেকে নামলাম। কুন্দনন্দিনীর কম্বলশুদ্ধ শরীর দু'হাতে টেনে তুলে বললাম, 'ওঠো।'

ও জোর করলো না। আমি প্রায় আন্দাজেই লম্বা শোফায় নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দিলাম। ভালো করে ঢেকে দিয়ে বললাম, 'ঘুমোও।'

ও আমার হাত টেনে ধরলো। অনেকটা সরে গিয়ে আমাকে টেনে বসালো। আমি কি এখন তুষার সিংহের পদতলে? সর্বনাশীর আঁতুড়ঘর আর কতো দূর? কুন্দনন্দিনী আমার গায়ের ওপর কম্বল তুলে দিল। আমি তার তপ্ত নিশ্বাসের মধ্যে নিচু স্বরে শুনতে পেলাম, 'ঘুমোও। আমাকে ঘুমোতে দাও।'

সর্বনাশীর প্রপাত ধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।

আবার যখন আমার ঘুম ভাঙলো, কাঁচের জানলার পর্দার ঈষৎ ফাঁকে দিনের আবছা আলো দেখতে পেলাম। আমি সন্তর্পণে কুন্দনন্দিনীর কম্বল থেকে বেরিয়ে এলাম। মোজা পরাই ছিল। জুতো পায়ে দিলাম। সকলেই ঘুমোচ্ছেন। আমি নিশব্দে পা টিপে টিপে দরজা খুলে বাইরে গেলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো একটি বৌদ্ধ মঠ আর পবিত্র ধ্বজা। আকাশটা যেন শাদা মেঘে আচ্ছন্ন।

বারান্দা থেকে নেমে রাস্তার ওপরে গেলাম। কোথাও একটি জনমানুষ চোখে পড়ছে না। আমাকে টানছে সেই প্রবল জলপ্রপাতের শব্দ। আমি আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে গেলাম। বাঁদিকে একটা লাল ক্রশ চিহ্ন দেওয়া কুটির চোখে পড়ল। বোধ হয় ডিনপেন্সারি। আরো নিচে নেমে কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়লো। সবই বন্ধ। তার পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা নেমে গিয়েছে। শব্দটা কি এদিকেই? নেমে গেলাম, আর তৎক্ষণাৎ আমার চোখের সামনে দূরের আকাশ জেগে উঠলো। আবার সেই বিশাল ঠাকুরদালানের নিচে তুষারের বিশাল উঠোন। এবার অতি নিকটে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। পশ্চিমের পাহাড়ের কোলে বিশাল এক শাদা আর নীল জলের স্রোত, গভীর নিচে ঝরে পড়েছে। বিশাল এক জলপ্রপাত। কোনো জলপ্রপাতের কথা তো শুনিনি।

আমি আবার সেই তুষারের শৃঙ্গের দিকে তাকালাম, বিশাল মাথা উঁচু বিগ্রহ সকল। তাদের সর্বাঙ্গ এখন ধূসর। কিন্তু দেখতে দেখতেই একপাশে লালের আভা পড়লো। দ্রুত রঙ বদলাতে লাগলো। সহসা আমার বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠলো। আমার চোখের সামনে বিশাল এক সিংহমূর্তি।

পান্না সবুজ কেশর ফোলানো। সামনের দুই পায়ের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনের দুই পায়ের ওপর শরীরের ভার। বুকের তলে সুগভীর নীল। পিঙ্গল দুই চোখে এদিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি বৌদ্ধ নই। সেই অর্থে হিন্দুই কী? জানি না। আমার দুই করজোড় আপনিই কপালে উঠে গেল। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে। আমার ভিতর থেকে যেন কেউ আর্তস্বরে বলে উঠলো, 'ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো।' কুন্দনন্দিনীর মুখ একবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

'কখন এলেন?' মেজর ঘোষাল আমার পাশ থেকে বলে উঠলেন।

আমি চমকিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, 'আমাদের চারদিকেই এখন তুষারগিরি।'

বললাম, 'আমি তুষার সিংহকে দেখতে পাচ্ছি।'

মেজর অবাক চোখে তাকালেন, বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ওই যে জলপ্রপাত দেখছেন, ওই হলো তিস্তা। তিস্তা ওখান থেকেই প্রথম নিচে নেমেছে। যতোই ওপরে যাবেন, কেবল তুষার আর বরফ। তিস্তা আছে সেইখানে কিন্তু আসল অবতরণিকা এটাই।'

এই তাহলে সেই জায়গা, যেখান থেকে সে সমতলে রণে যাত্রা করেছে। এই তার আঁতুড়ঘর। সমস্ত তুষারাবৃত পাহাড়ই তার জন্মভূমি। বহু দিনের সাধ। খাজাঞ্চিখানা দেখবো। সুখ সম্পদ মোক্ষ দর্শন এবং লাভ।

তুষার সিংহ রৌদ্রের স্পর্শে আরো যেন প্রকাণ্ড হয়ে উঠছেন। চোখ ফেরাতে পারছি না। আমার পাশে এসে দাঁড়ালো কুন্দনন্দিনী। সারা গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। আলুথালু চুল। পায়ে জুতো। পাগলিনী, নাকি সর্বনাশী?

হঠাৎ ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে উঠলো, তার সঙ্গে শঙ্খের গভীর নাদের মতো বিলম্বিত শব্দ। মনে হলো, বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে। কুন্দনন্দিনী আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমি তুষার সিংহের দিকে তাকালাম। মনে হলো, তাঁর মুখ লাল আর নীলে মেশানো। পান্না-কেশর উড়ছে। সর্বনাশীর রঙও মুহূর্তে বদলিয়ে যাচ্ছে।

ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং। শিঙার গম্ভীর ধ্বনিতে ডাক শোনা যাচ্ছে। চলো, আপন পতিত জমিনের আবাদে। মানবদের ডাক পড়েছে। 'ওহে, গরীব আমার প্রাণ!'

তার ডাক শুনেছি অনেক দিন। এমন না যে, সে ডাক আমার শ্রবণ চমকে দিয়ে, চকিত করে তুলেছে। আমার নিত্য দিনের নানা কাজের মধ্যে নানানখানা অকাজের শিথিল আলস্যের মুহূর্তগুলোতে, তার ডাক বেজেছে। শুনেছি। উৎকর্ণ হইনি। শুনেছি। চকিত হয়ে উঠিনি। অনেক শব্দের মধ্যে, সেই ডাকের ধ্বনি, তার আপন স্বরে সুরে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। চেনা দেয়নি। অচিন সুরে ডাক দিয়েছে। তবু দিয়েছে বারে বারে। আর আমি ছিলাম যেন স্বপ্নের ঘোরে। সে ডাক দিয়ে যায়, আমি শুনে যাই। বলতে গেলে, এমন বলতে হয়, কে যে কাকে ডাকছে, সে চেতন ছিল না।

আবার তাও বলি, দেখেছি তার হাতছানিও। অথচ তাকে চোখে দেখিনি। নিজের মধ্যে কী রহস্য বুঝি না। হেসে বলতে ইচ্ছা করে, পাগল নাকি হে! না কি মাতালের প্রলাপ! বাঁশি শুনেছি, তাকে চোখে দেখা যায়নি, এমন মন্ত্র-বিভোর কথার তবু মানে বোঝা যায়। ডাক শুনলে অচিন সুরে, কিন্তু কে যে কাকে ডাকছে, জানতে পারলে না। ডাক বেজে ফিরেছে তার আপন মনে। তোমাকে চকিত করেনি। তারপরে দেখেছ তার হাতছানি; অথচ তাকে চোখে দেখনি। একি পোড়া চক্ষের ধন্দ। তাই প্রলাপে বাজো।

কথাটা আসলে তা না। কিন্তু আসলে তা-ই।

লগ্ন বলে একটা কথা আছে। আছে, কি নেই? কেউ বলতে পারবে না, নেই। সব কিছুরই, একটা সময় আছে। কিলিয়ে কি আর কাঁঠাল পাকাতে পার? তার শক্ত জান নরম করতে পার। কিন্তু রস পাবে না, মিঠা তো বহুত দূর। রস টসটস ফলটি কারোর মুখের কথায়, জাদুকরের ভোজবাজীতে রসালো হয় না। কুঁড়ি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল। তারপরেও সেই ছোট্ট কচি কাঁচা ফলটি দিনে দিনে বাড়ে, রস টেনে টসটসে রসালো হয়। যা হয়, তা সময়ে হয়। বলব না যে, সব যন্ত্রের নিয়মে বাঁধা। ওটা মানুষের তৈরি কথা। জীবনের সঙ্গে, যন্ত্রের কোনো কথা নেই। কিন্তু এমন আমাদের

জীবনের ছক, যে যন্ত্র আমরা বানালাম, সে কিনা আমাদের যান্ত্রিক করে তুলল। প্রকৃতি যন্ত্র না। মানুষও যন্ত্র না। ঋতুর আবর্তে, প্রকৃতিকে মনে হয় বটে, সে বুঝি একটা ধারা-বাঁধা নিয়মে চলছে। বুদ্ধিতে শান দেওয়া মানুষের বড় দেমাক। তাই প্রকৃতিকেও তারা বন্দিনী বলতে চায়। যেমন কি না বলে, 'প্রকৃতিকে জয় করবে মানুষ।' শিশুর আবোল-তাবোল বলে কানে বাজে। ইচ্ছা করে, সুকুমার রায় মশাইকে ডেকে বলি, ওগো মশাই, এসব বিজ্ঞানীদের কচকচি নিয়ে, স্বর্গ থেকে নতুন একটা আবোল-তাবোল লিখে পাঠান। বলে দিন এসব মতলববাজদের, অকারণ মানুষকে যেন গোঁয়ার করে না তোলে। মানুষ তার নিজের ক্ষমতার ওপর যেন আস্থাবান থাকে, ভৌতিক শক্তির বলে লাফালাফি না করে। প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। চাঁদের বুকে জুজু-পায়ে হাঁটিলেও না। প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে লেনা-দেনা ছাড়া, সম্পর্ক অচল। প্রকৃতির রসদ দিয়েই, প্রকৃতিকে তিলে তিলে আবিষ্কার করা যায়। আবিষ্কার, জয় না।

কিন্তু এসব বিতর্কের স্রোতে আমি কেন। তর্কের কি শেষ আছে। ও বড় কূট-কচালে বিষয়। আমি না হব তর্কতীর্থ, তর্ক-চূড়ামণি। ওসব থাকুক গিয়ে ন্যায়শাস্ত্রের কচকচিতে। বলে দাও, বিশ্বাসে বস্তু মেলে, তর্কে না। তবে কি না, নিজেকে তো আর সব সময় দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। সকলের সঙ্গে থেকে, সকলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কচকচি না করতে পারলে, নিজেকে দশের এক বলে চেনা যায় না। তখন মেজাজ চাড়া দিয়ে ওঠে বৈকি। কেন মিছামিছি মানুষকে রাবণ বানানো। তার চেয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো, প্রকৃতির মুণ্ডু ধরে টানাটানি করা যায় না। মানুষ প্রকৃতির থেকে বড় না। প্রকৃতিরও এমন কোনো জেদ নেই, নিজেকে সে মানুষের থেকে বড় বলে প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। সে চলেছে তার আপন চালে। মানুষ তার আপনাতে। লেনা-দেনা দু'জনাতে।

তা থাক গিয়ে সে কথা। কথা তো ছিল, লগ্ন নিয়ে। সময় বলে কথা। সময় না হলে, কিছু হয় না। তার মধ্যে একটু যোগ ছিল, সময় হওয়াটা যান্ত্রিক না। একটা নিয়ম আছে বটে। তাও বলি, বিষয় ও কারণে, নিয়ম তার আপন চালেই চলে। সবখানে সে একটা ছকে চলে না।

এত কথারই বা কী দরকার। কথা ছিল ডাকের। কথা ছিল হাতছানির। তার ডাক শুনেছি, অথচ চিনতে পারিনি, চকিত হইনি। দেখেছি তার হাতছানি, তবু কিনা, তাকে দেখতে পাইনি। এখন বল, তুমি বজ্রযানী বৌদ্ধ

না, বাউলও না। তুমি তোমার তত্ত্বকথা গূঢ় ভাষায় ভাসো না। তোমার কথা লোকে শোনে একরকম, অথচ তুমি বল অন্য কথা। পণ্ডিতে বলেছেন একে বলে সন্ধ্যা ভাষা। সন্ধ্যার আবার ভাষা কী? কী আবার। সন্ধ্যা তো সন্ধ্যাই। দিন না, রাত্রিও না। দিনের ভাষা দিনের মতো স্বচ্ছ। রাত্রের মতো অন্ধকার। আর সন্ধ্যার ভাষা সন্ধ্যার মতো। পুরো আলো নেই। পূর্ণ অন্ধকারও নেই। ছায়া ছায়া, অস্পষ্ট। দেখা যায়, তবু দেখা যায় না। চেনা যায়, তবু চেনা যায় না। ছায়ার মতো একটি মানুষ চলে যায়, কিন্তু তাকে চেনা যায় না। চর্যাপদ আর বাউল গানও সেই রকম। তুমি শুনছ গান, মানুষের ছায়া দেখার মতো। গায়ক বলছে তার তত্ত্ব, যা তোমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বোঝদার পণ্ডিত তোমাকে শুধু এইটুকু বলতে পারেন, 'ইহার অর্থ পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না। বলিতে গেলে বড় অশ্লীল হইয়া পড়ে, ইত্যাদি।'…

একজনের তত্ত্বকথা, আর একজনের কাছে অশ্লীল। তা হলেই বুঝ হে, মানুষ কত বিপরীত রীতিতে চলে। তবে এই বিষয়ে দুয়ারে কাঁটা। মুখে আমার কলুপ, এ তর্কে যাব না।

তবে আমার কথা গূঢ় ভাষা না। যাকে বলে সন্ধ্যা ভাষা। আমার ভাষা দিনের ভাষা। দিনের আলোর মতন স্বচ্ছ। ডাক শুনেছি, তবু যে শ্রবণ চমকে চকিত হইনি, হাতছানি দেখেছি, তবু যে তাকে দেখতে পাইনি, তার কারণ তো আর কিছু না, তার কারণ, সময় হয়নি। সেই লগ্নটি আসেনি। ঠিক ঘণ্টাটি বাজেনি। তাই যে ডাক আমি শুনেছি, সে ডাক আমার, নানা কাজ অকাজের মাঝে রোজ ফিরেছে। বলতে পার, ঘুমের ঘোরে ডাক শোনার মতো। শুনেছি, স্বর চিনতে পারিনি। কথা বুঝতে পারিনি। হাতছানিটাও সেই রকমের। হঠাৎ কোনো এক দুপুরের উতলা বাতাসে, সহসা পাখির ডাকে, অথবা এক জলাশয়ের ধারে বিশাল মহীরুহের ছায়ায়, আমি যেন কার হাতছানি দেখতে পেয়েছি। অথচ কার হাতছানি, তা দেখতে পাইনি।

পাওয়া যায় না। '…আমার সময় হয় নাই? ফিরে ফিরে গেলে চলে তাই।'…আর এখন দেখ, আমার শ্রবণ চকিত, ডাক তার স্পষ্ট। ডাক শুনতে পাচ্ছি এই ফাল্গুনের পাতা ঝরার শব্দে। ফুল যখন ডালে ডালে। মৌমাছিরা গুঞ্জরে। ডাক শোনা যাচ্ছে, দূর নীল পাহাড় থেকে, সবুজ বনের গভীর থেকে। হাতছানি স্পষ্ট, এই তো তার রূপের ছায়া ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে, যে মৃত্তিকা রঙ ফেরাল, বন্ধুর

হল। সোনারঙ বালি আর পাথরের কূল ভাসিয়ে, এক দিকের নদী যেখানে নাম নিল সুবর্ণরেখা। আর একদিকের নদী কলকলিয়ে বলল, 'আমি কোয়েল!' পাহাড়ের বুক থেকে নেমে, পাথর ভাসিয়ে চলি গভীর অরণ্যে। শুধু কোয়েল না। কুলকুল ঝিরঝির করে কেবল পাক খেয়ে নামে আর নামে, বনের ছায়ায়, যেন লুকোচুরি খেলে পাহাড় বনের সঙ্গে, নাম তার কোয়েলা। হাতছানির আরো স্পষ্ট রূপ যদি দেখতে চাও, তবে দেখো না, সেইসব বনবালাদের। যারা হাসে নাচে, গানে কাজে বাজে। সঙ্গে বনের মানবকুল। রূপ আর শব্দ, হাতছানি আর ডাক, সব সেখান থেকে। ভূগোলের হিসাব যদি চাও, তা হলে চেয়ে দেখো, বাংলার ভূপ্রকৃতির দক্ষিণ-পশ্চিমে। উত্তরের টানও থাকবে। নাম কি স্থানের? ছোটনাগপুর? পাশ ঘেঁষে, উড়িষ্যা প্রদেশের গায়ে ঢলে পড়া? তবে তাই। চলো, ডাক এসেছে সেই নীলপাহাড় থেকে, সবুজ বন থেকে, ইস্পাতরঙ নদী-নির্ঝর থেকে, নানারঙ ফুল পাখি পতঙ্গ প্রজাপতির কাছ থেকে।

সময় হয়েছে, তাই চকিত মন, বিবাগী খুশির ঘরছাড়া ডানায় বেগ পেয়েছে। চল যাই বনে। কেবল এইটুকু বললেই কি হয়। এ ঘরছাড়া বনের ডাক কি, বনভোজনের ডাক। না, এমন করে ভাবতে ইচ্ছা করে না। ভোজন একরকম বলতে পার। সব স্বাদ আস্বাদন কেবল মুখে না। জিভ দিয়ে চেখে, রস তারিয়ে, একেবারে জঠরে! এক কথায় ভোজন বললে, তা-ই বোঝায়। কিন্তু এমন ভোজনও তো ঘটে, যখন জঠরজ্বালা জ্বলে না। জিভ স্থূল স্বাদের কথা ভুলে যায়। অথচ প্রাণভরা ক্ষুধা। বড় ক্ষুধা, ক্ষুধার হাহাকার। তখনো কিন্তু প্রাণভরে কথাটা সেই, 'খাই খাই'। কী খেলে প্রাণ ভরে, সেই আহারের ভাবনা।

এবার বনের ডাক সেই প্রাণ ভরানোর ভোজনের ডাক। বনভোজন নয়। বনভোজন। কথাটা এল কোথা থেকে? কথাটা তৈরি করেছে মানুষ, উৎসবের আনন্দটাও মানুষের ভোগের। চড়ুইভাতি কথাটা যেন কানের কাছে ঝংকার দিচ্ছে। বনভোজনের সঙ্গে চড়ুইভাতির কোথায় একটা মিল আছে। চড়ুই-ভাতিও বনভোজন। চড়ুইদের বনভোজন। কত দিন কত মাঠের পথ ধরে যেতে গিয়ে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সেই যে নীল আকাশের বুকের ওপর, পশ্চিমের ছটা লাগা লম্বা সোনালী দাগের গা ঘেঁষে, হঠাৎ একটা ঝলকের মতো তাদের দেখতে পেয়েছি বলা যায় না, দেখতে না দেখতেই, যেন মন্ত্রবলে ছিটিয়ে, শতে না হাজারে, কে জানে, ঝুপঝাপ

ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেখানে খানিক বন, খানিক মাঠ। তখন ডাকাডাকি নেই। অন্য সময় যেমন মল ঝমঝমানো বাজনার মতো ঝমঝমিয়ে বাজে। এমন কি চক্ষেও দেখতে পাবে না। কেন না, তখন ভোজন হচ্ছে। চড়ুইদের চড়ুইভাতি কয়েক পলক পড়েছে কি না পড়েছে, তারপরেই আবার দেখ, মাঠ বন ছাপিয়ে, আকাশে ঝিলিক হেনে, উধাও হল কোথায়।

এই চড়ুইভাতির ভোজন দেখে কি মানুষ বলল, চল আমরা বনভোজনে যাই। চড়ুই হয়ে, চড়ুইভাতি করি গিয়ে। দেওয়াল ঘেরা মাথা ঢাকা ঘরের মধ্যে, স্থায়ী আখাতে আগুন দিয়ে, অন্ন-ব্যঞ্জন পাক তো রোজই আছে। গোছগাছ পোছপাছ করে, নেটোপেটো হয়ে ভোজন তো দুই বেলা। একদিন কেন পাখি হই না? বনে যখন পাতা ঝরে, মাঠ যখন ফসলের দায়মুক্ত, উত্তরায়ণের রৌদ্রতাপে রক্তে যখন সুখের উত্তাপ, আকাশ নীল হল আরো, আর কনকনিয়ে বাতাস আসে হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে, তখন পাখি হয়ে চল যাই বনে। কুটোকাটি পাতা ঝাঁরি, যা-পাই, তা-ই জ্বালি। সংগ্রহের কোনো তরিবত নেই, ঘর বাজার থেকে যা জুটেছে, তাই নিয়ে এসেছি। জল আছে ওই দেখ, তুমি পাখি হয়েছ, বনের পাখিরাও এসেছে। পিছনে পিছনে গাঁয়ের পাহারাদাররাও এসে দিব্যি ল্যাজ নাড়াচ্ছে। গোড়া থেকেই নিজেদের মধ্যে রেষারেষি। পাত চাটাচাটিতে ব্যস্ত করো না। কামড়া-কামড়ি হয়ে যাবে কিন্তু।

প্রকৃতির ধন, প্রকৃতির সঙ্গে মিলতে চায়। তাই পাখি হয়ে বনভোজন। তা যদি বলি, তবে মেলা কাকে বলে? সেও তো বনভোজনের আর এক রূপ। আজকের জগাখিচুড়ি বে-রঙা মেলাগুলোর কথা বলছি না। সেই যাকে বলত, 'পল্লী বাংলার মেলা' তার কথা বলছি। তার সঙ্গেও কি বনভোজনের কোনো যোগ ছিল? অন্য কথাও মনে থাকে। হেমন্তে শীতে বসন্তে, সেই সব মেলা, অন্য পণ্য শিল্পসামগ্রীর লেনাদেনার হাটও বটে। উপলক্ষ প্রায় ক্ষেত্রেই ধর্মীয়। হয়তো শরণোৎসব, দ্বারকোৎসব, অথবা কোনো পার্বন বা তিথি উৎসব। কিন্তু ঘরে বসে না, বাইরে, বনে আর মাঠে। এখন না হয়, মেলার ডাক শুনলে, অন্নব্যঞ্জনওয়ালারা তাদের হাতা হাঁড়ি খোন্তা বেড়ি নিয়ে ছুটে আসে। তাঁবু খাটায়, না তো চালা বাঁধে, গায়ে একটা লিখন লটকে দেয়, 'অমুক হিন্দু হোটেল' অথবা 'জয় মোরশেদ হোটেলখানা'। কিন্তু মেলার আদিকালে এই সব শহুরে পাচক রসুইওয়ালাদের কারবার ছিল না।

মেলা এখন বনভোজনের আসর। যেমন কী না, উপলক্ষ করে এলে, গুরু

জয়দেবের মেলায়, দু'দিন রইলে থাকলে ঘুরলে বেড়ালে, কেনাকাটা করলে কাস্তেটা হাতুড়িটা ঘুনিপাতাটা জলসেঁচাটা, মায় দরকার পড়লে ঢেঁকি দরজা জানলার পাল্লা, কিন্তু তার মধ্যে অজয়ের বালিচরে কাঠ পাতা জালিয়ে র [illegible] খেলে, মন মস্তরের গান শুনলে, সেটা কিছু কম না। বনভোজনটা আরো বড় কথা। বনভোজনের মানত করতে হয় যে। কেমন? না, ঠাকুর আসছে বছর যদি তোমার কৃপা হয়, তবে তোমার থানে এসে বসত করব দিন সাত, তোমার সেবা করব, রেঁধে বেড়ে খাব। মানতে ঘাট রাখব না ঠাকুর, সাকুল্যে হাঁটা পথে আর মোটরবাসে তিন কুড়ি বারো মাইল রাস্তা, তোমার রাস্তা, তোমার নাম করে হেঁটে আসব।

কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সত্যি কঠিন কী? নিজের চোখে দেখেছি যে। সারা গায়ে মাথায় পায়ে ধুলা মেখে, মানতের যাত্রীরা এল মেলার থানে। ক্লান্তি আছে, ক্লেশ কোথায় হে। এসে যে পৌছনো গেল তাইতে প্রাণ ভরা। তারপরে দেখ, ধুলা ধুয়ে নিয়ে, গাছতলা ঝাঁট পাট দিয়ে নিকিয়ে, কলাপাতায় কেমন ফালা ফালা করে বঁটিতে বেগুন কেটে সাজিয়েছে। শাকপাতা কুচিয়ে জড়ো করেছে। মাটি খুঁড়ে, ঢ্যালা সাজানো চুলায়, হাঁড়িতে বগ্‌বগ করে ডালে চালে কথা কয়। নাকে একবার বাস নিয়ে দেখ। মহাপ্রাণী উদ্দীপ্ত হবে। তার মধ্যেই বা শুনতে পাবে, পাশে বসে কে যেন কোন দূরে চলে গিয়েছে, সুর করে বলছে, 'ও পাখি, কখন এলি, ভোজন করলি, আমার ভজন হল না…।' অন্য দিকে বা কার ভেজা চুল পিঠে এলিয়ে পড়েছে, অধরা বুকের আঁচল কাজের বাগে বেসামাল, তার মধ্যেই ধরতাই, 'তারপরেতে তিনি যখন পুকুরের জল থেকে ডুব দিয়ে উঠলেন, ওম্মা! কোথায় সেই গায়ের ঘা পাঁচড়া। কোথায় বা সেই বোজা চোখ। দিব্যি দুটি বড় বড় চোখ, কালো কুচকুচে তারা, চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে সেই অ-বোলা মানুষ চিরজন্মো যে বোবা, সে ডাক দিয়ে উঠল, "জয় গুরু।" শুনে সকলের গায়ে যেমন কাঁটা দেয়, তেমনি আনন্দে ভেসে যায়। সেই থেকে…।'

গাছতলায় রান্না, গান, গুরুর জীবনকথা—একে বলে বনভোজন। যে উপলক্ষে, যে নামেই বল, আসলে তো ঘর ছেড়ে প্রকৃতির কাছে যাওয়া। প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একটু থাকা। চড়ুইয়ের কাছেই শিখে থাক, আর যার কাছ থেকেই পেয়ে থাক। আজকাল বনভোজনের নয়া নাম কী? ফিস্‌টি! বিদ্রূপ করে যে হাসব, তাও পারি না। গা জলে যায়? তাও না। লজ্জা করে। যে সমাজে বাস করি, সে সমাজে আত্মগোপন করে থাকা যায় না। মনে

মনে থাকতে হয়। মনে মনেই থাকি। ফিস্টি যাত্রার ছবিটা দেখেছ? নাচন-কোঁদনে কোনো ব্যজ দেখি না। একটু গান বাজনা গাল গল্প জমবে না, তা হয় না। শোকযাত্রায় তো বেরোয়নি কেউ। কিন্তু মাত্রা রাখবি তো রে ভাই। একটা অচিন মেয়েকে জীবনে কোনো দিন হাসাতে পারলি না, আওয়াজ দিয়ে খেউড় করলি। জীবনে কোনো দিন জানতে পারলি না, সংসারে সকলেরই দু-কুল ভরা হাসি আছে রাশি রাশি। বাজাতে না জানলে তা বাজে না। কিন্তু বাজতেই চায়। তুই না শিখলি বাজাতে, না পারলি বাজাতে. নিজের অপমানবোধটা গেল মরে, আর হাসির বদলে কেবল ধিক্কার, কথাটা অবিশ্যি একতরফা না। নিজেদের সম্পর্কে দাবি যাদের 'শ্রীময়ী' কথাটা তাদের কাছেও। এর মধ্যে জাল-জটিল কিছু নেই। তোমার খুশি খেয়ালের ঐশিয্যিটিকে মুদ্গার করে, পরের মাথায় মারা কেন। নিজের মধ্যে নিজেরা থাক। কিন্তু নামেই যে গলদ লাগে। ফিস্টি! শুনলেই যে ধ্বনি আর চিত্রটি মনে আসে, বড় ভয় ধরানো।

কিন্তু ব্যাপার কি। নিজেকেই জিজ্ঞেস করি, আমার ব্যাপার কী? বসেছিলাম ধান ভানতে, গাইছি শিবের গীত। কথা ছিল, চল যাই বনে। বনভোজনে না, তবে এক রকমের ভোজনে। তার থেকে সাতকাণ্ড রামায়ণ। সে কথা যাক গিয়ে, এই বনের ডাকটা কেমন? বলব না, বনবাসের ডাক। আমাদের রক্তে যে বনবাস অন্য কথা বলে। বনবাস দুঃখের, শাস্তির, নির্বাসনের, পলায়নের। বনে যাব, কিন্তু বনবাসে না। তপস্যায় যাব নাকি? মানুষ দেখছি, নিজেকেও লজ্জা দিতে ছাড়ে না। সংসারের কূলে কূলে ঘাটে বাটে বন্দরে ভেসে বেড়াচ্ছি, কখনো হাল ছাড়িনি, লগি ছাড়িনি। নিজের সব কিছু নিয়ে বিকিয়ে বেড়াচ্ছি। সবাইকে ডেকে ডেকে বলছি, এনেছি পসরা, নাও হে। সর্বাংশে, যাকে বলে একেবারে কোটির মতো বাঁচতে চেয়েছি। আমি যাব তপস্যায়? এ জীবনের কোথাও তার একটুও ছায়া নেই। যদি কোনো-দিন কোনো এক অজানা মুহূর্তে সহসা দীর্ঘশ্বাস পড়ে থাকে, সে কথাও জানি না। নিজেরই অগোচরে, হয়তো কখনো কোনো এক অজানার ধ্যানে বসতে চেয়েছি। গভীর তপস্যায় মগ্ন হতে চেয়েছি। সে অজানা কে, কী তার রূপ, কেন বা তার তরে ধ্যান তপস্যা, সে সব কিছুই জানি না। মনের মধ্যে সে আপনি জেগেছে, আমার সকল ক্ষুদ্রতার তাড়নায়, আবার আপনি কখন হারিয়ে গিয়েছে। দূর আকাশের বিদ্যুচ্চমকের মতো মন হঠাৎ কেন চমকেছে, আর দীর্ঘশ্বাস পড়েছে, জানতে পারিনি।

না, বনে যাব, তপস্যায় না। কিন্তু মন যে বলে তপস্যারই থান হল বন। অতএব চল, বনের তীর্থক্ষেত্রে। তবু মনটা যে খুঁতখুঁত করে। বন বললেই সুন্দরবনের কথা মনে পড়ে যায়। সে এক চোখ জুড়ানো, লবণাক্ত জলরাশির ঢেউ-লাঞ্ছিত বন-কূল। চোখে স্বপ্নের মায়া লেগে যায়। অথচ শিরদাঁড়ার কাছে কেমন একটা কাঁপন লেগে থাকে। প্রাণ ভোলানো সৌন্দর্যের সঙ্গে, মৃত্যু ফেরে পায়ে পায়ে, তার নাম সুন্দরবন। তোমাকে কেউ বলে দেবে না। বুঝিয়ে দেবে না। পারাপারহীন বায়ুমণ্ডলের কূলে, বেলাশেষে যখন নৌকার ছইয়ের ওপর বসে থাকবে, আর দূরে সেই বিশাল অজগরের মতো নদীর বুকে আঁকেবাঁকে যে দুলছিল, সে আস্তে আস্তে শত শত বালিহাঁসের রূপ ধরে আকাশে উড়বে, হারিয়ে যাবে বনাঞ্চলের ছায়ায়, তখন জলে স্থলে সর্বত্র রূপের অধিক, আরো কিছু তোমার মনের মধ্যে শিরশির করে উঠবে। অথচ কিছু ব্যাখ্যা করতে পারবে না। কী যেন আছে, সেই লবণাক্ত গভীর জলের স্রোতে, আকাশের গাম্ভীর্যে, রহস্যঘন বনে। কেন যেন মনে হবে, বনের বহু দূরান্ত ভূমি, ফাঁকা, যতদূরে চোখ যায়, চিকচিক করছে। কিন্তু ছায়ানিবিড়, মাথা ঢাকা বনের জটা সূর্যকেই মাথা কুটে তপস্যা করতে হয় সেখানে হাজিরা দেবার জন্য।

কিন্তু এসব কূটকচালে কথা থাক। বন না বলতে চাও, অরণ্য বল। তাও যদি না বলতে চাও, জঙ্গল বল। ডাক যখন পেয়েছ, হাতছানি যখন ঘর ছাড়ার ডানায় বেগ দিয়েছে, ত্বরায় চল। সত্যি বলতে কি, যা দেখি, তারই কি নাম দেওয়া যায়? নাম ভুলে তো, শেষ পর্যন্ত যা থাকে, তা একটি ছবি, কিছু শব্দ। নামের কথা তখন কে বা মনে রাখে।

একটা ভৌগোলিক পরিচয় আগেই দিয়েছি। জায়গার নিশানা থাকে বলে। পথের ঠিকানাও বাতলে দিতে পারি। রেলগাড়িতে চেপে গেলে, চলে যাও সেই লৌহনগরী পার হয়ে, যার নাম টাটানগর। আর যদি পায়ে চলা পথ ধরো, ধরতে পার, জানে কুলাবে না। তখন যেমন তেমন হাওয়াগাড়ির দরকার হবে। তা সে হাওয়ার চাপ যা দিয়েই বানিয়ে নাও, কয়লা কিংবা তেল। মেদিনীপুর জেলাটি পার হতে হবে। সমুদ্রের ধার দিয়ে না, বিপরীতে, যেখানে মাটি তার কালো রঙ ছাড়িয়ে ক্রমে লাল—লাল—একেবারে সিঁদুরেও যেতে পার, আর সমুদ্রের ঢেউ তখন ভূমিতে। রাঙা মাটির তরঙ্গ, দুলতে দুলতে কখন যেন সে নীল হয়ে যায়, সবুজ হয়ে ওঠে। মিলেমিশে লাল আর কৃষ্ণনীল—তার মাঝখানেই হঠাৎ দেখলে সোনার কূলের ছটা লাগছে চোখে, রূপোলী কলস্বিনী বাজে খিলখিলিয়ে।

ঘর ছাড়া বিবাগী হয়ে বেরোইনি। ঝোলাঝুলি নিয়ে তাই, রেলগাড়িতেই দৌড় দিয়েছি। পথের কষ্ট সইবে না। গায়ে গতরে একটু নগর চালের অভ্যাস আছে কি না। সন্ন্যাসের বনবাসযাত্রা তাই সম্ভব না। তবে যে আমাকে ডাক দিয়েছে, আমি যে কেবল তার খুশি ঝলমলে হাসিটি দেখেছি তা না। তার গভীরের একটা কল্পনার ছবি, কেমন যেন গম্ভীর আর নম্র আর উদাস করে তুলতে চেয়েছে। তা না হলে, হঠাৎ একটা ইস্টিশনের নাম পড়ে, মনটা এমন বিষন্ন নির্বাক হয়ে গেল কেন। এই 'ঘাটশীলা' ইস্টিশনে কী মায়া লেগে আছে? ফলকে অন্য নাম ভাসে কেন আমার চোখে। মাথা নত হয়ে আসে। মনে মনে বলি, যাই তোমারই ধ্যানাসনের সন্ধানে। তীব্র বিষের নিজের কি কোনো জ্বালাবোধ আছে? আমি কালকূট। হলাহল গভীর। আর কিছু না, তীর্থক্ষেত্রের ঝরাপাতার নিবিড় ছায়ায়, অমৃতের একটু বাতাস যদি ছুঁয়ে যায়।

'শালাগোর যত বাটপাড়ি আর জুয়াচুরি।'

আশেপাশে কথাবার্তা অনেকক্ষণ ধরেই শুনতে পাচ্ছিলাম। ভাষাও ভিন্নতর, বহুবিধ। কিন্তু এমন নিপাট ক্ষোভ আর দুঃখ মেশানো, কেমন যেন একটু যশোরিয়া টানের কথা শুনিনি। কিংবা শুনেছি, কানে বাজেনি। রাত পোহাবার পর থেকে, ধলভূমগড়ের প্রকৃতি সেই যে চোখ টেনে নিয়ে গিয়েছে, তাকে আর এই রেলগাড়ির খুপরিতে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। এত মুগ্ধতা কেন। চোখের তারায় তো অনেক দিনের দাগ, তবু এত অবাক চিকচিক কেন। সংসারে এত বিস্ময় ছড়ানো, আর ধলভূমগড়ের প্রকৃতি এমন করে মজিয়ে দিলে চলে! বিজ্ঞ বিবেচকরা হাসবে যে। শিশু তো না।

তা না। মদ খেয়েছি যে। খেলেই যে মাতাল হই। কী করব, খেয়ে মাতাল হই না, হৃদয়ের এমন জোর কখনো কোনো দিন হয়নি। ধলভূমগড়ের প্রকৃতি যদি দৃষ্টি চুঁইয়ে রস দেয়, আমি কি করব। কিন্তু এবার আর মুখ না ফিরিয়ে পারলাম না। ফিরিয়ে দেখলাম, হা পোড়াকপাল। সত্যি দুঃখেরই কথা। ক্ষোভ হবারই কথা। প্রায় ষাটের কাছে বয়স মহাশয়ের। মাথা জোড়া টাক, পাতলা ধূসর পাড় তিন দিক ঘিরে আছে। গায়ে একটি আধ-ময়লা জামা, তার বোতামগুলো সবই খোলা। বুকের কেশ আর ধূসর নেই, শুভ্র। তার মাঝখান দিয়ে, নিত্য তৈলমর্দনের সাক্ষী পৈতাটি দর্শনীয়। মোটা ধুতিটি তুলেছেন অনেকখানি, তাতেই সাব্যস্ত, কেন না, স্বস্তি। পদযুগল পাদুকামুক্ত।

কিন্তু বর্ণনাটা সব না। বর্ণনা এখন মুখের। দু-একদিনের আকাটা গোঁফ

দাড়ি, গোলগাল ভাবের মুখে কপালে কিছু ভাঁজ, নাকটি সব দিক দিয়েই বিশিষ্ট, যেমন খাড়াই, তেমনি স্ফীত। দাঁত সব আছে কী না, টের পাচ্ছি না, তবে পানের ছোপ লাগানো দুটি দাঁতে একটি পোড়া বিড়ি কামড়ে ধরা আছে। হাতে কাঠিবিহীন শূন্য দেশলাই, পায়ের কাছে নিদেন এক ডজনের বেশি কাঠি পড়ে আছে। আমি মুখ ফেরাতেই চোখাচোখি। বিরক্ত ভ্রূকুটির সঙ্গে সত্যিকারের ক্ষোভ। দাঁতে বিড়ি কামড়ে রেখেই, পায়ের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'শালার কাণ্ড দেখেছেন, এতগুলানের মধ্যে একটাও জ্বলল না!'

সত্যি, এর থেকে আক্ষেপের কিছু থাকতে পারে না। নেশা গেল তলিয়ে, আগুন জ্বলল না। এতে কুশকাঁটা নির্মূল করতে ইচ্ছা কার না করে। চাণক্যের দোষ কী। মহাশয় শূন্য দেশলাইটা আমার চোখের সামনে তুলে দেখিয়ে আবার বললেন, 'অ্যাঁ, বর্ষা বাদলার দিন না, শুকনো খটখটে, কালরাত্রে কিনেছি। চারটে বিড়ি জ্বালাতে পেরেছি কী না সন্দেহ। অ্যাঁ, শালাগোর ব্যবসা দেখেছেন, অ্যাঁ? এই করেই বাঙালীর ব্যবসা ডোবে। এত ফাঁকি দিলে হয়?'

আমি সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করি, 'বাঙালী কোম্পানীর দেশলাই নাকি এটা?'

ভদ্রলোকের এক কথা, 'তা না হলে এরকম হয়? দেন, দেন তো আপনার ম্যাচটা, আগে বিড়িটা ধরাই।'

অবিশ্যিই। আগে দুটো টান হোক। দেশলাই বের করে দিয়েও, মনটা মানল না। মহাশয়ের হাতের দেশলাইটি বাংলাদেশের তৈরিই না। সে কথা বলে, ক্ষোভের বোঝা বাড়াতে চাই না। উনিও তো স্পষ্টতঃই বাঙালী। আমাদের সকলেরই যে বাঙালীর কপাল। কিন্তু কপাল খারাপ আমার ম্যাচেরও। সে যে কেবল ঝিলিক মারে, ফুচুক করে, বিড়ি জ্বলে না। যত জ্বলে না, তত জেদ বাড়ে, ক্ষোভ বাড়ে, আধখানা বিড়ি ভিজে মুখের মধ্যে চলে যাবার যোগাড়।

এ সময়েই কাঁচা গলায় ঝাঁঝের স্বর বাজে, 'আরে ধুত্তোরি, তোমার ওই বিড়িটা ফ্যালো দিকি নি, ওটার আর কোনো পদাথ নেই। নতুন একটা ধরাও না।'

তাকিয়ে দেখি, আঠারো কুড়ির জোয়ান। সূচ্যগ্র কৃষ্ণ গোঁফ, একমাথা রুক্ষ চুল, মোটাসোটা, শার্ট-ট্রাউজার পরনে। এই ঝাঁঝের পরেই, কী সুর বাজা উচিত, বোঝবার আগেই খিলখিল হাসি, জোয়ানের পাশ থেকে। রোগা রোগা শ্যামলী, ওই ষোড়শী অষ্টাদশীর সীমাতেই হবে। চুলে বাসি বিনুনি, [illegible] ডুরে শাড়ি, হাতে বুঝি কয়েক গাছা চুড়ি, হবে হয়তো কানের লতিতে কিছু

চিকচিক করছে। গ্রামীণ ভাবটাই বেশি, কালো ভুরু, ডাগর চোখ, হাসিটি খুশিতে টলটলানো। তার ওপরে যদি কিছু কিঞ্চিৎ লজ্জার ছটা লেগে থাকে, থাকতে পারে। বলল, 'বাবার যা কাণ্ড, সেই তখন থেকে দেখতে পাচ্ছি, ঘুন্‌সি পোড়ানো বিড়িটা ধরাবার জন্য, দশ গণ্ডা কাঠি পুড়িয়ে নষ্ট করলে।'

এতক্ষণে বোধহয় মহাশয়ের একটু মনে হল, কথাটার মধ্যে কোথাও একটু সত্যি আছে। সবটাই ম্যাচের দোষ না। সেই ভেবেই পোড়া বিড়িটা দংশনমুক্ত করে, চোখের সামনে এনে দেখলেন। পোড়া ছাই, আঙুল খুঁটিয়ে ফেললেন। কিন্তু মুখের ভাব প্রসন্ন হল না। বললেন, 'না, সোলেমানের দোকান থেকে আর বিড়ি কিনব না। ব্যাটা দিনে দিনে বিড়ির সাইজ ছোট করছে। তা না হলে, দু-টানও তো দিই নি। এর মধ্যেই ঘুন্‌সিতক পুড়ে গেছে।'

ঘুন্‌সি, তাও আবার বিড়ির। শিশুদের কোমরে যা থাকে, সুতোর বন্ধনী। বিড়িরও তেমনি ঘুন্‌সি। মহাশয় এবার পোড়া বিড়িটি, চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। বুকপকেট থেকে একটি ভাঙা বাণ্ডিল বের করে, বিড়ি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিপলেন। কানের কাছে শুকনো তামাকের আওয়াজ নিলেন। তারপরে দাঁতে চেপে ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, যখন একটু আরাম বোধ করলেন, তখন বললেন, 'একটা পান দাও গো।'

আশেপাশে আরো অনেক লোক। দু-পাশের বেঞ্চির মাঝখানে, লটবহর নিয়ে অনেকেই বসে গিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, এই বনদেশের নরনারী। পাড়ি বিভিন্ন অঞ্চলে। লটবহরের মধ্যে, বাক্‌সো-প্যাটরা বলে কিছু নেই। অধিকাংশই বোঁচকা-বুঁচকি, পোঁটলা-পুঁটলি। কি সামগ্রী চলেছে, কে জানে। কেবল এইটুকু দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর সরলতম নিষ্পাপ নরনারী, স্বাস্থ্যে যাদের কৃষ্ণ সূর্যের ছটা, অরূপ যৌবন প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। সভ্যতার যা সুন্দর, সেই লজ্জা এখানে পাপ।

মহাশয়ের পায়ের কাছে বসে, একটি বনবালা কিশোরী দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিগুলো জড়ো করছে। কেন, তা কে জানে। ইতিমধ্যে পান এল কন্যার হাত দিয়ে। কন্যার পাশেই, পঞ্চাশোর্ধ্বের সধবাকে দেখলেই বোঝা যায়, তিনি এখনো ঘোমটা টানা, সহবতে চলা প্রায় বৌটি। হাতের শাঁখা লোহা আর বিবর্ণ চুড়ি, আটপৌরে ধরনের শাড়ি, পানের কৌটা, সব কিছুই বলে দেয়, পরিবারটিও একটি আটপৌরে বাঙালী পরিবার। পুত্র-কন্যা-পত্নী নিয়ে কোথাও যাত্রা করেছেন। তবে শুরু থেকে যে যাত্রা করেননি, সেটা মনে আছে। হাওড়ায়

এ পরিবারকে দেখতে পাইনি। মনে হয়, ইস্পাতনগরী থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। শুরুর যাত্রী, যাদের দু-চার মুখের ছবি দেখেছিলাম, তাঁরা অনেকেই নেই। কে কখন কার গন্তব্যে নেমে গিয়েছে। গাড়িখানি তেমন রাজকীয় না। রাত্রের দিকে যদি বা কিছু দৌড় ছিল, দিনের বেলা দেখছি, দৌড় অনেক কম। কোনো ইস্টিশনের মায়া সে ছাড়তে পারছে না।

না পারুক। ক্রমে প্রকৃতি নয়ন-ভোলানো হচ্ছে। বনের নিবিড়তা বাড়ছে। সব থেকে যে অবাক করছে, তা হল রঙ। এত বর্ণ, কোনো বনে কি আর দেখেছি! নাম জানি না গাছের, নাম জানি না ফুলের। ক্ষতি নেই। কিন্তু এ মৃত্তিকার রসের ধারায় এ কি জাদু, যেন রঙের ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছে।

'কী, কী, কী চাই কী?'

মোটা স্বরের ঝাঁজালো কাশালো ধমক শুনে, তাকিয়ে দেখতে হল। মহাশয়ের বিরক্ত দৃষ্টি তাঁর পায়ের কাছে। সেখানে একটি কিশোরী বনবালাকে দেখতে পেয়েছিলাম, পোড়া কাঠি সংগ্রহ করছে। এখন দেখছি, তার পাশে এক জোয়ান বনবাসী। একটি নিষ্পাপ কিন্তু সঙ্কুচিত হাসি তার মুখে। হাতে ধরা—ওটা কী? বিড়ি? লম্বায় নিদেন ছ'ইঞ্চি, মোটা ততোধিক না যে, চুরুট বলব। কাছাকাছি। মহাশয়ের দিকে চেয়ে, হাসিটা একটু করুণ করে বলল, 'দে না।'

মহাশয় ধমক দিয়ে বললেন, 'নেই দেগা। তোর ওই ফিকা ধরায়েগা, আমার বিড়ি নিবে যায়েগা। ভদ্দরলোকের আর কত কাঠি আমি নষ্ট করব। নেন এই নেন তো মশায় আপনার ম্যাচ।'

দেশলাইটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমারই দেশলাই যখন, নিতেই হল। কিন্তু বনবাসীটির অপরাধ কী। মহাশয়ের কাছে আগুন চেয়েছে? মহাশয়ের ভয়, তাঁর বিড়ির আগুন নিভে যাবে, তাই আগুন দেবেন না। তবু নেশার দায়টা তো বুঝতে হয়। দেখছি, বনবাসীর হাসি-হাসি, একটু বা করুণ, একেবারে আরণ্যক চোখের দৃষ্টি একবার আমাকে ছোঁয়, আর একবার মহাশয়কে। মহাশয় নির্বিকার, তাঁর বিড়ির আগুন এখন ঘুন্‌সির দিকে নেমে চলেছে। তার মানে নেশার সুখটান বাড়ছে। অগত্যা বনবাসীকে আমিই দেশলাইটি বাড়িয়ে দিই। সে আর কতক্ষণ পরের মুখের ধোঁয়া দেখে ঢোঁক গিলবে।

কিন্তু এ আবার কী। বনবাসী যে ঘাড় নাড়ে। দেশলাই নিতে চায়

না। আগ বাড়িয়ে উপকার করতে গেলাম। বিমুখ করে দিচ্ছে? বাংলাতেই জিজ্ঞেস করি, 'চাই না?'

বনবাসীর হাসিটি আরো নিবিড় হল, কারণ হাসিতে চোখ দুটো কোথায় যেন ঢেকে গেল। ঘাড় নাড়িয়ে দিল কেবল। মহাশয় ঝাঁঝালো কাশালো স্বরে সংবাদ দিলেন, 'আরে মশাই, ও ম্যাচ নিয়ে কী করবে? ফিকা ধরাতে পারবে নাকি? কামের মধ্যে আকাম করবে, কুড়িটা কাঠি নষ্ট করবে।'

কারণ? মহাশয় না হয়, ঘুন্‌সি পোড়া ভেজা বিড়ির মাথায় কয়েক গণ্ডা কাঠি পুড়িয়েছেন। বনবাসীরও সেই দশা হবে কেন? অবিশ্যি নতুন একটা নাম শোনা গেল। বনবাসীর বিড়ি, বিড়ি না, ফিকা। হয়তো স্থানীয় বা বনবাসীরা তাই বলে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই নাকি?'

মহাশয় বললেন, 'তবে? দিয়ে দেখেন না। দেখতিছেন না, ব্যাটা নিজেই ম্যাচ নিতে চায় না! ম্যাচ জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাতে শিখেছে নাকি?'

বলে, অতি দয়াপরবশ হয়ে, তাঁর বিড়িটি এবার বনবাসীকে এগিয়ে দিলেন, 'নে, জলদি ধরা, নিবিয়ে মাত্‌দেগা, মার দেগা।'

ভাষার কথা আর বলব না। অনেকক্ষণ ধরেই শুনে আসছি। মহাশয়ের বাক্যের হুবহু উদ্ধৃতি দিইনি। তবে কথার উচ্চারণ টান-টোন সবই যে যশুরে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি তাঁর হিন্দী বাতও শুনছি, আর ভাবছি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। যাকে বলেছেন, সে ঠিক অনুধাবন করতে পারছে তো?

পারছে নিশ্চয়ই। তা না হলে আর বাক্য-বিনিময় ঘটছে কী করে। একথাও ঠিক, মহাশয় অভিজ্ঞ, এ অঞ্চল ও অধিবাসীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে। আমি ভেবে যতই অবাক হই, একটা লোক দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাতে অক্ষম, ঘটনাটা ঘটছে যে চোখের সামনেই। আমার দেশলাই ফেরত এল, ওদিকে বিড়ির আগুনে ফিকার মুখে ধোঁয়া উড়তে শুরু করেছে। মহাশয়ের দৃষ্টি সাবধানী এবং তীক্ষ্ণ, লক্ষ্য বিড়ির আগুনের দিকে। নিভে গেলে মারবেন, বলেই দিয়েছেন। কিন্তু বনদেবতারই দয়া, বিড়ি নিভলো না, ফিকাও ধরল। মহাশয় বিড়িটি নিয়ে, টানের বদলে, বার কয়েক চুষলেন। কেন না, ঘুন্‌সিতে আগুন লেগেছে। মুখ থেকে তুলে এনে, বিড়িটার প্রতি বিরক্ত চোখে তাকিয়ে দেখলেন। তারপরে, মুখ ফেরাবার অবকাশ পেলাম না, আমার দিকে ফিরে বললেন, 'সব ব্যাটা জুয়াচোর, বোঝলেন, তাবত বিড়িওয়ালা। দু-টান দিতে না দিতেই খতম, এ খেয়ে কখনো সুখ হয়!'

অত্যন্ত অনিচ্ছায় দগ্ধ বিড়ি ছুঁড়ে দিলেন বাইরে। এ বিষয়ে মন্তব্য করার ভাষা আমার জানা নেই। সব বিড়িওয়ালা জুয়াচোর কী না, তাদের সেই ব্যবসায়িক সততা অসততা বিষয়েও সম্যক জ্ঞান নেই। কিন্তু সংসারে কি আরো বহুতর বিড়িওয়ালা নেই? মহাশয়ের মনের মতো দীর্ঘ বিড়ি কি কোথাও তৈরি হয় না?

এবার কথা আসে জোয়ানের কাছ থেকে, 'সোলেমানের বিড়ি নাও কেন? নাগাইয়ের বিড়ি এনে দিলে তোমার পছন্দ হয় না।'

বিড়ি-প্রসঙ্গ দেখছি ছোটখাটো ব্যাপার না। পুত্রও পিতাকে পথ বাতলায়। মহাশয় মুখখানি বিকৃত করে বললেন, 'ছাই। নাগাইটা একেবারে গলাকাটা হারামজাদা। কেবল পাতার সাইজ বাড়ায়, ভেতরে, এক কণা সুখা থাকে না। এক টানেই ভুস্। ওগুলোন আবার বিড়ি নাকি?'

পুত্র দেখছি তারপরেও বলে, 'তুমিই ওকথা বল, নাগাইয়ের বিড়ি সবাই ভালোবাসে।'

তার মানে কি, পুত্র স্বয়ং নাগাই-বিড়ি-রসিক নাকি! তা না হলে এমন বাদানুবাদ কেন? পুত্রের মুখের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। সূচাগ্র গোঁফ আছে বটে, ফরসা ফরসা মুখখানি মোটেই চোয়াড়ে শক্ত না। চোখ দুটি ডাগর, কোমলতার আভাসও আছে। কথাবার্তার সময় দেখছি, ভাইবোনের মধ্যে একটু চোখাচোখি হয়। তার মধ্যেই কেমন যেন একটু দুষ্টামির ঝিলিক খেলে যায়। পিতৃদেবকে রাগাবার তাল নাকি? সাহস আছে বলতে হবে। ওরকম একখানি টাক এবং নাসিকা দেখলে, আমার পিতৃদেবের সামনে বোধহয় কেঁচো হয়ে থাকতাম।

মহাশয় ঠোঁট বাঁকিয়ে, পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, 'থো ফেলায়া তোর নাগাই, চোর চোর সব ব্যাটা চোর।' বলে পকেট থেকে সেই বাণ্ডিলটি বের করলেন। আবার সোলেমান! আসলে সোলেমানেই আছেন, সোলেমানের ছোট ছুঁচোবাজিতেই তাঁর মৌতাত। তা না হলে, এত ঘন ঘন টান পড়ত না। যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা, সে কথা আলাদা। উঠতে বসতে যাকে গালমন্দ করি, অথচ তাকে ছাড়া একদণ্ড চলে না, সে ভাবের ভাব আলাদা। সোলেমানের বিড়ি সেই ভাবের ভাবী। সে জানে, মৌতাতের বাজিটি ছোট না করলে তার আদর কমে যাবে।

মহাশয় বাণ্ডিলটি বের করে, হাতে রাখলেন। কথা বললেন অন্যদিকে ফিরে, 'খুকী একটু পান দে!'

সেই ষোড়শী বা অষ্টাদশী। সে ফিরল তার মায়ের দিকে। মা-টি অমনি পানের ডিবে খুলে, ছোট একটি খিলি বের করে দিলেন মেয়ের হাতে। যেন তৈরি হয়েই ছিলেন, কর্তার মুখ খোলার অপেক্ষা। কিন্তু খুকী একেবারে নিভাঁজ না। পানটি এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কত পান খাবে? খালি পান আর বিড়ি, বিড়ি আর পান। দু-চক্ষে দেখতে পারি না।'

মহাশয়ের মুখের কোথাও টোল খেল না। রাগ তো নয়ই, অন্যদিকে মুখ করে, পানটি চিবোতে লাগলেন। কেমন একটি শব্দ করলেন, 'হুম্!'

খুকীও অমনি আওয়াজ দিল, 'হুম্!'

বলে একবার দাদা, আর একবার মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি। হাসির ঝিলিক। কিন্তু কন্যার শাসন সেখানেই শেষ হল না, আবার বলল, 'আর সেই বাড়ি গিয়ে, ভাত খেয়ে পান খাবে।'

গিন্নী তখন সবে গালে পান পুরতে যাচ্ছেন। কন্যার সঙ্গে সঙ্গে ধমক, 'এই হল, যেই বাবা পান মুখে দিল, অমনি মায়েরও গলা শুকিয়ে গেল।'

এবার চোখাচোখি কর্তা গিন্নীর সঙ্গে। দু'জনের মুখেই পান। কিন্তু চোখে ঠোঁটে যে হাসিটি বিনিময় হয়ে গেল, তার ব্যাখ্যা আমার বচনে নেই। এ কি কন্যার প্রতি স্নেহ, না কন্যার শাসনে প্রৌঢ় ছেলে-মেয়ে দুটি প্রেমিক হয়ে উঠলেন, ধরতে পারলাম না। মনটা কেমন খুশিতে ভরে গেল। জানলার দিকে তাকিয়ে, নিজের হাসিটা আড়াল করতে হল। তবু কেন যেন একটা অনিবার আকর্ষণে, খুকীর দিকে একবার ফিরে দেখতে ইচ্ছা করল। আর তা-ই দেখতে গিয়ে, কেমন যেন ঠেক খেয়ে গেলাম। ভাই বোন, দু'জনেই, আমার দিকে তাকিয়ে। গলা নামিয়ে কী যেন বলাবলি করছিল। চোখাচোখি হতেই চুপ। এক মুখে একটু লজ্জার ছটা, আর এক মুখে ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাব। আমিও ঝটিতি মুখ ফেরালাম। অস্বস্তি লাগল যেন গোটা শরীর জুড়ে। এদের মধ্যে আমি আবার কখন প্রবেশ করলাম। প্রবেশ ঘটবার কারণই বা কী। আমি তো কেবল শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। ওই বয়সটাকে কেমন যেন একটু ভয় লাগে। ওরা যে কখন কী ভাবে, কেন হাসে, সব সময়ে বোঝা যায় না। আর একজনের প্রাণান্ত।

মুখ ফিরিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গাড়ি চলেছে যেন নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে বনবাসী মেয়ে পুরুষদের দেখতে পাচ্ছি। বনের গভীরে তারা চলেছে, কোথাও বা দল বেঁধে কী সব কাজে যেন ব্যস্ত। থেকে থেকে বনের ছায়ায়, হঠাৎ যেন কী চিকচিক করে উঠছে। নদী নাকি?

দ্রুত ধাবমান গাড়ির সঙ্গে, নজর বেঁধে রাখতে পারি না। মনে হয় চোখের তারা হারিয়ে যায়। ছবিটা আঁকা হয়ে থাকে মনের কোণে।

'দেন, ম্যাচটা দেন।'

কথাটা কানে গেল। ফিরতে যাব। সেই মুহূর্তেই, খলখলানো, খিলখিলানি হাসিটা কানে বাজল। ফিরে দেখি, ভাই আর বোন দু'জনেই গায়ে ধাক্কাধাক্কি করে হাসছে। দু'জনের ঝলকানো চোখের দৃষ্টি আমার দিকে। অস্বস্তি ছিল, লজ্জা পাব কী না, বুঝে ওঠবার আগেই, পিতৃদেবের ধমক শোনা গেল, 'আরে, এত হ্যা হ্যা করার কী হল, অ্যাঁ? ব্যাপার কী?'

ভাই বোনের হাসি আরো উচ্ছ্বসিত হল। দৃষ্টি সেই আমার দিকেই। ভাই হঠাৎ বোনের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক বলেছিলাম কী না।'

বোন ঘাড় নেড়ে আপত্তি দিল, 'ইস্, তুই বলবি কেন, আমিই তো বললাম, বাবার মজাটা এবার ছাখ।'

মহাশয় অবাক হল না, কিন্তু জিজ্ঞেস করেন, 'কেন, আমি আবার কী মজা করলাম?'

খুকীর জবাব, 'তুমি ভদ্রলোকের কাছ থেকে দেশলাই চাইবে, ঠিক জানতাম।'

মহাশয় বললেন, 'এই কথা।'

আমার মনেও তাই, এই কথা! এই কথার জন্য, ভাই বোনের এত হাসাহাসি? বেশ বোঝা যাচ্ছে, একটু আগে, এ নিয়েই দু'জনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। আর দেশলাইটি সেই থেকে আমার হাতেই রয়েছে, পকেটে পোরা হয়নি। আমি হেসে দেশলাইটি মহাশয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। উনি ততক্ষণে সোলেমানের বিড়ি একটি দাঁতে কামড়ে ধরেছেন। দেশলাইটি নিয়ে বললেন 'এতে আবার মজা কী করলাম বলেন তো। আমার নাই, আপনার আছে, একটা ম্যাচ, ক'টা কাঠি নিয়ে কথা, অ্যাঁ? কী বলেন?'

বলতে হয় 'নিশ্চয়ই।'

তথাপি কন্যা নাছোড়বাদী। বলে, 'তুমি উনপঞ্চাশটা বিড়ি খাবে, আর ওনার ম্যাচবাক্তি জ্বালাবে?'

বলতে বলতে একবার আমার সঙ্গেও চোখাচোখি। খুশির সঙ্গে একটু লাজুকতা। কিন্তু বিড়ির সংখ্যাটা উনপঞ্চাশ উচ্চারিত হল কেন? সংখ্যার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য বুঝি?

মহাশয় বললেন, 'মনোহরপুর আসুক, ম্যাচ একটা কিনব। নেন, আপনি একটা বিড়ি খান।'

এতক্ষণে মহাশয় আমাকে প্রকৃত বিপদে ফেললেন। তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, আপনি খান। আমার আছে।'

তা বললে মহাশয় শুনবেন কেন। আমার যে-হাত আমি পকেটে ঢুকিয়েছিলাম, উনি সেই হাত, ওঁর থাবাসদৃশ মুঠি দিয়ে চেপে ধরে বললেন, 'তা জানি আপনার আছে। ম্যাচ পকেটে আছে, আর মাল নাই, তা কখনো হয়? তবু আমার একখান নেন।'

সোলেমানের বিড়ি একখানি বাড়িয়ে ধরলেন মুখের কাছে। আবার বললেন, 'মেয়ের কথা বোঝলেন না? আপনার এতগুলোন কাঠি নষ্ট করলাম, তবু আপনাকে একটা বিড়ি দিলাম না। তা বটে, সব কি আর মনে থাকে। আর আমারা হলাম মশায় জংলী মানুষ, ভদ্দরলোকের সঙ্গে মিলমিশ ওঠাবসায় হে কম্‌মো হয়ে গেছে। নেন, ধরেন। দেখতে ছোট, কামে বড় কামেয়াব, সোলেমানের বিড়ির কথা বলছি।'

অগত্যা। এমন কোনো মধুসূদন দেখি না, যিনি আমাকে ত্রাণ করতে পারেন। ওদিকে মায়ে ঝিয়ে পোয়ে ভারি দিলদরিয়া। নিজেদের মধ্যে নজর হানাহানি, হাসি টেপাটিপি। কখনো বা ত্যারছা নজর হানে আমার দিকে। মহাশয় এত সব দেখেন শোনেন না। নিজে একটি বিড়ি কামড়ে ধরে, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, আগে আমার দিকে ঝুঁকে এলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিলেন, 'আ কচুপোড়া খেলে যা। সব শালা জুয়াচোর!'

কাঠিটি নিভে গিয়েছে। জুয়াচোরকে চিনতে আর এখন কারোর বাকি নেই। অনুনয় করে বললাম, 'আমাকে দেবেন, একটু চেষ্টা করে দেখি?'

'দেখেন দেখেন। আরে মশাই, আজ তক হাজারটা কোম্পানির ম্যাচ জ্বালিয়ে দেখেছি। কাঠির ডগে বারুদের রঙ দেখলে বলে দিতে পারি, কোনটা জ্বলবে, কোনটা জ্বলবে না। নেন, আপনারটা আপনিই দেখেন।'

কোন্ দেবতাকে যে ডাকব। গুরুর নাম স্মরণ করি, বারুদে বারুদ ঘষি, জয় গুরু! কোটি দণ্ডবত্, মান রেখেছ। মহাশয় আগে, পরে আমি। দু'জনের মুখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কলসী থেকে জল গড়ানো বগবগে হাসিটা যার বাজল, সে হল পায়ের কাছে বসা বনবাসী। তার সঙ্গে সুর মিললো বনবাসিনীর কলকলানি। ওদিক থেকে পুত্রের বচন, 'দেখলে বাবা? তুমি পার না, সে সে কথা বলবে না, কোম্পানিকে খালি জোচ্চোর বলবে।'

মহাশয়ের গলায়, 'হুঁ' কিন্তু গাল চুপসে টান চলেছে। কিন্তু আমি কী বিপদে পড়লাম। তীরে এসে আমার তরী ডুবেছে। হালে পানি নেই, আমার বিড়ি নিভে গিয়েছে। যত টানি ধোঁয়া নেই। থাকবে কেমন করে। অভ্যাস বলে একটা কথা আছে তো। অথচ বুঝতে পারছি, বিড়ি দেশলাইয়ের এই অকিঞ্চিৎকর নাটক এখন অসামান্যের পর্যায়ে এসে পড়েছে। দর্শক বিস্তর। আশেপাশে বিপরীতে। কিন্তু দায়ভাগীরাই বোঝে। পাতায় মোড়া তামাক টানা অভ্যাস নেই। তা সে যেকোনো সোলেমানেরই হাতের বানানো হোক। কলে বানানো কাগজে মোড়া, দেখতে শুনতে চটকদার, যাকে বলে সিগারেট—কারা যেন এটাকে আবার 'সিগ্রেট'ও বলে, সেইটি টানা অভ্যাস। আগুনের একটি ঝলক ঝিলিকেই কেল্লা মাত। তারপরে শেষ অবধি চলে যাও, আগুন তোমার ভাই। কিন্তু এই পাতামোড়াকে নিয়ে যে মোটেই সুবিধা করতে পারছি না। সে কথা বলাও তো বিপদ।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে যায়, ডাগর কালো তারার ঝিলিকের দিকে। খুকীর আঁচল উঠেছে মুখের ওপর। রোগা রোগা, ছিলছিলে কচি ডাঁটার মতো শরীরটি বাতাসে না, হাসিতেই কাঁপছে। নজর আমার বিড়ি টানার দুর্গতির প্রতি। ভাইয়ের কনুইয়ের ধাক্কা লাগল শরীরে, ধমক শোনা গেল, 'ধ্যাৎ পাজী।'

তাতে শরীরের কাঁপন বাড়ল ব্যাতিরেকে কমল না। মুখটা ফিরল অন্যদিকে। মহাশয়ের মোটা গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'অ, ভুস হয়ে গেছে বুঝি? নেন নেন, আমারটা থেকে নেন, ওটা তো মোটে ধরেই নাই।'

বিনীত হয়ে বললাম, 'না না থাক, আমি অন্য একটা খাচ্ছি।'

মহাশয় একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'অন্যটা খাবেন কী মশায়, এটার তো মুখও ধরে নাই। নেন নেন, আমারটা থেকে ধরিয়ে নেন।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বললাম, 'আমি এটার থেকে একটা খাই। আপনারটা বরং—'

মহাশয়ের মুখের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাঁর বিশাল মুখের অভিব্যক্তিতে, এটা হাসি, না বিদ্রূপ, না বিরক্তি বা ধিক্কার, কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেবল ঠোঁট উলটে বললেন, 'সিগারেট। হুঁস! ওতে কি আর নেশা হয় মশায়, ওসব ছোঁড়ারা ফোঁকে বাবুগিরির জন্যে।'

বলে, আমার হাতে মুখ-পোড়া বিড়িটার দিকে একবার তৃষিত চোখে তাকিয়ে দেখলেন। নিজের বিড়িতে টান দিলেন। জানি, আমার হাতে

সোলেমানের একটি অখণ্ড বিড়ির দুর্দশা দেখে ওঁর মর্মমূলের কোথায় বিদ্ধ হয়েছে। তা না হলে এক কথায় ছোঁড়াদের বাবুগিরি বলতে পারতেন না। এখন একমাত্র নেশার দেবতাই জানেন, এই ধূমপান আমার বাবুগিরির জন্য কী না। সঙ্কুচিত হয়েই সিগারেটটা ধরালাম। ভাই বোনের সঙ্গে চোখাচোখি হল। আমার হাতে তখনো বিড়িটা। ফেলে দিতে কেমন যেন হাতটা কাঠ হয়ে যাচ্ছে।

'মারব হারামজাদাকে এক থাপ্পড়। তখন থেকে পা ঘষে ঘষে আর রাখলে না!'

আবার কী হল। কী আবার, বনবাসীর ফিকা নিভে গেছে। আবার তার আগুন চাই। তা, মারো আর হারামজাদাই বল, ফিকাওয়ালার মুখ ভরা হাসি। এবার মনে হল, চোখ দুটি একটু বেশি লাল। পাশে কিশোরী বনবাসিনীটি খিলখিল করে হাসল। সেই সঙ্গে, প্রকৃতির রূপ যেন একদিকে আঢাকা বুকেও হেসে দুলে গেল। মহাশয় চিৎকার করে বললেন, 'নাই দেগা বজ্জাত।'

চিৎকারটা শুনে বনবাসীর চোখ দুটো এবার পিটপিট করে উঠল। মহাশয় হঠাৎ এমন এক ভাষায় কথা বললেন, জীবনে কোনোদিন যা শুনিনি। জবাবে বনবাসী বলল, 'সাম্‌টা।'

মহাশয়ের আবার সেই ভাষাতেই, দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসা। বনবাসীর জবাব, 'মণির বাবু।'

মহাশয় মুখটা ভয়ঙ্কর করলেন, অনেকটা নিজের মনেই বললেন, 'মাতাল কমনেকার। সবগুলোনে হাঁড়িয়া খেয়ে মরেছে, সারা রাত নাচ-গান করে ফেরা হচ্ছে, আর খালি আগুন দাও। ওদিকে ঠিকাদার বাবু জঙ্গলে গিয়ে বসে আছে। বদ্‌ বুনো।'

বলে তার পোড়া বিড়িটা বাড়িয়ে দিলেন। মনে হল, তাঁর সঙ্গে বনবাসীর কিছু কথা হল, যার ভিতর দিয়ে দু'জনের জানাজানি টের পাওয়া যায়। মহাশয় আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেন, বিড়িটা দেন।'

প্রায় কেন্নোর মতো কুঁকড়ে বললাম, 'কী করবেন?'

'দেন না মশায়, একটা আস্ত বিড়ি নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। ওর একটা গতি করতে হবে তো।'

কী গতি হতে পারে জানি না। তবে এ বড় সুলভ বিড়ি না। অত্যন্ত সঙ্কোচে বিড়িটা দিলাম। তিনি সেটা নিয়ে পায়ের কাছে, ভাগ্নী বনমালাকে দিয়ে বললেন, 'খা।'

ভাগরী চোখের পাতা কুঁকড়ে, মাথা ঝাঁকালো, নেবে না। মহাশয় বললেন, 'তবে মর্‌গা যা।'

বলে হাত তোলবার অবসর পেলেন না, ভাগরী বিড়িটা টেনে নিল। তার-পরে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে, ঘাড় দোলালো। ব্যাপার কিছু বুঝে ওঠার আগেই, মহাশয় মারতে উদ্যত হয়ে হাত তুলে হাঁক দিলেন, 'তবে রে মুণ্ডানী, তোর নোলা ছিঁড়ব আমি আজ।'

যেমনি বলা, ভাগরী অমনি মেঝেতে মুখ চেপে, পিঠ কুঁকড়ে কী কলকল হাসি। সেই সঙ্গে মা পোয়ের থেকে ঝিয়ের হাসি চড়া। আর ব্যাপার কিছু না বুঝে, আমি থ, যেন চিলে আমার খাবার ঠোঙা নিয়ে হুস্ করে আকাশে। আমি একটু ধন্দভরে মহাশয়ের দিকে তাকাই। তখন আমার আশপাশের হাসির বহরটা ছড়িয়ে গিয়েছে। মহাশয় তখন বাজছেন, 'মোটে মা রাঁধে না, তার আবার তপ্ত আর পান্ত। উনি বাবুর সিগারেট খাবেন, অ্যাঁ! খেতে জোটে না, শুতে রাঙা পাটি। চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে মারব তোকে আমি।'

ব্যাপার বোঝা গেল। কিন্তু যাকে বলা, তার কষ্টিপাথর কাটা খোলা পিঠ তখনো কাঁপছে। আর একজন ফিকা টানতে টানতেও হেসে বাঁচছে না। হাসিটা তেমন সংক্রামিত হচ্ছে না, মাড়োয়ারী বলে যাদের সন্দেহ হচ্ছে বা ঠেট বিহারা বা মধ্যবিত্ত ওড়িয়াদের প্রতি। এর মধ্যেই একটু দূর থেকে কার গলা যেন শোনা গেল, 'অ গাঙ্গুলি খুড়া, ওরা সব মাতাল।'

মহাশয় কোনো দিকে না তাকিয়ে, উপুড় শরীর চুল এলানো ভাগরীর দিকে চোখ রেখেই বললেন, 'তা আর জানি না সুখেন, তুমি আমাকে বোঝাবে?'

আমার মনটা কেমন মনের মধ্যে ডুব খায়। ডুব খেয়ে খেয়ে, অবাক মানে, আর জিজ্ঞেস করে, গোটা কামরাটার চেহারা বড় মজার। হঠাৎ শুনলে মনে হয়, বাংলাদেশের গ্রামের পথে, মাঠের ধারে কথা শুনছি। অথচ আমার দু-পাশে, ক্রমে বন গভীর-গভীরতর হয়। এই বন সম্পর্কেই শোনা, বিশাল গাছের ডাল জড়িয়ে, অজগর মাথা রাখে আর এক বনস্পতির শিরে। নিচে দিয়ে রেলগাড়ি চলে যায় ঝমঝম ঝমঝম। অথবা প্রকাণ্ড একটা লতার মতোই, চলন্ত রেলগাড়ির জানলার সামনে অজগরের মাথা আর শরীর দোলে। আর এক দিকে অবাক হস্তী নির্বিকার চেয়ে থাকে বাষ্পীয় শকটের দিকে।

আমি এখন সেই বনের গভীরে ঢুকি। শকটের যান্ত্রিক শব্দ কখন থেকেই চিনতে ভুলে গিয়েছি। আর বনবাসী বনবাসিনী পায়ের কাছে বসে এই রঙ্গ করে। এতদিনের বনপাগলা অরণ্যপ্রেমিকদের রচনার সঙ্গে এ চেহারাগুলো

ঠিক মেলাতে পারছি না কেন। সেই যে কবে পালামৌ-এর অরণ্যবৃত্তান্ত মুগ্ধ হয়ে পাঠ করেছিলাম, এই যে সেদিনও বইহার বনঝারি লবটুলিয়ার অরণ্য-কাহিনীর প্রেমে পড়েছিলাম, তার সঙ্গে, এ পরিবেশ চরিত্রের মিল পাই না যেন। এর রূপ রঙ যেন আলাদা। যদিও, এখনো বনে যাইনি, চলন্ত গাড়ি থেকে দেখছি মাত্র। তবু এ যেন কেমন কেমন লাগে না? অথচ বুঝতে পারি না, এই পাহাড়িয়া বনের রাজ্যে, এই গাঙ্গুলি খুড়াটি কে, সুখেনই কে, এঁরা করেনই বা কী। দেখে শুনে মনে হয়, এই বনে, বনবাসী এবং এঁরা, সকলেই সকলের জানপহ্চান। এঁরা যাচ্ছেনই বা কোথায়?

তৃতীয় শ্রেণীর দীর্ঘ ডাব্বা। হাওড়া থেকে যাদের দেখেছিলাম, সবাইকে মনে করে রেখেছি, এমন কথা বলি না। কিন্তু এই গাঙ্গুলি খুড়া সপরিবারে, এবং ভিড়ের মধ্যে সুখেন যে মাঝ রাস্তা থেকে উঠেছেন, সন্দেহ নেই।

'যাবেন তো রাউরকেল্লা?'

মহাশয়ের—থুড়ি, এখন আর মহাশয় বলা চলে না, গাঙ্গুলি মহাশয়ের দিকে ফিরে দেখে বুঝলাম, প্রশ্ন আমাকেই। রাউরকেল্লা? 'কেল্লা' বলে তো নিজেই একবার হাস্যাস্পদ হয়েছিলাম। কেন না, কেল্লা না, কেলা। কেলা মানে কী? আমরা বাঙালীরা তো 'জনতা হিন্দী'র মাধ্যমে কেলাকে কদলী বলেই জানি—যার নাম কলা। এক্ষেত্রে কেলা মানে নিশ্চয়ই ভিন্ন। ওড়িষী ভাষায় 'এর যদি কোনো মানে থেকে থাকে, আমার জানা নেই। কিন্তু গাঙ্গুলিমশাই এতটা সাব্যস্ত করেন কেন, আমি রাউরকেলাতেই যাব। বললাম, 'না তো!'

গাঙ্গুলিমশাই যেন ভারি তাজ্জব, 'তবে কোথায় যাবেন? আরো দূরে নাকি?'

বললাম, 'না, আরো এদিকে।'

'আর আমি তখন থেকে ভাবছি, এ নিশ্চয় রাউরকেলার চাকুরে। বিস্তর লোক তো এখন রাউরকেলার কারখানায় কাজ করতে যায়। তা, আরো ইদিকে মানে কোথায়? সবই তো জঙ্গল। মনোহরপুরে যাবেন বুঝি?'

গাঙ্গুলিমশাই হয়তো তাঁর নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাতেই, ঢিল ছোঁড়েন। এখনো কোনোটাই লাগল না। রাউরকেলায় আমি চাকরি করতে যাব না। মনোহরপুর নামটি সুন্দর, মনোহরণ কতখানি করে জানি না। দেখিনি তো। কিন্তু সেখানেও আমার গন্তব্য না। বললাম, 'না, আমি যাব জরাইকেলা।'

'জেরাইকেলা!'

গাঙ্গুলিমশাই এতক্ষণে বসেছিলেন এক ভাবেই। এবার হঠাৎ সমগ্র শরীর

নিয়ে, আমার দিকে ফিরতে গিয়ে, ধাক্কা মারলেন আমাকেই। পতন ঘটত, জানালা ধরে না ফেললে। তখন অন্য দিক থেকেও আওয়াজ উঠেছে, 'জরাইকেলা? জরাইকেলা কোথায়?'

গাঙ্গুলিমশাই এতক্ষণে আমাকে হাতে জড়িয়ে ধরে ফেলেছেন, 'আ হা হা লাগেনি তো?'

'বাবা যে কী করে!' কন্যার কোপকটাক্ষের সঙ্গে, শাসনের স্বর।

খুকী তো খুকীই। চোখাচোখি হল, কিন্তু লজ্জার থেকে এখন বাবার প্রতি বিরক্তিটাই যেন বেশি। লাগা বলতে যা বোঝায় সেরকম একটু লেগেছে বৈকি। গাঙ্গুলিমহাশয়ের শরীর, আমার থেকে, সর্বাংশেই দ্বিগুণ তো বটেই, তিন গুণ কী না, সেটা বিচার্য। লম্বায় যদি বা তেমনটা ছাড়িয়ে যেতে পারেননি, অন্যান্য দিকে আমার হার অনেক দিক থেকে বেশি। কিন্তু ঢোঁক গিলে হেসে বলতেই হয়, 'না, লাগেনি।'

সে কথা শোনবার জন্য গাঙ্গুলিমশাই তেমন ব্যস্ত ছিলেন বলে মনে হল না। জিজ্ঞেস করলেন, 'জেরাইকেল্লায় কোথায় যাচ্ছেন? আত্মীয়স্বজন আছে নাকি কেউ?'

এরকম উদ্দীপ্ত প্রশ্নের সামনে চুপ করে থাকা মুশকিল। তা ছাড়া, প্রশ্নটা গাঙ্গুলিমশাইয়ের মুখে ফুটেছে, তাঁর গোটা পরিবারের চোখেও যে। অন্যান্য দিক থেকে আরো দু-একজনেরও যে সে প্রশ্ন এবং উৎকর্ণ শ্রবণ রয়েছে, তা বুঝতে পারছি। অনুমান, এরাও বোধহয় জরাইকেলার লোক। যদিও জরাইকেলা না, 'জেরাইকেল্লা'। বললাম, 'আত্মীয়স্বজন না, বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি।'

গাঙ্গুলিমশাইয়ের মুখের গভীর ভাঁজ গভীরতর হল। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণতা। জিজ্ঞেস করলেন, 'কারবারী বন্ধু?'

তা হলেই তো বিপদ। কেন না আমি তো কারবারী অকারবারী ভেবে যাচ্ছি না। আমার যোগাযোগটাও কারবারের না, কারবারীর দ্বারা না। বরং বলা যায়, যোগাযোগের মাঝখানে যিনি আছেন, তিনি কাব্যলক্ষ্মীর বেদীর সামনে, রসিক আসনে উপবিষ্ট। মুদ্রিত চক্ষে সৃষ্টির ধ্যান। এমন এক বন্ধুর সহযোগিতায়, বনভ্রমণের যোগাযোগ। যাঁর গৃহে গমন হচ্ছে, তিনি কারবারী হতে পারেন। পারেন বা বলি কেন তিনি কারবারী। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বললাম, 'কারবারের বিষয় আমি কিছু জানি না। বেড়াতে যাচ্ছি।'

গাঙ্গুলিমশাই হা হা করে হাসলেন। এমন হাসি তাঁকেই মানায়, কেন না; হাসিটিও যেন ঝাঁজালো এবং কাশালো। সেই সঙ্গে তাঁর বড় বড় চোখ আরক্ত হল। চাপড় মারলেন আমার হাঁটুতে। বললেন, 'সে আর জানি না! সাহেব সিং যখন প্রথম এসেছিল, বলেছিল তার মা নাকি স্বপ্ন দেখেছে, কোয়েল নদীর বালির চরে, পুব-দক্ষিণ কোণে নাকি শিবলিঙ্গ পড়ে আছে। উনি সেটি উদ্ধার করতে এসেছেন। তা বাবা মহেশ্বরের নাম নিয়ে বলতে হয়, কোয়েলের পুব-দক্ষিণ কোণে বিস্তর পাথর আর কী বলে ওগুলোনরে—অ্যাঁ, সেই কী হে সুখেন, কী বলে?'

কোন্ দিক থেকে যেন জবাব এল, 'বোল্ডার।'

'বোল্ডার, হ্যাঁ, বড় বড় পাথরের চাংড়া। দেখলে মনে হয় পোকাগু পোকাগু মোষ সব পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে বসে আছে। কোয়েলের জলে আর চরে, সে যে দিকেই যাও, বিস্তর পাথর পড়ে আছে। সাহেব সিং কোথাও তাঁর মায়ের স্বপ্নে দেখা সেই শিবলিঙ্গ খুঁজে পেলেন না। একমাস ধরে ঘোরাফেরা করলেন, একটা পাতার ঘরও করলেন, তারপরে একটা মুদীদোকান খুললেন। তারপরে দু-বার চাইবাসা ঘুরে এলেন…তা যাক গে সে সব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কী লাভ। সাহেব সিং-এর এখন মস্ত মোকাম, চারখানা লরি। সব থেকে বড় বনের ঠিকাদার, বড় বড় দুটো দোকান…তা সে যাক গে ওসব পুরনো কথা, পঁচিশ বছর হয়ে গেল। তারপরে আবার ঘরের বগলে এখন রাউরকেল্লা, তার বগলে বাণ্ডামুণ্ডার রূপ খুলছে, সাহেব সিং-এর এখন …তা সে যাক গে যাক, ওসব কথা দিয়ে কী হবে।'

এতগুলো 'যাক গে যাক' দিয়ে প্রায় একটি গোটা কাহিনীর সমস্ত সংকেত শেষ করে গাঙ্গুলিমশাই আবার হা হা করে হাসলেন কিন্তু আমার মনটা নানান-ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। গাঙ্গুলিমশাই—জানি না, তিনি কে, কী করেন, কোথায় থাকেন, আমাকে এসব শোনাচ্ছেন কেন? জবাব অবিশ্যি তিনিই দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, একটু ভিন্ বচনে, 'আপনি যদি কারবার করতে এসে থাকেন তাতেও আমাদের কিছু বলবার নেই। বেড়াবার জায়গা অনেক আছে, পুরী আছে, বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা, আরো সব কত কত জায়গা আছে। আর আপনি বেড়াতে এসেছেন এই জঙ্গলে? আপনার বন্ধুটি কে?'

অতঃপর গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথার জবাব দেওয়া উচিত কি না, স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা আমার মনে মনে। মনটা কেমন বিরূপ হয়ে উঠেছে। সোলেমানের বিড়ি, দেশলাই কোম্পানীর জুয়াচুরি এবং তাঁর বিড়ির আসক্তি, সব মিলিয়ে

মানুষটিকে খারাপ লাগছিল না। বিশেষ পথ-চলতি একটি মানুষ, কিছুক্ষণের দেখা কয়েকটি কথা, তার মধ্যে একটি পারিবারিক ছবির আবছা ছায়া, সমগ্র জীবনের কয়েকটি মুহূর্ত, অনেক কোটির মতো, যা হয়তো, এই কামরার বাইরে গেলে আমরা সবাই ভুলে যাব। শ্লেষ আমার খারাপ লাগে না, বিশেষ করে, তা যদি হয় উপযুক্ত পরিবেশে ও কথার পৃষ্ঠে। কিন্তু অবিশ্বাস আর সন্দেহটা, কেমন যেন অসুখের মতো। গাঙ্গুলিমশাইয়ের এই ব্যাধির কারণ কী, জানি না। মহাশয় আমার প্রতি নির্দয় কেন?

তবে একা গাঙ্গুলিমশাইকেই দোষ দিই কেন? সুখেন না দুখেন, সে রকম আরো কয়েকজনের ভাব-সাব তো সেই রকমই দেখলাম। এদিকে চুপ করে আছি দেখে, গাঙ্গুলিমশাইয়ের দৃষ্টি বরং উৎসুক হয়েছে, মুখ ফিরিয়ে নেননি। হঠাৎ হাঁক দিলেন, 'সুখেন, তোমার ম্যাচটা দাও।'

জবাব এল, 'ম্যাচ তো নাই গাঙ্গুলি খুড়া।'

আমার মুখ অন্য দিকে ফেরানো ছিল। গাঙ্গুলিমশায়ের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। উনি কি আমার প্রতি বিরক্ত হয়েছেন? অসন্তুষ্ট? সে রকম কোনো আচরণ তো তাঁর সঙ্গে করিনি। তবে আমাকে এভাবে বঞ্চিত করার কারণ কী? এখনো তো আমার 'ম্যাচবাক্তি'তে কিছু কাঠি আছে। তিনি যদি সব শেষ করেন, কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করব না। মনটা একটু খারাপই হয়ে গেল। বলতে ইচ্ছা করে, মন, তুমি মন কলা খাও গিয়ে। গাঙ্গুলিমশাই কী বলেছেন না বলেছেন, এত তোমার গায়ে মাথার কী দরকার। কোন্ বেলাত থেকে এলে হে, কেউ মুখ বাড়িয়ে রকমারি কথা বললেই ভদ্দরলোকের মান চলে যায়? ভুলে গেলাম নাকি, কার ডাকে এসেছি। কার নিমন্ত্রণে? গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথাতেই, তার রেশ কেটে যায়? মন বিচলিত? এ মন তো না-বুঝ। গাঙ্গুলিমশাইয়ের ধরতাই তো এখনো পাইনি। তবে?

তাড়াতাড়ি দেশলাইটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এই তো আমার কাছে রয়েছে, এটা নিন।'

গাঙ্গুলিমশাই উদাসভাবে দেশলাইটি নিলেন। মা-ঝি-পো, সকলের সঙ্গেই একবার চোখাচোখি হল। পো তখন কী একটা ছায়াছবির বইয়ে মনোনিবেশ করেছে, তবু একবার চোখ তুলে দেখল। মা পান মুখে দিতে দিতে, ঘোমটার ফাঁক থেকে একবার দেখলেন। ঝি-এর ঠোঁটে ওটা কী? হাসি? ষোড়শী না, দেখছি চতুর্দশী বা তারো চব্বিশ ঘণ্টা কম ত্রয়োদশী। আসলে শাড়ি পরেছে, আর গাঙ্গুলিমশাইয়ের মতো পিতাকে ধমকে শাসন করে, আর খিলখিল করে

হাসে, সব মিলিয়ে বয়সটা ধরতে দেয়নি। রোগা বটে, স্বাস্থ্যের, ঔজ্জ্বল্য কিছু কম নেই। ওর চোখের তারায় যেন কেমন দুষ্টামি চিকচিক করছে। একবার দেখছে ওর বাবাকে, আর একবার আমাকে। ও কি ওর মস্তবড় চেহারার অভিমানী ছেলেটিকে দেখে মজা পাচ্ছে নাকি ? অর্থাৎ গাঙ্গুলিমশাইকে। কেন না, আমার নিজেরও সেইরকম মনে হচ্ছে। না-ই বা আমাকে চিনলেন, আমার ওপর অভিমান করতে বাধা কী।

'সব জুয়াচোর।'

বটেই তো, কারণ কাঠি জ্বলছে, নিভছে, বিড়িতে আগুন লাগছে না। তারপরেই হঠাৎ খুকীর প্রশ্ন, 'জরাইকেলায় কাদের বাড়ি যাবেন আপনি ?'

মুখ ফিরিয়ে দেখি, খুকীর কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা আমাকেই। পিতার কৌতূহল চুঁইয়ে ঢুকেছে কন্যাতে। মনে হল, সেটা যে কেবল নিজের কৌতূহল মেটানো, তা না। পিতার মনকেও একটু সহজ স্বচ্ছন্দ করা। হতে পারেন পিতাটি বয়স্ক কিন্তু ছেলে যে বড় মেজাজী। এখন মাকেই তাই দায়িত্ব নিতে হয়। বলতে যে চাইনি, তাও না। গোপন করার তো কিছুই নেই। মহাশয় যে আমাকে সেই কোন সিংজী না পণ্ডিতজী না বাবুজীর সঙ্গে তুলনা করে অকারণ অবিশ্বাসে একটু বিঁধতে চেয়েছিলেন। বললাম, 'গোপালচন্দ্র ঘোষের বাড়ি।'

কন্যার চোখের কালো তারায় অমনি ঝিলিক, মুখে হাসির ছটা, তার সঙ্গে অবাক খুশির ঝলক। বলে উঠল, 'ওমা গোপালদাদাদের বাড়ি ?'

ওদিকে মায়ের চোখেও তখন অবাক কৌতূহলের দৃষ্টি, ঘোমটার ফাঁক থেকে বারেক ছুঁয়ে গেল আমাকে। জোয়ান ছেলেও কী যেন বলতে গেল, তার আগেই গাঙ্গুলিমশাই, শুধু যে অবাক, তা না। যেন কী মুশকিলেই পড়েছেন, এমনিভাবে বললেন, 'ত্যাখো দিকিনি, যাবেন গোপালদের বাড়ি তা সে কথাটা বলতে এত দিকদারি ?'

সেই আবার আমার ওপরেই দোষারোপ। বললাম, 'দিকদারি তো কিছু করিনি। আপনি যে শোনার আগেই কি সব বলেছিলেন, তাতে একটু ঘাবড়ে গেছলাম।'

'ঘাবড়ে গেছলেন ? কেন কেন, আমি আবার কী বললাম আপনাকে ?'

এত তাড়াতাড়ি বিস্মরণ ? আমার বেড়াতে আসার প্রতি তাঁর কটাক্ষ, বলতে গেলে কেমন যেন একটা কটু সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছিল, কথাগুলো এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ? এমন কি সিংজীর সঙ্গে উদাহরণ পর্যন্ত বাদ

যায়নি, যে কী না বেড়াতে আসার নাম করে, জরাইকেলায় রাজ্যপাট বিছিয়ে বসেছেন।

কিন্তু আমাকে কিছু বলতে হল না। এবার পিতার মুখের সামনে জোয়ান দিলে পুত্রতুল্য ঝাড়, 'বলনি? উনি এসেছেন গোপালদাদের বাড়ি বেড়াতে, তুমি শুনিয়ে দিলে সিংবাবুজীর কথা।'

গাঙ্গুলিমশাইয়ের হাতের বিড়ি জ্বলেনি, কারণ জুয়াচোরের দেশলাই জ্বলেনি। শিশুটির মুখ দেখ এখন। যেন ধমক খেয়ে ছেলে বড় মুষড়ে পড়েছেন। কিছু বা বিব্রত অপ্রস্তুত ভাব। কিছু বলবেন ভেবে, মুখ খুলতে গেলেন। তার মধ্যেই কন্যা দিল মুখঝামটা, 'বাবার যত আর আনতে কুড়। কাকে কী বলতে হয়, তার কোনো হাথা মাথা নেই।'

বলে কন্যা মুখ ফিরিয়ে চোখের নজরে সাক্ষী মানতে গেল গর্ভধারিণীকে। অমনি মায়ের গ্রীবায় ঝাঁকি, নাকছাবিতে কাঁপন। ফোঁস করলেন, 'বরাবর এমনি।'

শিশুটির অবস্থা এবার একেবারে কাহিল। শাদা শাদা ক'দিনের আকাটা গোঁফদাড়ি মুখখানি কী অসহায়। এতগুলো অভিভাবক-অভিভাবিকার শাসনে, কী যেন বলবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। যা উগরেছিলেন, এখন তা ঢোঁক গিলে গলস্থ করতে হচ্ছে আর তার একমাত্র পন্থা হচ্ছে হাসি। হেঁ হেঁ করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'আমি কি মন্দ ভেবে কিছু বলেছি নাকি? তা বলিনি। মিছা কথাও তো বলিনি। এই আপনাকেই বলি—' বলে আমার দিকে ফিরলেন, 'অই গোপালকেই জিজ্ঞেস করবেন, কত সব ভাল মানুষ সেজে আসে, বলে, এই একটু বেড়াতে দেখতে শুনতে এলাম। তারপরেই দেখলেন, কোথা থেকে কী হয়ে গেল, সে লোক রাতারাতি ঠিকাদার বনে গেছে। তবে আপনাকে আমি সে কথা বলিনি। মিছামিছি আপনাকে কেন তা বলতে যাব।'

বাহ্ গাঙ্গুলিমশাই, চমৎকার। আপনি কেন মিছামিছি আমাকে ওসব বলতে যাবেন। তবে মন বলে কথা। মনে সেরকম একটা চিন্তা এসে পড়েছিল, তাই বলেছিলেন। তবু আমি বললাম, 'কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন, আমি সত্যি সত্যি বেড়াতে এসেছি। বন দেখতে এসেছি, বন বেড়াতে এসেছি।'

গাঙ্গুলিমশাই একেবারে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার হাঁটুর ওপর। বললেন, 'আরে ছি ছি ছি, আমি কি আপনাকে অবিশ্বাস করছি? কিন্তু দেখেন তো, শালার ম্যাচ তো জ্বালাতে পারছি না। আপনি একটু দেখেন।'

শালার ম্যাচ? নিশ্চয়ই আমাকে বলেননি? ম্যাচের প্রতি বা কোম্পানির প্রতি নিশ্চয়ই। আমি নিজেও একটি সিগারেট ঠোঁটে চেপে, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালাম। আগে দিলাম সোলেমানের বিড়ির মুখে আগুন, তারপরে নিজেরটাতে। গাঙ্গুলিমশাই এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, আরামের শব্দ করলেন, 'আহ্! আপনার হাতে দেখি কাঠি কথা কয়। আর আমার বেলায় ফুচ্ ফুচ্।'

হাসি দমন করা গেল না। চোখাচোখি হয়ে গেল পুত্র কন্যা মাতার সঙ্গে। সকলের মুখেই হাসি। তবে খুকী আর কাঁচা জোয়ানের মুখে কেবল হাসি না। একটা জিজ্ঞাসু কৌতূহলের ঝিলিক। মনে হয়, জিজ্ঞাসা রয়েছে ঠোঁটের পাতে, খসতে একটু দ্বিধা। নয়া মানুষ কী না। ইতিমধ্যে এসে পড়ল মনোহরপুর। ইস্টিশনের ভিড়ভাট্টা মন্দ না। চা পান বিড়ি-ওয়ালাদের দৌড়াদৌড়ির সঙ্গে বনবাসীদের ছুটোছুটিই বেশি। তার মধ্যেই বাঙালী ওড়িয়া বিহারী মাড়োয়ারীদের চলাফেরা, ওঠানামা। ইস্টিশনটি তেমন ছোটখাটো না। বনের সীমা একটু সরে গিয়েছে। গাঙ্গুলিমশাই ছেলেকে আগে নির্দেশ দিলেন, 'একটা ম্যাচবাত্তি কেন তো শিবু। আর যদি তোরা চা খাস তো খা।,

বলে তার কোঁচকানো মোটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে কিছু খুচর, পয়সা বের করে দিলেন। বিড়িতে টান চলেছে সমানে। শিবুর পক্ষে উলটো দিকের জানলায় ভিড় কাটিয়ে যাওয়াই মুশকিল। একদিকে যেমন দরজায় ঠেলাঠেলি, অন্যদিকে তেমনি বসবার আসন, মেঝে আর বাংক, কোথাও তিলধারণের ঠাঁই নেই। তবে শিবু জোয়ান এলেমদার। ঠিক পৌঁছে গেল জানলায়। ফেরিওয়ালাকে ডেকে আগে কিনল দেশলাই। তারপরে ফিরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে কে চা খাবে?'

গাঙ্গুলিমশাই আগে আওয়াজ দিলেন, 'আমার জন্য এক ভাঁড় নিস।'

খুকী বলল, 'আমার জন্যও নিস দাদা।'

'আর মা?' শিবুর উচ্চকণ্ঠ জিজ্ঞাসা।

মা মেয়ের দিকে চেয়ে অসম্মতিতে মাথা নাড়লেন। খুকী জবাব দিল, 'না।'

তারপরেই শুনতে পেলাম, 'আপনি চা খাবেন?'

খুকী জিজ্ঞেস করেছে আমাকে। সুরে স্বরে কোথাও নাগরিকতার ঠাট পাবে না। অনেকটা গ্রাম্য ঘরোয়া অন্তরঙ্গতায় বাজল। সহজ তো বটেই, একেবারে সোজাসুজি। এদিকে আমার জবাবের আগেই গাঙ্গুলিমশাই একেবারে সোজাসুজি তাঁর শিবুকেই হেঁকে নির্দেশ দিলেন, 'ওরে শিবু, ওনার জন্যেও এক ভাঁড় নিস্।'

বলে তাঁর খুকীর দিকে ফিরে বললেন, 'খাবেন না কেন? জরাইকেলায় ভিড়তে এখনো তো কিছু সময় বাকি। তাছাড়া উনি হলেন গোপালের অতিথি।'

ইতিমধ্যে শিবুর ঝাঁজালো গলা বেজে উঠেছে, 'এই তিপু, হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চায়ের ভাঁড়গুলা নিবি তো। আমি কি সব একসঙ্গে নেব নাকি?'

খুকী অমনি উঠে দাঁড়াল। বাবার খুকী, দাদার কাছে তিপু। পুরো নামের ভাঙাচোরা ডাক যে কী দাঁড়ায়। সে এক পরম রহস্য। অনসূয়া 'অনু' হয়, অমিয়া 'অমি', মৃন্ময়ী 'মিনু' হয় ভবানী 'ভবি'। অতএব তিপুর পুরোটা কল্পনা করা সহজ না। যাকে বলে 'রিসার্চ' তার এখন সময় না। দেখছি, তিপুর পক্ষে হাত বাড়িয়ে, ভাঁড় নেওয়া বড় কঠিন। তা হলে আরো একখানি পুরো হাত জোড়া লাগাতে হয়। ওদিক থেকে শিবুর হাত, এদিক থেকে তিপুর হাত, মাঝখানের ফাঁকটা কে ভরাট করবে? করল একজন। একটি বনবাসিনী মেয়ে। কিছু বলতে হল না, সে নিজের থেকেই হাত বাড়িয়ে, তিপুর হাতে ভাঁড় বাড়িয়ে দিল। কিন্তু বনবাসীর এত হাসির কী হল? যেন কী একটা মজার ব্যাপারই ঘটেছে। কৌতূহল হয়। জানতে ইচ্ছা করে। এত সহজে কি তা মেটে?

তিপু আমাকে আর গাঙ্গুলিমশাইকে চায়ের ভাঁড় দিল। তারপরে নিজেরটা নিল। শিবু তখন খাঁটি বাংলায় বনবাসিনীকে জিজ্ঞেস করছে, 'তুই চা খাবি?'

যুবতী বনবাসিনীটি আঁচল টেনে মুখে চাপতে গিয়ে, তার বক্ষস্থল উদাস করে তুলল। কেবল যে লজ্জা পেয়েছে, তা-ই না, যেন বড় অভক্তিতে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না না, ইটা। দীখুলোগ খা।'

বলে, মুখে আঁচল চেপেই কি হাসি। এতক্ষণে যেন বনবাসিনীর হাসির হদিস একটা পাওয়া গেল। চা মানে পানীয়, তার জন্য আবার এত ব্যস্ততা, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। তার জন্যই এত হাসাহাসি। পাহাড় জঙ্গলের অধিবাসীদের তুমি যদি আদিবাসী বলতে পারো, মুণ্ডা বা ওরাওঁ, তা হলে সমতলের গ্রাম আর শহরবাসীদের ওরা দীখু বলবে। আর দীখুদের চা খাওয়ার এমন মাতামাতি দেখলে, কোন বনবাসীর না হাসি পাবে? এরকমটাই মনে হয়।

ইতিমধ্যে আমার কানে বাংলা কথোপকথন বাজছিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জগৎকে আমি বলে দিইচি, সে কাল তিন গ্যালন মবিল নিয়ে যাবে। গাড়ি বসাতে বারণ করে দিইচি। মোহনবাবুর কাজে বড়জামদা হয়ে বাহাদায় যাবে।'

গাঙ্গুলিমশাই হাঁক দিলেন, 'কার সঙ্গে কথা কও সুরীন ?'

জবাব এল, 'সন্তোষের সঙ্গে।'

গাঙ্গুলিমশাই আবার হাঁকলেন, 'তবে সন্তোষকে বলে দাও, জগৎ যেন দু-টাকার দোক্তাপাতা কাল নিয়ে যায়। তোমার খুড়িমার মনে ছিল না, আমারও না, টাটা থেকে আনা হয়নি।'

এবার জবাব এল অন্য গলায়, 'আচ্ছা গাঙ্গুলিখুড়ো পাঠিয়ে দেব। টাকাটা জগতের হাতে দিয়ে দেবেন।'

গাঙ্গুলিমশাই হাঁকলেন, 'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, সন্তোষ, তোমার টাকা মার যাবে না।'

অন্যদিকে, বোধহয় সুরীন আর সন্তোষের গলায় হাসি বাজল। কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, বাংলাদেশেরই কোনো জায়গায় রয়েছি। অথচ জানি, বিহার ছাড়ো-ছাড়ো উড়িষ্যার দরজায় প্রায় ছায়া পড়েছে। যদিও কী না, এ উড়িষ্যা সমুদ্রতীরের বিপরীত, বন-পাহাড়ের সীমানা। এদিকে ঘণ্টা বাজল, এঞ্জিনের সিটি বাজল, গাড়ি দুলে উঠে, অজগরের মতো নড়লো। গাঙ্গুলিমশাই এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, 'শিবুটা আবার গেল কই, ম্যাচটা যে ওর কাছে।'

মহাশয়ের হাতে ইতিমধ্যেই আবার নতুন বিড়ি উঠেছে। আঙুলে টিপন টাপন চলেছে, কানে তামাকের আওয়াজ শোনা হচ্ছে। বিড়ি ছাড়া বোধহয় এক মুহূর্ত চলে না। আবার বললেন, 'খুকী, তোর মাকে একটু পান দিতে বল্।'

চায়ের পরে পান-বিড়ি সহযোগে মৌতাত। কিন্তু সত্যি, শিবু গেল কোথায় ? গোটা কামরায় তাকে দেখি না। অন্য দিকে গৃহিণী কথার আগে প্রস্তুত, বলার অপেক্ষা। কন্যার হাত দিয়ে পান বাড়িয়ে দিলেন। গাঙ্গুলি-মশাই আবার ব্যস্ত হলেন, 'শিবুটা কোথায় গেল ?'

তিপু-ই জবাব দিল, 'কোথায় আবার যাবে, আছে গাড়ির মধ্যেই।'

'ম্যাচটা যে ওর কাছে রয়েছে।'

আমি আমারটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এটাই নিন।'

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'ও আমার হাতে জ্বলবে না। তা হলে আপনিই জ্বালেন।'

অগত্যা। তাঁর বিড়ির মুখে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। তখন চোখে পড়ল, শিবু বেরোচ্ছে বাথরুমের দরজা খুলে, আর সন্ত দরজা খোলা বাথরুমের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগলিয়ে। এবার বুঝহ সন্ধান, শিবু গিয়েছিল কোথা। সম্ভবত মিশিরের বিড়ির গতি করতে গিয়েছিল। পিতার সামনে স্বাধীনতা না

হয় নেই, তা বলে নেশা তো মানে না। বিষয়টা জানত বোধহয় তিপু, সেই কারণেই ওর জবাব ছিল নিরুদ্বেগ শান্ত। শিবু ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে, আগে বাবার হাতে দিল ম্যাচ। গাঙ্গুলিমশাই ম্যাচটি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দেখলেন। মুখে ফুটল হতাশা আর বিরক্তি। বললেন, 'বাজে। যত জুয়াচুরি ব্যাপার।'

তারপরে বিড়িতে টান দিয়ে, একটু যেন সাব্যস্ত হলেন। আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নামটা বলেন তো শুনি।'

জিজ্ঞাসার ভঙ্গিটা এমন যেন, তার ওপরেই নির্ভর করছে, আমার সম্পর্কে তিনি কী মন্তব্য করবেন। কিন্তু আমাকে সহবতেই টলতে হয়, নামটা বলি। গাঙ্গুলিমশাইয়ের ভুরু কোঁচকালো, ঠোঁট ধনুকাকৃতি ও বিস্তৃত হল। যেন মনে মনে কিছু হাতড়ে ফিরে মাথা নেড়ে বললেন, 'নাহ্, এ নাম তো কখনো গোপালের কাছে শুনিনি।'

সেটা নিশ্চয়ই আমার অপরাধ না। না শোনবারও অনেক কারণ। গোপাল আমার বন্ধুর ছোটভাই। বন্ধু যেমন কলকাতাবাসী, তেমনি তার ভাই জরাইকেলায় পৈতৃক ব্যবসায়ে রত এবং বসবাসকারী। কিন্তু শিবুর চোখে কেমন যেন একটা ঝিলিক সেই সঙ্গে তিপুর ভুরুও একটু কেঁপে গেল। ভাই বোনে চোখাচোখি হল। শিবু বলল, 'নিতুর মুখে নামটা শুনেছি যেন।'

আমার মনে পড়ল, নিতু অর্থাৎ নিতাই, গোপালের ছোটভাই। সে-ও জরাইকেলায় থাকে। মাঝে মাঝে কলকাতায় যায়। গাঙ্গুলিমশাই ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললেন, 'উঁহু, আমি তো কোনোদিন এ নাম শুনিনি! আপনি কি গোপালদের আত্মীয়-টাত্মীয় হন?'

বললাম, 'না। আমি গোপালের দাদা বলরামের বন্ধু। সেই সুবাদেই বেড়াতে আসা।'

গাঙ্গুলিমশাই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তাই বলেন, আপনি হলেন গে আমাদের বলরামের বন্ধু। বলরাম তো আবার যেন কী—সেই কী বলে লেখক না কবি?'

শিবু বলল, 'নাট্যকার।'

গাঙ্গুলিমশাই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পালা লেখে।'

আমি বললাম, 'নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সবই বলতে পারেন।'

'বুঝেছি বুঝেছি, বলরাম বেশ এলেমদার ছেলে। কথাবার্তাও খুব ভাল, শান্ত ধীর স্থির, ওই ছেলেই ঘোষ বংশের নাম রাখবে।

ফুট কাটল তিপু, 'আহা আর গোপালদা নিতুদা বুঝি ভাল না?'

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'তা কি বলছি? গোপালও খুব ভাল কাজের ছেলে। তবে নিতুটা একটু অন্যরকম, বড় চঞ্চল আর দাপুটে।'

তার কারণ বোধহয়, নিতুর বয়সটা অনেক কম। এখনো তার কোনো দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে চাপেনি। গাঙ্গুলিমশাই আবার বলেন, 'ছেলেগুলান ভাল সবাই, তবে বলরামের মতন এলেমদার সবাই না। শুনি কলকাতায় তার খুব নাম-ডাক।'

মিথ্যা না, আমার চারুকলাশিল্পী বন্ধুর প্রতিভা আজ স্বীকৃত। বললাম, 'ঠিকই শুনেছেন।'

গাঙ্গুলিমশাই যেন ভারী অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন, বললেন, 'দেখেন তো! আরে মশাই বলবেন তো, আপনি আমাদের বলরামের বন্ধু। তা আপনার নিবাস কোথায়, কলকাতাতেই?'

বললাম, 'এক অর্থে তাই ধরতে পারেন। কলকাতার বাসাড়ে, বাসিন্দা অন্য জায়গার।'

'করেন কী?'

তবেই তো বিপদ! তবে তেমন বোধহয় না। কারণ, বলরাম যখন এলেমদার, আমি একেবারে বরবাদ হয়ে যাব না। বললাম, 'একটু লিখি টিখি।'

শিবু সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিল, 'সেইজন্যই তো বলছিলাম, নামটা কেমন শোনা শোনা। আমি নিতুর মুখে আপনার নাম শুনেছি।'

তিপুও ওর দাদার কথায় তাল দিল, 'আমিও শুনেছি। বইও পড়েছি।'

থাক্, এসব কথা থাক, ওতে বড় ব্যজ। অন্তত আমার মনটা বাজে না।

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'লেখেন টেখেন বুঝলাম, আর কী করেন? আমাদের বলরাম তো সরকারী চাকরি করে। লিখে তো আর টাকা আসে না।'

এই তো বরবাদের লক্ষণ। এই আশঙ্কাটাই করেছিলাম। অতি ক্ষীণস্বরে কবুল করতে হয়, 'আজ্ঞে আর কিছুই করি না।'

গাঙ্গুলিমশাইয়ের ঠোঁট আবার ধনুকাকৃতি ও বিস্তৃত হল, ঘাড় ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ, বড় কঠিন কর্ম। কেবল সরস্বতী ঠাকরুণ হলে তো হবে না, ওনার বোনটিকেও চাই। লক্ষ্মী সরস্বতী একসঙ্গে না দিলে চলবে কেন। যাক, ভগবান করুন, তা-ই যেন হয় আপনার। কিন্তু আহ্হা, বলবেন তো, আপনি বলরামের বন্ধু, লেখেন টেখেন। আমার ছেলে মেয়েরা ইস্তক আপনার নাম জানে, বই পড়েছে। এখন বুঝলাম, কেন আপনি বনে বেড়াতে এসেছেন।'

আমি গাঙ্গুলিমশাইয়ের দিকে জিজ্ঞাসু কৌতূহলে তাকাই। গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'বিভূতিবাবুও ওই জন্যেই আসতেন, ঘুরতেন বেড়াতেন।'

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কোন্ বিভূতিবাবু?'

গাঙ্গুলিমশাইও যেন অবাক হয়ে বললেন, 'কোন্ বিভূতিবাবু আবার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বই লিখতেন যিনি।'

এবার শোন কথা। গাঙ্গুলিমশাই যেন আমার চোখের সামনে, টার্কি মুরগীর মতো রঙ বদলিয়ে চলেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছেন?'

'দেখেছি? এই শোন দিকিনি ছেলেটার কথা।'

বলে তাকালেন তাঁর গোটা পরিবারের দিকে। আমিও তাকালাম সেদিকে। দেখি, মায়ে পোয়ে ঝিয়ে, সবাই মিটিমিটি হাসে। গৃহিণী ঘোমটাটা একটু টানবার চেষ্টা করেন। আর এদিকে গাঙ্গুলিমশাই তখন আমার প্রতি মোহাস্র ছেড়ে যাচ্ছেন, 'বলে, বিভূতিবাবুকে দেখব না? জরাইকেলায় আমার বাড়িতে এসেছেন, খাওয়া-দাওয়া করেছেন, দাওয়ায় বসে কত গল্প বলেছেন, তারপরে আর দেখাদেখির কী আছে। তা ছাড়া উনি তো আবার যশোরের লোক ছিলেন, আমরাও তো যশোরের লোক।'

সে সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল, তাঁর বাচনভঙ্গি আর উচ্চারণে। এতক্ষণ তা হলে আমি কার সঙ্গে কথা বলছিলাম। বনসাহিত্যের সৃষ্টিরাজ্যে যিনি রাজা, সেই রাজা গাঙ্গুলিমশাইয়ের অতিথি হয়েছিলেন, পরিচয় ছিল, খাওয়া-দাওয়া গালগল্প করেছেন একসঙ্গে দাওয়ায় বসে। গাঙ্গুলিমশাইয়ের পায়ের ধুলা নেবার জন্য যে আমার শিরদাঁড়া নত হয়ে পড়ছে। কিন্তু সেও যে আবার থিয়েটারের মতো চমক লাগানো ব্যাপার হবে। নিজেরই তাতে লজ্জা করবে। আমি একবার তাঁর সমগ্র পরিবারের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললাম, 'আপনাদের পরম সৌভাগ্য।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। বাঁড়ুজ্যেমশাই মানুষটিও যে বড় ভাল প্রাণখোলা ঋষির মতো মানুষ। আমাদের বাড়ির পেছনে, উঁচু টিলাটার দিকে তাকিয়ে কী যে দেখতে পেতেন, কে জানে। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হত যেন, সেই টিলার ওপরে কোনো দেবতাকে দেখতে পেয়েছেন।'

এই হলেন গাঙ্গুলিমশাই। বাজেন আটপৌরে ভাষায়, আমার কোথায় যেন তরঙ্গ তুলে দেন। আমার কল্পনায় যেন সত্যি এক ঋষির ছবিই ভেসে

ওঠে। সেই রাজাকে আমি কোনোদিন চোখে দেখতে পাইনি। সেই কথাটাই বললাম, 'তাঁকে আমি কখনো দেখতে পাইনি।'

'আমরা দেখেছি। জরাইকেলার অনেক লোকই দেখেছে। গোটা সারেণ্ডা বনটা যে আতিপাতি করে দেখেছেন। অমন বন-পাগল মানুষ দেখিনি! কী বলব বাবা আপনাকে, মায়েদের দেখেছেন তো ছেলে কোলে করে, তার গোটা শরীর আতিপাতি করে দেখে, কোথায় একটা তিল, কোথায় একটা জড়ুল, কোথায় একটা ফুসকড়ি, দেখতে দেখতে মায়েদের দেখেন না, কেমন যেন ওনাদের চোখ জুড়িয়ে যায়, বিভূতিবাবুর কাছে বন ছিল সেই-রকমের। সব একেবারে হাত দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।'

গায়ে যেন কাঁটা দেয়। মনে মনে বলি আর বলবেন না গাঙ্গুলিমশাই। এই গায়ে কাঁটা দেওয়া অন্যরকম, অনুভূতির এক বেদনানন্দের লহরী। কিন্তু অবাক মানি গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথা শুনে। তাঁর ভাষাও যে ছাপিয়ে রাখবার মতো। বন ভালবাসার এমন তুলনা আর কখনো শুনিনি। এখন আমার মনে একটি সুখ, একটি সান্ত্বনা, আমিও চলেছি সেই জরাইকেলায়। আমিও যাব সেই গভীর সারেণ্ডা বনের পথে পথে, ছায়ায় ছায়ায়, ঝর্ণার ধারে, পাহাড়ি নদীর কূলে কূলে। কিন্তু গাঙ্গুলীমশাইয়ের বাড়িটি যে তীর্থক্ষেত্র। সেখানেও তো একবার যেতে হবে। আহ্বানের অপেক্ষা রাখতে হবে নাকি? তার থেকে নিজেই যেচে বলি, 'জরাইকেলায় গিয়ে, আপনার বাড়িতে একদিন যাব।'

'আমার বাড়িতে?'

গাঙ্গুলিমশাইয়ের মস্ত মুখে এমন ভ্রূকুটি দেখা দিল, মনটা লজ্জা আর ভীরু হতাশায় ভরে গেল। কিন্তু ততক্ষণে শিবু তিপু খল্‌খল্ খিলখিল করে বেজে উঠেছিল। গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'আপনি যাচ্ছেন গোপালদের বাড়িতে আর আমার বাড়িতে যাবেন, সেটা আবার বলে কয়ে?'

তিপু এবার নিজের থেকে বেজে উঠল, 'আমি গিয়ে রোজ আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসব।'

কিশোরীটির কথায়, খুশিতে মনটা টলটলিয়ে উঠল। তার আগেই, কৃতজ্ঞতায়, গাঙ্গুলিমশাইয়ের পায়ে মনে মনে আর একবার লুটিয়ে পড়েছি।

গাঙ্গুলিমশাই আবার বললেন, 'কেবল কি আমার বাড়িতে আসবেন? গোপাল আপনাকে একলা নিয়ে মজা লুটবে, তা আমরা দিই কখনো? আপনাকে আসতে হবে, থাকতে হবে, খেতে হবে। দাওয়ায় বসে গল্পগুজবও করতে হবে।'

আর কী চাও হে। বর যা পাবার, তা সবই পেয়ে গেলে। এখন গাঙ্গুলিমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে কেবল ভাবছি, মানুষ চেনা কত দায়। বোঝা তো বহুত দূর। দিয়াশলাইয়ের কোম্পানিগুলো সব জুয়াচোর, বিড়িতে তামাক কম, কেবল এই কথাটাই যাঁর মুখে শুনে এসেছি, এমন কি একবার আমাকে দংশনেও উদ্যত হয়েছিলেন, এই কী না সেই মানুষ! বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ হৃদয়ে রেখে বসে আছেন।

গাঙ্গুলিমশাই আবার বললেন, 'আর আমার বাড়িতে তো আপনাকে যেতেই হবে।' জরাইকেলার আসল জায়গায় যাবার পথ তো আমার বাড়ির পাশ দিয়েই।'

সেই আসল জায়গাটা কী। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় বলুন তো?'

'কেন কোয়েলের ধারে যখন যাবেন? কোয়েল নদী না দেখলে, জরাইকেলায় আর কী দেখবেন? আর কখনো এসেছেন এদিকে?'

'না।'

'তবে? এই গাড়ি থেকেই কোয়েল নদী দেখতে পাবেন, দাঁড়ান গাড়ি আর একটু আগিয়ে যাক। ওটা তো কেবল নদী না। নদীর পাড় তো সোনার।'

প্রায় থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করি, 'সোনার?'

'হ্যাঁ, সোনার চর। জানেন না বুঝি? কত সোনাখোঁচারা, সোনা খুঁচিয়ে ফিরছে।'

যত শুনি, অবাক মানি তত। সই সঙ্গে মনে মনে বড় কৌতূহল আর ব্যগ্রতা। সোজাভাবেই বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না। সোনার চর মানে?'

'সোনার চর মানে, সোনার চর। দাঁড়ান, একটা বিড়ি ধরাই।'

এই তো হয় মুশকিল। তবে এবার আর আমি জ্বালানো নেভানো আর জুয়াচোরদের প্রতি গালাগাল শুনতে রাজী না। নিজেই তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বালিয়ে ধরে বললাম, 'নিন ধরান।'

গাঙ্গুলিমশাই নির্বিকার মুখেই বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'কোয়েল নদীর ধারে ধারে, কোয়েল নদীর জলে, সোনা আছে বুঝলেন তো? সত্যিকারের সোনা বালিতে মেশানো থাকে। কোয়েলের চরের রঙ দেখবেন সোনালী। তার মানে হল গে, কোয়েল তো আসছে পাহাড় থেকে। সেই পাহাড়ের কোথাও আছে সোনার খনি। ছিল বলেই জানতাম, এখন আছে কী না, জানি না। তবে সোনাখোঁচারা এখনো সোনা খুঁচিয়ে বেড়ায়। পায়ও।'

জিজ্ঞেস করি, 'সোনাখোঁচা কী?'

গাঙ্গুলিমশাই হাসলেন হেঁ হেঁ করে। বললেন, 'কাদাখোঁচার মতন। পাখি কেন কাদা খোঁচায় বলেন তো?'

প্রায় বুদ্ধিমান ছাত্রের মতো হেসে বলি, 'খাবার জন্যে।'

'কী খাবার জন্যে?'

রীতিমতো মাস্টারমশাইয়ের মতো প্রশ্ন। আমার চোখ পড়ে যায় তিপুর দিকে। ওর ঝিলিকহানা চোখ দেখছিল আমাকে। বোকা ছাত্রকে চুরিয়ে জবাব বলে দেবার মতো, কী যেন একটা ইশারা করতে চাইল। কিন্তু তার দরকার ছিল না। জবাবটা আমার জানা ছিল। কাদাখোঁচা পাখি কাদা খুঁচিয়ে পোকা খোঁজে। কাদার পোকা। বললাম, 'পোকা খাবার জন্য।'

গাঙ্গুলিমশাই খুশি হয়ে বললেন, 'এই হল গে কথা! সোনা খোঁচারা বালি খোঁচায় সোনার জন্য।'

তথাপি আমার জবাব মিলছে কোথায়। সোনাখোঁচা নামে কি কোনো পাখি আছে? বললাম, 'সোনাখোঁচা নামে কোনো পাখির নাম কখনো শুনিনি।'

গাঙ্গুলিমশাই তাঁর বিশালবপু শরীরখানিসুদ্ধ প্রায় আমার দিকে ফিরে তাকালেন। অন্য দিকে হাসির ঝংকারটা তিপুর গলাতেই বেজে উঠল জোরে। কিন্তু গাঙ্গুলিমশাইয়ের চোখে ভ্রূকুটি বিস্ময়। বললেন, 'এই এক দেখি, আপনাদের লেখক মানুষদের যা প্রাণ চায় তাই ভেবে বসে থাকেন। আপনারা সব বানিয়ে ভাবেন, নিজের মনের মতন। বিভূতিবাবুকেও দেখেছি। আর আমাদের বলরামের তো কথাই নাই। সে তো কোয়েলের চরে দাঁড়িয়ে কী যে সব মাথামুণ্ডু বলতে থাকে, আমি ছাই বুঝি না।'

তিপু বলে উঠল, 'কী আবার বলবে, বলরামদা কবিতা বলে।'

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'এই শোন, নদীর চরে দাঁড়িয়ে কবিতা বানাতে শুরু করে দেয়, অথচ তার বিন্দুবিসর্গও বোঝা যাবে না। আপনিও তেমনি, বলে দিলেন, সোনাখোঁচা পাখির নাম কোনোদিন শোনেন নাই। আরে আমি কি বলেছি, সোনাখোঁচা পাখির নাম?'

কিশোরী তিপু আবার খিলখিলিয়ে বেজে উঠল। সেই সঙ্গে শিবু আর তার মা-ও আছে। আমিই একটু যেন বিব্রত আর বোকা হয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি, 'তবে সোনাখোঁচা কী?'

'সোনাখোঁচা মানুষ।'

গাঙ্গুলিমশাই জবাব দিলেন, 'যারা সোনা খোঁচায়, তারাই সোনাখোঁচা।'

এমন সরলভাবে বুঝিয়ে বলে দিলেন, তারপরে আর বলার কিছুই থাকে না। কিন্তু নিজের বুদ্ধিকেই বা খাটো করে দেখব কেমন করে। সোনাখোঁচার পরে কাদাখোঁচার নামটা তিনি তুলেছিলেন। আর সোনাখোঁচা নামটাই এমন, শুনলেই কেমন পাখি পাখি মনে হয়। তার চেয়েও অবাক লাগে, যে মানুষেরা শিল্পী বা কবি আখ্যায় ভূষিত হয়নি, তাদের মুখ দিয়ে এমন একটি আশ্চর্য নাম! আসলে কথাশিল্পী সবাই, তার ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে সকলের মুখে মুখে। যার কানে বাজে, বাজবার মতো করে, সে তখন হয়ে ওঠে চিহ্নিত রূপকার হয়ে। শ্রবণের থেকে মহৎ কী আছে। রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটা মনে পড়ে যায়, 'আমাকে যদি শ্রুতি আর দৃষ্টি, দুটোর কোনো একটা হারাবার হত, আমি দৃষ্টি হারাতে রাজী হতাম, শ্রুতি নয়।' ইচ্ছা করে, তালে তাল দিয়ে, আমিও এমনি করে বলি। বিশ্বচরাচরের যে মহাসঙ্গীত নিরন্তর বেজে চলেছে, শ্রুতি না থাকলে, তার কোনো রহস্যই ধরা যায় না। পতঙ্গের পাখা ঝাপটা থেকে শুরু করে, সবই যে শব্দে বাজে।

'অই অই অই দেখেন কোয়েল নদী।'

গাঙ্গুলিমশাই হাত তুলে দেখালেন। আমি ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অনিবিড় বনের ফাঁকে, দূরে নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলেছে ইস্পাতরঙ কোয়েল। পাহাড়ী নদীর শীর্ণতা তার নেই। গভীরতা টের পাই না। চওড়ায় অনেকখানি, রৌদ্রচ্ছটায় চিকচিক করছে। মাঝে মাঝে বিশাল বনহস্তী যেন জলের বুকে পিঠ ভাসিয়ে রয়েছে, এমনি পাথর। আরো দূরান্তরে ঘন আর নিবিড় লম্বা লম্বা ঘাস। হঠাৎ মনে হয় বুঝি কাশবন।

কিন্তু চোখের তৃষ্ণা মেটে না, হঠাৎ কোয়েল হারিয়ে যায় বাঁকের মুখে। সহসা বন হয়ে ওঠে নিবিড়। রেললাইন মোড় নিয়ে চলে যায় আর একদিকে। মন আনচান করে। চোখের সামনে ভেসে থাকে কেবল, চওড়া আঁকাবাঁকা সুদীর্ঘ একটি ইস্পাত-চিকচিক ছবি।

'মাছ বড় মিষ্টি।'

কথা এল একেবারে ভিন্ন জগৎ থেকে। শব্দে বাজল যেন রসনার আস্বাদ। গাঙ্গুলিমশাইয়ের দিকে ফিরে তাকাই। নিভে যাওয়া পোড়া বিড়ি আঙুলে ধরে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলছেন, 'কোয়েলের মাছের কথা বলছি। রাঘব-বোয়াল আর রুই-কাতলা মেলে না। ছোট ছোট মাছ, যেমন মিষ্টি তেমনি স্বাদ। আহা, তেল-ঝাল যা হয়!…

গাঙ্গুলিমশাই সত্যি সত্যি ঢোঁক গিললেন। আর আমি, যে কী না কোয়েলের ছবির স্বপ্নে ছিলাম, আমারও মনে হল যেন, মাছের ঝালের স্বাদ পেলাম। এর নাম মানুষ। সে যে কখন কোথা থেকে কোথায়, কেউ বলতে পারে না। তিপু দেখছি, ওর কিশোরী চোখ দুটি মেলে মিটিমিটি হাসছে। বলে উঠল, 'আপনাকে খাওয়াব।'

চমৎকার! লক্ষ্মী মেয়ে। এতক্ষণে তিপুর সঙ্গে আমার মুখোমুখি কথা, জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি তো?'

তিপু চোখের তারা ঘুরিয়ে বলল, 'আমি বুঝি মিথ্যা বলছি? দেখবেন খাওয়াই কী না।'

আমি একবার ওর মায়ের দিকে দেখি। ঘোমটার ফাঁক থেকে তিনি কন্যার দিকেই দেখছেন। গাঙ্গুলিমশাই পোড়া বিড়ি কামড়ে ধরে বললেন, 'আমাদের খুকী খুব ভাল মাছের ঝাল রাঁধতে পারে।'

খুকী সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'ভাল না ছাই।'

বলেই আমার দিকে তাকাতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে গেল। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি, তিপু নিজের হাতে মাছের ঝোল রান্না করে খাওয়াবে। ভেবেছিলাম, সে খাওয়াবে, রাঁধবেন নিশ্চয় ওর মা। ওর গুণের কথাটা শুনে, খুশি হয়ে উঠলাম। বললাম, 'ভাল না ছাই, সেটা আমি খেয়ে বলব।'

তিপু আরো একটু লজ্জা পেয়ে, চোখের পাতা নামাল। আবার তাকাল। গাঙ্গুলিমশাই সার্থকভাবে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে বিড়ি ধরালেন। বললেন, 'মেয়ের আমার রান্না খুব ভাল। কেবল নুনের হাতটা একটু খরো।'

তিপু অমনি সোহাগী অভিমানে ঝামটা দিল, 'দেখছ তো মা।'

মা কিছু বলার আগে, বাবা আবার বললেন, 'তবে তাতে কিছু যায় আসে না। একমুঠো ভাত বেশি মেখে নিলেই নুন খরা কেটে যায়।'

তিপু এবার আর মাকে না, একেবারে বাবাকেই, টুকটুকে লাল জিভটি দেখিয়ে ভেংচে দিল, 'অ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।'

গাঙ্গুলিমশাই আমার দিকে তাকিয়ে একখানি হাসি দিলেন। গুটিকয় লাল ছোপ ধরা দাঁত, আর বুড়ো চোখের পাতা পিটপিট। আমার হাসিটা বেজে উঠতে চাইল জোরে। তিপুর ঠোঁট ফুলে উঠতে পারে, ভয়ে সামলে নিতে হল। এবার বুঝহ সুজন, বাপ বেটির আঁতাতটি কেমন।

এমন সময় শিবু ঘোষণা করল, 'জরাইকেলা আসছে।'

সঙ্গে সঙ্গে গাঙ্গুলিমশাই ব্যস্ত। উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করে বললেন, 'এল?'

শিবু প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না তো। তুমি মাকে আর তিপুকে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে থাকো। মালপত্তর আমি এগিয়ে নিচ্ছি।'

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'তুই একলা পারবি কেন। একটা ট্রাংক দুটো বড় বড় বোঁচকা।'

'হচ্ছে হচ্ছে। তিপু তুই তোর ব্যাগটা নে।'

তিপু বলল, 'নিয়েছি।'

পায়ের কাছে যে বনবাসীটি বসেছিল হাতে ফিকা নিয়ে, সে এবার উঠে দাঁড়াল। শিবু অনায়াসে তাকে বলল, 'ধর তো ভাই ট্রাংকটা, দরজার কাছে নিয়ে যা।' ট্রাংকটা ছিল আসনের নিচে। বনবাসীটি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। বলল, 'হোয় হোয়, তুই যা।'

অবাক হয়ে দেখি বনবাসিনীটিও গাঙ্গুলিমশাইদের বোঁচকা ধরে টানাটানি করছে। যেন, এ আবার বলাবলির কী আছে। তোরা হেথায় নামবি, মালগুলো নামিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা। দেওয়া হচ্ছে, তোরা আগে নাম তো। গাঙ্গুলিমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা কোথায় যাবি?'

বনবাসীটি বলল, 'বাণ্ডামুণ্ডা।'

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'তাই বল্। তোদের তো এখন সকলেরই বাণ্ডামুণ্ডার টান।'

কথাটার অর্থ বুঝলাম না, বাণ্ডামুণ্ডার টান কেন। রেল কোম্পানির বইয়ে দেখেছি, বাণ্ডামুণ্ডা হল, রাউরকেলার আগের ইস্টিশন। রাউরকেলা উড়িষ্যার ইস্পাত-নগরী। গাঙ্গুলিমশাইয়ের হঠাৎ খেয়াল হল, আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার মালপত্র কোথায়?'

বাংকের দিকে দেখিয়ে বললাম, 'একটা স্যুটকেস ছাড়া আর কিছু নেই। স্টেশনে কুলি পাওয়া যাবে না?'

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'এখানে ওসব পাওয়া যায় না।'

আমি নিজের হাতে স্যুটকেসটা নামাবার জন্য হাত বাড়ালাম। শিবু বলে উঠল, 'আপনি যান না, আমি সব নামিয়ে দিচ্ছি। যান যান, আপনি যান।'

গাঙ্গুলিমশাইও আমাকে ডাকলেন, 'আসেন যাই।'

তথাপি একটু দ্বিধা থেকে যায়। যদিও তাতে কোনো লাভ নেই মনে হচ্ছে। অতএব গাঙ্গুলিমশাইয়ের পিছনে পিছনে চলি। আমার পিছনে তিপু,

তার পিছনে মা। গাড়ির গতি অতি মন্দ, প্রায় থামে থামে। আর গাঙ্গুলিমশাই হেঁকে চলেছেন, 'এই, ওরে সর একটু। ইস্, ত্যাখো কোথায় সব মাল-পত্তর রেখেছে। এক চিমটি জায়গা রাখেনি। অ স্বরীন—!'

দরজার কাছ থেকে জবাব আসে, 'আসেন।'

গাড়ি থামবার আগে ঝাঁকুনি খেল। তিপু আমার পিঠের জামা শক্ত করে চেপে ধরল। আমি পিছন ফিরে ওকে দেখলাম। হাসছে, কিন্তু লজ্জা পায়নি। বলল, 'পড়ে যাচ্ছিলাম।'

বললাম, 'ধরে থাকো।'

পিছন দিক থেকেও চাপ। নামবার যাত্রী কেবল আমরা না। যাত্রী আছে, তা ছাড়া আছে মালপত্র নিয়ে এগিয়ে আসার চাপ। সকলের সঙ্গে সকলের শরীর পিষ্ট। যাকে বলে দলা পাকানো, প্রায় তেমনি করে নেমে এলাম সবাই। ওঠবার যাত্রীদের ভিড়ও কম নেই দরজার কাছে। প্ল্যাটফরমে নামতে না নামতেই শুনলাম, 'কী রে তিপু, তোরাও এলি আজ?'

পাশ ফিরে দেখি নিতাই, অর্থাৎ নিতু, বলরামের ছোটভাই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলল, 'আপনার জন্যই আমি এসেছি। মেজদা গেছে জঙ্গলে।'

মেজদা অর্থে গোপাল। জঙ্গলে বাস, জঙ্গলেই কাজ। কত দূরে গিয়েছে, কে জানে। নিতু আসাতে স্বস্তি বোধ করছি।

তিপু বলল, 'নিতুদা, তুমি না এলে, ওঁকে আমি তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতাম।'

নিতু হেসে বলল, 'তাই নাকি? তুই ওঁকে চিনিস?'

তিপু বললে, 'হ্যাঁ, রেলগাড়িতে চেনা হয়ে গেল।'

বলে তিপু একবার আমার দিকে চেয়ে হাসল। নিতু চেঁচিয়ে উঠল, 'শিবুও এসেছিস?'

তার গলায় খুশির ঝঙ্কার। শিবুও সেই ভাবেই জবাব দিল, 'হ্যাঁরে।'

বলে শিবু তখন সেই বনবাসীটিকে কিছু পয়সা দেবার চেষ্টায় আছে। আর বনবাসীটি হাতের ঝাপটা দিয়ে বারে বারে বলছে, 'যা যা, ঘরকে যা।'

শিবু বনবাসিনীটিকে পয়সা দিতে গিয়ে একই জবাব পেল, এবং সেই সঙ্গে দু'জনের কী হাসি। গাঙ্গুলিমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে নিতু, তোদের খবর সব ভাল তো? ত্যাখ্ তোদের অতিথিকে তো আমরাই নিয়ে এলাম। শুনলাম বলরামের দোসর।'

যদিও জবাবের কোনো প্রত্যাশাই তাঁর নেই। সঙ্গে সঙ্গেই আবার শিবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যারে শিবু, এসব মালপত্তর নিয়ে এখন বাড়ি যাবি কেমন করে?'

শিবু বলল, 'দেখছি। তুমি মা আর তিপুকে নিয়ে হাঁটা দাও না। আমি কারোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

গাঙ্গুলিমশাই আমার দিকে ফিরে বললেন, 'চলি বাবা, আমরা থাকি রেল-লাইনের ওপারে। নিতুরা থাকে এ পারে।' বলে হাত দিয়ে দু-দিকে দেখিয়ে নিতুকে বললেন, 'অরে নিতু, এনাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি আসিস। গোপাল কোথায়?'

নিতু জবাব দিল, 'মেজদা ছোট নাগরায় গেছে।'

গাঙ্গুলিমশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'জেমা আছে তো বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, ও না থাকলে রান্নাবান্না করবে কে?'

'যাক, মেয়েটা আছে বলে তোরা বেঁচে গেলি। গোপালটাকে এবার বিয়েটিয়ে করতে বল্।'

নিতু হাসল, বলল, 'সে তো আপনারা বলবেন।'

এদিকে গাঙ্গুলিগিন্নী নিচু স্বরে কী যেন বললেন তিপুকে। তিপু বলল, 'বাবা চলো, অনেক বেলা হয়েছে, এখন গিয়ে রান্নাবান্না করতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চল্।'

গাঙ্গুলিমশাই প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। গিন্নী পিছনে পিছনে। তিপু আমাকে বলল, 'আমাদের বাড়ি আসছেন তো?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

'আজ বিকালেই আসুন না। নিতুদা নিয়ে আসবে।'

নিতুর চোখে দুষ্টুহাসির ঝিলিক। বলল, 'তিপু যে খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছিস্। এক গাড়িতে এলি, আবার আজ বিকালেই দেখা চাই?'

তিপু হঠাৎ লজ্জা পেয়ে, কথার কোনো জবাব না দিয়ে, হাত বাড়িয়ে নিতুর ফর্সা ঘাড়ের কাছে চিমটি কেটে দিল। নিতু লাফিয়ে উঠে বলল, 'উহু, ওরে রাক্ষুসী, মাংস তুলে নিয়েছিস।'

তিপু বলল, 'বেশ করেছি। কেন বললে?'

নিতুকে সেই রকমের ছেলে বলা যায়, যাকে আমরা বলি মুখ ফাজিল। বাক্যেতে যে যন্ত্রণা দেয় না, কিন্তু হাসির মধুর সঙ্গে একটু ঝাল মিশিয়ে দেয়, যার স্বাদটা আলাদা। অন্যদিকে ওর মনটা শাদা যাকে বলে অকৃত্রিম, আর

এক দিকে বুদ্ধির ধারটা বেশ শানানো। তিপুর চিমটিটা সে সহজে নিল না, বলল, 'তা এখন শাড়ি পরেছিস, চোখ খুলে গেছে।'

তিপু তৎক্ষণাৎ আবার হাত বাড়াল। কিন্তু নিতু এবার সাবধান ছিল। ঝটিতি কাত হয়ে সরে গেল। তিপু কপট রাগে বলল, 'আচ্ছা, আর কখনো বুঝি পাব না! দেখছেন তো, কেমন পেছনে লাগছে?'

বলে আমাকে সাক্ষী মানলো। সারা রাত্রি গাড়িতে থাকার পরে, মাটিতে নেমে, আর এই বনপাহাড়ের দেশে প্রথম ফাল্গুনের রোদে দাঁড়িয়ে, এমনিতেই আমার ভাল লাগছিল। তার সঙ্গে, সকলের কথাবার্তা, আশে-পাশে বনবাসী ও বাসিনীদের, কারো কৌতূহলিত দৃষ্টিপাত, কারোর বা উদাস হয়ে চলে যাওয়া, এবং তার সঙ্গে নিতু তিপুর এই খুনসুটি, কেমন একটা খুশির হাওয়ায় দুলিয়ে দিচ্ছে। নিতুকে আমার খুব ভালোই জানা আছে। এই 'পিছনে লাগার ব্যাপারটা ওর বেশ আয়ত্তে আছে। বললাম, 'নিতু এখন থাক না, ছেড়ে দাও।'

নিতু বলল, 'আমি কি আর সাধে বলছি। আপনার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে দেখুন না। যেন জোড় বাঁধা কলাবৌটি এল। তা বিকেলে কেন, এখনই সঙ্গে নিয়ে যা না।'

তিপু এবার পা দাপিয়ে, প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠল, 'ও মা গো, উহ্!'

নিতুর এটা একটু বাড়াবাড়ি, যদিও সত্যি আমি আর ওদের সম্পর্কের বিষয়ে কতটুকুই বা জানি। তবু বললাম, 'কি হচ্ছে নিতু!'

নিতু বলল, 'আচ্ছা, আর বলব না। তা তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কাকাবাবু ও কাকীমার সঙ্গে চলে গেলি না কেন?'

তিপু ঝাম্‌টা দিয়ে বলল, 'আমার ইচ্ছা।'

নিতু ঠোঁট টিপে হাসল, আড়চোখে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। ওদিকে শিবু সুরীন নামক লোকটির সঙ্গে কী যে বকবক করে চলেছে, সে-ই জানে। লক্ষ্যণীয়, সুরীন যার নাম, রোগা লম্বা কালো শক্ত চেহারার লোকটি মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এদিকে তিপু গরগর করছে, 'দাঁড়াও না, তোমাকে আমি দেখাব।'

জবাবে নিতুর সেই হাসি। এবার সুরীন বলল, 'আর কোনো ব্যাটা বেটিকেই এখন পাওয়া যাবে না। চল্, হাতে হাতে নিজেরাই নিয়ে যাই।'

শিবু বলল, 'তাই যেতে হবে দেখছি। চেনাশোনা কাউকে তো দেখছি না।'

নিতু বলল, 'ডেকে আনব কাউকে ? নাকার কাছে অনেকে বসেছিল দেখেছি।'

সুরীন বলল, 'হ্যাঁ, এখন যাবি নাকায়, লোক ডেকে নিয়ে আসবি সেখান থেকে। নে চল, যাওয়া যাক।'

এমন সময়ে দূর থেকে শোনা গেল, 'আ গিয়া রে শিবু, হম আ গিয়া।'

শিবু একেবারে দিশী ভাষায় বাজল, 'ওই দেখ শালা, গোমা আসছে।'

তাকিয়ে দেখি, দূর থেকে খালি গায়ে হাফ-প্যান্ট পরা একটি জোয়ান ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে আসতে শিবু জিজ্ঞেস করল, 'কে বলল তোকে ?'

গোমা যার নাম, তার মুখটাই বোধহয় হাসির অভিব্যক্তি দিয়ে তৈরি। বলল, 'তোর বাপ।'

যেন একেবারে খাঁটি বাংলায় কথা বলল। তারপরে আবার বলল, 'সিং সাবকা মোকাম কা সামনে বৈঠ্ রহা, বাবুকো দেখা, বাবু হুকুম দিয়া, দৌড়কে আয়া।'

শিবু বলল, 'বেশ করেছ চাঁদ, এখন মালগুলো নে।'

গোমা বলল, 'দে।'

সুরীন আর শিবু গোমার মাথায় ট্রাংক আর দুটো বেশ বড় বড় চটের থলি তুলে দিল। সে বিনাবাক্যে প্রায় দৌড় দিল। সুরীন লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স হবে। হঠাৎ হেসে হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল। আমি একটু অবাক ব্যস্তভাবে নমস্কার ফিরিয়ে দিলাম। সুরীন বলল, 'আমাদের জরাইকেলায় বেড়াতে এসেছেন আপনি, খুব আনন্দের কথা। পরে আবার দেখা হবে। এখন চলি।'

কেবল বলতে পারলাম, 'আচ্ছা, পরে দেখা হবে।'

শিবু ডাকল, 'তিপু আয়।'

আমার দিকে ফিরে বলল, 'যাচ্ছি। এবার আপনি ঢুকবেন উড়িষ্যায়, আমরা বিহারেই থেকে যাচ্ছি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই নাকি ?'

নিতু জবাব দিল, 'হ্যাঁ। এই প্ল্যাটফরম থেকে নেমে গেলেই আমরা উড়িষ্যায় ঢুকে যাচ্ছি। স্টেশনটা বিহারের মধ্যে।'

বললাম, 'একেবারে সীমান্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি বল।'

নিতু প্ল্যাটফরমের বাইরে একটা ছোট খাদের ওপর গাছের গুঁড়ি পাতা সাঁকো দেখিয়ে বলল, 'ওপারটা উড়িষ্যা।'

বলে নিতু আমার সুটকেসটা তুলে নিল। আমি বললাম, 'আমাকেই দাও না।'

যেন একেবারে অলীক কথা বলেছি, এমনিভাবে নিতু বলল, 'মাথা খারাপ!'

শিবু পা বাড়াতে উদ্যত হয়ে বলল, 'তিপু আয়।'

তিপু আমার দিকেই তাকিয়েছিল। ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'যাচ্ছি।'

নিতু আবার একটু চিমটি কাটল, 'তিপু তো আমাদের বাড়িতেও যেতে পারিস।'

তিপু স্পষ্ট করেই জবাব দিল, 'পারিই তো। মা এখন একলা রান্না করবে, তা না হলে যেতাম। তোমাকে বলতে হত না।'

নিতু চলতে উদ্যত হয়ে বলল, 'উরে শাব্বাশ্।'

আমি এবার তিপুকে বলি, 'চলি।'

তিপু বলল, 'বিকেলে আসছেন, কোয়েলের পাড়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

শিবু তখন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তিপু পিছন ফিরে দৌড় দিল। পিঠের ওপর বিনুনিটা দুলছে। যেন এই বনাঞ্চলেরই একটি কিশোরী বনবাসিনী। সরল নিষ্পাপ স্নিগ্ধ, অথচ কোথায় যেন একটি লাজে লাজানো ভাব আছে। আমি মুখ ফিরিয়ে, নিতুর সঙ্গ ধরলাম।

এতক্ষণ নানান কথার মধ্যেও, আমার শ্রবণ বারে বারে চকিত হচ্ছিল। এখন স্পষ্টই শুনতে পেলাম, ঝিঁঝির ডাক। যদিও আশে পাশে ঘন বন নেই। সুরকি ফেলা ইঁট বাঁধানো এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। আশে পাশে দু'একটা দোকান। আঞ্চলিক নরনারীরা চলাফেরা করছে। আশে পাশে ঝোপ-ঝাড় দেখে মনে হচ্ছে, অধিকাংশই বনগাঁদা আর বনশিউলি। কেবল যে ঝিঁঝির ডাক শুনছি, তা না। কোনো কোনো পাখিও কোথায় যেন ডাকছে। মনে হয় টুনটুনি আর বুলবুলি, একজনের একটু তীক্ষ্ণ, আর একজনের একটু স্নিগ্ধ শিস্ বাজছে। কিন্তু গাড়ি থেকে নামা পর্যন্ত একটা বিলম্বিত ঘস্ ঘস্ একটানা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। অথচ শব্দটা যান্ত্রিক বলে মনে হচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'নিতু, এই শব্দটা কিসের?'

নিতু উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শুনে বলল, ওহ্, 'ওই ঘস্ ঘস্ শব্দটা? করাতিরা করাত চালাচ্ছে। লম্বা বড় করাত—বড় বড় শালের গুঁড়ি চেরাই হচ্ছে। পরে আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাব।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তখন বলছিলে নাকা থেকে লোক ডেকে নিয়ে আসবে। সে জায়গাটা কোথায় ?'

নিতু হেসে বলল, 'ওহ্, নাকা মানে ঠিক কোনো জায়গার নাম না। রিজার্ভ ফরেস্টে ঢুকতে হলে যে সব গেট আছে, তাকে নাকা বলে। এই দেশী কথা। এরা বলে নাকা চেক। গাড়ি লরী ঢুকতে হলে, ওই সব গেট দিয়ে ঢুকতে হয়। তার জন্য আলাদা পারমিশন লাগে।'

এরকম ব্যাপার আমার জানা ছিল না। এতকাল জানতাম, বন অরণ্য প্রকৃতির রাজ্য সেখানে সকলের অবারিত দ্বার। সেখানেও যে এত বিধিনিষেধ আছে, আগে জানিনি। নিতুর বয়স বছর কুড়ি, কিন্তু এখানে ছেলেবেলা থেকে যাতায়াত। কারণ এই অরণ্যদেশে ঠিকাদার এবং লরীর ব্যবসাটা ওদের দুই পুরুষের। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন অনুমতি লাগে কেন ?'

নিতু খানিকটা অবাক স্বরে বলল, 'বাহ্, তা না হলে, যে খুশি গাছ কেটে চুরি করে নিয়ে চলে যাবে না ?'

খুব স্বাভাবিক কথা। তা না হলে আর সংরক্ষিত বন বলা হয়েছে কেন। সরকারের সংরক্ষণের স্বার্থই বা থাকে কোথায়। নিজেকেই আমার বেকুফ্ বলে মনে হয়। ইতিমধ্যেই আমরা উড়িষ্যায় পা দিয়েছি। আশে পাশে বিচ্ছিন্ন দু'একটা মাটির ঘর দেখা যায়। গৃহস্থের দেখা পাওয়া যায় না। বাতাসে যে কেবল শালকাঠের গুঁড়ির গন্ধ, তা না। একেবারে নতুন একটা অচেনা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। গভীর বন নয়, এ গন্ধও তার নয়। কিন্তু কেমন একটা পাঁচমিশেলি গন্ধ, যাকে বনজ বলাই উচিত।

হঠাৎ বনশিউলির ঝোপের কাছ থেকে, একটি লোক এগিয়ে এল টলতে টলতে। এসেই নিতুর হাত থেকে আমার স্যুটকেসটা টেনে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'আই বাবা, বোঙা হামকো খা লেগারে লিতু বাবু, বাকসোটা হামকো দে, লে যায়েগা।'

নিতু ঝাঁজিয়ে বলল, 'ভাগ্, ব্যাটা মাতাল হয়ে আছিস, ফেলে-টেলে দিবি।'

লোকটির খালি গা। উলঙ্গই বলা যেতে পারত। কিন্তু কানি বলতে যা বোঝায়, তাই দিয়ে সে তার লজ্জা রক্ষা করেছে মাত্র। একমাথা পাকানো পাকানো ধূসর চুল, ঘাড়ের কাছে জট বাঁধবার উপক্রম করেছে। দুই কানের ফুটোয়, প্রায় এক জ মোটা গাছের ডাল পোরা, বোধহয় ওটা কর্ণভূষণ। গলায় কালো সুতোর সঙ্গে, ছোটখাটো একটি গাছের ডালই যেন বাঁধা রয়েছে। জানি না এটি কণ্ঠহার অথবা কোনো মন্ত্রপূত মাদুলি। চোখের বর্ণ টকটকে লাল,

তারা দুটো ধূসর দেখাচ্ছে। বয়সে প্রৌঢ় হলেও, গা হাত পা পেটানো শক্ত। তার গোটা গা থেকেই বোধহয়, পানীয়র গন্ধ বেরোচ্ছে, যা মোটেই সুখকর না। বলল, 'কা বোল্‌তা রে তু লিতুবাবু। হাম মংলা না? হামারা হাত সে বাক্‌সা গির যায়েগা?'

বাংলা কথার জবাব দিব্যি হিন্দীতে দিয়ে চলেছে। তার মানে, বাংলা কথা বুঝতে পারে, বলতে পারে না। নিতুর হাত থেকে একরকম ছিনিয়েই নিয়ে নিল স্যুটকেসটা। তারপরে আমার দিকে ফিরে, নিচু হয়ে কপালে হাত ঠেকাল। বলল, 'সালাম বাবু। কলকাতা সে আতা?'

জবাব দিল নিতু, 'হ্যাঁ।'

লোকটি টাল খেয়ে একবার রাস্তার ধারে চলে গেল। আবার সোজা হয়ে বলল, 'উতো হামকো দেখকে মালুম হো গিয়া, কলকাতাকা বাবু। উসলিয়ে তো হাম বাক্‌সা তেরা হাত সে লিয়া রে লিতুবাবু।'

নিতু আমার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, 'তা আর জানি না, তুই মংলা মুণ্ডা, মতলব ছাড়া চলিস না। কিন্তু একটা পয়সাও পাবি না।'

মংলা মুণ্ডা আমার দিকে চেয়ে হাসল। তার হলুদ দাঁত দেখা গেল। চোখ দুটো যে কোথায় গেল, বোঝা গেল না, কেবল আলপিনের মতো দুটো সরু ঝিলিক দেখা গেল। একটু জড়ানো স্বরে বলল, 'আহ্ লিতুবাবু। বাবুকা পকেট মে লাখো পয়সা হায়। তু কাহে দেগা, বাবু হামকো দেগা।'

নিতু বলল, 'হ্যাঁ, বাবু তোকে পয়সা দেবে, তুই গিয়ে আরো হাঁড়িয়া গিলে মরবি। ওসব হবে না।'

মংলা তাড়াতাড়ি জিভ কেটে, সোজা এল আমার পায়ে ধরতে। সামলাতে না পেরে, মাথা ঠুকল আমার হাঁটুতে। বলল, 'আন্দ্রি বোঙা কা নাম লেকে বোলতা, আর হাণ্ডিয়া না পিয়েগা, মোইরি।'

নিতু ধমকে উঠল, 'এই ব্যাটা, ওঠ।'

আমিও একটু বেকায়দায়। মাতাল দাঁতালকে ভয় পায় না, এমন লোক কম আছে। তাদের আক্রমণের চেহারা বিবিধ। অনেক সময় তার প্রেম-পীরিতও এক রকমের আক্রমণ, তার ধকল সইতে প্রাণ যায়। মংলা আমার পায়ের কাছ থেকে উঠল, স্যুটকেসটা হাতছাড়া করেনি। কিন্তু তার 'মোইরি' কথাটা কী? নিতুকে জিজ্ঞেস করলাম। নিতু হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'বলতে চাইছে 'মাইরি'। ব্যাটাকে এত করে শেখাবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই বলতে পারে না।'

মংলা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে, ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'মোইরি।'

অর্থাৎ দিব্যি গেলে বলছে, সত্যি পারে না। যদিও এমন কিছু কঠিন উচ্চারণের ব্যাপার না, কিন্তু সামান্যই তো অনেক সময় অসামান্য হয়ে ওঠে। তা না হলে আম রাম হয় রাত হয় আত, সে তো খাস বাঙালীর উচ্চারণ। আর একজন মুণ্ডা মাইরিকে মোইরি বলতে পারে না! ও-কার আ-কারের তফাত বৈ তো না। তবু বাংলা দিব্যি তো গালছে।

প্রথম ফাল্গুনের বাতাসে এখানে শীতের ছোঁয়া লেগে আছে। এই দুপুরেও তা টের পাওয়া যায়। নিরিবিলি পথের আশে পাশে কী গাছ জানি না। ফল ঝুলছে তার ডালে ডালে। পাতা প্রায় শূন্য, সব ঝরে গিয়েছে। ফুলের একটা মিষ্টি তীব্র গন্ধ। মৌমাছিরা ছেঁকে ধরে আছে। নিতুকেই জিজ্ঞেস করি, 'এগুলো কী গাছ? কী ফল?'

নিতু বলল, 'কেঁদু গাছ, ফলের নামও কেঁদু। খুব মিষ্টি। আমাদের বাড়ির আশে পাশে অনেক আছে, খাওয়াব আপনাকে। বেশি খেলে পেট খারাপ হয়।'

নিতুর বলার ভঙ্গিতে হাসি পায়। যেন মিষ্টি ফলের জন্য বেশি লোভ না করি, তার আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছে। বললাম, 'ফলগুলো দেখে তো মনে হচ্ছে, অনেকটা আমাদের গাব ফলের মতো।'

নিতু বলল, 'অনেকটা। তবে গাবের থেকে এর বিচি ছোট, বেশি মিঠে আর রসালো। অনেকটা সবেদার মতো। এ সময়ে এখানকার গরীব লোকেরা এক একদিন শুধু কেঁদু খেয়েই পেট ভরিয়ে ফেলে।'

মংলা একটু জড়ানো স্বরে আওয়াজ দিল, 'হাম ভী কেন্দু খাতা। হাম খাতা, চিড়িয়া খাতা, লিলেকো খাতা, মেরং খাতা, উরি খাতা··· ।'

নিতু এবার ধমকে উঠল, 'এই, এই মংলা, থাম ব্যাটা। মাতাল বকতে আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না।'

মংলা একবার আমার দিকে তাকিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। যার মানে করা যায়, মাতাল সে একেবারেই না। কিন্তু হাম আর চিড়িয়া অর্থাৎ পাখি বোঝা গেল। বাকীগুলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। নিতুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কাদের কথা বলছিল, তুমি জানো নাকি?'

নিতু বলল, 'জানি। লিলেকো হল মৌমাছি, মেরং মানে ছাগল, উরি মানে গরু।'

মংলা হিসেবে ভুল করেনি। মিষ্টি পাকা কেঁদু ফল, মানুষ পাখি মৌমাছি

গরু ছাগল সবাই খায়। একলা সে খায় না। তার থেকে অন্তত এইটুকু অনুমান করা যায়, এই সংরক্ষিত বনের গাছের ওপর মানুষের অধিকার না থাক, ফলের ওপর আছে। কে জানে, ঋতুতে ঋতুতে বনে কত গাছে কত ফল ফলে। মানুষকে কত সে দান করে, কোনো পালনের প্রত্যাশা না করে, মানুষকে পেট ভরে খাওয়ায়।

নিতু ডাকল, 'এসে পড়েছি। এদিকে আসুন।'

সে ডান দিকে ফিরল। একটা মাটির ঘরের পাশ দিয়ে, গাছের ডাল দিয়ে বানানো গেট। বাঁধা ছাঁদা নেই, ঠেলতেই খুলে গেল। ছোট একটি মাটির ঘর দেখে, একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ঘর পেরিয়ে দু'পাশের খোলা জমিতে যেন কিসের চাষ্ হয়েছে। ছোট ছোট সবুজ চারা মাথা তুলে আছে। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। বোঝা গেল, গৃহসীমানায় ঢুকেছি। কিছুটা গিয়ে, অনেকখানি কঞ্চির বেড়ার বেষ্টনি। সেখানেও একটি আগল। আগল ঠেলে ভিতরে ঢুকলেই, গাছের ছায়ায় ঘেরা একটি মস্ত বড় উঠোন। উঁচু বারান্দাওয়ালা বাংলো ধরনের বাড়িটি নিঝুম। আশেপাশের বন তেমন গভীর না। তবু মনে হয় সেই, 'কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে, দেখা যায় যে ঘরখানি সেথায় বঁধু থাকে গো' অনেকটা সেই রকম। যেন বনের মধ্যে নিরিবিলি বাড়িটি আপনাকে মিশিয়ে রেখেছে।

উঠোনের আর একদিকে, মাথায় টালি একটি মাটির ঘর। সেখানে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দটা স্পষ্টতই রান্নার। মংলা সোজা এগিয়ে গিয়ে, বারান্দার ওপরে তুলে দিল আমার স্যুটকেস। আর আমাদের সাড়া পেয়েই বোধহয়, একটি মেয়ে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে, মাটির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, চোখ দুটি নামিয়ে নিল। মুখে ফুটল একটু বা লাজে লাজনো হাসি। বয়স অনুমান পঁচিশ-ছাব্বিশ। নীল পাড় শাদা জমির শাড়ি পরার ধরনটি, পুরোপুরি আটপৌরে বাঙালী। গায়ে একটি জামাও আছে। দু'হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথার চুলে এলোখোঁপা জড়ানো। কালো মেয়েটিকে হঠাৎ দেখলে বনবাসিনী বলে মনে হয় না। অথচ তার মুখে এ অঞ্চলের বনবাসিনীর ছাপ সুস্পষ্ট। যে কথাটা বলতে আমার বাধে, তা হল 'আদিবাসী।' শব্দটার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেন, কোনোটাই আমার তেমন মনঃপূত না। 'আদিবাসী' বললেই, কেমন যেন দূরে ঠেলে দেওয়া হয়, আজকের সমগ্র ভারতের সঙ্গে মেলানো যায় না। ভারতবাসী থেকে আলাদা করে রাখার মতো শোনায়। তাতে বিদেশী

সরকারের কতখানি স্বার্থ ছিল জানি না। আজকের ভারতের কোনো স্বার্থ থাকতে পারে না, থাকা উচিত না।

নিতু বলে উঠল, 'কী রে জেমা, অমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এই তো সেই দাদাবাবু, কলকাতা থেকে যাঁর আসার কথা ছিল।'

জেমা নামটাই যেন মেয়েটির বনবাসিনী পরিচয়কে স্পষ্ট করে দিল। মনে পড়ে গেল, ইস্টিশনে গাঙ্গুলিমশাই জেমার নাম বলেছিলেন। নিতুর কথা শুনে জেমার কী করার আছে বুঝি না। সে আর একবার আমার দিকে তাকাল। সলজ্জ হাসিটি আর একটু স্পষ্ট হল। তারপরে পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'দাদাবাবুকে নিয়ে ঘরে যাও।'

ঠিক যেন একটি বাঙালী মেয়ে কথা বলছে। নিতু বলল, 'তা নিয়ে যাচ্ছি। দাদাবাবুর জন্য ভাল করে রান্না করেছিস তো?'

জেমা লজ্জায় ঘাড় ফিরিয়ে হাসল, শোনা গেল, 'আমি কি ভাল রান্না জানি?'

বাংলা কথায় একটু জড়তা নেই। শুনে অবাক লাগে। এমন বাংলা শিখল কেমন করে। সে কৌতূহল এই মুহূর্তেই প্রকাশ করে লাভ নেই। এবার নিজেই বললাম, 'সেটা খেয়ে দেখব।'

জেমা আমার দিকে একবার তাকাল। ওর চোখের কালো তারায় ঝিলিক। মুখটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে রাখল। বোঝা গেল, জবাব দেবার হয়তো কিছু আছে, কিন্তু লজ্জার বাধাটা কাটিয়ে না ওঠা পর্যন্ত, তা সম্ভব না।

এ সময়েই মংলা তার নিজের ভাষায়, জেমাকে কিছু বলে উঠল। জেমা হেসে সেই ভাষাতেই জবাব দিল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, একেবারে অন্ধকারে। নিতু বলে উঠল, 'ব্যাটা তোকে মেরে তাড়াব। জেমা তোর জন্য এখন ভাত নিয়ে বসে আছে? যা, ভাগ্, এই নিয়ে যা।'

বলে নিতু ওর নিজের পকেটে হাত দিল। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'নিতু, ওটা তুমি না, আমি। ও আমার স্যুটকেস এনেছে।'

মংলা আমার কাছে এসে, দু-হাত কপালে ঠেকাল। আমি ওকে একটি টাকা দিলাম। দান-খয়রাতি বা উদারতার জন্য না, ভাল লাগার একটা মন টলানো ব্যাপার। নিতু বলে উঠল, 'করলেন কী, একটা টাকা দিয়ে দিলেন? ও তো আজ সারাদিন হাঁড়িয়া খেয়ে পড়ে থাকবে।'

মংলা তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, চাউলি কিনে গা। মাণ্ডি পাকায়ে গা, খায়েগা।'

নিতু বলল, 'হাঁ ঘরে নেই বৌ, তুই চাল কিনে ভাত রাঁধবি।'

জেমা এবার হাসির শব্দে বাজল। বলল, 'ওর বৌ তো পালিয়ে গেছে।'

মংলা হাসল না, কিন্তু টলে পড়তে গিয়ে সামলে নিল। বলল, 'হাঁ হাঁ, হামারা বৌ কাম করনে গিয়ে।'

নিতু জিজ্ঞেস করল, 'ক' বছর গেছে?'

মংলা দুটো থ্যাবড়া কালো আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'দুই সাল।'

নিতু আর জেমা একসঙ্গে হেসে উঠল। জেমা বলল, 'দুই সাল ধরে কাজ করতে গেছে, কবে আসবে?'

মংলার রক্তাভ চোখের ধূসর তারা কেমন যেন অন্যমনস্ক অবাক আর স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে ঝাঁকড়াচুলো মাথমা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আয়ে গা, এক রোজ চলা আয়ে গা। লেড়কা-লেড়কি কো লে গিয়া না? সব কো লেকে এক রোজ চলা আয়ে গা।'

নিতু আর জেমা এবার তেমন হেসে বেজে উঠল না। নিতু বলল, 'আসবে, তুই চিতায় উঠলে। যা, এখন যা।'

'হাঁ হাঁ।' বলে সে আবার আমার পায়ের কাছে টলে পড়ল।

আমি বললাম, 'থাক থাক।'

কিন্তু এবার সে মানতে রাজী না। পা ছুঁয়ে হাত কপালে ঠেকিয়ে, প্রায় টলতে টলতেই বেরিয়ে গেল। মংলা হাসির আলোয় কেমন যেন একটু ছায়া ঘনিয়ে দিয়ে গেল। হয়তো সে নিজেও জানে, তার বৌ-ছেলেমেয়েরা আর কোনো দিনই ফিরবে না। তাদের কথা মনে হলে এখনো সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, অবাকও হয় বোধহয়। কী ভাবে সে-ই জানে। হয়তো অনেক কথা মনে পড়ে যায়। তবু একটা আশা আপনা থেকেই বেজে ওঠে, 'আসবে আসবে, একদিন সবাইকে নিয়ে বৌ ফিরে আসবে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর বৌ বুঝি চলে গেছে?'

নিতু বলল, 'হ্যাঁ। আর একজনের সঙ্গে চলে গেছে। ওদের ওসব লেগেই আছে।'

নিতুর গলায় তাচ্ছিল্যের স্বর। আমার চোখে চোখ পড়ে যায় জেমার। জেমা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু নিতু যেমন করে বলল, তাই-ই কী? ওদের এমনি ছাড়াছাড়ি লেগেই থাকে? যদি থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, জীবনে কোথাও বিড়ম্বনার একটা গভীরমূল শিকড় ছড়িয়ে আছে।

নিতু জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবেন তো একটু?'

বেলা অনেক হয়েছে। তবু চা-তে অরুচি নেই। বিশেষ করে, এখনো চান করা দাড়ি কামানো ইত্যাদি বাকি আছে। বলতে গেলে প্রাতঃকৃত্যাদি সবই বাকি। বললাম, 'অসুবিধা না থাকলে—'

আমার কথার মাঝখানে নিতু যেরকম হেসে উঠল, ঠিক তেমনি করেই জেমাও হেসে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। নিতু বলল, 'চলুন ঘরে যাই।'

নিতু নিজেই এবার আমার স্যুটকেসটা ঘরের মধ্যে তুলল। গৃহস্থালি তেমন একটা উজ্জ্বল ঝলমলে কিছু না। শহুরে ছাপ প্রায় নেই। প্রথম ঘরটায় একটা সাবেকি খাট, পুরনো কাঠের আলমারি, একটা বিবর্ণ টেবিল আর চেয়ার। নিতু আমাকে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে খাটিয়ার ওপরে বিছানা পাতা। একপাশে একটা টেবিল আর চেয়ার। দেওয়ালে ঝোলানো আয়না। বলল, 'আপনি এ ঘরে থাকবেন।'

পিছন দিকের একটি বন্ধ দরজা দেখিয়ে বলল, 'ওই দরজাটা খুললেই, ডান দিকে চানের ঘরের দরজা, কিন্তু পায়খানাটাই মুশকিল।'

'কেন?'

'যেতে হবে অনেক দূর।'

'মাঠে নাকি?'

নিতু হেসে উঠল, বলল, 'ঠিক মাঠ না। গাছপালা-ঘেরা একটা জায়গা আছে।'

সেখানকার ব্যবস্থাও প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায়, কোনো না কোনো জলাশয়ের ধারে, উঁচু খুঁটি পুঁতে, তার ওপরে খুপরি ঘর। সিঁড়ি বলতে আধ ফুট চওড়া একটি তক্তা। ভারসাম্য হারিয়ে যাতে পপাত ধরণীতল না হতে হয়, সে জন্য একটি বাঁশ রেলিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাও সব ক্ষেত্রে না। সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতোই তরতরিয়ে ওঠে সবাই। অভ্যাসের ব্যাপার। তাছাড়া, কী যেন বলে একটা, বেগ পেলে বাঘের ভয় থাকে না। কে আর তখন বাঁশের কথা ভাবে।

তবে কেবল পূর্ববঙ্গের কথাই বা বলি কেন। দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলেও একই ব্যবস্থা দেখেছি। বিশেষ করে বাদার ভেড়ি বাঁধ অঞ্চলে। কিন্তু সেটাকে তো তবু একটা ব্যবস্থা বলে। রূঢ় অঞ্চলে তো দেখেছি, তা অনেক গ্রামে নেই। বীরভূম বাঁকুড়ার অনেক সম্পন্ন গ্রামে, বস্তুটির চিহ্নও দেখিনি। গ্রামের বাইরে, মাঠে, কোনো পুকুরধারে সকলের টান, ভাগাভাগি কেবল স্ত্রী পুরুষে। একটা যদি উত্তরে, আর একটা দক্ষিণে।

কিন্তু এ চিন্তা আপাতত মুকুব। নিতুর বর্ণনায় যা পেলাম, আমার কোনো অসুবিধা নেই। পূর্ববঙ্গ বা রূঢ়, কোনোটাই আমার বাদ নেই। আমি মোটেই বিপদগ্রস্ত বোধ করছি না।

নিতু দরজা খুলে দিল। সামনে চওড়া, মাথা-ঢাকা বারান্দা। এটাকে যদি সামনের দিক বলা যায়, তা হলে পিছন দিকের সঙ্গে কোনো মিল নেই। এখানকার ছবিটি সম্পূর্ণ আলাদা। সামনে অনেকখানি নিবিড় সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ। কঞ্চিবাঁশের বেড়া নেই, শাল বরগার শক্ত ঘেরাও। এমন কি একটা বড় গেটও আছে। পুরনো হলেও বোঝা যায়, এককালে গেটটি বেশ ভাল ছিল। সবুজ ঘাসের মাঠটিও। গেটের দিকে তাকালে দেখা যায়, সামনে একটা রাস্তা, বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে বোধহয় উত্তর-পশ্চিমে। এখন একেবারেই দিক ঠিক করতে পারছি না। আর একটা মেঠো লাল মাটির পথ চড়াই-উৎরাইয়ে চলে গিয়েছে সামনের দিকে। তার দু'পাশে অনিবিড় বড় বড় গাছ। বাঁ দিকেও সেই রকম। কিন্তু ডান দিকটা নিবিড় বন, শাল বরগার বেড়া ডিঙিয়ে। এত নিবিড়, মনে হয়, ওখানে ঢুকলে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সূর্যের আলো ঢোকে না। সেগুন শাল চিনতে পারছি। শাল-গাছে ফুল ফুটেছে। অর্জুনের শক্ত সুঠাম শরীর চিনতেও ভুল হয় না। বাকি গাছগুলোকে চিনতে পারছি না। একটা গাছ দেখছি, তার পুরোটাই হাল্কা বেগুনি। বেগুনি রঙটা পাতার না ফুলের বুঝতে পারছি না। কিন্তু এতদূর থেকেও মৌমাছিদের ভিড় দেখতে পাচ্ছি। তাই সন্দেহ হল, সবই ফুল। নিতুকে গাছটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। নিতু বলল, 'গাছটার নাম জানি না। কিন্তু পাতা না, সবই ফুল।'

সেই হালকা বেগুনি রঙ ফুলের ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে, চোখ ফেরাতে ভুলে যাই। মনে হল, সেই ফুলের রঙের ছটা, অন্য গাছেও লেগে গিয়েছে।

নিতু বলল, এরকম অনেক দেখতে পাবেন। নীল বেগুনি হলুদ লাল, গোটা গাছ কেবল ফুলে ভরা, পাতা একটাও নেই।'

চোখের তৃষ্ণা যেন আকণ্ঠ হয়ে উঠল, জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ?'

'জঙ্গলের মধ্যে। এ তো কিছুই না। আসল জঙ্গলের চেহারাই আলাদা।'

ডান দিকের বন দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ বনটাও তো বেশ গভীর মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ওদিকে খানিকটা অংশ, রেললাইন বরাবর জঙ্গল একটু ভারি। ওদিকে সাম্‌টা নালা আছে।'

'নামটা নালা কী ?'

'একটা ছোট নদী। পাহাড় থেকে নেমে, কোয়েলের দিকে চলে গেছে।'

'দেখতে যাওয়া যায় ?'

নিতু যেন শিশুর কথা শুনে হাসল, বলল, 'তা যাবে না কেন। ও বেলাই যেতে পারি। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা আছে। আমরা তো ছেলেবেলায় শুনেছি, আগে জরাইকেলা রেললাইন দিয়ে গাড়িতে যেতে যেতে, গাছের ডালে অজগর ঝুলতে দেখা যেত। হাতির দল দাঁড়িয়ে থাকত রেললাইনের ধারে।'

বনপিয়াসী মন এবার যেন একটু থমকে গেল। অজগর এবং হাতি ? ভুলেই যাই, বন শুধু বন না, সেখানে বন্যপ্রাণীরাও আছে। আর সেই সব প্রাণীরা কলকাতার চিড়িয়াখানার বাঁধা বা পোষা না। মানুষ সম্পর্কে তাদের প্রীতিটা বোধহয় তেমন না। বন্যহস্তী কি পয়সা ফেলে দিলে, খুশি হয়ে শুঁড় দিয়ে তুলে নেয় ? নিয়ে তার পালক মাহুতের হাতে তুলে দেয় ? বোধহয় না। পয়সা বস্তুটা তার কাছে অচেনা, নিশ্চয়ই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের চোখে দেখবে। আর অজগরের তো কোনো কথাই নেই। ভাবতে গেলেই যেন শিরদাঁড়ার কাছে কাঁপন ধরে যায়।

নিতু জিজ্ঞেস করল, 'ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ?'

একটু ঠেক খাওয়া ভাবে বললাম, 'বনে এসে আর ওদের মুখোমুখি হওয়ার তেমন সাধ নেই।'

নিতু হেসে উঠল, 'ভয় পাবেন না। আমি তো আজ অবধি একটাও জংলা হাতি দেখতে পাইনি। অজগর বলতে যা বোঝায় তাও না। তবে বড় সাপ দেখেছি।'

নিতুর কথায় একটু আশ্বস্ত হাওয়া গেল, তখন কিছু রঙ-বেরঙের প্রজাপতি আমার দৃষ্টি টেনে নিয়ে গিয়েছে। দেখতে দেখতেই হঠাৎ বেশ বড় একটি হলুদ-বুক নীল-পাখা পাখি, নির্ভয়ে উড়ে এসে বসল সবুজ মাঠের উঠোনে। বাসন্তী রঙ চঞ্চু, ঘাসে ডুবিয়ে, কী যেন খেতে লাগল। আর শুনছি নিরন্তর ঝিঁঝির ডাক। সেই সঙ্গে নানা পাখির আচমকা শিস দিয়ে ওঠা। আর ঠিক এই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়ে গেল, বারান্দার নিচেই ঘাসের ওপর দিয়ে একটি সাপ কিলবিল করে চলে যাচ্ছে। আমি চমকে উঠে বললাম, 'সাপ !'

নিতু বলল, 'ও কিছু না। এগুলো কামড়ায় না, বিষও নেই। সারাদিনই চলা-ফেরা করে।'

বলে সে নেমে গেল মাঠে। সাপটা যাচ্ছিল মন্থরে। নিতুর তাড়া খেয়ে পালাল তরতরিয়ে। কিন্তু আমার শরীরটা আড়ষ্ট, শিরদাঁড়াটা শক্ত হয়ে উঠেছে। নিতু বনে থেকে বন্যতা পেয়েছে। আমি তা পাইনি। ঋষি পুরুষও নই যে, বন্যপ্রাণী সম্পর্কে নির্বিকার থাকি। মুগ্ধতা-বোধের সুর যেন ক্ষণে ক্ষণেই কেটে যেতে চায়। মনে হয়, এই বন যেন আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমার বনপিয়াসী মনকে একটু খুঁচিয়ে সুখ পাচ্ছে। আমি নিতুকে ডেকে বললাম, 'দরকার কী, উঠে এস না।'

নিতু উঠে এল। আমার পিছনেই শুনতে পেলাম, 'দাদাবাবু, চা নিন।'

পিছন ফিরে দেখি, জেমা ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে চা নিলাম। এককাপ চা দেখে নিতুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি খাবে না?'

নিতু বলল, 'না, আমি এমনিতেই চায়ের ভক্ত না।'

সেই জন্যই জেমা চা নিয়ে আসেনি। জেমা ঘরের ভিতর থেকে, আমার কাছে একটা মোড়া বসিয়ে দিয়ে গেল। কিছু বলল না। বলার দরকার নেই বলেই। ও যে বেশ গোছানো কাজের মেয়ে, তা যেন ওকে দেখলেই বোঝা যায়। নিতুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও তো বোধহয় এদেশেরই মেয়ে?'

নিতু বলল, 'হ্যাঁ, জেমা ওরাওঁ মেয়ে?'

'এমন সুন্দর বাংলা শিখল কেমন করে?'

'ওর জন্ম তো আমাদের এ বাড়িতেই। আমার বাবা যখন প্রথম এখানে ঠিকাদরি করতে আসেন, তখন জেমার বাবা-মা আমাদের বাড়িতে কাজ করত। ঢোকবার সময় সামনে যে ঘরটা দেখলেন, সেই ঘরেই থাকত। আমাদের ভাই-বোনেরা কারোর কারোর জন্ম তো এখানেই হয়েছে। জেমা ছেলেবেলা থেকে আমাদের সঙ্গেই মিশেছে, কথা বলেছে। বৌদি অনেকবার এখানে এসে থেকেছেন। জেমা আমাদের কলকাতার বাড়িতেও অনেকবার গেছে, থেকেছে। ওর সবই আমাদের মতো হয়ে গেছে। কথাবার্তা চালচলন। এমন কি আমাদের সব রান্নাও ও জানে। এখানকার সংসার তো জেমা-ই চালায়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর বাবা-মা কোথায়?'

'মারা গেছে।'

'ভাই বোন নেই?'

'আছে। যে যার নিজেদের কাজের জায়গায় থাকে।'

তারপরেই স্বাভাবিকভাবে মনে একটা প্রশ্ন আসে। ওরাওঁ সম্প্রদায়ের এত

বড় যুবতী মেয়ে। এখনো কি জেমার বিয়ে ঘর সংসার ছেলেপিলে হয়নি? জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর কি বিয়ে হয়নি?'

নিতু বলল, 'হয়েছিল, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি?'

মনে কৌতূহল থাকলেও আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। কোন্ কথার সীমা কোথায় লঙ্ঘিত হয়, কে জানে। তথাপি জেমার মতো সুশ্রী, কর্মনিপুণা বনবালা সংসার-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, এ চিন্তাটা মন ভার করে দেয়। কিন্তু নিতু নিজেই আবার বলতে থাকে, 'ওর স্বামীটা এমনিতে খারাপ না। দেখতে শুনতে ভাল ছিল। হাঁড়িয়া পচুই ওরা সবাই খেয়ে থাকে, দুধের শিশুটিও বাদ যায় না। জেমার স্বামী একটু বেশি নেশা করত, জেমার সেটা ভাল লাগত না, ও তো আবার একটু অন্য ধাঁচে বড় হয়েছে। তার জন্য ঝগড়া লাগত প্রায়ই। তাতেও কিছু যেত-আসত না। জেমার স্বামী খৃষ্টান হয়ে গেল। অনেক মিশনারিয়া আছে তো, আদিবাসীদের খৃষ্টান করতে চায়। জেমা কিছুতেই খৃষ্টান হতে চায়নি। তা নিয়ে অনেক ঝগড়া বিবাদ অশান্তি হয়েছে। তখন ওরা আমাদের বাড়িতে থাকত না। গুয়ার খনিতে কাজ করত ওর স্বামী, কুলির কাজ। আমার বাবা তখনো বেঁচেছিলেন। আজ থেকে প্রায় দশ-এগারো বছর আগের কথা বলছি, একদিন জেমা আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। বাবার কাছে এসে কান্নাকাটি করল, সব ঘটনা বলল। বাবার একটাই ভয় ছিল, অশান্তির ভয়, জেমার স্বামী এসে যদি কোনোরকম হুজ্জত-হাঙ্গামা করে। তবু জেমাকে থাকতে দিলেন, বললেন, 'কাজকর্ম করবি, থাকবি, তোর যতদিন ইচ্ছা। তোর বাবা-মা এ বাড়িতেই মরেছে, তোদের জন্মও আমাদের ভিটাতেই। আমি না থাকি, আমার ছেলেরা তোকে রাখবে। আর যদি কখনো কারোকে আবার বিয়ে করিস, তখন নতুন সংসারে চলে যাস।'

নিতুর কথার সঙ্গে সঙ্গে, ওর বাবার ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তাঁকে আমি বোধহয় একবার মাত্র কলকাতার বাড়িতে দেখেছি। তাঁর হৃদয়বত্তা এবং বিবেচনাবোধ আমাকে মুগ্ধ করল। জিজ্ঞেস করলাম, সেই থেকে জেমা তোমাদের বাড়িতে আছে?'

'সেই থেকে। ও তো প্রায় মেজদার বয়সী, একটু ছোট হতে পারে। আমাদের বোনেরই মতো।'

সেটা ওদের কথাবার্তা শুনলেও খানিকটা অনুমান করা যায়। আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'জেমার কোনো ছেলে মেয়ে হয়নি?'

'না।'

একটু থেমে নিতু আবার বলল, 'বিয়ে হয়তো হতে পারত আর একটা। এখনো হতে পারে, যদি জেমা রাজী হয়। কিন্তু ও কিছুতেই রাজী না।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তাই নাকি? কে বিয়ে করতে চায়?'

নিতু বলল, 'অনেক ছেলে। অনেকে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এখনো অনেকে চায়। বেশ ভাল পণ দিয়েই ওকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু জেমা কিছুতেই করবে না।'

কৌতূহলিত হয়ে বললাম, 'পণ মানে?

নিতু হেসে বলল, 'ওদের সিস্টেম হল, মেয়েকেই পণ দিয়ে বিয়ে করতে হয়। এমন কি এখানকার গঞ্জুর ছেলে পর্যন্ত ওকে বিয়ে করতে চেয়েছে, রাজী হয়নি।'

'গঞ্জুটা কী?'

'অনেকটা খাজনা আদায়কারীর মতো বলা যায়। আবার অন্য দিক থেকে, সেই লোকটাই হয় ওদের পঞ্চায়েতের নেতা ওদের সমাজে খুবই গণ্যমান্য লোক। গঞ্জু নিজে এসে সাধাসাধি করেছে। মেজদাকে বলেছে। মেজদাও বলেছে। জেমা রাজী তো নয় বটেই, মেজদা বলেছিল বলে কান্নাকাটি শুরু করেছিল।'

একটু অবাকই লাগে। একটি ওরাওঁ যুবতী ছাড়া কিছু না। স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী। স্বাভাবিকভাবেই তার বিয়ের ইচ্ছা থাকতে পারে। সন্তান-সন্ততির আকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এমন করে বেঁকে বসার কারণ কী? ওরাওঁ বালাটির মনে কী সুর গুঞ্জরে? শুনি প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কোথাও জেমা পাখি ধরা পড়ছে না? অথচ দেখে শুনে তো মনে হয়, এখনো চোখ থেকে রঙের ছটা যায়নি। ব্রীড়া আর লজ্জা মেশানো অভিব্যক্তিতে, এ মেয়ের প্রেমিকা হয়ে উঠতে সময় লাগে না। তবে পিরীতি ধন বলে কথা। সে নাকি আবার ফুলের মতো। কখন যে ফোটে, কেউ বলতে পারে না। অনেক সময় ফুটলেও, চোখে দেখা যায় না। সে আপন ভারে আর গন্ধে আত্মহারা হয়ে থাকে। জেমার কী হয়েছে, কে জানে।

নিতু ওর স্বভাবচতুর হাসি হেসে বলল, 'এখন আপনারা বলতে পারেন, জেমার মন কী চায়।'

'কেন?'

'আপনারা তো মানুষের মন নিয়ে কারবার করেন।'

হেসে বলি, 'সে-রকম ঝানু কারবারী আর হতে পারলাম কোথায়। তোমার দাদা বলরাম কী বলে?'

নিতু বলল, 'দাদার ধারণা, জেমা মনে প্রাণে বাঙালী হয়ে গেছে, ও আর কোনো আদিবাসীর ঘরে যেতে চায় না।'

জিজ্ঞেস করি, 'তেমন বাঙালী ছেলে নেই, যে জেমাকে বিয়ে করতে পারে?'

নিতু যেন একটু ভাবল। তারপরে বলল, 'তেমন আর কোথায়? এমন বাঙালী অবিশ্যি আছে, যে জেমাকে নিয়ে মজা-টজা লুটতে চায়। বিয়ে করবার সাহস কারোর আছে বলে তো মনে হয় না। তবে—'

কিন্তু একটু গমকে গেল, ঠোঁট টিপল। আমি নিতুর মুখের দিকে তাকালাম। টেপা ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ঠেকিয়ে রেখেছে। চোখেতে হাসি চিকচিক। আস্তে আস্তে মুখ খুলল নিতু, 'জেমার বোধহয় বাঙালীই পছন্দ।'

নিতু যেন কথার মোড় ঘুরিয়ে, অন্যদিকে চলে যেতে চাইল। একটা কী বলতে গিয়ে বলল না। আমিও রেহাই দিলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, 'সেরকম বাঙালীর খোঁজ কি জেমা পেয়েছে?'

নিতু নিঃশব্দে হেসে উঠল। বলল, 'বোধহয়।'

'এখানকারই বাঙালী?'

'হ্যাঁ। আপনি তাকে দেখেছেন।'

প্রায় থ হয়ে যাবার মতো কথা। জরাইকেলার মাটিতে পা দিয়েছি কতক্ষণ? ক'জন মানুষকেই বা দেখলাম। এর মধ্যেই জেমার ফাঁদপাতা পুরুষটিকে দেখেছি আমি। মনের তলা হাতড়ে, গাঙ্গুলিপরিবার ছাড়া কারোর কথা মনে করতেই পারছি না। তার মধ্যে শিবুকে চিন্তা করতে পারি না। শ্রীমান নিতুকেও না। কেন না, ও তো আগেই জানিয়ে দিয়েছে, জেমা ওদের বোন। বললাম, 'পরিষ্কার কর বাপু, একেবারেই মনে করতে পারছি না।'

নিতু হেসে বলল, 'কেন, সুরীনদাকে দেখলেন না?'

লোকটির চেহারা মনে পড়ে গেল, সেই সঙ্গেই, হঠাৎ নমস্কার করে বিদায় নেবার ছবিটাও ভেসে উঠল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'উনি কি এখনো অবিবাহিত নাকি?'

নিতুটা সত্যি ফাজিল, বলল, 'না সেই আপনারা কী যেন বলেন ভাল কথায়—বিপত্নীক। সুরীনের বৌ মারা গেছে বছর খানেক হল। দুটি বাচ্চাও আছে।'

'কী করে জানা গেল, সুরীনবাবুকে জেমার পছন্দ ?'

'জেমার দিক থেকে এখনো সেরকম স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে সুরীনদা মুখ ফুটে বলেই ফেলেছেন।'

'কাকে ?'

'জেমাকে বলেছেন, মেজদাকেও বলেছেন।'

'জেমা কী বলে ?'

'ঠিক করে কিছুই বলে না। তবে সুরীনদা এলে, জেমা একটু কেমন যেন হয়ে যায়। সকলের সামনে সুরীনদার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। আড়াল হলেই দু'জনে কথা বলে। সুরীনদা জরাইকেলায় থাকলে, রোজই একবার আমাদের বাড়িতে আসে। যখনই আসুক, জেমা তাড়াতাড়ি চা করে দেয়। ইদানীং দুপুরে সব কাজকর্ম মিটিয়ে, খেয়ে দেয়ে, জেমা রোজ একবার বাড়ি থেকে বেরোয়। রেললাইন পেরিয়ে ওপারে যায়। সবাই জানে, সুরীনদার বাড়িতে যায়। সুরীনদা বাড়িতে না থাকলে ছেলে দুটিকে একটু দেখেশুনে আসে। তাতেই মনে হয়, জেমারও বোধহয় ইচ্ছা সুরীনদাকে বিয়ে করে।'

সুরীন নামক সেই ব্যক্তিটির মুখ আবার আমার মনে পড়ল। তেমন ভাল করে চেয়ে দেখা হয়নি। এখনো মুখটা অস্পষ্ট। এইটুকু খালি মনে হয়, খুবই সাধারণ চোখ মুখ। কপালে আর রগের কাছে, কিছু চুলে পাক ধরেছে। অনেকটা, একটি গ্রামীণ পরিশ্রমী মানুষের মতো। মানুষটি সম্পর্কে কৌতূহল জেগে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি করেন কী ?'

'মোটর মেকানিক। চাকরি করেন না, তবে অনেক ঠিকাদারেরই তো লরী আছে। তার জন্য মেকানিকের দরকার হয়। আগে কাজ করতেন জামসেদপুরে। সেখান থেকে প্রায় এখানে আসতেন লরী সারাতে। তারপরে এক সময়ে কী খেয়াল হয়েছিল, বরাবরের জন্য এখানেই চলে এসেছেন। ছোটখাটো একটা মাটির বাড়িও করেছেন। রেলের ওপারে শিবুদের বাড়ির দিকে। আসল জরাইকেলাটা ওদিকেই। আমাদের এদিকটাকে সামটা বলা যায়। শুনেছি সুরীনদার সঙ্গে তার ভাইয়ের ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল। তার জন্যই এখানে চলে এসেছিলেন। এমনিতে রোজগার তো খারাপ না। এসব জায়গায় মোটর মেকানিকরা শহর ছেড়ে আসতে চায় না। সুরীনকে তাই মনোহরপুরেও যেতে হয়। সবাই ডাকাডাকি করে। তারপরে হঠাৎ বৌ মরে গেল। তাও অসুখ করে না, কী ফল নাকি খেয়েছিল। তার বিষক্রিয়াতেই মারা গেছে। চাঁইবাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাঁচানো যায়নি।'

নিতু চুপ করল। আর আমার মনে হল, একটা গোটা জীবনের অধ্যায় যেন শুনছি। কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, 'জেমা আজও নিশ্চয় সুরীনবাবুর বাড়ি যাবে?'

নিতু বলল, 'তা বলা যায় না। আজ আপনি এসেছেন তো। তবে সুরীনদাই আসবেন। বিকেলটা হোক না।'

নিতুর বলার ভঙ্গিতে আমার হাসি পেয়ে গেল। আর মনে পড়ে গেল, সুরীনের শেষ কথা, 'আবার দেখা হবে।' কী ভেবে বলেছিল, কে জানে। এ বাড়িতে আসবেন, সে কথাটা অগ্রিম জানিয়ে রাখার জন্য নাকি?

এ সময়েই পিছন থেকে জেমার গলা শোনা গেল, 'নিতু দাদাবাবুকে নাইতে যেতে বল। রান্না তো হয়ে গেছে। তুমিও চান করে নাও এবার।'

জেমার স্বরে নির্দেশের সুর। আমি পিছন ফিরে একবার জেমাকে দেখলাম। সেই সলজ্জ হাসি-হাসি ভাবটি এখনো আছে। মুখ নামিয়ে চলে গেল। নিতু লাফ দিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, অনেক বেলা হয়েছে উঠুন।'

তার পরেই একবার জেমার চলে যাওয়ার পথের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'আমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে কী না কে জানে।'

নিতুকে বেশ শঙ্কিত দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'শুনতে পেলে কী হবে?'

নিতু চোখ গোল করে বলল, 'ওরে বাবা, আমাকে গালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে। ভীষণ ক্ষ্যাপা মেয়ে, রাগলে রক্ষে নেই, মা-কালী।'

নিতুর কথার ধরনে হাসি দমন করা সম্ভব না। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলাম, 'গোপাল আসবে কখন?'

নিতু বলল, 'মেজদার আসতে আসতে সন্ধ্যেরাত্রি হবে যাবে। আপানার সব সারুন, আমি চানটা সেরে নিই।'

নিতু চলে গেল অন্য ঘরে। জেমাকে বেশ ভয় পায় দেখছি। অথবা, এটা ভয় নয়, প্রীতি এবং শ্রদ্ধা। ওরাওঁ মেয়েটিকে যে ও শ্রদ্ধা করে, বোনের মতো ভালবাসে, সেটা স্পষ্ট। ইতিমধ্যে আমার মধ্যেও একই অনুভূতি যেন চুঁইয়ে ঢুকেছে। মানুষ মানুষ করলাম এত, তবু মানুষ বোঝা কী দায়। শেষ কোথায় আছে? নেই বোধহয়। তাই এই বনের ডাকে ছুটে এসেও, মানুষ প্রকৃতির রূপে মন ভুলে যায়। আবেগ? হতে পারে, কিন্তু মাথাটা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে। কাকে যে প্রণাম করি, জানি না।

ঘুম আসেনি। রাতের গাড়ি আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতে পারেনি। চিরদিন অপরের ঘুমন্ত নিশ্বাস আর নাসিকাধ্বনি শুনেই, রাতের গাড়ি আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তবু এই বনদুয়ারের নিদাঘ দুপুর, আমার চোখে ঘুম এনে দেয়নি। নিয়ত ঝিল্লিস্বর আচমকা পাখির ডাক, বনের গন্ধ, আমার সমগ্র অনুভূতিকে এক নতুন জগতের প্রান্তে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। যদিও বিশ্রামের ব্যঘাত হয়নি। আমার শরীরে কোনো আলস্য নেই, গ্লানি নেই। খাটিয়ার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েই যেন তাজা হয়ে গিয়েছি।

আর মনে পড়ছে বারে বারেই, জেমার খেতে দেবার কথা। নাগরিকতার অনেক ঝলক ঝিলিক তো দেখছি। তাতে আত্মার অহংটা বেশ রম্‌রমিয়ে ওঠে বটে। অনির্বচনীয় সুধারসের একটা তৃপ্তি বলে কথা আছে, সেটা মেলে না। তার মানে হল, চিত্তে অনেক বিপরীতের খেলা। যদিও লোকেরা মনে করে, স্বরবর্ণের 'এ' আর 'ও' চিরদিনই ভিন্ন, একের মধ্যে দুইকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে কথা থাক গিয়ে। গাছের ছায়ায় ঢাকা পিছনের উঠোনের ওপারে, মাটির ঘরের মেঝেতে পিঁড়ি পেতে বসে খেয়ে যে কেবল তৃপ্তি পেয়েছি, তা না। সমস্তটাই যেন একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের মতো বোধ হয়েছিল। মাটির মেঝে নিকিয়ে, ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাতের পাতে নিমপাতা ভাজা দিয়ে শুরু করে, পোস্তচচ্চড়ি, ডাল, নিরামিষ ব্যঞ্জন। রুইমাছের ঝোল আর তেঁতুলের অম্বল, অনন্য স্বাদের সেই খাদ্য পরিবেশন করেছিল কে? একটি বনবাসিনী ওরাওঁ মেয়ে। চর্যাপদের কবিতায় যেন কী পড়েছিলাম? কলাপাতায় ঝরঝরে গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছ, বেড়ে দিয়ে যে স্বামীকে খাওয়ায়, সে-ই পুণ্যবতী। চল্লিশ বছর বয়সের, খোঁচা খোঁচা গোঁপ-দাড়ি ভরা, নিরীহ গ্রামীণ মুখ, সুরীন মোটর মেকানিকের কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল।

তার প্রথম স্ত্রীকে দেখিনি। কিন্তু লোকটি যে পুণ্যবান, তাতে সন্দেহ নেই।

ঘুম আসেনি, চোখ বুজে শুয়েছিলাম। কিছুক্ষণ থেকেই, দূর থেকে কাদের অস্পষ্ট কথার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। উঠে পড়ে টেবিলে রাখা ঘড়ি দেখলাম। চারটে বাজে। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, এই বনাঞ্চলে প্রথম ফাল্গুনের রোদ মায়াময়, কিন্তু যেন হেলে পড়ার ইচ্ছা তার নেই। তথাপি খাটিয়ায় গা পাততে আর ইচ্ছা করল না। দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটা খোলা। উঁকি দিয়ে দেখলাম, নিতু নেই। আমার অন্য পাশেও ঘর আছে, তার দরজা বন্ধ।

বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। একটানা ঝিঁঝির ডাক যেন নৈঃশব্দ্যেরই একটা ধ্বনি। কোথাও একটা লোক নেই। অস্পষ্ট কথার স্বর তখনো শুনতে পাচ্ছি। আমি ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বারান্দাটা বাঁক নিয়েছে ডাইনে। গোটা বাড়িটার চারদিকেই বারান্দা। ইটের চওড়া দেওয়াল আর মাথায় টালি, যাকে বলা যায় বাংলোবাড়ি। এদিকটায় ওবেলা আসিনি। দেখছি কিছু ধামা চুপড়ি, দুটো পুরনো লরীর টায়ার, জং-ধরা কিছু যন্ত্রপাতি একপাশে এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে একটু চমকে উঠলাম। চোখ গেল উঠোনের দিকে। রান্নাঘরটা এখান থেকে দেখা যায়। হাসিটা থামবার পরে, আবার অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা গেল। মনে হল, রান্নাঘর থেকে হাসি আর কথা ভেসে আসছে। সম্ভবত নিতু আর জেমা। ভাবনাটা পুরো করবার আগেই, আমার পিছনেই নিতুর গলা শোনা গেল, 'ঘুম ভেঙে গেছে আপনার?'

অবাক হয়ে ফিরে বললাম, 'ঘুম আর কী, জেগেই ছিলাম। ঘুম এল না।'

নিতু বলল, 'রাত্রি জেগে এসেছেন।'

'কিন্তু খারাপ লাগছে না।'

'তাহলে জেমাকে চা করতে বলি।'

বললাম, 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধহয় রান্নাঘরে জেমার সঙ্গে কথা বলছ।'

নিতু ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'আমি না। সুবীনদা এসেছে, জেমার সঙ্গে কথা বলছে।'

বলে সেখান থেকে গলা তুলে বলল, 'জেমা, চা করবি নাকি?'

জেমারও উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা ভেসে এল, 'করব। দাদাবাবু উঠেছেন?'

নিতু বলল, 'হ্যাঁ।'

আমরা দু'জনেই বারান্দার সামনের দিকে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বেরিয়েছিলে?'

নিতু বলল, 'হ্যাঁ, আমি একটু মোহনবাবুর বাড়ি গেছলাম। উনি এখানকার জঙ্গলের একজন ঠিকাদার। বাঙালীদের মধ্যে, এখন ওঁর অবস্থা মোটামুটি ভাল। ওঁর সঙ্গেই মেজদা জঙ্গলে গেছে। রাত্রে আসবেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

মনে ভাবি, ঠিকাদার মানুষের কি আমাকে ভাল লাগবে? নিতু আবার বলল, 'আপনার জঙ্গলে যাবার ব্যবস্থা মোহনবাবুই ঠিক করেছেন।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, ওঁর নানান ব্যবস্থা আছে। কোথায় কোথায় আপনি থাকবেন, সেসব উনি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

উপকারী ব্যক্তি, নিঃসন্দেহে। মেজাজটাও খুশ হল। আমার বনে যাবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি। নিতু আবার বলল, 'চা খেয়ে বেরোবেন তো ?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে আগে তিপুদের বাড়ি যেতে হবে।'

নিতু ভোলেনি দেখছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'যেতেই হবে ?'

নিতু সহজভাবেই বলল, 'হ্যাঁ, তা না হলে পাগলি ক্ষেপে যাবে। আপনাকে তো কিছু বলবে না। আমাকে নিয়ে পড়বে। ভাববে, আমিই আপনাকে যেতে দিইনি। চা হতে হতে আপনি তা হলে তৈরি হয়ে নিন।'

তৈরি হওয়ার মধ্যে, চোখে-মুখে জল দিয়ে জামাকাপড় পরে নিলাম। নিতুও পোশাক বদলে নিল। জেমার চা আসবার আগেই, ঘরের দরজায় গলা-খাঁকারির শব্দ পেলাম, তারপরে, 'নমস্কার।'

তাকিয়ে দেখি সুরীনবাবু। ও-বেলা ছিল বিদায়ের নমস্কার, এ-বেলা বোধহয় আবার দেখার নমস্কার। দেখছি, এখন তেলতেলে মুখটি বেশ সাফ-সুরত, গোঁফ-দাড়ি কামানো। মাথার চুলও তেল-চুকচুকে। মোটা ধুতির ওপরে সাধারণ জামা, পায়ে স্যাণ্ডেল। বললাম, 'নমস্কার, আসুন।'

নিরীহ মুখে বিনীত নম্র হাসি। চলা-ফেরার ভঙ্গিটিও সেইরকম। ঠিক যেন যন্ত্র-ঘাঁটা লোক না। ঘরে ঢুকে বলল, 'বেরোচ্ছেন নাকি ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, কোয়েল নদীর ধারে যাব।'

সুরীন বলল, 'ঘুরে আসেন। আমরাও ওদিকেই কাছাকাছি থাকি। তবে কোয়েল দেখতে ভাল লাগে ভোরবেলা, প্রথম রোদটা যখন ওঠে। তখন নদী আর চর, সবই যেন সোনার মতন চিকচিক করে।'

কথাগুলো মোটেই মোটর মেকানিকের মতো শোনাচ্ছে না। এ তো দেখছি প্রকৃতি-রসিক। এ সময়েই জেমা এল দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে। এখন ওর খোলা চুল। নীলডোরা কালোপাড় শাড়ি। চায়ের কাপ আগে দিল আমাকে, তারপরে সুরীনকে। কোনো কথা না বলে চলে গেল। যেন সুরীনের সঙ্গে তার পরিচয়ই নেই।

সুরীন চায়ের কাপ নিয়ে আবার নিজের কথায় ফিরে এল। বলল, 'কোয়েলে চান করবেন, ভাল লাগবে। ভারি ঠাণ্ডা আর মিষ্টি জল।'

নিতু ঢুকল। জিজ্ঞেস করলাম, 'চা খাবে না?'

'না, আমার ভাল লাগে না।'

আসলে ও চা খায় না। আমি তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ শূন্য করে নামিয়ে দিলাম। সুরীন নিতুকে বলল, 'কোয়েলের ধারে যাচ্ছিস?'

'নিয়ে, একবার শিবুদের বাড়িও যেতে হবে।'

সুরীন বলল, 'হ্যাঁ, ওনারে গাড়িতেই দেখেছি গাঙ্গুলিখুড়ার সঙ্গে কথা বলতে।'

আমরা বেরোবার উদ্যোগ করলাম, নিতু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখন আছ তো?'

সুরীন বলল, 'খানিকক্ষণ আছি। তারপরে একবার সাহেবের কাছে যাব, ডেকে পাঠিয়েছে যেন কী জন্য।'

'কে, উইলিয়ম?'

'হ্যাঁ। কেন, তোর কোনো দরকার ছিল?'

নিতু বলল, 'দরকার মানে, সোলেমান আজ পাঁঠা কাটবে কী না, খোঁজ নিতে পারলে হত। একটু মাংস আনতাম তা হলে।'

সুরীন বলল, 'আচ্ছা সে আমি দেখব'খন। কাটলে আমিই দিয়ে যাব। আধসেরটাক তো?'

'হ্যাঁ।'

আমরা পিছনের দিক দিয়ে বেরোলাম। সুরীন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠোন পর্যন্ত এসে বলল, 'সোলেমান পাঁঠা না কাটলে একবার মাংরাদের পাড়ায় ঢুকে দেখে আসব, কেউ বনমোরগ বা ডাক শিকার করতে পেরেছে নাকি। উনি আবার পাখির মাংস খান তো?'

'উনি' মানে আমি। নিতু আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। আমি হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। ভোগের ব্যাপারে নিজেকে সর্বভুক করে রেখেছি। তবে মুরগী খেলেও, ডাকপাখির স্বাদ জানা নেই। নিতুর পিছনে চলতে চলতে, ডাকপাখি ধরার ভঙ্গিটা মনে পড়ল। শোনা কথা। এখানকার অধিবাসীরা বোধহয় তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করে। আমি শুনেছি ফাঁদের কথা। প্রেমের ফাঁদ ডাকপাখি যে ধরে, তার থাকে একটি পোষা মেয়ে-ডাকপাখি। খাঁচা খোলা রাখলেও সে পালিয়ে যায় না। যেখানে ডাক-পাখিদের আনাগোনা, তেমনি একটি নিরিবিলি ছায়ায়, মেয়ে-ডাকপাখিটিকে খোলা খাঁচায় রেখে দেয়। আর সে ডাকতে থাকে। তার ডাক শুনলেই,

পুরুষ-ডাকপাখি অস্থির হয়। সে-ও ডাকে। প্রেমের ডাকাডাকি। ডাক-পাখিকে খুব সাবধানী পাখি বলা হয়। একটু সন্দেহ হলে, সে আর ধারে-কাছে নেই। কিন্তু মেয়ে-ডাকপাখিটি যখন খাঁচার একপাশে বসে কেবল ডাকতে থাকে, তখন সজাগ সাবধানী পুরুষটি আর স্থির থাকতে পারে না। তখন তার প্রকৃতিগত সাবধানতা কোথায় হারিয়ে যায়। তার থেকেও বড় প্রকৃতির টানে সে খাঁচায় গিয়ে ঢোকে। ফাঁদওয়ালার খাঁচার এমন কায়দা, ঢোকা মাত্রই খাঁচার মুখটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর ঝটাপটি করলেও নিস্তার নেই। সে তখন বন্দী।

মেয়ে-ডাকপাখিটার কথা ভেবে অবাক লাগে। মানুষের হাতের ক্রীড়নক হয়ে নিজের প্রেমিকদের এমন সর্বনাশ সে কেমন ক'রে করে? কিন্তু তা-ই করে কি? বোধহয় জেনে-শুনে করে না। সে-ও হয়তো ডাকবার জন্যই ডাকে, সঙ্গী পাবার আশায়। পায়ও, কিন্তু পেয়েও পাওয়া হয় না। যে প্রেমিককে সে ডেকে নিয়ে আসে, সে প্রেমিককে মানুষ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। একদিক থেকে দেখতে গেলে, তার হাহাকার চিরদিনের। দিনের পর দিন সে প্রেমিককে ডেকে আনে, অথচ তাকে পায় না। মানুষের হাতে সে শুধু শিকার ধরার ফাঁদ।

কিন্তু হঠাৎ আমাকে থামতে হল। ডাকপাখির ফাঁদের কথা ভাবতে ভাবতে নিতুর সঙ্গে কোথা দিয়ে কতখানি এসেছি, খেয়াল করিনি। সহসা আমার সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে আগুনের শিখা দেখে, থমকে দাঁড়ালাম। সে আগুনের শিখার অগ্নিঝলক কেবল যে আমার গায়ে লাগল, তা না। যেন আমার প্রতি রোমকূপের ভিতর দিয়ে মিশিয়ে গেল রক্তে রক্তে। আমার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে একটা দাবানলের গোপন উল্লাস। অথবা অন্য কিছু, যেন অগ্নিসুধায় মাতাল হয়ে গেলাম। এমন করে আগুন জ্বালাল কে। শিখা যার ছড়িয়ে গিয়েছে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশের দিকে।

নিতুর স্বর আমার কানের কাছে বাজল, 'কুসুম গাছ।'

কুসুম গাছ! হয়তো তা-ই। জীবনে কখনো দেখা ছিল না। অনেক গাছের অনেক ফুলের, অনেক ঝলক দেখেছি, কিন্তু এমন আগুনের শিখার সমারোহ দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কি ফুল, না পাতা?

নিতু বলল, 'সবই পাতা। নতুন পাতা।'

আহ্, আমার কথা, তুমি বড় দরিদ্র। এই কুসুমের অগ্নিশিখার বর্ণনা দিই, তেমন কথা আমার ভাণ্ডারে নেই। দরিদ্রতম আমি, না হলে রঙ তুলি পট

নিয়ে বসে যেতাম, ধরে রাখতাম এই অগ্নিশিখাকে, এই মুহূর্তে কার যেন একটা ছবির কথা চোখের সামনে, অস্পষ্টভাবে ভেসে ভেসে উঠল। শস্যের মাঠে, সূর্যালোকে, পাকা ফসলের অগ্নিশিখা।

নিতুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে, ও হেসে উঠল। বলল, 'একেবারে ভুলে গেলেন যে!'

বললাম, 'ভুলে যায়নি, ভুলিয়ে দিল।'

বলতে ইচ্ছা করল, 'ক্ষেপিয়ে দিল।' মনে মনে ভাবলাম, লাল রঙ দেখলে যে শিং বাগানো পশুটি মত্ত হয়ে তেড়ে আসে, সে পশু কুসুম গাছের সামনে এসে দাঁড়ালে কী করবে? আঘাতে আঘাতে মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলবে নাকি? ভুল দেখিনি। এখনো পড়ন্ত বেলার রোদের ছটা আছে। কেবল আমার নিজের গায়ে না, নিতুর গায়ে, ওর ফরসা মুখেও কুসুমের রক্তিম ঝলক লেগেছে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রচ্ছটায়, কুসুমের ঝলকে ফরসা মুখের রূপ কেমন দেখাবে? লজ্জারুণ? মনে হয়, লজ্জা ভুলে যাওয়া, আত্মহারা বাসনা আগুনে দীপ্ত।

নিতু বলে উঠল, 'তবে বেশি দিনের জন্য না। ফাল্গুন শেষ হতে না হতেই, সব পাতা সবুজ হয়ে যাবে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি 'সবুজ?'

'পুরোপুরি, আর সব গাছের পাতার মতোই।'

নিতুর মুখের হাসিতে যেন একটা রহস্যমাখা। যেন ও আমাকে হতাশ করে দিতে চাইল। কিন্তু হতাশ হলাম না। সবুজকে ভালবাসি প্রাণদাত্রীর মতোই। এই আগুন একদিন সবুজ হবে তখন তার অন্য রূপ। এখন যে তার অগ্নিঝলকে আমাকে মাতাল করে দিচ্ছে, এ রূপকেও অস্বীকার করবে কে? রূপ থেকে রূপান্তর, নিরন্তরতার মধ্যে সত্য তো সেইখানে। নিরন্তরতা একমুখী না ভিন্ন ভিন্ন দিকে তার গতি।

কুসুম গাছটি একাকী নেই, আশেপাশে অর্জুন শাল, আরো সব নাম-না-জানা গাছের ফাঁকে ফাঁকে, আরো কিছু কিছু আগুনের শিখা উঁকি মারছে। এসে পর্যন্ত এমন একটি ছবি চোখে পড়েনি তারপরে ডান দিকে তাকাতে, একটু দূরে চোখে পড়ল, কঞ্চিবাঁশের বেড়ার বেষ্টনী। পরিষ্কার উঠোন। উঁচু মাটির দাওয়ার ওপরে কাঠের ফ্রেমে টিনের দেওয়াল, টিনের চালাবাড়ি। বাড়িটার পিছন দিকে একটা পাহাড়ী টিলা উঠেছে আকাশমুখী হয়ে। টিলার মাথার ওপরে কয়েকটা গাছ।

রেললাইন পেরিয়ে, কখন কতটা এসেছি খেয়াল করিনি। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখছি দেখে, নিতু বলল, 'তিপুদের বাড়ি।'

সেই বাড়ি। আরণ্যকের রচয়িতা যে বাড়িতে খেয়েছেন, দেয়েছেন, দাওয়ায় বসে গল্প করেছেন। গাঙ্গুলিমশাইয়ের গৃহ। নিতু বলল, 'কারোর সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। চলুন একটু এগিয়ে-দেখি।'

বললাম, 'থাক না। চল আমরা কোয়েলের ধারে ঘুরে আসি। ওঁরা হয়তো ঘুমোচ্ছেন। রাত জাগা গেছে তো।'

নিতুর মুখে, কপট হলেও শঙ্কার ছায়া। বলল, 'ওরে বাবা, তিপুকে না জানিয়ে, আপনাকে নিয়ে আমি কোয়েলের ধারে চলে গেলে রক্ষে থাকবে না। রাক্ষুসী আমার চুল টেনে ছিঁড়ে দেবে।'

স্নেহ প্রীতি কেমন সুরে বাজে, বচনেই বোঝা যায়। তথাপি মনটা খুঁত-খুঁত করে। চুপচাপ বাড়ি। মনে হয় সবাই ঘুমোচ্ছেন।. নিতু আগল ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে ডাকল, 'আসুন।'

অগত্যা। পিছন পিছন উঠোনে পা দিলাম। তুলসীমঞ্চটা চোখে পড়ল, মাটির মঞ্চ। এমন সময়েই স্বর শোনা গেল, 'নিতু না কিরে?'

স্বরের স্থান লক্ষ্য করতে গিয়ে চোখে পড়ল, উঠোনের একপাশে আর একটি চালাঘর। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘরের দরজা খোলা। নিতু আমার থেকে এগিয়ে রয়েছে। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ কাকীমা। শিবু ওরা সব ঘুমোচ্ছে নাকি?'

গাঙ্গুলিগিন্নী নিশ্চয়ই। আমাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমিও না। জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এইবার সব উঠবে। সেই বুঝেই আমি চায়ের জল বসিয়েছি। তোর কাকাবাবু উঠে পড়েছে।'

ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, 'কে রে?'

গাঙ্গুলিমশাইয়ের গলা। নিতু বলল, 'আমরা—আমি নিতু।'

নিতুর কথা শেষ হল না। দাওয়ার অন্যদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল তিপু। ডান হাতে ওর চিরুনি, বাঁ হাতের মুঠোয় চুলের প্রান্তের গোছা। মুখে ছড়িয়ে পড়ল এক ঝলক খুশির হাসি। চোখে ঝিলিক। দেখলেই বোঝা যায়, ও সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে আসেনি। আমার দিকে চেয়ে বলল, 'এসেছেন? আসুন, ঘরে আসুন।'

নিতু খানিকটা ধমকের সুরে, বিকৃত মুখে বাজল, 'আজ্ঞে না, এখন আর ঘরে গিয়ে বসবার সময় নেই, আমরা এখন কোয়েলের ধারে যাচ্ছি।'

তিপুও পিছিয়ে যাবার পাত্রী না, চুলে চিরুনি চালাতে চালাতেই 'ওঁকে নিয়ে আমি যাব, তুমি না, সেইরকমই কথা আছে। দেখতে পাচ্ছ, তৈরি হচ্ছিলাম। আর একটু দেরি হলে, আমি নিজেই চলে যেতাম তোমাদের বাড়ি।

বলতে বলতে তিপুর সলজ্জ হাসির দৃষ্টি একবার আমার মুখের ওপর ছুঁয়ে গেল। নিতু বলল, 'ওরে তিপু, তোর দশা দেখে যে ভয় লাগছে। দাদাকে আঁচলে বাঁধবি নাকি?'

তিপু অনায়াসে ঘাড় দুলিয়ে, জিভ ভেংচে দিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে বলে গেল, ওঁকে নিয়ে একটু বস নিতুদা, চা খেয়ে যাওয়া হবে।'

গাঙ্গুলিমশাই বেরিয়ে এলেন। দোভাঁজ ধুতি, কচ্ছবিহীন করে পরা। খালি গায়ে পৈতা। মুখে একটি আধপোড়া বিড়ি ঠিক আছে। আমাকে বললেন, 'আসেন।'

তিপু আবার ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল, হাতে কাঠির মাদুর নিয়ে। সামনের দিকের দাওয়ায় সেটি বিছিয়ে দিয়ে আবার ভিতরে চলে গেল। কোনো আপত্তি যে টিকবে না, তা বোঝা-ই যাচ্ছে। অতএব দাওয়ায় উঠে, মাদুরে গিয়ে বসতেই হল। গাঙ্গুলিমশাইও বসলেন। নিতু চলে গেল ঘরের ভিতরে। সামনের দিকে তাকিয়ে সেই কুসুমের অগ্নিশিখা দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে অন্যান্য গাছপালা। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করল বিভূতিবাবু কি দাওয়ায় এখানটিতে বসতেন? পারলাম না, ভেবে নিলাম, এই দাওয়ারই এখানে ওখানে বসতেন। তবে আমরা এখন যেখানে বসে আছি সেখান থেকে পাহাড়ী টিলাটি দেখা যাচ্ছে না। সেটা বাড়ির পিছন দিকে।

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'এবার আর কিছু করা হয় নাই। তা না হলে লাউ-সীম প্রতিবছরই হয়। চালকুমড়োর মাচাও থাকে। এবার টাটায় বড়ছেলের কাছে অনেকদিন কাটিয়ে এলাম। ঘর-দোর এভাবে থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। একটা মুণ্ডা ছেলে ওর বৌ নিয়ে থাকে বটে রান্নাঘরটায়। কিন্তু ঘর দরজা তো বন্ধ থাকে। বাইরের উঠোন দাওয়া যা একটু ঝাঁটপাট লেপাপোছা হয়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার বড়ছেলে বুঝি টাটায় কাজ করে?'

'কাজ না, ব্যবসা করে। একটা ছোটখাট দোকান আছে, মুদী দোকান, তার সঙ্গে জ্বালানি কাঠ। শিবুটাকে কাজে ঢোকাবার চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। পড়াশোনা আর হবে না।'

বলতে বলতে দুটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলল, নিভল, বিড়ি ধরল না, তবে কোম্পানিকে 'জুয়াচোর' বললেন না, কারণ এখন গৃহস্থ তাঁর সংসারের ভাবনায়

আছেন। গাঙ্গুলি-গৃহিণী ঘোমটা মাথায়, মুখখানি প্রায় অর্ধেক ঢেকে, ডিশ ছাড়া, দু-কাপ ধূমায়িত চায়ের কাপ বসিয়ে দিয়ে গেলেন আমাদের সামনে। ওদিকে ঘরে তিপু নিতুর কথা হাসি ঝগড়া, একসঙ্গেই বাজছে।

গাঙ্গুলিমশাই অনেকটা নিজের মনেই বললেন, 'মাথায় একসময়ে চেপেছিল, জঙ্গলের ইজারা নেব। নিয়েও ছিলাম। কিন্তু সব কাজ সবারে দিয়ে হয় না। একটা পয়সা কোনোদিন মুনাফা করতে পারলাম না, লোকসান দিয়ে মরেছি।'

সর্বাংশে এমন লোকসান কেন। বললাম, 'তাই নাকি?'

গাঙ্গুলিমশাই শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। চোর না হলে, এসব ইজারাদারি চলে না।'

ভিন জগতের ব্যাপার। আমার জ্ঞান-গম্যির বাইরে। তবু অবাক লাগে বৈকি। জিজ্ঞেস করি, 'চোর?'

গাঙ্গুলিমশাই আরো ওপরে গেলেন, বললেন, 'চোর না, ডাকাত না হলে হয় না। ডাকাতি করতে পারলে, ইজারাদারি চলে। কর্তাদের ঘুষ খাওয়ান, আর বেআইনি চুরি করে গাছ কাটেন। যায় যাবে, সরকারের যাবে, আপনি নিজের কোলটি ভরেন। সৎপথে ইজারাদারি চলে না। লোকসান দিয়ে মরতে হবে।'

জিজ্ঞেস করতে ভয় পাই, তিনি কেন সৎপথে থাকলেন? কিন্তু এ কথা কি জিজ্ঞেস করা যায়? গাঙ্গুলিমশাইয়ের মুখটি এখন অসুখী আর বিমর্ষ। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'তবে অনেক বড় বড় ইজারাদারকেই তো আজ পর্যন্ত দেখলাম, শেষটা কারোরই ভাল না। সেটা যে ঘুষ দিয়ে চুরির জন্য, তা না।'

গাঙ্গুলিমশাই চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'মহাপাতকের কাজ তো। প্রাণীহত্যার দায় যাবে কোথায়? বনের ইজারাদারদের বংশ কখনো সুখী হয় না।'

প্রাণীহত্যার দায়? জিজ্ঞাসু অবাক চোখে গাঙ্গুলিমশাইয়ের দিকে তাকালাম। গাঙ্গুলিমশাই তাঁর ঈষদারক্ত বড় বড় চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গাছ তো প্রাণী। আপনি খাট আলমারি নিয়ে ভোগ করেন, সেটা আলাদা। কিন্তু যে তারে মেরে খায়, তার অভিশাপ লাগবেই। খুন হওয়ার কষ্ট সকলের সমান।'

মুহূর্তের মধ্যেই যেন সমস্ত বনভূমি আমার চোখে নতুন রূপে জেগে উঠল। গাছেরও প্রাণ আছে, এমন কথা জানা ছিল। কিন্তু সেই প্রাণের মর্ম জানা

ছিল না। সে যে নিহত হয়, কষ্ট পায়, অভিশাপ দেয়, এমন করে কথাটা কোনোদিন মনেও আসেনি। কিন্তু সত্যি কি গাছের অভিশাপ মানুষের লাগে? এমন কথাও কোনোদিন শুনিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এমন অভিশপ্ত মানুষ আপনি সত্যি দেখেছেন?'

গাঙ্গুলিমশাই একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখেছি বৈকি বাবা। এই এই জরাইকেলাতেই দেখেছি, আপনাকে দেখাব। মনোহরপুরে দেখেছি। এখন আর তাদের কিছুই নেই। বংশগুলোই যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। কম করি আর বেশি করি, পাপ তো আমিও করেছি। তাই মনে হলেই মধুসূদনকে ডাকি, ত্রাণ করো হে, ত্রাণ করো।'

একটা বিস্ময় এবং কষ্টে, গাঙ্গুলিমশাইয়ের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। তাঁর অন্যমনস্ক মুখ, চোখে আর্ত দৃষ্টি। কিছুক্ষণ কারোরই কোনো কথা নেই।

তারপরেই হঠাৎ নিতু হাসতে হাসতে দৌড়ে উঠোনে ছুটে আসে। পিছনে পিছনে তাড়া করে এল তিপু। বেরিয়ে এল শিবুও। গাঙ্গুলিমশাই কন্যার দিকে তাকিয়ে, একটু বা রুষ্টস্বরে বলেন, 'আহ্, কী করিস সব সময়ে!'

তিপু বলল, 'দেখ না বাবা, নিতুদাটা খালি আমার পিছনে লাগে।'

গাঙ্গুলিমশাই বললেন, 'লাগালাগি তো তাদের লেগেই আছে।'

দেখলাম তিপু বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে। বিনুনি বাঁধা হয়ে গিয়েছে। আর কিছু ওর প্রসাধন নেই। আমার দিকে চেয়ে ডাকল, 'চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

গাঙ্গুলিমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাস?'

'নদীর ধারে।'

গাঙ্গুলিমশাই আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তবে আর দেরি করবেন না, ঘুরে আসেন।'

নিতু আর শিবুই আগে আগে হাঁটা দেয়। তিপু আমার সঙ্গে সঙ্গে। আগল পেরোবার আগেই, গাঙ্গুলিমশাই আওয়াজ দেন, 'অন্ধকার হবার আগেই ফিরে আসিস।'

তিপু সে কথার কোনো জবাব দিল না। লাল মাটির পথ ধরে চলতে থাকে। বাঁ দিকে শালবন, তেমন বড় না, ঘনও না। মাঝে মাঝে ঝাড়ালো পলাশ। যে গাছ চিনতে পারি না, তিপুকে জিজ্ঞেস করি, 'ওটা কী গাছ, তুমি কি চেনো?'

তিপু লক্ষ্য করে বলে, 'এখানকার লোকেরা বলে পানজান।'

পানজান। আমার নিজেরও নতুন শোনা। আরো কয়েকটি গাছ দেখিয়ে তিপু আমাকে নাম বলল, 'এটা হল ধ, এটা করম। আর এই যে, এটা নিশ্চয়ই আপনি চেনেন?'

গাছটা পথের ধারেই। তার ফুল না ফল ফুটেছে জানি না, সাদা রঙ। গন্ধে মাতোয়ারা এত তীব্র যেন নিশ্বাস আটকে যায়। তীব্র মদির ও মধুর। মৌমাছিতে ছেঁকে ধরে আছে। চিনি চিনি মনে হল, কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছি না। তিপু বলে উঠল, 'মহুয়া তো!'

মহুয়া মহুয়া! এমন নামটিও মনে পড়ে না, আরে ভোলা মন রে আমার। যেখানেই দেখে থাকি, এ যে মহুয়া, তাতে কোনো সন্দ ধন্দ নেই। গাছের তলা বিছিয়ে ফল পড়ে আছে। তিপু ছুটে গিয়ে, ঘাসের ওপর থেকে কয়েকটি তুলে এনে দিল আমার হাতে। বলল, 'খেয়ে দেখুন মিষ্টি লাগবে।'

নাম যার মহুয়া, সে কখনও মিষ্টি না লেগে পারে। মুখে তুলে জিভ দিয়ে স্বাদ নিয়ে, দাঁতে কাটি। ঠিক মিষ্টি লাগল কি? না যেন। তার সঙ্গে কোথায় যেন কষুটে স্বাদের স্পর্শ আছে, যাকে বলা যায় একটু বা তিক্ত। মধুর স্বাদও একেবারে মিষ্টি? দু পা এগিয়েই দেখি, একটি গরু চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তার নাকের ফুটো দিয়ে রক্ত ঝরছে। ব্যাপার কী? তিপুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গরুটাকে কি জোঁকে ধরেছে?'

'জোঁক?' তিপু অবাক হয়ে গরুটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'না, অনেক মহুয়া খেয়ে মরেছে। এখন নড়তে-চড়তে পারছে না, চোখ দুটো কেমন টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। নেশা হয়ে গেছে, নাক দিয়ে তাই রক্ত পড়ছে।'

গরুর নেশা? তাও মহুয়া খেয়ে! সবই নতুন, জীবনেও এমন দৃশ্য দেখা ছিল না। একটু শঙ্কিত হয়ে বললাম, 'তা হলে আমারো তো খাওয়া উচিত না, মাতাল হয়ে যাব।'

তিপু খিলখিলিয়ে বাজল একেবারে কিশোরী শরীরের সর্বাঙ্গে। বলল, 'ধু-র এই ক'টা ফুল খেলে আবার নেশা হয় নাকি? আর মানুষ বেশি খেতে পারে না। মহুয়া চোলাই করে মদ হয়, এখানকার মেয়ে-পুরুষ সবাই খায়। ঘরেই বানায় তো।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, ওরা বলে সড়গা। ওই ফল ওরা শুকিয়ে ঘরে তুলে রেখে দেয়। পরে তরকারি রেঁধে খায়। আবার গুঁড়ো করে ছাতুর মতন খায়।'

বাহ্, তিপু অনেক খবর জানে। মহুয়া দিয়ে মদ তৈরি হয়, এমত সংবাদ আমারও জানা ছিল, স্থানীয় বনবাসীরা তাকে সড়গা বলে, তা জানতাম না। আর খাদ্য-ব্যঞ্জনের কথা তো মোটেই না। জিজ্ঞেস করি, 'তোমরা খাও না ?'

তিপুর টুকটুকে ঠোঁটের কোণে বাঁক, একটু যেন অভক্তিতে বলল, 'বাহ্, ও আবার খাওয়া যায় নাকি!'

নিতু শিবু যে কোথায় চলে গিয়েছে দেখতেই পাই না। তারা বোধহয় এতক্ষণে কোয়েলের কূলে পৌঁছেছে। হঠাৎ ডানদিকের ছোট পাহাড়ী টিলার দিকে চেয়ে দেখি, কয়েকটা পাথর যেন গেঁথে রাখা হয়েছে। চৌকো মতো লম্বা, দেখলেই বোঝা যায়, মানুষের নিজের হাতে কাটা, এবং গাঁথা। আশে-পাশে কয়েকটা গাছপালা, ঝিঁঝি ডাকা নিঝুম। তিপুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই পাথরগুলো কী ?'

তিপু একবার তাকিয়েই, একেবারে আমার গায়ে লেপটে এল। চোখের দৃষ্টিতে ভয়, একটু যেন শিউরেই উঠল। ভয় পাওয়া স্বরেই বলল, 'ঠিক ওদিকেতেই আপনার চোখ গেল ?'

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, ওখানে কী ?'

তিপু আর সেদিকে ফিরেও তাকাল না। এক হাত দিয়ে ও তখন আমার জামার হাতা চেপেই ধরেছে। বলল, 'নিজেই তাকিয়ে দেখুন না।'

অবাক! দেখছি তো, কতগুলো লম্বা লম্বা, হাত দুয়েক চওড়া পাথর গেঁথে রেখেছে। দু-একটা একটু বা হেলে পড়েছে। একটু তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ-ই মনে হল, দাঁড়িয়ে থাকা পাথরগুলো, আর তাদের পড়ন্ত রোদের লম্বা ছায়ায়, কেমন যেন একটা অলৌকিক মাহাত্ম্য রয়েছে। ওখানকার বাতাসটাও যেন ঠিক আমাদের গায়ে লাগা বাতাসের মতো না। তিপুর ভয় লাগা অভিব্যক্তিই যেন আমাকে আরো বিশেষ করে বলে দিল, ওই টিলার শূন্যতা কেবল শূন্যতাই না। চোখে দেখা যায় না অথচ আছে, এমন কিছু সেখানে বিরাজ করছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কি শ্মশান ?'

আমার জামার হাতা ধরা, তিপুর মুঠি আর একটু শক্ত হল। বলল, 'ওরা পোড়ায় না, মাটিতে চাপা দিয়ে পাথর গেঁথে দেয়।'

আন্দাজটা একেবারে ভুল করিনি। সমাধিক্ষেত্র। কিন্তু যাদের সমাধি-ক্ষেত্র, তারা কি খৃষ্টান বা মুসলমান ? তাদের সমাধির কথাই যেন মনে করিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কি খৃষ্টানদের গোরস্থান ?'

তিপু বলল, 'তা জানি না। ওরাওঁরা মারা গেলে, ওইভাবে রাখে। একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন না।'

তিপু আমাকে প্রায় টেনে নিয়েই চলেছে, পারলে ছুট দেয়। আমি পাল্লা দেবার চেষ্টা করে বলি, 'তোমার বুঝি ওসব দেখলে খুব ভয় লাগে?'

তিপু বলল, 'কার না লাগে? সকলেরই লাগে। আপনার লাগে না বুঝি? একলা থাকলে দেখতেন।'

তাও তো বটে। আমার সঙ্গে তিপু রয়েছে, আমার আবার ভয় কী। এমন সঙ্গিনী, বুকে যার হাতুড়ির ঘা পড়ছে। আবার একটু বনের চেহারা বদলাচ্ছে। বড় বড় গাছের ছায়া আমাদের গ্রাস করছে, তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক একটা বড় বড় পাথরের চাঁই, অধিকাংশই কালো তাদের রঙ, কিম্ভূতাকৃতি বিরাট বিরাট পশুর মতো। বাঁদিকে তেমনি ছোট ছোট শাল এবং এবং ঝাড়ালো পলাশের বন। কিন্তু লাল কাঁকরমাটির রাস্তাটা যেন ক্রমেই নিচের দিকে ঢালুতে নামছে। বললাম, 'একলা ডাকলেও, আমার ভয় লাগত না, কারণ আমি তো কিছু জানি না, ও পাথরগুলো কিসের। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতাম, আর ভাবতাম। তা ছাড়া, আমার একটা অন্য বিশ্বাস আছে।'

তিপু তখন আমার জামার হাতা মুঠিমুক্ত করেছে। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী বিশ্বাস?'

আমি মুখের ভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, 'শুনেছি যাদের মন ভাল, মানে ভাল মানুষদের ওরা কোনো ক্ষতি করে না।'

তিপু আমার মুখ থেকে চোখ সরাল না কিন্তু হঠাৎ কিছু বলল না। আমি আবার বললাম, 'ওরা মানে, তুমি যাদের কথা বলছ, আমি তাদের কথাই বলছি।'

তিপু জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ভাল মানুষ মানে?'

আমি একটু বিব্রত হলেও তাড়াতাড়ি সে-ভাব সামলে নেবার চেষ্টা করে বললাম, 'ভাল মানুষ—ভাল মানুষ মানে, যাদের মনে কোনো পাপ নেই।'

তিপু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, 'এমন মানুষ বুঝি আছে, যাদের মনে পাপ নেই?'

কিশোরী তিপুর মুখের দিকে ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। না, কোনো জটিলতা দেখতে পাই না। কিশোরীর সারল্য সেই মুখে। কিন্তু ওর কথা যেন বিশ্বের এক চির প্রশ্নের মতো বেজে উঠল, যা অনেকটা কশাঘাতের মতো। অথবা একটা গভীর বোধ থেকে অতি সহজ একটি কথা। কিন্তু তিপুর বয়সী

একটি কিশোরী মেয়ে এমন কথা বলে কী করে? আমি আমার মনের অবস্থা ওকে বুঝতে দিতে চাই না। জিজ্ঞেস করি, 'সব মানুষের মনেই বুঝি পাপ আছে?'

তিপু সহজভাবে বলল, 'আছে।'

যেন ওর এ বিশ্বাস টলানো যায় না! আমি আমার জিজ্ঞাসাটা বিদ্ধ করলাম ওর দিকেই, যদিও সেটা নিজের কাছেই কেমন যেন নিষ্ঠুর বোধ হচ্ছিল, 'তোমার মনেও কি পাপ আছে?'

তিপুর মুখ একটু গম্ভীর হল। ঘাড় কাত করে শুধু শব্দ করল, 'হুঁ।'

তিপু, একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, সত্যি কি ওর মনে পাপবোধের অবকাশ আছে? জানি না। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় মনকেই বোধহয় আমি পুরোপুরি জানি না। তারপরেও আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত না। কিন্তু আমার তীব্র কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা দমন করতে পারলাম না, 'কী পাপ বল তো?'

তিপু মুখ নামিয়ে চলছিল। প্রশ্ন শুনে, আমার চোখের দিকে তাকাল। বলল, 'তা জানি না।'

বললাম, 'তার মানে নেই।'

তিপু জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, 'আছে।'

'কী?'

তিপু বলল, 'হিংসে বুঝি পাপ না?'

হিংসা পাপ, সব ক্ষেত্রে কী না জানি না। শিশু তার নবজাত ভাই বা বোনকে হিংসা করে। সে হিংসা পাপ না। কিন্তু এ সব কূট চিন্তায় না গিয়ে বলি, 'যদি হয়?'

তিপু বলল, 'তা হলে তো আমার পাপ আছে। আমার মধ্যে হিংসে আছে।'

এটা একটা উদাহরণ মাত্র। তিপুর পাপবোধের মধ্যে কতগুলো বিশ্বাস আছে। ওর অভিজ্ঞতাও এই বলে, সব মানুষের মনেই পাপ আছে। যা ভেবেই হোক, যে চিন্তা থেকেই হোক, পৃথিবীর এত বড় সত্য কথাকে মেনে নেব না, এতখানি সাহস আমার নেই। বনের ডাকে ঘরছাড়া এক উল্লাসে ছুটে এসেছি, যদি বা সেখানে বিবাগী মনে আপনভোলা সুর বেজে থাকে, বনের ছায়ায় চলতে চলতে, নিজের মনে ডুব দিয়ে দেখি, তিপু ধর্মে বেজেছে। হয়তো না-জেনে। তিপু সত্যে বেজেছে। আমাকে তা-ই স্বীকার করতে হল, 'ঠিক বলেছ। সকলের মধ্যেই পাপ আছে।'

তিপু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টি সন্দিগ্ধ। বলল, 'হুঁ, আমাকে ঠাট্টা করছেন।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

তিপু বলল, 'তা বলে আমি বলিনি, আপনার মধ্যেও পাপ আছে।'

তিপুর এ মনও স্পষ্ট। তাই না হেসে পারি না। সব মানুষের মধ্যে ও আমাকে মিশিয়ে ফেলতে চায় না। সেটা যে সত্যি ভেবে আমাকে আলাদা করে রাখতে চায়, তা না। আমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়, পাছে দুঃখ পাই।

কিন্তু ওর এ কথাটার জবাব দেবার অবকাশ পেলাম না। ঢালু পথের বাঁক ফিরতেই, সোনালী চর আমার চোখের সামনে জেগে উঠল। চওড়া চরের অনেকখানি দূরে, সেই ইস্পাতনীল নদী। যত এগিয়ে যাই, ততই মনে হয়, এ নদী কলকলালে স্রোতস্বিনী না, যাকে দেখলে একটি চঞ্চল কিশোরীর কথা মনে পড়ে যায়। নদীর ওপারে, ডান দিক ঘেঁষে উঁচু নীল পাহাড়ের মাথা জেগে উঠেছে। তার ছায়া পড়েছে কোয়েলের জলে। আরো দূরে, গভীর বন এবং পাহাড়, যার ভিতর থেকে কোয়েল নেমে আসছে, একটা বাঁকের মুখ থেকে। আকাশ এত বড়, উদার, সব মিলিয়ে, কেমন একটা গভীর গাম্ভীর্য রয়েছে। যে গাম্ভীর্যে ভ্রূকুটি নেই, ধ্যানের মহিমা বিরাজ করছে। চরের এখানে ওখানে, হঠাৎ কিছু বড় বড় পাথরের চাঁই জড়াজড়ি করে আছে আদিগন্ত সোনালী চরের মাঝখানে, এখন তাদের তেমন বিশাল মনে হচ্ছে না। যদিও তাদের অবয়ব হস্তীতুল্য।

শুধু চরে না, জলেও বড় বড় পাথরের চাংড়া, পাহাড় থেকে ধসের সঙ্গে একদা নেমে এসে ঠেকে পড়েছে। দূর থেকে দেখলে, হঠাৎ মনে হয়, হাতি বা মহিষেরা জলে গা ডুবিয়ে রয়েছে। জলের স্রোত তাদের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে, কলকল রোলে বাজছে।

তিপু আর আমি জলের দিকে এগিয়ে চলেছি। নদীর ওপারে যাদের লম্বা লম্বা ঘাস বলে এক সময়ে মনে হয়েছিল, এখন দেখছি স্পষ্টতঃই তা কাশের বন। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্য জিজ্ঞেস করি, 'ওপারে ওগুলো কি কাশবন?'

তিপু বলল, 'হ্যাঁ।'

অবাক লাগে। আমি বাঙালী, আমি জানি, শরৎকালে কাশবনে ফুল হয়। এই বিহার-উড়িষ্যার সীমান্তে, কোয়েলের তীরে দেখছি, ফাল্গুনে কাশের বনে ফুল। জিজ্ঞেস করলাম, 'হেঁটে পার হওয়া যায়?'

তিপু ঘাড় নেড়ে বলল, 'না। মাঝামাঝি পর্যন্ত যাওয়া যায়। তারপরে জল বেশি। সেই জায়গাটা পার হতে পারলে, আবার হাঁটু-জল।'

'পার হয়েছ কোনো দিন?'

'অনেকবার। আপনি যেদিন চান করতে আসবেন, সেদিন আপনাকে নিয়ে ওপারে যাব।'

তিপু ধরেই নিয়েছে, কোয়েলে আমি চান করব। তিপু আবার জিজ্ঞেস করল, 'সাঁতার জানেন তো?'

ওকে বলতে পারি না, জলের পোকা ছিলাম, হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সাঁতার শেখা হয়েছিল। বললাম, 'জানি।'

তিপু কোয়েলের জলের মতোই কলকলিয়ে উঠল, 'আহ্, খুব ভাল হবে। মাঝখানে ওই পাথরগুলোর ওপর বসে থাকতে খুব মজা লাগে।'

বলে ও নদীর দূর বুকে আঙুল তুলে দেখাল। কোয়েলের রূপে এত মুগ্ধ ছিলাম, লক্ষ্য করিনি, প্রায় একটা উলঙ্গ আধ-বুড়া আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অকারণেই তার মুখে একটি অনির্বচনীয় হাসি। হাতে তার ময়লা ন্যাকড়ার একটা পুঁটলি। ওবেলার মাতাল মংলার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু এ লোকটি মাতাল না। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, সে কপালে একটি হাত ঠেকাল, একটু বা মাথাও নোয়াল। আমিও কপালে হাত ঠেকিয়ে জবাব দিয়ে, তিপুর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। তিপু বলল, 'সোনাখোঁচা।'

এই সেই সোনাখোঁচা আজ সকালেই গাঙ্গুলিমশাই যাদের কথা বলছিলেন। তিপু আবার বলল, 'ওর হাতের পুঁটলিতে বালি আছে, সেই বালিতে সোনা আছে। ওরা জানে, নদীর জলের ধারে ধারে কোথায় বালিতে সোনা আছে। সেখানে ওরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বালি তোলে।'

সত্যি, আমি আমার এমন দেশটির তুলনা খুঁজে পাই না। প্রকৃতির জলের ধারায় মানুষ সোনা খুঁচিয়ে বেড়ায়, যে সোনা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে দাপাদাপি, মারামারি, কাড়াকাড়ি। তবু কেমন যেন সন্দেহ লাগে, এতবড় বালির পুঁটলিটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কত সোনা এতে আছে?'

তিপু বলল, 'কত আর, দু পাই তিন পাই হতে পারে। বড়জোর এক আনা।'

মাত্র। অথচ দেখে মনে হচ্ছে, নিদেন দু' সের আড়াই সের বালি আছে। তিপু নিজেই আবার বলল, 'ও তো সেই সকাল থেকে খোঁচাচ্ছে, এখন ফিরছে। এখার গিয়ে বিক্রি করবে।'

অবাক হয়ে বলি, 'বল কী, সেই সকাল থেকে ? আর এতটা বালিতে, আমি তো ভেবেছিলাম, অনেকখানি সোনা আছে।'

তিপু বলল, 'তা হলে তো এ বুড়ো বড়লোক হয়ে যেত।'

তিপু যা-ই বলছিল, লোকটা ওর কথার সঙ্গে ঘাড় দোলাচ্ছিল, আর আমার দিকে চেয়ে হাসছিল। বুড়োর সব দাঁত নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় বিক্রি করবে ?'

তিপু বলল, 'এখানে দু'জন মাড়োয়ারী আছে যারা এই বালি কেনে। তাদের লোক আছে, যারা এই বালি ঝেড়ে সোনা বের করে নেবে। কিন্তু এ বুড়ো কত পাবে বলুন তো ?'

'সোনার দামটুকু পাবে।'

তিপু স্পষ্ট ওর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে দেখিয়ে বলল, 'কাঁচকলা। আট আনা কি এক টাকা।'

বুড়ো ঘাড় দুলিয়ে, সায় দিয়ে বলল, 'হঁয় হঁয়, আঠানা এক টাকা।'

সকাল থেকে এই শেষবেলা পর্যন্ত, সারা দিনের আয়। বঞ্চনা আর কাকে বলে। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, 'বুড়ো দুপুরে খেল কী ?'

তিপু বলল, 'কিছুই না। এখন পয়সা পাবে, তারপরে যা হয় খাবে।'

বলে, তিপু বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, 'মাণ্ডি খাবি, না ডিয়েং খাবি ?'

বুড়ো গল্‌গল্‌ করে হেসে বলল, 'মাণ্ডি মাণ্ডি।'

তিপু ঠোঁট উলটে, চোখ পাকিয়ে বলল, 'মিথ্যুক। তোদের চিনি না ? যা পাবি, তাই দিয়ে হাঁড়িয়া গিলে মরবি।'

তিপু এতও জানে! বুড়ো তবু বারে বারে বলতে লাগল, 'না না মাণ্ডি মাণ্ডি।'

বলে আর আমার দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকায়। তারপরে স্পষ্টতঃই হাত পাতে। এতক্ষণে বোঝা গেল, সোনাখোঁচা আমার কাছে কিছু প্রার্থী। তিপু ধমক দিয়ে বলল, 'না, এক পয়সাও পাবি না।'

ধমক খেয়ে বুড়ো আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। হাসিটা কিন্তু ফোগলা মুখে আছে। আমি পকেট থেকে কয়েকটি খুচরা পয়সা তুলে দিলাম। সোনাখোঁচা বারে বারে ঝুঁকে কপালে হাত ঠেকালো। তারপরে পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করল। কোথা থেকে দেখি, একটা কুকুর ছুটে দৌড়তে দৌড়তে এল, বুড়োর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। আর বুড়ো তার সঙ্গে কী সব কথা বলতে বলতে চলল।

তিপুও দেখছিল, ওর মুখে একটু অন্যমনস্কতার ছাপ। তারপরে বলল, 'এ সোনাখোঁচা বুড়োটার কেউ নেই, ওই কুকুরটা ছাড়া।'

জিজ্ঞেস করি, 'তুমি চোনো বুঝি?'

তিপু বলল, 'নাম জানি না, চিনি। ও রোজ সোনা খোঁচাতে আসে। থাকে উইলিয়াম সাহেবের করাত-কারখানার পাশে একটা ভাঙা ঘরে।'

তিপু সব জানে। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, 'মাণ্ডি মানে ভাত, ডিয়েং মানে কী?'

'হাঁড়িয়া।'

দেখছি, একা তিপুই আমাকে বনের সব কিছু চিনিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে। হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, নিতু আর তোমার দাদা কোথায় গেল বল তো।'

তিপু অনায়াসে বলল, 'কোথাও বসে বিড়ি খাচ্ছে বোধহয়।'

তিপু তাও জানে। আবার বলল, 'চলুন, স্যাণ্ডেল খুলে রেখে একটু হেঁটে আসি।'

উত্তম প্রস্তাব। বললাম, 'চল।'

পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে রেখে দু'জনেই জলে নেমে গেলাম। স্বচ্ছ জল, নিচের কাঁকর বালি সবই দেখা যায়, কিন্তু স্রোত বেশ প্রবল। প্রথমে পায়ের পাতা ডুবল, তারপরে আরো খানিকটা। ডুবতে ডুবতে আমার যখন হাঁটু, তিপু তখন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বলল, 'আমি আর যেতে পারব না।'

দেখলাম ওর মুখে হতাশা আর লজ্জার হাসি। ইতিমধ্যেই প্রায় ওর হাঁটুর ওপরে কাপড় উঠেছে। আমি ওর কাছে পিছিয়ে গেলাম। তিপু বলল, 'আহ্, কী ভালো হত যদি এখন চান করতে পারতাম!'

বললাম, 'অসুবিধে কী?'

তিপু ভুরু কুঁচকে বলল, 'বা রে, এ সময়ে চুল ভেজাবো? মা বকবে।'

তাও তো বটে। কিন্তু স্রোতের ধাক্কায়, কেবল যে আমিই টলমল, তা না। তিপুও। জিজ্ঞেস করলাম, 'পড়ে যাবে না তো?'

তিপু জবাব দেবার থেকে, আমার ডানা আঁকড়ে ধরাটাই সহজ মনে করল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বুঝি ফিরে গিয়ে, এসব লিখবেন?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন বল তো?'

তিপু বলল, 'আপনি তো লেখক।'

সত্যিই তো। এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। বললাম, 'লিখতেও পারি।'

তিপু ঠোঁট নাড়লো, কিন্তু কিছু বলল না। ঠোঁট টিপে হাসল। লজ্জার ছটা ওর মুখে। মাথার ওপরে উদার নীল আকাশ, একটু বা রক্তের ছোঁয়া লেগে গিয়েছে। নীল পাহাড়, বর্ণাঢ্য বন, কোয়েলের স্রোত বহে যায়। জলে দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী লজ্জারুণ মুখে হাসছে। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'আমার—আমাদের কথাও লিখবেন ?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

'কী লিখবেন ?'

আমি একটু ভাবলাম। তারপরে বললাম, 'লিখব, তিপু না থাকলে আমার বন দেখাটা সার্থক হত না।'

'ইস্।' বলেই তিপু অনায়াসে আমার ডানাতেই ওর মুখটা চেপে ধরল। ওর মাথা থেকে নারকেল তেলের গন্ধ পাচ্ছি। পুষ্ট আর দীর্ঘ বিনুনিটি পিঠের ওপর এলানো। কিশোরীসুলভ লজ্জা আছে। যুবতীসুলভ নিষিদ্ধবোধ এখনো জাগেনি। সে জন্যেই এমন সহজ আর অনায়াস। তার সঙ্গে আছে বোধহয়, এই প্রকৃতির ছোঁয়া। বললাম, 'আমি কিন্তু এসব নিয়ে, মোটেই মিথ্যা বলি না।'

তিপু মুখ চেপে রেখেই বলল, 'তা বলে, ও কথা লিখবেন কেন ? আমি আবার কী করলাম ?'

'তুমি আমাকে কত গাছ চিনিয়ে দিলে, কত কী বুঝিয়ে দিলে, কোয়েলের ধারে বেড়াতে নিয়ে এলে।'

তিপু এবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখে-মুখে লজ্জার ছটা গাঢ়তর। তবু চোখের দৃষ্টি যেন একটু সন্দিগ্ধ, আমার কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে চাইছে। তারপরে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও তো সবাই পারে।'

বললাম, 'তবু সবাই তো আমার কাছে আসেনি।'

তিপু আবার আমার দিকে দেখল। তারপরে বলল, 'আমার খুব ভাল লেগেছে।'

বলে, চোখ নামিয়ে নিল। ঠোঁটের লজ্জিত হাসিটি উজ্জ্বল। কোয়েলের জল বহে যায় কলকল করে। আমি ওকে কোন প্রশ্ন করি না, বলি, 'আমারো।'

তিপুর চোখ চিকচিক করে উঠল। তারপরেই ঠোঁট উল্টে দিল, অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে। আমার ডানা ধরে টেনে বলল, 'চলুন পাড়ে উঠি।'

দু'জনেই, কাপড় বাঁচিয়ে সন্তর্পণে চরে উঠে আসি। রোদ আর নেই। চরে ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। বন একটু বেশি নিবিড় হয়েছে। চরে এসে তিপু আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'চলুন, ওই দিকে যাই। ওদিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে, জরাইকেলার দোকানপাটের সামনে গিয়ে উঠেছে।'

'চল।'

আমাদের কাছাকাছিই ছিল, বিশাল উঁচু পাথরের চাংড়া। যেন শুঁড় গুটিয়ে একাধিক হাতি গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনা-সামনি হতেই প্রচণ্ড এক হাঁক। ঝপ করে যেন কেউ লাফিয়ে পড়ল তিপুর একেবারে ঘাড়ের কাছে। তিপুও সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। নিতুর অট্টহাসি তখন কোয়েলের ছায়াঘন আকাশ কাঁপিয়ে বাজছে। শিবু পাথরের ধারে দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসছে।

আমার শরীর থেকে, তিপু ছিটকে লাফিয়ে পড়ল নিতুর দিকে, চেঁচিয়ে বলল, 'গুণ্ডা দস্যি, দেখাচ্ছি আজ তোমাকে।'

নিতু দিল দৌড়। তিপু করল তাড়া। কে যে কম, তা বুঝতে পারছি না। তবে নিতু যে চালাক তাতে সন্দেহ নেই, কারণ ও যখন বুঝতে পারল, সোজাসুজি দৌড়লে, তিপু ওকে ধরে ফেলতে পারে, তখন গতি করল সর্পিল। ছুটল সাপের মতো এঁকে-বেঁকে। তিপুও ছাড়বার পাত্রী না। কিন্তু অবাক লাগে, ওর ছোটবার দ্রুতগতি দেখে। দমও কম নেই। শিবু বলল, 'দুটোই সমান। বললাম নিতুকে, ওরকম করিস না। কথা শুনল না। আজ ওর পিঠে কয়েক ঘা পড়বেই।'

আমারো তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু ক্রমেই তিপু আর নিতু আমাদের চোখের সামনে থেকে এত দূরে চলে যাচ্ছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা বোধহয় সমীচীন না। বললাম, 'আমরা কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব?'

শিবু বলল, 'না, চলুন আমরা ওদের পিছু যাই। এক জায়গায় ওরা থামবেই।'

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। মানুষ একদিকে যেমন নিরন্তর ও অমর, আবার অন্যদিকে সে মরণশীল এবং স্তব্ধ। এমনি করে না বলে, বরং বলা ভাল, যে-কোনো ঘটনারই ইতি আছে। আপাতত, এখন পর্যন্ত নিতু তিপুর পালানো এবং তাড়া দেওয়া দেখে মনে হচ্ছে ওরা বুঝি আর থামবেই না। এক সময়ে ওরা আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল। যে-পথ দিয়ে কোয়েলের ধারে এসেছিলাম, সে পথ ফেলে এসেছি পিছনে। এখন অন্য দিকে

চলেছি। বালুচরের ধারে ধারে বন তেমন নিবিড় না। দিকের ক্ষেত্রে, অনুমান করতে পারি, ডান দিক ঢুকলেই, জয়াইকেলার জনবসতি পেয়ে যাব।

কথাটা মনে এল এই কারণে, কোয়েলের তীরে একটু একলা থাকতে ইচ্ছে করছে, চরের বুকে একটা পাথরের ওপরে। ধ্যান করব না, সে মন পেয়েছি আর কবে। তবু, এই যে ছায়া ঘনিয়ে আসা চর, ওপারের পাহাড়ের মাথায় আকাশে লেগেছে রক্তাভা, এবং ক্রমে বন নিবিড়তর। কোয়েলের কলকল ধ্বনি, দূরে গাছে পাখিদের কলরব, আর একেবারে নির্জন বালুবেলা। এখানে চুপ করে একটু বসে থাকতে ইচ্ছা করছে। ধ্যান না, জপ না, যে কথাটা হতে চায় না নানা কাজের মধ্যে, সেই কথাটা সেরে নিতাম। নিজের সঙ্গে দু-কথা। কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে যে মুনি-ঋষিদের কথা, যাঁরা তপস্যা করেছেন এমনি নিবিড় বনের ছায়ায়, সে-রকম তপস্যা আমার কিছু নেই। যে-জীবনটা কাটাই, বারো মাস যা নিয়ে থাকি, মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে, সে-ই সব সত্য না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে, এই বনের হাতায়, অসীম আকাশের তলায়, একবার নিজেকেই দেখতে ইচ্ছা করে। যে-আমি আমাকে ছেড়ে উদাস হয়ে বেড়ায়।

শিবুকে বললাম, 'আমি না হয় একটু পরে যাব। তুমি চলে যাও।'

শিবু অবাক হয়ে বলল, 'এখানে? একলা? না না, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এখানে এখন একলা থাকা উচিত না। তাছাড়া আপনি নতুন মানুষ। আমরাই কখনো থাকি না।'

শিবুর আপত্তি বেশ দৃঢ়। সংশয় আমার মনেও আছে। ওর পাশে পাশে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করি, 'ভয়ের কিছু আছে নাকি?'

শিবু বলল, 'অনেক কিছুই থাকতে পারে। ধরুন অন্ধকার হয়ে গেলে, হয়তো একপাল হাতি এসে হাজির হল।'

'হয় নাকি?'

'দেখিনি, শুনি মাঝে মাঝে। লোকজনের সামনে অবিশ্যি হাতিরা বিশেষ আসতে চায় না। ওপারের বন থেকে হাতিরা মাঝে-মধ্যে কোয়েলের জলে আসে। তা ছাড়া সাপ-খোপ, কত কী থাকতে পারে। সব থেকে ভাল ভোরবেলা।'

সাপ-খোপ শুনলেই, শিরদাঁড়ার কাছে কেমন যেন একটু নাড়া খেয়ে যায়। শিবুর সঙ্গে বেশ খানিকটা হেঁটে এসে, কতগুলো বন্য ঝোপঝাড়ের দিকে, ডান দিকে মোড় নিতেই, দৃশ্য অপরূপ। নিতু দু হাত-পা ছড়িয়ে, বালির ওপরে

চিত হয়ে পড়ে আছে। ওর চোখ বোজা। আর একটু দূরেই, তিপু, বালির ওপরে বসে হাঁপাচ্ছে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কিন্তু মুখে হাসি। আমাদের দেখে, পড়ে থাকা আঁচলটা তুলে নিল বুকে। দ্রুত নিশ্বাসে সর্বাঙ্গ দুলছে। নিতুর অবস্থাও তা-ই। যদিও সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে, দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। চুল এলোমেলো। ঠোঁটের কোণে হাসিটি ঠিক আছে।

আমি তিপুকে বললাম, 'একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছ ?'

তিপু বলল, 'আচ্ছা করে চুল টেনে দিয়েছি।'

বেচারা নিতু। বললাম, 'গুণ্ডাটাকে তা হলে হারিয়ে দিলে ?'

তিপু বলল, 'যাবে কোথায় ?'

নিতু অমনি উঠে বসল, তিপুর দিকে ফিরে বলল, 'এই ছাখ, মিথ্যে কথা বলবি না। তুই আমাকে ধরতে পারিসনি, আমি নিজের থেকেই শুয়ে পড়েছিলাম। তারপরে তুই এসে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলি।'

তিপু ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'শুয়ে পড়েছিলে কেন মশাই ? যখন দেখলে তিপু কিছুতেই দমছে না, নিজেরো দম ফুরিয়ে গেছে, তখনই শুয়ে পড়েছিলে।'

নিতু এবার অবাক স্বরে বলল, 'সত্যি, তোর বুকের খাঁচায় কত দম ধরে রে রাক্ষুসী !'

আমি হাসি দমন করতে পারলাম না তিপু বলল, 'তবেই বুঝে দেখ।'

সত্যি, তিপুর কিশোরী টলটলে শরীরে এত শক্তি আসে কোথা থেকে। দেখলে তো মনে হয়, কোমল একহারা উজ্জ্বল শ্যামলী একটি মেয়ে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, এবার যেন তিপুর একটু লজ্জার অবকাশ হল। হেসে চোখ নামাল, এবং ওর বুকের আঁচলটিকে আর একটু সহবত করতে চাইল।

নিতু উঠে দাঁড়াল, গায়ের বালি ঝাড়ল, বলল, 'চলুন যাই।'

আমরা অনিবিড় গাছপালা, ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থের মাটির ঘরের পাশ দিয়ে, রেললাইনের ধারে চলে এলাম। ইতিমধ্যে অন্ধকার প্রায় নেমেছে। লম্ফ হারিকেন তো জ্বলছেই, কয়েকটি দোকানে হ্যাজাকের আলোও জ্বলছে। পুরোপুরি একটি বাজার বলা যাবে না, তবে নানা দোকানপাটে, এ জায়গাটা বেশ জমজমাট। মুদীদোকান, সজ্জী আর চায়ের দোকান। মিষ্টির দোকানে লাড্ডু আর জিলিপি, নিমকি আর সিঙাড়া রয়েছে। পান-বিড়ির দোকান তো আছেই। আর জটলা আছে প্রায় সব দোকানেই। রাস্তার ধারে চটের ওপরে বিছিয়ে বসেছে তামাক-তামাকপাতাওয়ালা। কাপড়ের দোকানও আছে দুটি। একটি একটু বড়, আর একটি ছোটখাটো। বনবাসী ছাড়াও আছে নানা

রকমের লোক। থাকাই স্বাভাবিক। এখানে বনবিভাগের সামুটা রেঞ্জের একটা অফিস আছে। একটা চেক-গেট আছে, যেখান দিয়ে এসে ঢোকে নানা প্রান্তের গাড়ি, চলে যায় প্রধানত উড়িষ্যার দিকে দিকে অভ্যন্তরে। করাতকলও কয়েকটি আছে। ঠিকাদার ইজারাদার আছে অনেক। বনজ সম্পদই প্রধানত সবকিছুর মূল এখানে। বনকে ঘিরেই এখানে সব মানুষের যা কিছু লেনা-দেনা।

এমন একটি ছোটখাটো দোকানপাটওয়ালা জায়গায় দাঁড়িয়েও, বেশ বুঝতে পারি, বনের মধ্যেই কোথাও রয়েছি। হ্যাজাক হ্যারিকেন লম্ফ, কেনা-বেচা, কোনো কিছুই বনকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। নিতু জিজ্ঞেস করল, 'তিপু জিলিপি খাবি নাকি?'

'তুমি খাও।'

তিপুর ফুঁসে ওঠা জবাব। নিতুর হাসি। যারা নিতান্তই বনবাসী, তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বোধহয় সারল্যের মধ্যে একটি নিরন্তর বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা থাকে। তা না হলে, ওদের মেয়ে-পুরুষ সকলের দৃষ্টির অভিব্যক্তিটা কী। অথবা নিতান্তই অপরিচয়ের কৌতূহল, আর সেটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ ষোল-সতেরো বছরের একটি বনবাসিনী মেয়ের আঁচল ধরে টেনে দিল তিপু। বলে উঠল, 'এই বিশো, কোথায় যাচ্ছিস রে?'

বিশো নামে বনবালা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপরে তিপুর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল। তারপর আমাদের দিকে দেখল। নিতু বলল, 'বিশো যে খুব সেজেছিস? তোর বিয়ে হয়েছে নাকি?'

বিশো এবার খিলখিল করে হাসল, বলল, 'ভাগ।'

বিশোর গায়ে কোনো জামা নেই। রংটি কিন্তু নিকষ কালো বলা যাবে না। অটুটগঠন শরীরখানিকে বেড়ে দিয়ে আছে মোটা হাতে-বোনা ছোট একটি শাড়ি। এমন শাড়ি কোথায় তৈরি হয়, আমি জানি না। হাতে দুটো কাঠের বালা। মাথায় খোঁপা, কিন্তু বাংলা খোঁপা বলা যায় না, যেন চুলের গোছা শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধা। তাতে কতগুলো লাল ফুল গোঁজা। তিপু আবার ওর ফুলে হাত ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মধুফুল, না রে?'

বিশো হেসে বলল, 'হুঁ ইচা ফুল। লিবি?'

তিপু বলল, 'না, খোঁপা থেকে নেব না।'

ইচা ফুল! এমন নাম কখনো শোনা ছিল না। বিশো এবার ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইচা ফুলটা কী?'

তিপু বলল, 'ওরা ওই ফুলকে ইচা বলে।'

আর আমি বাঙাল, আমার মনে পড়ে গেল চিংড়িমাছের কথা। চিংড়িকে পূর্ববঙ্গে ইচা মাছ বলে।

এমন আর তফাৎ কী। মানুষের কাছে দুটো বস্তুই প্রায় সমান আদরণীয়। ফুল আর মৎস্য। অবিশ্যি আমার কোনো পশ্চিমবঙ্গীয় বন্ধু শুনলে বলত, 'বাঙাল কি আর গাছে ফলে।' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়েটি যে শাড়ি পরেছিল ওগুলো কিসের কাপড় ?'

তিপুই জবাব দিল, 'ওগুলোকে বলে কিচ্‌রি। ওদের তাঁতীরা নিজেরা বোনে, ওরাই শুধু পরে।'

এমন সময় মেয়েলী সরু গলায়, দুর্বোধ্য ভাষায় সমবেত গান শুনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, জনা চারেক বনবাসিনী যুবতী, হাত দিয়ে পরস্পরের কোমর জড়াজড়ি করে, গান গাইতে গাইতে চলেছে। হাসছে, গান গাইছে, আর বেশ দ্রুত গতিতে, খানিকটা তালে তালে চলেছে। কিছুটা বা হেলে দুলে, টলে টলে। কোনো দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন কি সুস্তনী বনবাসিনীর আঁচল-খসা উদাস বক্ষ নিয়েও কোনো চিন্তা নেই।

তারা চলে যাবার পরে, আমার দৃষ্টি-বিনিময় হল নিতুর সঙ্গে। তারপরে তিপু। তিপু বলল, 'সব কটা হাঁড়িয়া গিলে মরেছে।'

জিজ্ঞেস করি, 'কী করে বুঝলে ?'

'দেখলেই বুঝতে পারি, গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। সারাদিন কাজের পর, এখন নেশা করে গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে।'

তিপু সব জানে। নিতু বলল, 'এখন কোথায় ?'

জিজ্ঞেস করি, 'এখানে কোথায় যাবার আছে ?'

নিতু হাসল, বলল, 'তা বলতে গেলে, কোথাও না। রাত্রে কোথাও যাবার জায়গা নেই। যতক্ষণ কেনা-বেচা, ততক্ষণ এখানে একটু লোকজন থাকে। আর একটু বাদেই সব নিঝুম হয়ে যাবে।'

এই কথার মাঝখানেই সুরীন এসে পড়ল। তার মুখ থেকেই জানা গেল, মোহনবাবু আর গোপাল জঙ্গল থেকে ফিরে এসেছে। সোলেমান ছাগল কাটেনি। দুটো বনমোরগ পাওয়া গিয়েছে। সে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।

নিতু জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে কি এখন বাড়ি যাবেন ?'

সুরীন বলে উঠল, 'এখন বাড়ি যাবি কেন ? গোপাল সারা দিন পরে এখন চান-টান করবে। একবার বোধহয় সিংজীর বাড়িতেও যাবে। ওঁকে নিয়ে উইলাম সাহেবের বাড়ি যা না।'

নিতু বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ স্বরীনদা। তুমি না হলে এসব কারোর মাথায় আসে? তুমিও যাবে?'

স্বরীন বলল, 'না, আমাকে একবার বাড়ির দিকে যেতে হবে।'

শিবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তা হলে তুমি তিপুকে নিয়ে যাও, ওকে বাড়িতে ছেড়ে দিও।'

তিপুও সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে ঝটকা দিল। বলল, 'না, আমি এখন বাড়ি যাব না। আমিও সাহেবের বাড়ি যাব।'

শিবু এক কথাতেই চুপ। নিতু গম্ভীরভাবে বলল, 'বড় অবাধ্য হয়েছিস খুকি। তোকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

বলেই তিপুর হাতের সীমার বাইরে সরে গিয়ে, আমাকে ডাকল, 'আসুন।'

শিবু বলল, 'নিতু, তোরা যা, আমি পরে আসব।'

নিতু বলল, 'ঠিক আছে।'

রেললাইন পেরিয়ে অন্য পারে যেতেই, ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছি না। কেবল মনে হচ্ছে, আশেপাশে, কী যেন স্তূপীকৃত হয়ে আছে। মনে হয়, বড় বড় গাছের গুঁড়ি। গন্ধতেও তাই মালুম দেয়। নিতু বলল, 'একটা ভুল হয়েছে। টর্চলাইটটা নিয়ে বেরনো উচিত ছিল।'

তিপু দিল খোঁচা, 'ওসব কাজের কথা মনে থাকবে কেন? তিপুর পিছনে খুব লাগতে পারো!'

বলেই, হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন, কিছু হবে না।'

নিতু বলল, 'হ্যাঁ, তোর তো আবার অন্ধকারে চোখ জ্বলে।'

তিপু বলল, 'জ্বলেই তো। দেখ না, কী রকম নিয়ে যাচ্ছি।'

মনে মনে হাসি। ওরা দুটিতে কাছাকাছি থাকলে পরস্পরের সঙ্গে, না লেগে পারে না দেখছি। এবং কেউ-ই কম যায় না। তবে স্বীকার করতেই হবে, তিপু আমার হাত ধরে, আমার শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ধীরে ধীরে সযত্নে নিয়ে চলেছে। ও এতই অনায়াস, আমার কোনো সংকোচের অবকাশ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'নিতু, এই উইলিয়ম সাহেবটি কে? তার কাছে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

আমি নিতুকে প্রায় দেখতে না পেলেও অন্ধকারে ওর গলার স্বর শোনা

গেল, 'এই সাহেবের জীবনটা খুব অদ্ভুত। খাস বিলেতি সাহেব, এক সময়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিরাট অফিসার ছিলেন। প্রিফেক্ট না কী বলে, আমি ঠিক জানি না, উনি তাই ছিলেন। ওঁর মেমসাহেব অবিশ্যি বারোমাসই জামসেদপুরে থাকতেন, ফরেস্ট বাংলোতে কখনো থাকতেন না। তিনিও খাস মেমসাহেব। কিন্তু সাহেব যেন কেমন করে মুণ্ডা হয়ে গেল।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুণ্ডা হয়ে গেল?'

তিতু বলল, 'হ্যাঁ। অদ্ভুত সাহেব, মুণ্ডাদের সঙ্গে খুব মিশত, তাদের ভাষা শিখেছিল, তাদের সঙ্গে বসে বসে মদ খেত, নাচত, গান করত। মুণ্ডা মেয়েদের সঙ্গে প্রেমও করত। এখন তো অবিশ্যি ওর মুণ্ডা বৌ-ই আছে, তাকে নিয়েই সংসার করে।

আমি আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর মেমসাহেব?'

'মেমসাহেব কবে বিলেত চলে গেছে। শুনেছি, মেমসাহেবের সঙ্গে খুব ঝগড়াঝাঁটি হয়। মেমসাহেব নাকি গভর্নমেন্টের কাছে উইলিয়মের নামে অনেক কিছু নালিশ করে, ফলে সাহেবের চাকরি চলে যায়। সাহেব নাকি তার জন্য কিছুই বলেনি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে জরাইকেলায় একটা করাতকল নিয়ে বসেছে। প্রথম মুণ্ডা-বৌ মরে গেছে, তার কয়েকটি ছেলেমেয়ে আছে। আবার একটা বিয়ে করেছে। তবে সাহেব এখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছে।'

শুনে একটু কৌতূহল হল। খাস বিলিতি সাহেব, কিন্তু বনবাসী হয়ে গেল, মুণ্ডানী নিয়ে সংসার জীবন যাপন করছে। অবাক হবার মতো ঘটনা। তিপু বলল, 'এখনকার বৌয়ের নাম সুনি।'

তিপু সেটাও জানে। আবার বলল, 'সাহেবের থেকে অনেক ছোট।'

তিপুর এটা অভিযোগ কী না, বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'সাহেব একটা বুড়ো-বৌ খুঁজে পেল না?'

তিপু ওর বিশ্বাস মতোই বলল, 'বারে, বিয়ে করার জন্য কেউ আবার বুড়ো কনে খোঁজে নাকি?'

তাওতো বটে। কিন্তু সত্যি কি তা-ই? কালের ঘণ্টার সঙ্গে, মন বদলায় কী না, জানি না। তবে চেনা মহলের মধ্যেও তো অনেককে বুড়ি কনের পাণিপ্রার্থী হতে দেখেছি। সে কথা তিপুকে শুনিয়ে লাভ নেই। ডান দিকে একটা বাঁক নিতেই, অন্ধকারকে যেন করাত দিয়ে চিরে একটা উজ্জ্বল আলোর ঝলক দেখা গেল। তারপরেই দেখা গেল, হ্যাজাক জ্বলছে। একটা টালি-ছাওয়া বারান্দায়। সেখানে চেয়ারে একজন আসীন। দূর থেকে মনে হয় ইনিই বোধহয় সাহেব।

কাছাকাছি কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে। উঠোনে ছড়ানো বড় বড় লম্বা তক্তা। বাঁ পাশে মস্ত একটা টিনের ছাউনি, তার দেওয়াল বলে তেমন কিছু নেই। অনেক বড় উঠোন ঘিরে শালকাঠের বেড়া। বড় একটা গেট খোলাই রয়েছে। আলো বলতে হ্যাজাকটি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। এই নিরন্ধ্র অন্ধকার ঝিঁঝি-ডাকা বনের জগতে, এই আলোই সহস্র শক্তির বিজলীবাতি। আশেপাশে কয়েকটি বড় গাছ রয়েছে। উঠোনে পা দিয়েই মনে হল মাটি নেই। সবটাই তক্তা পাতা, এবং সেই তক্তার নিচে যেন কিছু রয়েছে, তক্তায় পা দিয়ে একটু যেন গদীর অনুভূতি হয়। সম্ভবত ভারি গাড়ি ঢোকবার জন্য এই ব্যবস্থা। কাঠের গুঁড়ির গন্ধ।

আমরা বারান্দার কাছাকাছি হবার আগেই, তিপু বলল, 'সাহেব বসে আছে।'

অনুমান করেছিলাম। সাহেবকে ঘিরে যারা আছে, তাদের দু'জন বনবাসী ছাড়া, একজন শার্ট-প্যান্ট পরে আছে, কালা সাহেব। সাহেব বৃদ্ধ নিঃসন্দেহে, মাথার চুল ধবধবে সাদা। ভুরুজোড়াও যেন আমার চোখে পাংশুটে লাগছে। গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখে বিস্তর ভাঁজ। গায়ে শার্ট, বুক খোলা। নিচেটা দেখতে পাচ্ছি না। কটা চক্ষু তুলে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। নিতুকে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্যা রে নিতু, ক্যায়া খবর ?'

নিতুও দেখলাম, বাজারি হিন্দীতেই জবাব দিল, 'এমনি এলাম। আপনি কি এখন কাজ কাজ করছেন ?'

সাহেবের সামনে টেবিলের ওপরে একটি খাতা খোলা রয়েছে। বললেন, 'এমন কিছু না। আয়। মেয়েটাকে যেন চিনি মনে হচ্ছে ?'

সাহেবের চোখে এখনো ছানি পড়েনি। চশমাও তার চোখে নেই। তবে তাঁর নজর যে কিছু কিঞ্চিৎ কালের দখলে গিয়েছে, তা বোঝা যায়। তিপুর দিকে তাকিয়ে তিনি, তাঁর ঘষা কাঁচের মতো ধূসর চোখের নজরকে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছিলেন।

তিপু হাসছিল, বলল, 'হাম তিপু।'

সাহেব ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'আহ্ আহ্, গাঙোলিকা বেটি ! আও আও।'

নিতু আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আর ইনি আমাদের একজন দাদা, কলকাতা থেকে এসেছেন।'

বুড়ো উইলিয়মের হাসিটি জানিয়ে দেয়, তাঁর দাঁত বাঁধানো। ডেকে বললেন, 'আও বাবু, আও, বয়ঠো।'

তারপরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, 'সু—নি।'

আমরা সিঁড়ি দিয়ে সিমেণ্ট-বাঁধানো বারান্দায় উঠলাম। অন্যান্যরাও আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। টেবিলের কাছাকাছি, আরো কয়েকটা চেয়ার ছিল। নিতু আমাকে বসতে বলল। বারান্দার লাগোয়া ঘর। সেখানে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে বলে মনে হচ্ছে। তিপু সোজা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। কাছাকাছি দেখে মনে হল, এই বনের রোদ বাতাস, সাহেবের বিলিতি রঙকে অনেকটা নিজের মতো করে মেজে-ঘষে নিয়েছে। রঙ এখন তামাটে। সাহেব তখন আবার লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হল। শুনে মনে হচ্ছে, সারা দিনের হিসাবপত্র হচ্ছে।

তিপু আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে মনে হল, ওর বয়সীই একটি মেয়ে যেন, কিংবা একটু বেশি। রঙ তার কালো, টলটলে স্বাস্থ্য, কালো মুখখানি মিষ্টি। চোখে-মুখে হাসি। কোলে তার একটি দুধে-আলতায় মেশানো মাস ছয়েকের শিশু, কালা-গোরায় এমন গলাগলি বড় একটা দেখা যায় না। তিপু বলল, 'এই হল সুনি, আর এই ওর ছেলে।'

অপূর্ব! স্বভাবতঃই সুনি শ্রমজীবিনী নয়, সেজন্য তার গায়ে একটি জামা আছে, শাড়িটিও পরিচ্ছন্ন। একটু চকচকে ঝকঝকে। চুলের বাঁধনটা ঘোড়ার ল্যাজের মতো। তার হাসি আর অভিব্যক্তিতে যেমন একটু লজ্জা আছে, তেমনি গোরা পুত্র-গর্বও আছে। তিপু ছেলেটিকে নিজের কোলে নিয়ে বলল, 'দে, তোর ছেলেটাকে দে দেখি।'

হাত বাড়িয়ে, ছেলে কোলে নিল। সুনি নাম্নী মুণ্ডানী ছেলের দিকে দেখল, তারপরে তিপুর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। তিপু বলল, 'এর মধ্যে তোর ছেলে হয়ে গেল? তুই তো আমার থেকে বেশি বড় নোস্।'

সুনি হাসল, কারণ মনে হল, ও শুধু হাসতেই জানে। হাসিটি মিষ্টিও তেমনি। তিপু যে বলেছিল, সুনি সাহেবের থেকে অনেক ছোট, তা বটে। সাহেবের নাতনী হলে হয়তো মানানসই হত। তা বললে কী হয়। বুড়ো শিবু বলে তো একটা কথা আছে, না কী? সুনির কোলজোড়া এমন গোরা ছেলেটি তো তা-ই মনে করিয়ে দেয়। তাকে দেখে তো সুখী ঘরনী বলেই মনে হচ্ছে।

সাহেবের কাছ থেকে লোকজনেরা চলে গেল। সাহেব এবার আমাদের দিকে ফিরে বসলেন। তিপুর কোলে ছেলেকে দেখে সাহেবের মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, 'কী রে মেয়েটা, আমার ছেলে কেমন দেখছিস্?'

তিপু বলল, 'খুব সুন্দর।'

সাহেব কেমো গলায় হা হা করে হাসলেন। স্থনিকে একবার দেখলেন, তারপরে একটি বিড়ি ধরালেন। এমনটিও দেখতে হল, সাহেব ফোঁকেন বিড়ি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার চলবে বাবু?'

সাবেকি সাহেবদের মতো সম্বোধন, 'বাবু'। বললাম, 'দিন।'

বিড়ি ধরালাম। সাহেব বললেন, 'তোমাকে কী দিতে পারি বাবু, একটু মদগম্ পান করবে?'

অবাক হয়ে একবার নিতুর দিকে তাকিয়ে, সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, 'সেটা কী বস্তু?'

সাহেব বললেন, 'মহুয়ার মদ। বাণ্ডামুণ্ডার আগের স্টেশন বিসরার কারখানায় ডিসটিল করা, ভালই লাগবে।'

বলে তিনি স্থনির দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বললেন। স্থনি তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে চলে গেল। একটু পরেই বেরিয়ে এল একটি বোতল, তিন চারটি কাঁচের গেলাস নিয়ে। কিন্তু আমি তখন ফাঁপরে। নিতুর দিকে ঘন ঘন নজর মেলি। ওর মুখে সেই মজা লাগা খুশির হাসি। সাহেব তখন বোতল খুলছে। ছিপির মুখে গালা লাগানো। বোতলের গায়ে একটি কাগজের লেবেলও মারা আছে। পানীয়র রঙ একেবারে সাদা না, কিন্তু সোনালীও না, তার মাঝামাঝি হালকা। নামে মদগম্ বটে। তবে ওতে যে গম্ নেই, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বিনীতভাবে বললাম, 'ওটা আমাকে আর দেবেন না, ঠিক সইবে না।'

সাহেব হেসে বললেন, 'সইবে-সইবে, এ খুব কড়া জিনিস না। তোমাদের হুইস্কি রাম-এর থেকে নরম। জল মেশাবার দরকার হয় না।'

বলে সাহেব দেখি পর পর গেলাসে খানিকটা করে ঢালছেন। প্রথমে তিপুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পান করবি?'

তিপু জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ওম্, না না।'

বলতে গিয়ে ওর নাক কুঁচকে গেল। সাহেব স্থনির দিকে একটি গেলাস বাড়িয়ে দিলেন। স্থনি গেলাসটি নিয়ে তিপুর দিকে ফিরে, হিন্দিতেই বলল, 'একটু পিয়ে দেখ না।'

তিপু বলল, 'তুই খা।'

স্থনি বলল, 'আমি তো রোজ খাই।'

সাহেব তখন আমার দিকে একটি গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নাও বাবু। নিতু পান করবি নাকি?'

নিতু বলল, 'দাদা মারবে।'

সাহেব বাঁধানো দাঁতে হাসলেন, 'হ্যাঁ, গোপালটা তো আবার একদম সাধু, বিড়িও টানে না। আচ্ছা বাবু, চালাও। সারাদিন কাজের পরে, এ ছাড়া আর কী আমাদের আছে।'

বলে তিনি গেলাস তুললেন, নামিয়ে ঠোঁট স্পর্শ করলেন। আমি আর একবার নিরুপায় চোখে নিতুর দিকে দেখলাম। ওর মুখে সেই হাসি। সুনিও ওদিকে গেলাসে চুমুক দিয়েছে। তিপু হঠাৎ আমাকে বলে উঠল, 'একটু চেখেই দেখুন না। খারাপ লাগলে খাবেন না।'

তিপুও উৎসাহ দেয়। মুখের কাছে গেলাস তুলে, গন্ধটা মোটেই মহুয়ার মতো মিষ্টি মনে হল না। মুখে ছোঁয়াবার পরে, জিভ থেকে ভিতর পর্যন্ত, গলা দিয়ে যেন জ্বলন্ত কিছু নেমে গেল। মুখ ভরে গেল লালায়। বারে বারে ঢোঁক গিলছি দেখে সাহেব বললেন, 'প্রথমটা একটু ওরকম লাগবে। দু-চার চুমুকের পরে আর তা হবে না।'

রক্ষা করুন হে বুড়াশিব উইলিয়ম, আপনার মতো আমার এত ধক নেই। অবশিষ্টটুকু শেষ করতে পারলে ভাগ্য মানব। পরে দ্রব্যগুণের ক্রিয়া কি হবে কে জানে।

সাহেব আমাকে কলকাতার হালচালের কথা একটু জিজ্ঞেস করলেন। এক সময়ে নিজে প্রায়ই কলকাতা যেতেন, সে কথা বললেন। তারপর কথায় কথায় জানা গেল, ডিজেল চালিত এই করাতকলের মেশিন উনি ভাড়া নিয়েছেন একটা কোম্পানী থেকে। মেসিন কেনবার মতো পয়সা তাঁর নেই। কোম্পানীর ভাড়া মিটিয়ে কোনোরকমে চলে যায়। স্বভাবতঃই তাঁর অতীত জীবন বিষয়ে, আমার অনেক কৌতূহল থাকলেও, কিছুটা সঙ্কোচ ও ভদ্রতাবশত জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। কিন্তু তাঁর কথা থেকে এইটুকু বুঝতে পারলাম, তাঁর অর্থ বিত্ত বলতে কিছুই নেই, এই টালির বাড়ি আর জমিটুকু ছাড়া। মেশিন কোম্পানীকে যখন তাদের ভাড়া ঠিক মতো দিতে পারবেন না, তারা মেশিন তুলে নিয়ে যাবে। তখন—সাহেবের নিজের ভাষায়, 'আই উইল বী এ গোল্ড ডিগার অন দ্য কোয়েল ব্যাংক।'

তখন তিনি কোয়েলের চরে সোনাখাঁচা হয়ে যাবেন। শুনে যেন, এই নতুন দেখা, খাস বিলেতি সাহেবটির জন্য আমার মন টনটনিয়ে উঠল। ইতিমধ্যে কথায় কথায়, কয়েক পাত্র মদগম্ তিনি পান করেছেন। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, তাঁর বালিকা-গৃহিণী, সুনি উইলিয়ম। এক সময়ে, তিনি শিশুটিকে নিজের

কোলে নিলেন। শিশুটি তাঁর বৃদ্ধ মুখের ওপর, ছোট নরম থাবা দিয়ে মারছে। তিনি হাসছেন, আর মুণ্ডা ভাষায়, আদর করে কী যেন বলছেন। স্থনিকে দেখলাম, সে তখন সাহেবের চেয়ারের পাশে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ছেলের মুখের দিকে দেখছে। মদ্গমের রসে চকচকে চোখে-মুখে তার প্রেম আর স্নেহের হাসি সৃষ্টি করেছে অনির্বচনীয়তা। সংসারের এমন দুর্লভ দৃশ্যের সামনে বসে, সব ভুলে গেলাম। মনে হল, বনে এসেছি, বন তার যা দেবার, যেন এই মুহূর্তেই সব উজাড় করে ঢেলে দিল।

সহসাই আমার পিঠের কাছে স্পর্শে, পিছন ফিরে দেখলাম, তিপু। তিপু ঘাড় নেড়ে, ওঠবার ইশারা করল। নিতুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তারও সেই ইচ্ছা। আর উইলিয়ম দম্পতি, নিজেদের নিয়ে এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছে যে, এখানে অভ্যাগতদের ভুলে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যদিও আমরা অভ্যাগত না, নিতান্তই অনাহূত। আমরা উঠে যখন বিদায় চাইলাম সাহেব অনায়াসে বললেন, 'আচ্ছা বাবু, ইচ্ছা হলে আবার এস। তোমাকে আমি মদ্গম্ পান করাব।'

যদিও তাঁর দেওয়া সবটা আমি শেষ করতে পারিনি। বিদায় নেবার সময়, স্থনি তিপুর পিঠে আলতো করে একটা ঘুষি মারল। তিপুও ছাড়ল না, পিঠে মেরে বল, 'মাতাল।'

অন্ধকারে বেরিয়ে এলে, তিপু নিজের থেকেই আমার একটি হাত ধরল। বনের স্তব্ধতায় কেবল ঝিঁঝির ডাক। কিন্তু আমরা কেউ-ই কোনো কথা বলতে পারছি না কেন। নিতু আর তিপুর মতো ছেলে মেয়ে আমার সঙ্গে। ওরা তো চুপ করে থাকতে শেখেনি। তবু ওদের মুখেও কথা নেই। বোঝা গেল, যা স্পর্শ করে, তা সবাইকেই করে। মন এবং প্রাণের কোনো বয়স নেই।

আমরা যখন স্টেশনের কাছে এলাম, গায়ে এসে পড়ল টর্চের আলো। ইতিমধ্যে ওপারের দোকানপাট কিছু কিছু যেন বন্ধ হয়েছে। আলো কম দেখা যাচ্ছে। গলা শোনা গেল, 'আমি আবার এখন যাচ্ছিলাম সাহেবের বাড়ি। শিবুর মুখে শুনলাম, তোরা সেখানে গেছিস?'

অনেকদিন পরে হলেও, মনে হল, গোপালের গলা। মনে হওয়াটা ভুল না। টর্চের আলো ফেলে, সে আমাদের সামনে এসে পড়ল। টর্চের আলোর

বলয়ে যেটুকু দেখতে পেলাম, গোপালের সব সময়ের স্বভাবগম্ভীর মুখে যেন একটু হাসি। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

বললাম, 'কিছুমাত্র না। বেশ কাটছে।'

গোপাল বলল, 'মোহনবাবু বলে, এখানকার এক ইজারাদার ভদ্রলোক, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য, সিংজীর বাড়িতে বসে আছেন। সিংজীও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

তিপু তখনো আমার হাত ছাড়েনি। বলল, 'যান এবার আপনি বড়দের দলে চলে যান।'

গোপালকে ঠিক গম্ভীর বলা যায় না, যেন সর্বদাই চিন্তিত ও বিরক্ত। তিপুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোথায় টো টো করে ঘুরছিস?'

তিপু বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

গোপাল বলল, 'যা নিতু, তিপুকে পৌঁছে দিয়ে তুই বাড়ি চলে যা।'

নিতু বলল, 'তা ছাড়া আর উপায় কী।'

গোপাল আমাকে ডাকল, 'আসুন। তোরাও আমার সঙ্গে সিংজীর বাড়ি অবধি আয়, তারপরে টর্চলাইটটা নিয়ে যা। আমি মোহনবাবুর সঙ্গে ফিরব।'

তিপু আমার হাত ছাড়ল না। রেললাইন পেরিয়ে, সিংজীর পাকা মোকামের গেটের কাছে এসে হাত ছাড়ল। বলল, 'কাল সকালে আপনাকে গিয়ে আমি নিয়ে আসব।'

নিতু ধমকের সুরে বলল, 'হয়েছে, এখন আসুন।'

তিপু ওকে জিভ ভেংচে দিয়ে, আমার দিকে চেয়ে হাসল। ওরা টর্চলাইট নিয়ে চলে গেল। আমি গোপালের সঙ্গে সিংজীর বাড়িতে ঢুকলাম। বারান্দা দিয়ে যে ঘরে উপস্থিত হলাম, সেটা বোধহয় বৈঠকখানা। দেখলাম, নিচু বড় চৌকিতে ফরাস পাতা। সাদা চাদরের ওপর, ছোট তাকিয়া। ঘরে হ্যাজাক জ্বলছে। একজন আধশোয়া অবস্থায়, গড়গড়া টানছেন। তাঁকে দেখলেই কেন যেন অবাঙালী বলে মনে হয়। মাথায় কাঁচাপাকা ছোট ছোট চুল। ধূসর গোঁফজোড়াটি বেশ বড় আর খাড়া। তামাটে শক্ত মুখ, মোটা নাক, ছোট ছোট চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

তাঁর মুখোমুখি বসে আছেন এক ভদ্রলোক, বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, পাট করে চুল আঁচড়ানো মানুষটির ফরসা মুখে অমায়িক হাসি। গোপালের সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই, দু'জনে ফিরে তাকালেন। গোপাল

পরিচয় করিয়ে দিল। সিংজী তাঁর গড়গড়ার নল রেখে, বাংলাতেই বললেন, 'আসুন, আসুন, গোপালের কাছে আপনার কথা শুনছিলাম। বসুন।'

আর একজন মোহনবাবু। তিনি ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, 'আসুন, উঠে এসে বসুন।'

আপ্যায়ন খারাপ না। সিংজীকে বড় বেশি ভার ভারিক্কি লাগছে। মানুষ হিসাবেও যেন কোথায় একটা দূরত্ব বোধ করছি, যেটা মোহনবাবুকে মনেই হচ্ছে না। উঠে বসলাম। সিংজী নিজে একটি তাকিয়া আমার দিকে ঠেলে বললেন, 'আপনার গড়গড়া চলবে? আলাদা নল আছে।'

আমি হাতজোড় করে বললাম, 'আজ্ঞে না, ওটা চলে না।'

সিংজী বললেন, 'আপনারা শহরের লোক, সিগারেট খান। তবে পথে চলতে, আমি বিড়ি খাই।'

বলেই হাঁক দিয়ে ডাকলেন, 'বেচন এ বেচন।'

গোপালও ইতিমধ্যে বসেছিল। ভিতর দিকে যাবার দরজা দিয়ে, একটি নিরীহ মাঝবয়সী লোক এল। সিংজী বললেন, 'কা হো, দেখতেঁ হায় মেহমান আয়া। বোতল গেলাস উলাস পানী উনি লে আও।'

লোকটি 'জী' বলে তখুনি বেরিয়ে গেল। গোপাল দেখলাম অন্য দিকে তাকিয়ে, যেন খানিকটা উদ্বিগ্নভাবে, চোখ পিটপিট করছে। মোহনবাবুর মুখে মোহন হাসিটি লেগে আছে, একটু যেন সলজ্জ। বোঝা গেল, সিংজীর সামনে সকলেই একটু, অমায়িক কৃতজ্ঞ চুপচাপ। সিংজীর আচরণও বেশ রাজকীয়। বললেন, 'জঙ্গলের কোথায় কোথায় যাবেন বলুন।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার তো কিছুই জানা নেই।'

মোহনবাবু বললেন, 'আমি একটা মোটামুটি ছকে রেখেছি।'

সিংজী বললেন, 'তোমার ছকটা বাতাও শুনি।'

মোহনবাবু বললেন, 'রিমিডি পারোডি মাকরাণ্ডা ডোমলাই দিয়ে—'

সিংজী হাতের নল ফেলে দিয়ে, বলে উঠলেন, 'আরে ছোড় মোহনবাবু, ওসব তো জঙ্গলে ঢোকবার রাস্তা। তুমি একটা আস্তানা কোথাও করেছ? তোমার কাজ এখন কোথায় হচ্ছে?'

মোহনবাবু বললেন, 'থলকোবাদ ব্লকে পরশু থেকে কাজ শুরু হবে। সেখানে ঘর বানাতে বলেছি।'

'বহোত আচ্ছা, ওখান থেকে তিরিলপোষ্টা ঘুরিয়ে আনা যাবে। গুয়া রেঞ্জের ঘাটকুড়ি, করমপদা, কদলীবাদ আমার হাতে ছেড়ে দাও। ছোট নাগরায়

একবার নিয়ে যেতে হবে। লাটুয়া, আম্বিয়া; লেদা নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। গুয়া রেঞ্জে আমার কাজ চলছে। ছোট নাগরাতে ওখানেই ওঁকে এখন নিয়ে যাব। সেখানে আমি বাবুজীর থাকবার ব্যবস্থা করব। রাত্রে ওখানে থাকাই ভাল, ভয়ের কিছু নেই। রেঞ্জারকে বলে, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের একটা কোনো মাটির ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করব। সেখান থেকে, তোমার কাছে থলকোবাদ যাবে, কী বল ?'

মোহনবাবু বললেন, 'সে তো ভালোই হয়।'

সিংজী গোপালের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী গোপাল তোমার কি ইচ্ছা ? তোমার দাদার দোস্ত আছেন।'

গোপাল বললে, 'আপনি যা ব্যবস্থা করবেন, তা-ই হবে। দাদার কোনো অসুবিধা না হলেই হল।'

সিংজী বললেন, 'কোনো অসুবিধা হবে না। আমার দুটো লরি কাজ করছে। তোমার একটা মোহনবাবুর কাজ করছে। রেঞ্জার সাহেব না হয়, ডি. এফ. ও-র সঙ্গে, জীপে কখনো কখনো বাবুজীকে ভিড়িয়ে দেব।'

মোহনবাবু বললেন, 'সে তো খুব ভাল হয়।'

সিংজী বললেন, 'আর খাওয়া ? আমার কাছে সব ব্যবস্থা আছে। তোমার কাছেও থাকবে। ব্যস্‌, মিটে গেল।'

এবার আমি একটু বলবার সুযোগ পেলাম। বললাম, 'খুব বেশি জায়গায় ছুটোছুটি করার দরকার কী। বনের ভিতরে কোথাও কয়েকদিন কাটিয়ে এলেই হল।'

সিংজী বললেন, 'সেই কথাই হচ্ছে। কিন্তু এক জায়গায় থাকলে তো হবে না। জঙ্গলেরও তো অনেক রকমারি আছে। যতটা হয় দেখে নেবেন। দেখতে হবে, বিপদ-আপদ কিছু না ঘটে। বাঘের ভয় নেই, হাতির উৎপাত কোথাও কোথাও আছে। সে সব জায়গায় না গেলেই হবে। তা হলে পরশু সবেরে আমরা বেরিয়ে পড়ছি।'

মোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ।'

'বহোত আচ্ছা। আর গোপাল তুমি ? তুমি তো যাবে না ?'

'না। আমার আর জঙ্গলে যাবার কী দরকার। আমি এখানকার কাজকর্ম দেখব।'

সিংজী গড়গড়ার নলে টান দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার মতো ছোকরার আর আমাদের সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। কী বল মোহনবাবু ?'

মোহনবাবু হাসলেন। গোপালও হাসবার চেষ্টা করল। সেটা হাসি কী না, আমি বুঝলাম না। ইতিমধ্যে, বেচন নামক লোকটি একটি বড় পিতলের রেকাবিতে বোতল গেলাস আর জলের জাগ এনে, সিংজীর সামনে বসিয়ে দিল। দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। এই বনের রাজত্বে দেখছি, একেবারে স্কটল্যাণ্ডের খাঁটি পানীয়র বোতল। শহরে পানরসিকরা দেখলে নিশ্চয় খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সিংজীর ব্যাপার দেখছি, সত্যি রাজকীয়। উইলিয়মের মদ্যমের বোতলটির কথা আমার মনে পড়ে গেল। সিংজী বললেন, 'সেদিন রাউরকেলা গেছলাম। সেখান থেকে দু-বোতল পেয়ে গেলাম। এক সাহেব ক্লাব থেকে বন্দোবস্ত করে দিল। নাও মোহনবাবু, বোতলের মুখটা তুমিই খোল।'

মোহনবাবু অতি সলজ্জ হেসে বোতলটি তুলে নিলেন। আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'দাদার জন্য আজ আমাদের ভাগ্যও খুলে গেল।'

ভাবছিলাম, বনের ইজারাদার সিংজীর সঙ্গে, রাউরকেলার সাহেব আর ক্লাবের কী সম্পর্ক? তবে সব কথার জবাব কখনো পাওয়া যায় না। সিংজীর অন্তঃস্রোতের গতি যে কত দিকে, তা আমার জানা সম্ভব না। কিন্তু তিনটি দেখে একটু অস্বস্তি লাগছে। এর আগেই কিঞ্চিৎ মদ্যমের স্বাদ নিতে হয়েছে। এখন আবার এই বিলাতি পানীয়! নিঃসন্দেহে গোপাল পানরসিক না, কেন না, বোতলের দিকে সে চেয়ে আছে, যেন কোনো রক্তাক্ত আহত প্রাণীকে দেখছে। একটা ভয়, একটা আতঙ্ক এবং উদ্বেগ। মোহনবাবুর তিনটি গেলাসে পানীয় ঢাললেন, জল মেশালেন। সিংজী নিজের হাতে আমার দিকে একটি গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আসুন।'

আমি সংকোচে হাসলাম, কিছু বলতে গেলাম, সিংজী তার আগেই বলে উঠলেন, 'আরে ভাই, কম্ সে কম আমার ইজ্জতটা তো রাখুন, গেলাসটা নিন।'

এর পরে আর না নিয়ে উপায় থাকে না। বললাম, 'আমাকে না দিলেই পারতেন।'

সিংজী বললেন, 'ওটুকুতে কিছু হবে না, রাত্রে ভাল ঘুম হবে। নাও মোহনবাবু। জয় গুরু, জয় বনমাতা, জয় আন্দ্রি বোঙা।'

বলে গেলাসে চুমুক দিলেন। মোহনবাবুও চুমুক দিতে দিতে, সিংজীর মতোই উচ্চারণ করলেন। গোপালের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল। অগত্যা, আমারো, 'জয় বনমাতা।'...

তারপরের কথাবার্তা সিংজী আর মোহনবাবুতেই বেশির ভাগ। কথায় কথায় বোঝা গেল, মোহনবাবুর স্ত্রী এখানেই আছেন, এবং তিনি মদ্যপানের

প্রতি বিরূপ। যদিও মোহনবাবু তা মানেন না। সলজ্জ হাসি থেকে মোহনবাবু ক্রমে বেশ উচ্চস্বরে বাজতে লাগলেন। সিংজী ক্রমেই গম্ভীর হতে লাগলেন, পানের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। এক সময়ে গোঙানো স্বরে বললেন, 'সীমা বলছিল, কয়েকদিন থলকোবাদের বাংলোয় এসে থাকবে। সেই জার্মান সাহেবের সঙ্গে।'

বলে একটু যেন হাসবার চেষ্টা করলেন। তারপরে পাত্র শূন্য করে তাকিয়ায় এলিয়ে পড়তে পড়তে বললেন, 'ছেলেটা বোধহয় বাঁচবে না। টাটার ডাক্তার সেইরকমই বলছে।'

বলতে বলতে তিনি তাকিয়ায় মাথা পেতে দিলেন। আমি গোপালের দিকে তাকাতে, ও বলল, 'মোহনবাবু, এবার চলুন, সিংজী ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

মোহনবাবুও তাঁর পাত্র শূন্য করে বললেন, 'হ্যাঁ, চলুন।'

বেচন এসে দাঁড়াল। আমরা তিনজনেই বেরিয়ে এলাম। মোহনবাবুর হাতে টর্চ। তিনি বেশ শক্তই আছেন, একটুও টলছেন না। বাইরে কোথাও একটি আলো নেই। স্টেশনেও না। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। একেই বোধহয় বন্য নিঝুমতা বলে।

মোহনবাবু আমার নাম ধরে ডেকে বললেন, 'সীমা কে জানেন তো?'

বললাম, 'না তো।'

'সীমা হল, ওড়িয়া-বাঙালী মিকস্‌ড একটি মেয়ে। ভাল নাচ-গান জানে। সিংজী ওকে কটক থেকে এনে, রাউরকেলায় রেখেছিলেন। প্রেমিকাই বলুন, আর কংকোবাইন বলুন, যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু রাউরকেলায় আসার পরে, মেয়েটিকে ভাল লেগে গেল এক জার্মান সাহেবের। সিংজীর আবার স্টীলের ব্যবসাও আছে তো। সীমা এখন সেই সাহেবের কেয়ারেই আছে। সিংজী ছিনিয়ে নিতেও পারেন না, মেয়েটাকে ভুলতেও পারেন না।'...

মোহনবাবুর একটানা কথা শুনলেই বোঝা যায়, বিলাতি পানীয়র নেশা তাঁকেও টেনে নিয়ে গিয়েছে, সীমা-সিংজীর বিচ্ছেদের নাটকে। একটু থেমে চলতে চলতে আবার নিজেই বললেন, 'পাবার জন্য মানুষ সবকিছু হারাতে চায় না। কিন্তু জগৎটা বিলকুল গিভ অ্যাণ্ড টেকে চলছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সিংজী কার ছেলের কথা বলছিলেন?'

'ওঁর ছেলের কথা। ছেলেটা পোলিওতে ভুগছে, একমাত্র ছেলে। ফ্যামিলির সবাই এখন টাটায় আছে।'

গাঙ্গুলিমশাইয়ের বিকালের কথা আমার মনে পড়ে গেল। গোপালদের বাড়ির কাছে এসে, মোহনবাবু টর্চ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের পথ দেখালেন। উনি আরো এগিয়ে যাবেন। গোপাল বলল, 'আপনি চলে যান, আমরা যেতে পারব।'

তবু মোহনবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন, বললেন, 'ঠিক আছে, যান, আমি যাচ্ছি।'

টর্চের আলোয়, ভিতরের চাষ জমিটুকু পার হতে হতেই, মোহনবাবুর টর্চের আলো সরে গেল। অন্যদিক থেকে জেমা হ্যারিকেন হাতে এগিয়ে এল। সেই আলোয় অস্পষ্টভাবে ওর মুখ দেখতে পেলাম। না, ওর চোখে ঘুম জড়ানো নেই। এতক্ষণ এই ঝিঁঝি-ডাকা নিঝুম বাড়িতে ও কী করছিল? রান্নার পাট নিশ্চয়ই অনেক আগেই মিটে গিয়েছে। সুরীন একবার বিকেলে এসেছিল। আবার একবার নিশ্চয় বনমোরগ দিতে এসেছিল।

ওরাওঁ মেয়ে জেমা, বিপত্নীক বাঙালী মোকানিক সুরীন, কী কথা বলে?

গোপাল কোনো কথা না বলে, হাত থেকে হ্যারিকেনটা নিল। বলল, 'তুই খাবারটা বেড়ে ক্যাল, আমরা আসছি। নিতু খেয়েছে?'

জেমা বলল, 'খেয়ে শুয়ে পড়েছে।'

গোপাল আমাকে ডাকল, 'আসুন, জামাকাপড় ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নেওয়া যাক।'

গোপালের পিছনে পিছনে গেলাম। দেখলাম নিতু ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের ঘরে গিয়ে গোপাল একটা কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনের শিষ উস্কে দিল। দিয়ে চলে গেল। জামাকাপড় বদলে, হাতে-মুখে জল দিয়ে রান্নাঘরে খেতে গেলাম। সেখানে লম্ফ জ্বলছিল। জেমা গরম ধূমায়িত ভাত আর বনমোরগের মাংসের বাটি পরিবেশন করল।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, 'খাস্‌নি তো?'

জেমা বলল, 'খাব।'

খেতে খেতে গোপালের সঙ্গে সামান্য দু-চার কথা হল। কলকাতার কথা না। একানকার মন্দা ব্যবসা, দলাদলি, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি বিষয়ে, যে-বিষ ভারতের সর্বত্র বিষধরেরা ছড়িয়ে রেখেছে। তারই মধ্যে সিংজীর কথা উঠল। গোপাল চুপ করে গেল। পাশাপাশি ঘরে শুতে যাবার আগে গোপাল বলল, 'আমার বাবা এক সময়ে এখানকার বনের নাম-করা ইজারাদার ছিলেন। এখন আর কিছুই নেই।'

ওর ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। স্বল্পবাক গোপাল হঠাৎ কাথাটা বলল

কেন? সিংজীর কথা মনে করে? গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল আবার।

রাত পোহাতে পরের দিন বনের গভীরে যাবার আয়োজনটাই বড়। অবিশ্যি আমার তেমন কিছু করার ছিল না। কিন্তু মোহনবাবু এসে নিতুকে ডেকে নিয়ে গেলেন। প্রায় দু-সপ্তাহের জন্য যাত্রা। চাল আটা ডাল তেল মসলা নুন, যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। নিজেদের কার্যোপলক্ষেই যাত্রা। তার মধ্যে আমি একজন বাড়তি লোক, বনদর্শনে এসেছি। একবার নাকি বনের গভীরে ঢুকে গেলে, তথাকথিত সভ্যজগতের আর কোনো চিহ্ন নেই। অবিশ্যি সঙ্গে গাড়ি থাকলে সবই করা যায়। কিন্তু তাতেও পঁচিশ-তিরিশ মাইল বন পেরোতে হবে। কেবল তো বন না। হাজার দু-হাজার ফুট ওঠো, আবার নামো। রাস্তাও শহরের মতো মসৃণ না। অতএব যতটা সম্ভব তৈরি হয়ে যাওয়াই ভাল। সিংজী মহাশয়ের কথা আলাদা। ওঁর বিস্তর লোক, বিরাট ব্যাপার। তিনি শয্যায় শুয়ে থাকলেও কাজ হবে ঠিক। মোহনবাবুর তা না। তাই সকাল থেকেই সবাই বাইরে বাইরে ব্যস্ত।

আমিও গোটা দিনটি বসে রইলাম না। জেমার হাতে সকালবেলার জলখাবার শেষ না হতেই, তিপু এসে উপস্থিত। ওর তো সকলের সঙ্গে সমান ভাব। জেমার সঙ্গেও তাই। দু'জনের মধ্যে খুব খানিকক্ষণ কথা হল। সবাই জরাইকেলা আর টাটার কথা, নিজেদের জানাশোনা মানুষদের কথা। তিপু আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে জেমা হঠাৎ চোখে ঝিলিক হেনে বলল, 'তিপু ক'মাসে যেন অনেক বড় হয়ে গেছিস।'

তিপুর জবাব, 'শহরে থাকলে বোধহয় তাই হয়।'

যাবার আগে তিপু জানাতে ভুলল না, আজ দুপুরে আমার আহার ওদের গৃহে।

তারপরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, তিপু আগে আমাকে নিয়ে গেল সাম্‌টা নালার ধারে। বনের গভীর ছায়ায় মাঝে মাঝে শীত শীত করছিল। রোদ নরম আর মিষ্টি। তিপু আমাকে অনেক গাছ চিনিয়ে দিল। সাম্‌টা নালার ধারে গিয়ে আমার মনে হল, বন্যপশুদের জলপানের জায়গা। কল্‌কল্‌ বয়ে চলা নালা, এক এক জায়গায় কাঁচের মতো স্থির। তিপু জানাল, স্থির মানেই, জল সেখানে গহীন। মিথ্যা বলব না, আমার যেন এক এক সময় গা ছম্‌ছমিয়ে

উঠছিল। অথচ তিপুর মোটে ভয় নেই, যে তিপু গতকাল বিকালে সমাধি-স্থানের পাথর দেখে শিউরে উঠছিল। তিপুর মুখেই জানা গেল, চার-পাঁচ বছর আগে, সাম্‌টা নালার জলে একটি মেয়ে চান করতে এসেছিল। তাকে অজগরে গিলে খেয়ে ফেলেছিল। এবার আমি তিপুর ডানাটা আঁকড়ে ধরব কী না বুঝতে পারছি না।

তিপু আমাকে ফুল চেনাল, তারপরে একটা গাছের কাছে আমি থমকে দাঁড়ালাম। থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটে আছে। গন্ধটা অনেকটা কামিনী ফুলের মতো। কিন্তু তা কামিনী না। তিপু বলল, 'এখন তো গন্ধ মরে গেছে। গন্ধ ছড়ায় রাত্রে। এর নাম রাজারানী ফুল।'

'তাই নাকি! এরকম নাম তো কখনো শুনিনি।'

'তা জানি না। এখানকার লোকেরা বলে, আমরা বলি। মেয়েরা এ ফুল মাথায় পরে।'

কথাটা শোনার পরে, তিপুর বাসি খোঁপাটার দিকে আমার চোখ পড়ল। গতকাল সন্ধ্যের সেই লাল মধুফুল খোঁপায় গোঁজা বনবালার কথাও মনে পড়ে গেল, যার ফুল তিপু ছুঁয়েছিল। আমি কয়েক গুচ্ছ রাজারানী ছিঁড়ে নিয়ে বললাম, 'এসো, তোমার খোঁপায় পরিয়ে দিই।'

তিপুর মুখে লাল ছটা লেগে গেল। আমার গায়ের কাছে এসে পিছন ফিরে ঘাড়টা একটু নিচু করে দাঁড়াল। আমি ফুল গুঁজে দিলাম ওর খোঁপায়। সেই মুহূর্তেই হাসির নিক্কণে, ফিরে তাকিয়ে দেখলাম কয়েকটি বনবালা, একটু দূরে গাছতলা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে, আর হাসছে। মাথায় ওদের আমার অজানা এক ধরনের ঘাসের বোঝা।

তিপু আমার দিকে ফিরে তাকাল। এখনো লাজে লাজানো ছটা ওর মুখে। হঠাৎ শুনি বনমালা কয়টি সরু গলায় সমবেতভাবে গান গাইতে শুরু করেছে। যে গানের ভাষা আমি কিছুই বুঝি না। তিপু হঠাৎ নিচু হয়ে, একটা পাথর তুলে নিয়ে মেয়ে ক'টির দিকে তেড়ে গেল। ওরা হাসতে হাসতে দৌড়ে পালাল। জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী?'

ও ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'দেখুন না, যা তা বলছে।'

'কী বলছে?'

'সে কথা আমি বলতে পারব না।'

বলার দরকার আছে কি? ভাষা বুঝি না ঠিকই। ওদের গান হাসি, খোঁপায় ফুল গোঁজা, কিশোরী তিপুর কোপ, এ সবই তো, অধরা থেকে ধরার

মধ্যেই আছে। কিন্তু আমি তো আমি-ই। আমার মন খুশিতে টলটলানো। এই বনের সংসারে, আমি এক নবজাতক। তিপু আমার ধাত্রী। আমি তো জানি, ওর চোখে-মুখে এই যে লজ্জার ছটা, সেটা প্রকৃতির আপন ধর্মে রঙ ফেরানো। ওর হৃদয়ের অকলুষ স্পর্শ আমাকে সতেজ করেছে। বললাম, 'ওরা বলুক ওদের যা খুশি।'

তিপু সে কথা বোধহয় আমার থেকে বেশি বোঝে। ও আমার হাত ধরে এক জায়গায় সাম্‌টা নালা পার হল। জলের নিচে পিছল পাথর, সাবধানে পার হতে হল। তারপরে বনের ভিতর কোথা দিয়ে, তিপু আমাকে নিয়ে চলে এল একেবারে কোয়েলের ধারে। কোয়েলের ওদিকটায় একটু ভিড়। অনেকে চান করছে। মেয়েরাই বেশি। কেউ কেউ একটু গভীর জলে, বাংলাদেশের আঁটান জালের মতো জাল দিয়ে মাছ ধরছে। নদীর ওপারেই একটা গ্রাম। গায়ে গায়ে কতকগুলো মাটির ঘর।

তিপু বলল, 'চান করবেন তো?'

বললাম, 'চানের সরঞ্জাম কিছু যে নিয়ে আসিনি।'

'সরঞ্জাম আবার কী। আপনার চান করার জন্য আমি একটা কাপড় নিয়ে আসছি বাড়ি থেকে। আপনি এখানেই থাকুন, কেমন?'

'বেশ।'

তিপু তৎক্ষণাৎ ছুটল চরের ওপর দিয়ে। ভয় লাগে, পায়ে শাড়ি জড়িয়ে না হুমড়ি খেয়ে পড়ে। স্নান আর মাছ ধরা দেখতে দেখতে, এক ধারের নিরিবিলিতে দেখলাম, এক সোনাখাঁচা সোনা খোঁচাচ্ছে। তারপরে এক সময় তিপু এসে পড়ল কাপড়-গামছা নিয়ে। প্রায় একটা বোঝা। ওর নিজের শাড়ি-জামাও ছিল। জলে নামার পরে প্রথমটা বরফগলা জলের মতো ঠাণ্ডা মনে হল। তারপরে সমস্ত শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। কোয়েলের স্রোতের উজানে তিপুর সঙ্গে চলে গেলাম জলের বুকে পাথরের গায়ে। কখন এক সময়ে, কিছু বনবাসিনী জলে গা ভিজিয়ে চলে এল আমাদের কাছে। তিপুর সঙ্গে তারা অনেক কথা বলল, আর বারে বারে আমার দিকে চেয়ে দেখল। বোধহয় পরিচয় নেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ উদয় হল নিতু আর শিবুর। ঝাঁপাই জোড়া, জল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা কাকে বলে তখন বোঝা গেল।

কোকিলের মতো চোখ লাল করে যখন তিপুদের বাড়ি এলাম, গাঙ্গুলি-মশাই তখন গায়ে তৈলমর্দন করছেন। তিপু ছুটল রান্নাঘরে। ওর দেখা পাওয়া গেল একেবারে খাবার সময়। সবাইকে পরিবেশন করল ও নিজে।

কোয়েলের ছোট মাছের ঝালটা ওর নিজের হাতের রান্না। চান করে আসার পরে ওটা ছিল ওর সব থেকে বড় কাজ। বিদায় সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে। তিপু বলল, 'কাল বনে যাচ্ছেন। আমরা কিন্তু পথ চেয়ে বসে থাকব। ফেরবার সময় জরাইকেলা হয়ে যাবেন।'

তিপু সেই রাজারানী ফুল রেখে দিয়েছিল। বিকেলে চুল বেঁধে আবার পরেছিল। জরাইকেলা দিয়ে ফিরব কী না জানি না। তবু বলেছিলাম, 'দেখা হবে।'

তিপুর চোখে খুশি, তথাপি সংশয়। আর কী ছিল, জানি না।

যাত্রা লরিতে। সকালবেলাই। মোহনবাবু আমাকে বললেন, চালকের পাশে বসতে। মন মানল না। বললাম, 'মালপত্র তো নেই, পিছনে বসি। সব দেখতে পাব।'

তখন মোহনবাবুও আমার সঙ্গী হলেন। আমাদের আর এক সঙ্গী সুরীন। সে গিয়ে ভিতরে, চালকের পাশে বসল। নিতুর যাবার ইচ্ছা ছিল। গোপালের অনুমতি মিলল না। কাজ আছে। গোপাল বলল, দু-একদিন অন্তর অন্তর গাড়ি আসবে। দরকার হলে আমি যাব।'

মোহনবাবুর সঙ্গে ওর ইজারার কিছু অংশ আছে। সাম্‌টা নাকা অর্থাৎ চেক-গেটে কয়েক মিনিট দাঁড়াতে হল। কাজকর্ম সব আইনমাফিক। যেমন ইচ্ছা বনে ঢোকা যায় না। একলা তো আমাদের লরি না। পর পর লাইন দিয়ে আরো কয়েকটি দাঁড়িয়ে আছে। আরপর যখন ছাড়া পেল, গর্জন তুলে ছুটল সব। মাইল দুয়েকের মধ্যে, ঘন বসতি চোখে পড়ে। বনও তেমন নিবিড় না।

তারপরে এক সময়ে, যেন আহত পশুর আর্তনাদের শব্দ তুলে, লরি উঠতে আরম্ভ করে পাহাড়ের ওপরে। গতি হয়ে পড়ে শ্লথ। পথ বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার। বন ক্রমে নিবিড়তর। পর পর কয়েকটা গাড়ি চলছিল। এক সময়ে দেখলাম, যে যার পথে কোথায় কখন বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে। আমরা চলেছি একা।

মোহনবাবু বললেন, 'নোয়াডিহির পাহাড়ী জঙ্গলে আমরা উঠছি।'

অন্ধকার যেন আমাদের গ্রাস করল। মাথার ওপরে প্রথম ফাল্গুনের রোদ। কিন্তু ঠাণ্ডার স্পর্শ তাতে। গভীর বনের অন্ধকারে, বাতাস নেই, ঠাণ্ডা বেশি। লরির গর্জন একটু আগেও, বিরল বনপাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলছিল, এখন

আর তা নেই। বন তাকে গ্রাস করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'সব সময়েই যেন একটা কলকল শব্দ পাচ্ছি, এটা কিসের শব্দ?'

মোহনবাবু বললেন, 'কোয়েনার শব্দ। কোয়েনাও নদী বলতে পারেন। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে। আমরা কোয়েনার ধার দিয়ে দিয়ে চলেছি। সারাটা পথই চলব।'

হঠাৎ কক্‌কক্‌ ডাক আর পাখার ঝাপটা শুনে চমকে উঠলাম। আর মনে হল, আমরা পেরিয়ে যাবার আগেই, এক পাশ থেকে আর এক পাশে কী যেন একটা ছিটকে চলে গেল। মোহনবাবু হেসে বললেন, 'বনমোরগ।'

অপার কৌতূহলে বনের গভীরে তাকাই। নিঝুম, আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই, আবার তেমনি শব্দ। অনেকবারই শুনতে হল. একবার দু-বার দেখতেও পেলাম। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, বনমোরগ এক ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে, শূন্যে উড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জরাইকেলায় দু-একটি কুসুম গাছ দেখে, রক্ত মাতাল হয়েছিল। এখন এই বনের গভীরে, কোথাও কোথাও কেবল রক্তকুসুম। মনে হয় জগৎ সংসার সব লাল হয়ে গিয়েছে। বর্ণের হিসাব তো সাতটাই জানি। কিন্তু বড় বড় গাছে একটি পাতা নেই কেবল নানা রঙের ফুলে ভরা। মাটির রঙও যে এত বিচিত্র, বিচিত্রতর হয়, দেখা ছিল না। লাল, নীল, হলুদ, কালো, সাদা, পাহাড়ের গায়ে এক এক জায়গায় এক এক রঙ।

মোহনবাবু বললেন, 'মানুষ এই রঙ নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করেছে, যদি শহরের ইমারতে লাগানো যায়। কিন্তু কার্যকরী হয়নি।'

জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

'তা জানি না। নানারকম কেমিক্যাল মিশিয়েও, কাজে লাগানো যায়নি।'

গাড়ি পাহাড় থেকে ক্রমে নিচে নেমে চলছে। কিন্তু সামনেই আবার নতুন পাহাড়ের চড়াই। কয়েকবারই কোয়েনাকে দেখতে পেয়েছি। কখনো কাছাকাছি, কখনো হাজার ফুট নিচে। এমন ঋজু বিশাল শাল আর এত নিবিড়, কখনো দেখিনি। সেগুন কম, কিন্তু সেই মহীরুহের চেহারা দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রকৃত বনস্পতি।

এক জায়গায়, পাহাড়ের গায়ের অনেকখানি জায়গা টকটকে লাল, অথচ যেন আয়নার মতো মসৃণ। বুঝি মুখ দেখা যাবে। মানুষের কাজ ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কী করা হয়েছে?'

মোহনবাবু বললেন, 'হাতিরা গা ঘষেছে। ওদের গা চুলকোয় তো।

দেখুন, মাঝে মাঝে বড় বড় ফুটো আছে। ওদের দাঁতাল হাতি দাঁত ফুটিয়েছে। দাঁত গুলোয় তো মাঝে মাঝে।'

কেমন যেন স্থির থাকতে পারলাম না। বললাম, 'ওই জায়গায় একটু হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে।'

মোহনবাবু একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'দেখবেন?'

তারপরেই গলা তুলে বললেন, 'গাড়িটা থামাও তো একবার।'

গাড়ি থামল। মোহনবাবু বললেন, 'নেমে আসুন।'

তিনিও নামলেন আমার সঙ্গে। সুরীনও। সে বলল, 'এখানে নামলেন? হাতিদের জায়গা।'

বলে সে আশেপাশে তাকাল। মোহনবাবু বললেন, 'উনি একটু ওখানটা হাত দিয়ে দেখবেন। গণেশের নাম করে দেখা যাক।'

আমরা একটু এগিয়ে এসেছিলাম। পেছিয়ে গিয়ে, সেই রক্তাভ মাংসের মতো মসৃণ পাহাড়ের গায়ে হাত দিলাম। পাথর না, মাটি, কিন্তু যেন শহরের মোজাইকের মতো চকচকে। সত্যি ঝাপসা প্রতিবিম্বও দেখা যায়। ধনগোপাল মুখার্জির যূথপতির কথা মনে পড়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল, প্রাগৈতিহাসিক বিশাল দেহ সেই প্রাণীদের কথা। গা-টা যে একটু ছন্‌ছম্ করছে, তা না। তবু মনে হল বনের বাসিন্দাদের যেন একটু ছুঁতে পেলাম।

আমার সঙ্গে মোহনবাবুও হাত বুলিয়ে দেখলেন, বললেন, 'এ কথাটা আমার কখনো মনে হয়নি। আপনাদের লেখক মানুষের মন তো আমাদের না। আমরা কেবল গাছের দিকে চেয়ে দেখি। গোপালের দাদা বলরাম বলে, 'আমরা হলাম ঘাতক।'

মোহনবাবু হেসে বললেন, 'আসুন, আর না। কারোর গা চুলকোতে ইচ্ছা হলে, আগে এসে শুঁড়ে তুলে আমাদেরই আছড়ে মারবে।'

প্রাণের দায় বড় দায়। এখনে ঝিঁঝির ডাকও যেন কম। একটা গভীর স্তব্ধতা। হয়তো যারা এখানে গা ঘষে, তারা কোথাও থেকে আমাদের দেখছে। আমরা গিয়ে আবার লরিতে উঠলাম। এবার সুরীনও আমাদের সঙ্গে বাইরে এসে বসল। নিচে নামতে নামতে, আমরা খানিকটা সমতলে নেমে এলাম। দু-পাশে ঘন ঝোপ, লম্বা লম্বা ঘাস, তার পাশে পাশে গভীর বনের ছায়া। মোহনবাবু হঠাৎ বললেন, 'সুরীন, ওরা কারা যাচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে, শুক্রম ব্যাটা রয়েছে!'

মোহনবাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, হাতে তীর-ধনুক নিয়ে, খালি-গা

একটি যুবক। পরনে একটি নেংটি। বনবাসী শিকারী। সঙ্গে ছুটি বালা। লেখবার সময় নাকি কল্পনায় আমরা অনেক কিছু দেখি। কিন্তু আমার মনে হল, বনবালাদের বয়স যা-ই হোক, মন্দিরের পাথরের নারীমূর্তির কথাই তারা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সুরীন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, শুক্রমই তো, আপনার কুলি।'

মোহনবাবু বললেন, 'গাড়ি থামাতে বল তো। সঙ্গের রেজা দুটোও তো আমারই কাজ করছে না?'

'হ্যাঁ, শুক্রমের বৌ আর শালী।'

'দেখেছেন, এদেলবায় ওদের ঘর বানাবার কথা। কাল থেকে গাছ কাটা শুরু, হারামজাদা বৌ নিয়ে শিকারে বেরিয়েছে?'

বলেই হাঁক দিলেন, 'এই, এই শুক্রম!'

বনবাসী শিকারী আর সঙ্গিনীদ্বয় দূর থেকে ফিরে তাকাল। লরির দিকে ওদের যেন খেয়ালই ছিল না। ডাক শুনে এদিকে তাকিয়ে, নিজেদের মধ্যে যেন কি বলাবলি করল। তিনজনেই এগিয়ে এল লরির দিকে। কাছে আসতেই মোহনবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'ওঠ শিগগির।' তারপরে হিন্দিতে বললেন, 'আপনা কাম ছোড়কে ইধার উধার ঘুমতা?'

ওরা একটি কথাও বলল না। মুখে কোনো অভিব্যক্তি আছে বলে মনে হল না। তিন জনেই উঠে এল। আমরা গাড়ির সামনের দিকের কাঠের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। মাঝখানে ছিল দুটো টায়ার। ওরা তিন জনে সেই টায়ারের মাঝখানে গিয়ে বসল। গাড়ি ছাড়ার পরে কারণটা বোঝা গেল। গাড়ির ঝাঁকানির সঙ্গে, আমাদের তবু একটু ঠেক লাগানো ছিল। ওরা এক হাতে টায়ার ধরে না রাখলে, টাল সামলানো দায়। তিন জনে বসল খানিকটা গায়ে গায়ে। এক যুবতী বনবাসিনীর ময়লা কাপড়ের কোঁচড়ে, কি রয়েছে, টাটকা রক্ত দেখা যাচ্ছে। যুবকটি রোগা রোগা, শক্ত কালো চেহারা। তীর-ধনুক রেখে দিল। একটি বনবালা, যার কোঁচড়ে রক্তাক্ত বস্তু, তার বুকের কাপড় অনেকখানি উদাস। কোণারকের শিল্পীরা কি এই সব চোখে দেখেছিল? অন্য বালাটির বয়স অপেক্ষাকৃত কম। তার চোখ দুটি ডাগর। উদ্ধত শরীর যেন সামান্য একটু কাপড়ের আবরণে ভয় ধরানো বিদ্রোহে কাঁপছে।

এতক্ষণ ওরা নির্বিকার ছিল। তারপরে নিজেরা চোখাচোখি করে নিঃশব্দে হাসল। দু-একবার আমাদের দিকে দেখল। সুরীন বলল, 'বড়টি শুক্রমের বৌ।'

ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'এই শুক্রম, তোর বহু কা নাম কীরে?'

শুক্রম একগাল হেসে বলল, 'সোমারি না?'

বলার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। বৌয়ের নাম সোমারি। সুধীন আবার জিজ্ঞেস করলো, উঠো তো তেরা বহুকা বহিন। উস্‌কো নাম ক্যায়া?'

শুক্রম তেমনি হেসে বলল, 'সুরসতিয়া তো।'

কথার সুরই অন্যরকম। অর্থাৎ শ্যালিকার নাম সুরসতিয়া। এ কি ঠিক বনবাসিনীর নাম? নাকি সমতলের হিন্দুদের কাছ থেকে পাওয়া। সুরসতিয়া কি সরস্বতীর অপ্রভ্রংশ? জানি না সুধীন আবার জিজ্ঞেস করল, 'এই সোমারি, তেরা কাপড় মে ক্যায়া হায়?'

সোমারি হাসতে হাসতে নিরুত্তরে কাপড়ের কোঁচড় থেকে একটি গাঢ় লাল আর পিঙ্গল বর্ণের মৃত পাখি বের করে দেখাল। সুধীন বলল, 'বনমোরগ। তবে আর কি, আজ তো তোদের খুব খ্যাটন।'

ওরা কি বুঝল কে জানে। তিনজনেই হাসল। শুক্রম অনায়াসে সোমারির কোঁচড়ে নিজেই নিহত বনমোরগটি ভরে দিতে দিতে ওর পীন বক্ষে হাত রাখল, নিতান্ত টাল সামলাবার জন্য। আমার চোখের পাতা কেঁপে যায়। কিন্তু যাদের দেখে যায়, তারা একান্তই উদাস, তারপরে শুক্রম বুক থেকে হাত নামিয়ে, সোমারির কোমর জড়িয়ে ধরে বসল। সোমারি তার একটি পা ঢুকিয়ে দিল শুক্রমের উরুর নিচে দিয়ে। ইতিমধ্যে দেখেছি সুরসতিয়ার ঠোঁটে হাসি নাকের পাটা কাঁপছে। গাড়ির ঝাঁকানিতেই বোধহয় তার পাথর-উদ্ধত বুকের একাংশ রৌদ্র মাখে। হঠাৎ সে সোমারির দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল। পরশু বিকালে জরাইকেলার দোকানপাটের সামনে কয়েকটি মেয়ের, গতকাল সাম্‌টা নাকার পরে মেয়েদের সমবেত গানের মতো একটাই সুর। এর স্বরলিপি কী হতে পারে জানি না। যেন এক একটা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে, একই পর্দায় টানা সুরের গান। মনে হয়, মানুষ না, বনেরই গান শুনছি। বনের সঙ্গে মিলে যায়।

সুরসতিয়া গেয়ে উঠতেই, সোমারি, হাসল। আমার দিকে চেয়ে দেখল। সুধীনও হাসল মোহনবাবুর দিকে চেয়ে। মোহনবাবু ভুরু কুঁচকে আছে। তবু হাসিটি সামলে রাখতে পারছেন না।

সুরসতিয়া আবার এক কলি গান করল। আড়চোখে আমাদের দিকে দেখল। সুধীন দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে উঠল। দুই বোন খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর দু'জনেই আবার গুনগুন করে নিজেদের ভাষায় গেয়ে উঠল।

সুধীন হেসেও ধমকে উঠল, 'এত্‌না লালচ কাহে রে? বাবু হমলোগকা মেহমান, জঙ্গল ঘুমনে আয়া।'

এবার কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'ব্যাপারটা কী?'

সুরীন বলল, 'এই যে আপনি খাচ্ছেন, আর আপনার হাতে সিগারেটের টিন রয়েছে, এই সব বলাবলি করছে।'

'গান গেয়ে?'

'হ্যাঁ, সুরসতিয়া প্রথমে গান গেয়ে বলল, অচেনা নতুন এক ইজারাদার দেখছি। তার ধূমপানের গন্ধটি বড় মিঠে। তারপরে আবার গাইল, বাবুর হাতের টিনে মনে হয় অনেক সিগারেট আছে, বাবু বেশ খানদানি। তারপরে দুই বোনে একসঙ্গে গেয়ে বলল, এমন মিঠা গন্ধের সিগারেট, বাবু কি আমাদের দিতে পারে না? একলা খাওয়াতে কোনো সুখই নাই।'

আমি অবাক যত, খুশি তত। বলে উঠলাম, 'চমৎকার! একথাগুলো ওরা গান গেয়ে বলল?'

সুরীন বলল, 'হ্যাঁ। ওরা ওরকমই।'

বিশেষ করে, 'একলা খাওয়াতে কোনো সুখই নেই' কথাটি যেন নিমেষে আমার অনুভূতির এক নতুন দরজা খুলে দিল। সেই সঙ্গে আমার বোধেরও। এই হল বনতত্ত্ব। একলা কোনো কিছুতেই সুখ নেই। আমি তাড়াতাড়ি আমার সিগারেটের কৌটোর ঢাকনা খুলে, আগে সুরসতিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'নাও।'

সুরসতিয়ার উদ্ধত শরীরেও যেন এবার লজ্জার ঢল নামল। মোহনবাবু প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'আরে না না, ওদের এত দামী সিগারেট কেন দিচ্ছেন। ওসবের মর্যাদা ওরা বোঝে না।'

ওদের মর্যাদাবোধের বিষয় আমার জানার দরকার নেই। আমার মিঠা সিগারেট আমি ওদের না দিয়ে আর একলা খেতে পারব না। বললাম, 'নিক, এমন করে বলছে।'

তা ছাড়া যা-ই বল, চোখ যে ভুলেছে। মন ভুলেছে। এমন করে বলতে জানে কে? চাইতে জানে কারা? এমন ধরনটি তো আর কোথাও দেখিনি, 'একলা খাওয়াতে কোনো সুখ নেই।' সুরসতিয়া সিগারেট নিতে দ্বিধাবোধ করছে দেখে বললাম, 'নাও।'

বোধহয় ধুলোবালি ঘেঁটেছে, ময়লা হাত বাড়িয়ে সিগারেট কৌটা থেকে টেনে তুলল। কিন্তু একটি না, পর পর তিনটি সিগারেট টেনে তুলল। ঠিকই করেছে। ও কি একলা খাবে নাকি? তাহলে আর গানের মর্যাদা থাকল কোথায়? সোমারিকে একটি দিল, শুক্রমকে আর একটি। আমি দেশলাই

এগিয়ে দিলাম। গাঙ্গুলিমশাইয়ের মতো, 'জুয়াচোর' বলবার দরকার নেই, কিন্তু এই খোলা চলন্ত লরিতে বসে, দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়ে সিগারেট ধরানো, সকলের কাজ না। সুরসতিয়ারও না। পর পর কয়েকটি কাঠি নষ্ট হল।

সুরীন বলে উঠল, 'আ লো পোড়াকপালী, দেশলাইটাও ধরাতে শিখিসনি, সিগারেট খাওয়ায় শখ!'

জেমা ওরাওঁনী যে একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েছে! তাই সুরীনের চোখে সুরসতিয়া পোড়াকপালী। মোহনবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এই, এই, কেয়া করতা রে?'

আমি সুরসতিয়ার হাত থেকে দেশলাইটি নিয়ে বাতাসের হাত থেকে শিখা বাঁচিয়ে মুখের সামনে ধরলাম। এবার জ্বালাতে সমর্থ হল। কিন্তু সিগারেটের প্রায় অর্ধেকাংশ ঠোঁটের লালায় ভিজে গিয়েছে। মুখের মধ্যে বেশ খানিকটা পুরে না দিলে যে, ধরাই হয় না। কয়েক টান দিয়ে সোমারির দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিল। ওরা কর্তা-গিন্নীতে সিগারেট ধরিয়ে, সুরসতিয়াকে ফিরিয়ে দিল। তিন জনে মিলে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আর তিন জনেরই কি হাসি। বিশেষ করে দুই বোনের। খুব যে উপভোগ করছে, বোঝা যায়। টানা দেখে মনে হচ্ছে, ধূমপানে তেমন একটা অভ্যস্ত না। তা বলে ইচ্ছা বলে কথা নেই? বিশেষত অমন মিঠা গন্ধ যখন নাকে লেগেছে?

সুরসতিয়া আবার ওদের নিজেদের ভাষায় গুনগুনিয়ে গান করে উঠল। কয়েক লাইন পর পর। সেই একই সুরে গাইল। শুক্রম বনের দিকে চেয়ে সিগারেট টেনে চলেছে। সোমারি মিটিমিটি হাসছে বোনের দিকে চেয়ে। সুরসতিয়ার মুখেও হাসি। সুরীন বলে উঠল, 'ক্যায়ারে, ভিয়েং পিয়া? মনমে এতনা ফুর্তি কাহে?' সুরসতিয়া আর সোমারি খিলখিল করে হেসে উঠল। মোহনবাবু বললেন, 'বলা যায় না, হয়তো সকালবেলায় হাঁড়িয়া গিলে মরেছে।'

সুরীন আমার দিকে চেয়ে বলল, 'ও ছুঁড়ি গান গেয়ে কী বলছে জানেন তো? বলছে, মানুষটার মন বড় দরাজ। আমি চাইলে বোধহয় একটা পুরো পাহাড় দিয়ে দেবে। মানুষটার মন বেশ ভাল।'

অদ্ভুত গান, পুরো একটা পাহাড়ের আকাঙ্ক্ষা সুরসতিয়ার। আসলে সেটাই বোধহয় এদেশের চাওয়া, একটা পাহাড় পাওয়া মানে ভূমি আর বন-সম্পদ পাওয়া। কিন্তু অবাক লাগছে, গান গেয়ে একথা বলছে কেমন করে?

ছন্দ একটা আছে বুঝতে পারি। মিল আছে কী? সুরীনকে জিজ্ঞেস করি, 'ও কী ভাষায় গাইছে?'

সুরীন বলল, 'মুণ্ডা।'

জিজ্ঞেস করি, 'ও কি সত্যি গান বেঁধে গাইছে?'

সুরীন বলল, 'হ্যাঁ। ওদের কারোর কারোর মধ্যে এরকম দেখা যায়।'

অবাক লাগে। আমাকে কবিগানের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। স্বভাবকবি যাদের বলা হয়, যারা মুখে মুখে গান বাঁধে, সুর করে গায়। এ ক্ষেত্রে তফাৎ, সুর একটাই।

মোহনবাবু বললেন, 'আপনি যখন এদেলবায় আমার কাছে আসবেন, তখন আপনাকে ওদের নাচ দেখাব, গান শোনাব।'

সেই হবে আমার বন দেখার নতুনত্ব। আমি বীরভূমের, সাঁওতাল পরগণা প্রান্তে, মলুটি গ্রামে সাঁওতালদের নাচ দেখেছি। বনের গভীরে বনবাসীদের নাচ কখনো দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কি আপনার সঙ্গে যাচ্ছে?'

মোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এদের দেখা আপনি আমার কাজের জায়গায় গেলেই পাবেন। তবে দেখুন সিংজী আপনাকে কবে ছাড়েন। এখন তো আপনি তাঁর মেহ্‌মান। উনিও অবিশ্যি নাচ-গান দেখার ব্যবস্থা করতে পারেন।'

তা পারেন, কিন্তু সেখানে তো সুরসতিয়া থাকবে না। এই সুরসতিয়া তার ডাগর কালো চোখের কোণে বারে বারে আমার দিকে দেখছে। দিদির দিকে তাকিয়ে হাসছে। যেন এই হাসির মধ্যেও, নিঃশব্দে কোনো কথা বলাবলি হচ্ছে। সুরসতিয়া কি আমাকে ওদের আদিম মন্ত্রে মুগ্ধ করছে? উইলিয়ম কি এমনি চোখের টানেই মুণ্ডা হয়ে গিয়েছেন? সুরসতিয়া যেন এই গভীর বনের এক উল্লাস আমার রক্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমরা আর একবার পাহাড়ের ওপর উঠে, আবার নেমে চলেছি। একবার কোয়েনার জলস্রোতের ওপর দিয়ে পার হলাম। নিচে পাথরের চাঙড়া। গাড়ি খুব আস্তে আস্তে পার হল। তারপরেই একটি উপত্যকার মতো জায়গায় এলাম, যেখানে কিছু ঘর-বাড়ি দেখা গেল। উপত্যকাটি অনেকখানিই সমতল মতো। কাঁকর পাথরের লাল রাস্তার মাঝখানে, ছাড়া ছাড়া বেশ কয়েকটি বাড়ি। সবই মাটির ঘর, বেশির ভাগ বাড়ির মাথা-ই খোলার চালে ঢাকা। কিছু বা এক জাতীয় ঘাসের, যা বাংলাদেশে দেখা যায় না। খড় না, সুন্দরবনের গোলপাতা না পূর্ববঙ্গের ছন বলতে যা বোঝায়, তাও না। অনেকটা কাঠির মতো শক্ত।

গাড়ির গতি কমে এসেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দু-একটি এখানে সেখানে খেলা করছে। সকলেই তারা উলঙ্গ। অন্যান্য বনবাসী মেয়ে পুরুষও দু-চারজন চোখে পড়ছে। তারা আমাদের দিকেই দেখছে। চোখে পড়ল একটি উঁচু করে পাড় বাঁধানো ইঁদারা। কপিকল রয়েছে। কয়েকটি বনবাসিনী জল তুলছে, মাটির কলসীতে ঢালছে। তা ঢালছে, কিন্তু কাজ থামিয়ে আগে, দু-চোখ মেলে আমাদের দেখছে। সমতলের যে-কোনো গ্রামেই বোধহয়, এমন দৃশ্য চোখে পড়ে না। মেয়েরা সেখানে মুখ ঢেকে দিত, অথবা ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে নিত। তাদের রীতি-নীতি যে আলাদা। পরপুরুষকে মুখ দেখাতে নেই।

আর এখানে? নারী পুরুষের তফাত কোথায়? সব কিছুতেই, তারা সমান। একসঙ্গে পান, একসঙ্গে কাজ। মুখ লুকাবার অবকাশ কোথায়? তা বলে কি সহবত নেই? বনেরও সহবৎ আছে। সেই নিষ্পাপ সরল প্রাণের সহবতটি পাবে। এমন অনায়াসে, অবাক চোখে তাকানো দেখলেই বোঝা যায়, একটি বন্য কৌতূহল ছাড়া আর কিছু নেই।

ইঁদারাটা পেরিয়ে, খানিকটা গিয়ে লরি দাঁড়াল। মোহনবাবু বললেন, 'আপনার জায়গায় এসে গেলেন। এ জায়গার নাম নাগরা—ছোট নাগরা।'

লরিটা যেখানে দাঁড়াল, তার পাশেই একটি রক্তবর্ণ কুসুম। আমাদের গায়ে রক্তিম আভা ছড়িয়ে, সে, যেন রৌদ্র-মাখা উল্লাসে, অল্প অল্প দুলছে। আশে-পাশে আরো অজস্র গাছ। বনের মধ্যেই, সামান্য খানিকটা জায়গা ছাঁটকাট করে, গুটি কয় বসত।

আগে নামল সুরীন, তারপরে মোহনবাবু। জিজ্ঞেস করলেন, 'নামতে পারবেন তো?'

'উঠতে যখন পেরেছি, নামতেও পারব।'

গাড়ির সামনে দিক দিয়ে নামলাম। কুসুম গাছের উল্টো দিকে দুটি মাটির ঘর, টালি-ছাওয়া। মাটির নিচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সবই রক্তলাল। ভিতর থেকে খানিকটা পর্যন্ত কালো রঙ দেখে মনে হয়, আলকাতরা মাখানো। উইপোকার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নিশ্চয়। মোহনবাবু বললেন, 'সুরীন, তুমি ওঁর স্যুটকেসটা নামাও, গাড়ির সামনের দিকে আছে।'

এই সময়ে, মাটির বাড়ির সামনে একটি লোক এসে দাঁড়াল। তাকে বনবাসী বলে মনে হল না। মাঝবয়সী লোকটির গায়ে একটি শার্ট, পরনে ধুতি। কদমছাঁট চুলের পিছনে, শিখাটি জানিয়ে দিচ্ছে, সে বনের বাইরের

লোক। সে আগে সেলাম করল মোহনবাবুকে তারপরে আমাকে। মোহনবাবু আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'রতন, ও বাবুজী সিংজী সাহাব কা মেহমান।'

রতন আমাকে আর একবার সেলাম জানিয়ে বলল, 'সবেরে খবর মিল গয়া, উন্‌কো খানা ভি বনতা।'

মোহনবাবু হেসে বললেন, 'বহোত আচ্ছা। হম এদেলবা চলা যাতা, বাবুজীকো ঠিকসে দেখ্‌ ভাল করো।'

রতন হাতজোড় করে বলল, 'কোই কসুর না হোগা বাবুজী। সব ঠিক হো যায়েগা।'

সুরীন স্যুটকেসটা নামিয়ে নিয়ে এল। তার হাত থেকে নিল রতন। মোহনবাবু বললেন, 'চলি তা হলে। সিংজী সাহেব আসবেন দু-এক দিনের মধ্যে। আমার ওখানে আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন। নিজেও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন।'

মোহনবাবু নমস্কার করে গাড়িতে উঠলেন। সুরীনও উঠল। সুরসতিয়ারা আমার দিকে তাকিয়েছিল। সুরসতিয়া জিজ্ঞেস করল, 'হমলোগকা সাথ্‌ নাই যায়েগা?'

আমি তাড়াতাড়ি সিগারেটের কৌটো খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম, বললাম, 'দু-চার রোজ বাদ যায়েগা।'

সুরসতিয়া কৌটোর দিকে হাত বাড়াল না। মুখে তার হাসিটি লেগে আছে, চোখের দৃষ্টি অপলক। বললাম, 'নাও।'

সুরসতিয়া মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

সোমারিও নিল না। হঠাৎ শুক্রম হাত বাড়িয়ে একটি সিগারেট তুলে নিল।

সোমারি বলে উঠল, 'তুম এদেলবা আয়েগা, তব পিয়েগা।'

গাড়ি গর্জন করে উঠল। বন্য কুলিরেজাদের কাছ থেকে বিদায়পর্বকে এত মূল্য দিতে কেউ রাজী না। মোহনবাবুর গলা শোনা গেল, 'চলি স্যার।'

গাড়ি চলে গেল। গাড়িটা পাহাড়ের ওপর উঠছে। বাঁকের মুখে হারিয়ে যাবার আগে, সুরসতিয়ারা এদিকে তাকিয়ে রইল। গাড়িটাও চোখের বাইরে গেল, আর আমার কানে হাসি বেজে উঠল। পাশ ফিরে দেখি গুটিকয় বনবালা মাথায় কলসী নিয়ে, আমার পাশ কাটিয়ে চলেছে। সকলের মুখই হাসি-হাসি। কিন্তু কেউ আমার দিকে তাকিয়ে নেই। তবে শব্দ করে হাসল কারা? ওরা কিছুটা গিয়ে, ডান দিকের একটি গাছতলা দিয়ে পাশ ফিরতে

গিয়ে, তিন জনেই, মাথায় কলসীসহ, পিছন ফিরে তাকাল। তিন জনেই হাসল, যে হাসির শব্দ একটু আগেই শুনেছি। তারপরে তিন জনেই, ডান দিকে বনের আড়ালে, দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাসি কেন? সুরসতিয়াদের বিদায় দৃশ্যের প্রতি বিদ্রূপ নাকি? কিন্তু ওরা কি বিদ্রূপ করতে জানে? অথবা নিতান্তই একটি হাসির ঝলক?

'আইয়ে বাবুজী, অন্দর আইয়ে।'

রতন ডাকছে। আমি বাড়ির ভিতরে গেলাম। লেপা-পোঁছা মাটির উঠোন। উঠোনের একপাশে একটি অর্জুন গাছ। তার নিচের ছায়ায় একটি খাটিয়া পাতা রয়েছে। দুটি ঘরের কোলে, চালা-ঢাকা দাওয়া রয়েছে। সবই লাল, লেপা-মোছা ঝকঝকে। আরো একটি ঘর রয়েছে, ছোট নিচু ঘর, মাথায় পুরানো টিনের চাল। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখে বুঝতে পারলাম, রান্নাঘর।

দাওয়ায় উঠে দুটো ঘরই দেখলাম। দুটো ঘরেই খাটিয়ার বিছানা পাতা আছে। একটি ঘরের সাজসজ্জা একটু বেশি। বড় একটি আয়না, কাঠের আলমারি, জামাকাপড় রাখবার আলনা, সবই আছে। আর একটি ঘরে খাটিয়া আর চেয়ার-টেবিল। রতন কিছু না বলেই, আমার জন্য চা আর ডিম-সেদ্ধ নিয়ে এল। ডিমের জন্য না, মনটা বোধহয় অবচেতনে চা চা করছিল। খুশি হয়ে উঠলাম। হিন্দীতে বললাম, 'ঘরে বসে খাব না, বাইরের গাছতলায় খাটিয়ায় বসব।'

রতন বলল, 'যেখানে আপনার খুশি বাবুজী। কখন চান করবেন?'

হাতের ঘড়ি দেখে বললাম, 'এখন তো মাত্র দশটা। দেরি আছে।'

'ঠিক আছে আমাকে বলবেন, আমি জল এনে দেব।'

অর্জুন গাছের নিচে বসে চা আর ডিম-সেদ্ধ খাওয়া গেল। খেতে খেতে, চোখ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, নীল আকাশ আর বন। লোকজনের সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। ঝিঁ-ঝি-ডাকা নিঝুম, অথচ এটা একটা গ্রাম। রতন এসে খানিকক্ষণ নানান কথা বলল। জানা গেল, এখানে ঘর জমি বলতে নিজেদের কারোর কিছু নেই, সবই বনবিভাগের। বনবিভাগ থেকে ঘর জমি দিয়ে এখানে লোকজন রাখা হয়েছে। সময়ে অসময়ে কাজের লোকের দরকার হয়। অনেক সময় বনে আগুন লেগে যায়। নিয়মিত বন পরিষ্কার রাখা দরকার হয়। তখন বাইরের লোকের সাহায্য নিতে গেলে চলে না।

তাহলে সিংজী কেমন করে থাকেন? সিংজী হচ্ছেন মস্ত বড় মানুষ, বন-

বিভাগ থেকে তাকে ঘর দেওয়া হয়েছে। তবে গ্রামটা খুব ছোট না, বড়ই। প্রায় তিরিশ চল্লিশ ঘর লোক আছে। ব্লক ডেভেলপমেন্টের একটি ছোটখাটো স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নাকি এখানে আছে। ডাক্তার মাঝে-মধ্যে আসে। একজন নার্স অবিশ্যি থাকে। আর এই যে এ সব বাড়ি, এ সব বাড়ি নাকি খুবই শক্ত। মাটির দেওয়াল বলে যেন কেউ মনে না করে ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে। হাতি এসে গায়ের ধাক্কা দিলেও, হঠাৎ হুড়মুড় করে পড়ে যাবে না। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, হাতির উৎপাত মাঝে মাঝে হয়, যখন চাষবাস হয়। এখন অবিশ্যি সরগুজার চাষ কিছু হয়েছে আশে-পাশে। গ্রামের মধ্যে না হলেও, হাতিরা গ্রামেও ঢুকে পড়ে। তখন আগুন জ্বালানো, টিন পেটানো ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তবে ভয়ের কিছু নেই। দু-বছরের মধ্যে এরকম ঘটনা রতন মাত্র দু'বার দেখেছে।

রতনের গল্প শুনতে শুনতে, চা-পান শেষ করে, সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি।'

রতন বলল, 'তা যান বাবুজী, তবে গ্রামের বাইরে যাবেন না, বনের মধ্যে ঢুকবেন না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ঢুকলে কী হবে?'

'না, তেমন কিছু হবে না। এ সময়ে মহুয়া ফলেছে তো। অনেক সময় ভালুকরা মহুয়ার ফল খেতে আসে।'

বনের ব্যাপার, সবই বিচিত্র। রতন হেসে বলল, 'বেচারিরা মহুয়া খেতে এসে মরে।'

'কেন?'

'মহুয়া খেয়ে মাতাল হয়ে যায়। তখন মানুষের মতোই পা টলমল করে, চলতে পারে না। আর সবাই মিলে তীর-ধনুক দিয়ে, কুঠার দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলে।'

আহ্, কী নিষ্ঠুরতা। তোমরা পান করে মাতাল হতে পার, আর সে তার বনের ফল খেয়ে একটু মস্ত্ হতে পারে না? এ কি অবিচার। বললাম, 'মেরে ফেলার কী দরকার। সে তো কারোকে মারতে আসে না?'

রতন অবাক হয়ে বলল, 'মারতে আসে না? বলেন কি বাবুজী। ভালুকের হাতে পড়লে কারোর রক্ষা থাকে না। পালাতে না পারলে, ভালুক তাকে খতম করে দেবে। এই তো বছর দুয়েক আগে, একটা পোয়াতি মুণ্ডা বৌকে মেরে ফেলেছিল। ছিঁড়ে-খুঁড়ে আর কিছু রাখেনি।'

সেটাও নিষ্ঠুরতা। একটি গর্ভবতী মুণ্ডা বা বধূ নিশ্চয় ভালুক শিকার করতে যায়নি। শুনেছি, যে পশু যত হিংস্র, প্রকৃতপক্ষে সেই পশু তত ভীরু। আক্রান্ত হবার, এবং মৃত্যুভয়, তার সব থেকে বেশি। দাঁতাল বন্য বরাহ তার মধ্যে আছে। বন্য বাইসন—মহিষ যাদের বলে, অথবা কেউটে সাপ, এরা যাকে দেখে তাকেই আক্রমণ করে। কেউটে সাপ তো তার নিজের আন্দোলিত ছায়াকেও ছোবল মারে। নিরন্তর শঙ্কা, নিরন্তর নিষ্ঠুর আক্রমণের আর এক দিক। হাতি সিংহ বা বাঘ সম্পর্কে, বহুতর বিপরীত কাহিনী শোনা যায়, অথচ তারা অনেক সময়েই মানুষ-খেকো, একমাত্র হাতি ব্যতিরেকে। কিন্তু বাঘ সিংহ মানুষ খেতে চায় না, তাদের কাছে তা প্রিয় খাদ্যও না। কখনো অভাবে, অথবা সহসা ভয়ে সে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু দাঁতাল বরাহ, কেউটে, বন্যমহিষ, তাদের কাছে সবাই হন্তারক, সে জন্য তারা নিজেরা আগেই সেই ভূমিকা নিতে চায়। ভালুকের সম্পর্কেও কোনো মহৎ কাহিনী শুনেছি বলে মনে করতে পারি না।

আসলে বনের রাজ্যে, মানুষের আধিপত্য তারা ভালবাসে না। মানুষকে বিশ্বাস করার কারণও, তাদের প্রবৃত্তিবোধ থেকে কখনো ঘটেনি। অভিজ্ঞতা তো সুখের না।

নিরন্তর শঙ্কা, নিরন্তর নিষ্ঠুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত, সে কি কেবল বন্য পশুদের মধ্যেই? সমাজে সংসারে এমন মানুষ কি নেই? তাদের সংখ্যাও বোধহয় কম নেই। কিন্তু থাক, সে মানুষেরা থাক, আমি বন দেখি, বনে চলি, আমি এসেছি তার ডাকে। পশু বলতে পারি, কিন্তু বন তাদের আশ্রয়। জীবনের এটাও তো অভিজ্ঞতা, বন কেবল চোখ ভুলিয়ে, মন ভাসিয়ে, অনুভূতির মধ্যে এক অনির্বচনীয় গভীর অনিন্দ্যবোধের সৃষ্টি করে না। মৃত্যু তার ফাঁদ পেতে বসে আছে নানাখানে। ওহে, বনবিলাসী বনপ্রেমিক হয়ো, মন রেখো মনে মনে। সেই গানের মতো, 'কিছুদিন মনে মনে যত্ন করে, শ্যামের পীরিত রাখ গোপনে।' তেমনি গোপনে একটু মন সজাগ রেখো। রতনকে বললাম, 'যা, শোনালে, তারপরে আর জঙ্গলে একলা ঢুকতে সাহস পাব না।'

রতন বলল, 'জঙ্গলে অনেকেই ঢোকে বাবুজী, তারা জঙ্গলের ঘাঁত-ঘোঁত জানে। আপনি তো নয়া মানুষ তাই বলছি।'

বললাম, 'ঠিক আছে।'

বাইরে বেরিয়ে ভাবলাম, কোন দিকে যাই। ডাইনে না বাঁয়ে? বাঁ দিকের পথ ধরে এসেছিলাম। ডান দিকের পথের বাঁকে চলে গেছেন মোহন-

বাবুয়া। যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম, সে পথেই এগোলাম। মনে পড়ল, ওদিকে কোয়েনা নদী নির্ঝর পেরিয়ে এসেছি। লরিতে এসেছি, কতটা দূরে ফেলে এসেছি, বুঝতে পারছি না।

যেতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে কুসুম। এখন রোদ আরো চড়েছে, কুসুমের রক্তশিখা আরো যেন জ্বলে উঠেছে। লাল মাটিতে, আমার গায়ে, সবখানে তার রক্তাভ ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। এগিয়ে গেলাম। বাঁধানো ইঁদারার সিঁড়িতে একটি বনবালা চুপ করে বসে আছে। পায়ের কাছে তার কলসী। চুপ করে গালে হাত দিয়ে সে বসে আছে। বন কি তাদের কারোর শরীরেই, অমুদ্ধত শীর্ণতা দেয়নি? দেখে শুনে আমার তো যেন সেইরকমই মনে হচ্ছে। তিপু আমাকে কিচরি কাকে বলে শিখিয়ে দিয়েছিল। বনের তাঁতীদের নিজেদের হাতে বোনা এক রকম মোটা কাপড়, হালকা লাল তার পাড়। বনবালাটি সেরকম একটি শাড়ি কোনোরকমে কোমরে বুকে জড়িয়ে চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। পাশে একটি বড় শালগাছ। তার শাদা শাদা ছোট ছোট ফুল মাঝে মাঝে ঝরে পড়ছে।

এত কী ভাবনা বনবাসিনীর? বরের সঙ্গে বিবাদ হয়েছে? হাঁড়িতে চাল নেই? নাকি, এখনো অনূঢ়া? মনের মানুষটি দূরে কোথাও গিয়েছে? হাসি পেল আমার। এমন করে বসে থাকার কত কারণ থাকতে পারে। এখানকার জীবন মনের কতটুকু সমস্যা আমি জানি।

আরো এগিয়ে গেলাম। কয়েকটি বনবাসী পুরুষ মুখোমুখি বসে, রাস্তার ধারে কথা বলছে। দুটো গরু খুঁটিতে বাঁধা। গোটা কয় ছাগল চরছে। পোষা মুরগীরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বনবাসীরা সকলেই খালি গা, কোমরে সামান্য একটি কাপড়ের ফালি, সামনেটা ঢাকা। লজ্জা নিবারণ তাতেই যথেষ্ট তারা আমার দিকে অপরিচিত কৌতূহলে তাকিয়ে দেখল। একজন আবার একটু হেসে কপালে হাত ঠেকাল। কেন জানি না, আমিও তাই করলাম।

দু-পাশেই, ছোট ছোট মাটির ঘর। গায়ে গায়ে লাগোয়া না, ছাড়া ছাড়া। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে। গাছ না কেটে, যতটুকু সম্ভব, বসত ঘর করা হয়েছে। সব ঘর একরকম না। কয়েকটি আছে, সিংজী সাহেবের বাড়ির মতো। মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একাধিক ঘর। যত ঘর, গাছ তার থেকে বেশি। চলেছি যেন ছায়ায়। এক বয়স্কা বনবাসিনী, একটি ঘাসে বোনা মাদুরের ওপর কী যেন ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে। ভাল করে চেয়ে দেখি, মহুয়া। মহুয়া শুকোচ্ছে। আর এক জায়গায় দেখলাম, এক বনবালা কাঠের বড় খোলে,

কী যেন ঘষছে। কৌতূহল হল। এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি অবাক চোখে একবার আমার দিকে দেখল। তারপরে হঠাৎ একটু হেসে, আবার নিজের মনে কাজ করতে লাগল। কিন্তু হাসিটি যে মুখে কেবল লেগে রইল, তা না, হাসিটি একটু বেশি উদ্‌গত হয়ে পড়ায়, কিচরির আঁচলটি মুখে চাপা দিল। আমি দেখলাম, সে যেন কী গুঁড়ো করছে, যার রঙ অনেকটা শুকনো পাতার মতো। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী?'

আমি জানি না, সে আমার বাংলা কথা বুঝতে পারল কী না, কিংবা আন্দাজেই জবাব দিল, 'ভরগ্তো কুকড়ি।' বলেই হাসি।

ভরগ্তো কুকড়ি। এমন জিনিসের নাম কেউ কখনো শুনেছে? বাংলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'জিনিসটা কী?'

বনবালাটি এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। বয়স বোধহয় বিশ-বাইশ হবে। মাথার রুক্ষ চুল খোলা পিঠে ছড়ানো। দু-হাতে কাঁসার দুটি বালা। আর কোনো অলঙ্কার নেই। বোঁচা বোঁচা নাক, ভাসা ভাসা চোখ। তারপরে হঠাৎ ঘরে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে হাতে একটি ব্যাঙের ছাতা, নিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, 'এ ভরগ্তো কুকড়ি না?'

যেন আমি ওর কথা বিশ্বাস করিনি, এভাবে কথাটা বলল। ব্যাঙের ছাতাকে যে ওরা ভরগ্তো কুকড়ি বলে, সেটা জানা গেল। কিন্তু ওর কাঠের খোলের বস্তুর সঙ্গে, এর যোগাযোগটা কি বুঝতে পারছি না। খোলের বস্তু তো প্রায় ছাতুর মতো দেখতে। আমি বাংলাতেই আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার খোলের মধ্যে ওগুলো কি ভরগ্তো কুকড়ি?'

বনবালা ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যেয়া?'

আমি খোলের দিকে দেখিয়ে বললাম, 'ও ভি ভরগ্তো কুকড়ি হ্যায়?'

বনবালা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হাঁ, উসকো শুকায়া, আভি গুঁড়া করতা। ঘরমে রাখ্‌ দেগা।'

'উসকে বাদ?'

'ওতু পাকায়েগা, খায়েগা।'

বলেই হেসে উঠল। যেন এমন নির্বোধ সে আর কখনো দেখেনি। ওতু? সেটা আবার কি। ছাতু নাকি? যেরকম ব্যাঙের ছাতা চূর্ণ করছে, যা জীবনে কোনোদিন দেখিনি, সেই রকমই মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওতু ক্যায়া, ছাতু হ্যায়?'

বনবালাটির গায়ে যেন কেউ কাতুকুতু দিয়েছে, এমনিভাবে হেসে উঠে সে

তার খোলের ওপরেই প্রায় গড়িয়ে পড়ল। আমি বোকার মতো ওর হাসি উচ্ছলতা দেখছি। হাসবার মতো এমন কি বলেছি, বুঝতে পারছি না। বললাম, 'হাসতা কাঁহে?'

তখনো ওর হাসি থামল না। কথঞ্চিৎ সামলাবার পরে হাসি-আরক্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওতু কাঁহে ছাতু হোগা? তুমলোগ্ ভাজি নাই বানাতা? তরকারি তরকারি। ওইসা পাকায়েগা।'

বুঝহ ব্যাপার। ওতু মানে তরকারি। হায়রে ভাষা, কাদের মুখে যে তুমি কী রূপে বাজো, তা কেউ বলতে পারে না। এতক্ষণে অনুমান করলাম, ব্যাঙের ছাতা শুকিয়ে গুঁড়িয়ে তুলে রেখে দেবে। অভাবের সময় রান্না করে খাবে। যেমন আমাদের বড়ি, পোস্ত, শুকনো ফুলকপি, শুকনো আর নোনা মাছ, দুর্দিনের খাদ্য। বিশেষত বর্ষার দিনের। আমি ঘাড় নেড়ে বোঝালাম, বুঝেছি। আমি যাবার জন্য পা বাড়ালাম। বনবালা জিজ্ঞেস করল, 'তুমকো ঘর কহাঁ?'

বললাম, 'কলকাতা।'

এবার তার চোখে একটি বিস্ময়ের ঝলক লাগল। আমার ধুতিপাঞ্জাবি পরা শরীরকে আপাদ-মস্তক দেখল।

তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'জঙ্গলকা ইজারা লিয়া?'

বললাম, 'নহি। এ্যায়সা দেখনে ঘুমনে আয়া।'

'ইধার কিসকা ঘরমে আয়া?'

'সিংজী সাহাবকা ঘর।'

সে কয়েক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল। তার অভিব্যক্তি সঠিক বুঝতে পারলাম না। সে যেন একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আমার এমন অনায়াসে কথা বলল, কোথাও একটু সঙ্কোচ নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমকো নাম ক্যায়া?'

বলল, 'মিচো।'

বনবালার নাম মিচো। জিজ্ঞেস করলাম, 'মুণ্ডা?'

'হুঁ।' সে ঘাড় ঝাঁকাল। আমি ঘাড় হেলিয়ে বিদায় নিলাম। খানিকটা এগিয়ে দেখলাম, চাষের জমি। লাল মাটিতে কিসের যেন চাষ করেছে। কচি কচি চারা দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাস্তাটা ক্রমেই ডান দিকে ঘুরে, নিচে নেমে চলেছে। তারপরেই আমার কানে বাজল কুলকুল্ শব্দ। নামতে নামতে, এক জায়গায় দেখলাম, কোয়েনা নির্ঝর। ডাইনের দিকে বহে চলেছে। তার স্ফটিকস্বচ্ছ জলস্রোতের নিচে, মাকড়া পাথর দেখা যায়। বড় বড় পাথরের

টুকরো অনেক। দু-পাশে ঘন বন, নিচে কোথাও সূর্যের আলো পড়েনি। ছায়া নিবিড়, অন্ধকার যেন। ঝিঁঝি ডাকছে বিচিত্র নানা স্বরে। একটানা ঝিঁঝি ডাকার সঙ্গে, অন্যতর স্বর যেন কর্কশ ভিন্ন তালে তাল দিয়ে বাজছে। কয়েক জোড়া ঘুঘু এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন আর লতাগুল্মের একটা বিচিত্র গন্ধ। ইচ্ছা করলেই নির্ঝর নদী পার হয়ে ওপারে যাওয়া যায়। পায়ের স্যাণ্ডেলটা খুলতে হবে। রাস্তাটা ওপারে গিয়ে, আবার চড়াইতে উঠেছে। ইচ্ছাকে দমন করতে পারলাম না। পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে কোয়েনার জলে পা ডুবিয়ে, পাথরের ওপর দিয়ে সাবধানে পার হলাম। খানিকটা উঠে, মনে হল, বন আবার একটু অনিবিড় হয়ে এল। তারপরেই দেখি, সামনে অনেকখানি খোলা মাঠের মতো। প্রায় সমতল। মাঠের ডান দিকে আবার বনের সীমা। কিন্তু অবাক লাগছে, বনের সীমার কাছেই, মাঠের উপরে যেন একটা মন্দির মতো রয়েছে। সাদা রঙের পাকা ঘর, অ্যাসবেসটস দিয়ে, মন্দিরের চূড়ার মতো মাথা ঢাকা। একটা ত্রিশূল তার মাথায় গোঁজা।

পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ঘরটার সামনে গিয়ে দেখলাম, কিছুই নেই, মাঝখানে একটি বেদী ছাড়া। কোনো বিগ্রহ নেই। শানের মেঝেয় ধুলো পড়েছে। বুঝতে পারলাম না কিছুই। ভিতরে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিলাম। কিছুই নেই। ফিরে বনের দিকে তাকাতে গিয়ে থমকে গেলাম। বলতে গেলে, প্রায় একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য আমার সামনে। একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে। ফরসা রঙ, খানিকটা মাজা মাজা বলা যায়। চোখ দুটি ভাসা ভাসা, কালো ডাগর। মুখখানি স্নিগ্ধ। একটি লালপাড় মিলের পাতলা শাড়ি, কুঁচিয়ে ফেরতা দিয়ে পরা। যাকে বলে নাগারিকা পরিধান। গায়ের জামাটি লাল। কাঁধে একটি কাপড়ের ব্যাগ। হাতে ঘড়ি। কানে দুটি সাদা পাথরের ফুল। পায়ে স্লিপার। মুখে একটু ধুলো লেগেছে। চুলে বিনুনি বাঁধা।

অবিশ্বাস্য এইজন্য মনে হল, এরকম একটি মেয়েকে, একা এই বনের নিরালায় দেখতে পাব, ভাবতেই পারিনি। মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তাকিয়েছিল জিজ্ঞাসু কৌতূহলে। বাঙালী কি অবাঙালী, কিছুই বুঝতে পারছি না। এরকমের পোশাকের মেয়ে, ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু এমন নিবিড় বনে দেখা যায় কী না, আমি জানি না। মেয়েটি নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বাঙালী ?'

এই গভীর বনের ছাতায়, মাঠের রোদে দাঁড়িয়ে, বাংলা কথা কয়টি যেন

সেই উক্তি মনে করিয়ে দিল, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ। আপনিও তো তাই দেখছি।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'হ্যাঁ। এভাবে একজন বাঙালীকে দেখতে পাব ভাবিনি। কোথায় এসেছেন আপনি?'

বললাম, 'আপাতত এখানেই, এই ছোট নাগরায়।'

মেয়েটি এবার কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, 'বেড়াতে এসেছেন নাকি, না কোনো কাজে?'

বললাম, 'না, নিতান্ত বেড়াতেই।'

মেয়েটি বলল, 'এখানে বাঙালী যারা আসে, তারা তো কাজেই আসে। নিশ্চয় সিংজীর বাড়িতে উঠেছেন।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে বুঝলেন?'

'তাছাড়া আর ওঠবার জায়গা কোথায়? আর তো সবই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ঘর। দু-একটা অবিশ্যি ব্লক ডেভেলপমেন্টেরও আছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনিও কি বেড়াতে এসেছেন?'

মেয়েটি যেন একটু ক্লান্ত আর ম্লান মুখে হাসল। বলল, 'না। আমি এখানে চাকরি করি।'

'চাকরি?'

আমার অবাক হওয়া দেখে, মেয়েটি শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ। কেন, করতে পারি না?'

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু এরকম গভীর বনে, চাকরি করেন একটি বাঙালী মেয়ে, এ আমি যেন ভাবতেই পারছি না।'

মেয়েটি বলল, 'দায়ে পড়লে, মানুষকে কী না করতে হয় বলুন। সবখানেই যেতে হয়।'

অকপটে বললাম, 'বাঙালী মেয়েদের প্রতি, আপনি আমার শ্রদ্ধাকে অনেকখানি বাড়িয়ে তুললেন।'

মেয়েটি চোখে একটু ঝিলিক দিয়ে বলল, 'কেন, বাঙালী মেয়েদের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ছিল না নাকি?'

'নিশ্চয়ই ছিল। আপনি তা আরো বাড়িয়ে দিলেন। আর কে থাকেন আপনার সঙ্গে?'

'কেউ-ই না। আমি একলা।'

ওর সাদা সিঁথির দিকে আমার আগেই লক্ষ্য পড়েছিল। ক্রমাগত অবাকই হতে লাগলাম। বললাম, 'একেবারেই একা?'

মেয়েটি হেসে ফেলল। মিষ্টি হাসি, একটু গজদাঁতের লক্ষণ আছে। বলল, 'একটি মুণ্ডা মেয়ে আমার সঙ্গে থাকে, কাজকর্ম করে, খায় দায়।'

'কী কাজ করেন?'

মেয়েটি হতাশভাবে বলল, 'সে আর বলবেন না। ব্লক ডেভেলপমেণ্টের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে এখানে। আমি তার নার্স। কিন্তু না আসেন কোনো ডাক্তার, না আছে ওষুধপত্তর। লোক দেখানো, আমি একজন এখানে পড়ে আছি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেকি, চিকিৎসাকেন্দ্র আছে, অথচ ডাক্তার ওষুধ কিছুই নেই?'

মেয়েটি বলল, 'খাতায় পত্রে হয়তো আছে। মাসে দু'মাসে, ডাক্তার একবার এসে ঘুরে যান।'

বললাম, 'তবে আপনিও তো খাতা-পত্রেই থাকতে পারেন।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'হয়তো পারতাম, তেমন খুঁটির জোর নেই যে।'

এরকম সহজ কথায়, আমিও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে বললাম, 'তা ঠিক বলেছেন।'

মেয়েটি আবার বলল, 'কী মনে করবেন জানি না, বাঙালী হয়ে হয়েছে আরো বিপদ। তা না হলে হয়তো অন্য কোথাও ট্রান্সফার নিতে পারতাম। তাও দেয় না। অনেকবার বলেছি। অথচ আমার এখানে বিশেষ কিছু করবারও নেই। প্রথমত ওষুধপত্র সেরকম কিছু নেই। এখানকার লোকেরাও ওষুধ-বিষুধ খেতে চায় না। ইনজেকশন তো বাঘ। জ্বর জ্বালা হলে, একটু মিকশ্চার দিই। ম্যালেরিয়ার তেমন উপদ্রব এ জঙ্গলে নেই। সিজনাল ফিভারই বেশি। এই যেমন ধরুন এখন, 'এই সিজনে এখন অনেকেই জ্বরে ভোগে।'

বললাম, 'কেন, এখন তো ঠিক চেঞ্জের সময় না। মোটামুটি ঠাণ্ডাই আছে।'

'তা আছে। কিন্তু এই যে শাল ফুল ফুটেছে। আর এত ফুল, তার একটা রিঅ্যাকশন হয়। শরীরে উত্তাপ বাড়ে। রীতিমতো একশো দুই তিন জ্বর উঠে যায়।'

আমার যেন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। জিজ্ঞেস করি, 'অদ্ভুত বললেন, ফুলজ্বর নাকি?'

মেয়েটি হেসে বলল, 'তা বলতে পারেন, একরকম ফুলজ্বরই। কিন্তু আমাদের ওষুধ খেতে চায় না। ওদের গুনিয়ারা একরকম ওষুধ তৈরি করে দেয়, গাছের পাতার রস, সেদ্ধ করে খায়। গাছের নাম সিম্‌জাষ্টি সিমনানি।'

'আপনি গাছের নামও জানেন দেখছি।'

'ওদের সঙ্গে মিশে মিশে জেনেছি।'

'কতদিন আছেন এখানে ?'

'তা দু'বছর হয়ে গেল। আমাকে দিয়ে এখন একটা কাজই হয়। প্রসূতিদের একটু দেখাশোনা করি। প্রসবের সময় কাছে থাকি, এই পর্যন্ত।'

'মাইনে নেন কী ভাবে ?'

'মাসে একদিন বড় জামদায় গিয়ে মাইনেটা নিয়ে আসি। সারা মাসের চাল ডাল আটা তেল কেরোসিন তখনই নিয়ে আসি। মাসে একটি দিন, জঙ্গলের বাইরে যাই। তাও সরকারী গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই। ইজারাদারদের গাড়িতেই যাওয়া-আসা করি। সকলেই একটু দয়া-ধর্ম করে। চেনাশোনাও হয়ে গিয়েছে অনেকের সঙ্গে। মুশকিল হয় বর্ষাকালে। তখন তো গাড়ি প্রায় চলেই না। একমাত্র জীপগাড়ি ছাড়া। বনের কাজকর্মও তখন বন্ধ থাকে।'

বলেই মেয়েটি লজ্জিত হয়ে হাসল। বলল, 'পরিচয় না হতেই আপনাকে কত কী বলে ফেললাম।'

বললাম, 'তাতে কী হয়েছে, আমার জীবনে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা।'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সিংজী সাহেবের গাড়িতে এসেছেন ?'

বললাম, 'না, মোহনবাবু—জরাইকেলার—'

'বুঝেছি বুঝেছি, মোহনবাবুকে ভালই চিনি। আপনি তা হলে জরাইকেলা থেকে এসেছেন। বাড়ি কোথায় আপনাদের ?'

বললাম। তারপরেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না।'

নাম বললাম। মেয়েটি ভ্রূকুটি অবাক জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'মানে—আপনি—আপনি কি সেই লেখক ?'

হেসে বললাম, 'এই বনে এসে, সে পরিচয়টা দিতে বা শুনতে এখন মন চাইছে না।'

মেয়েটি বলল, 'কী আশ্চর্য! আমি যে আপনার একজন পাঠিকা। কী আশ্চর্য, আপনি ছোট নাগরায়! আমার ভীষণ ভাল লাগছে।'

দেখলাম সেই ভাল লাগাটা ওর চোখে-মুখে ঝলক দিচ্ছে। ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল, 'তৃপ্তি ভৌমিক।'

বলেই আবার বলল, 'শুনেছি, এ জঙ্গলে বিভূতিভূষণ ঘুরেছেন।'

বললাম, 'জানি।'

'তারপরে বোধহয় আপনি এলেন।'

'সেটা বলা যায় না। হয়তো অনেকেই ঘুরে গেছেন।'

এই তো বড় গোলমাল, মনে মনে বুঝতে পারছি, পরিচয় পাওয়ার পরে, তৃপ্তির সংকোচ আর লজ্জাটা যেন বেড়ে গেল। এতক্ষণ ও জানত, একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলছে। যদিও মূলে ব্যাপারটা তা-ই। অসাধারণত্বের কোনো দাবি তো আমার নেই-ই। বরং ভয় পাই, লজ্জা বোধ করি সময়ে ধিক্কারও দিই। তৃপ্তি বলল, 'ছোট নাগরায় এসেছেন, নাগরা দেখেছেন ?'

'সেটা কী ?'

তৃপ্তি সামনের জঙ্গলের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'আসুন, আপনাকে দেখাই।'

বলে ও জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল। বেশ ঘন আর ঝাড়ালো বন। গাছগুলোকে চিনতে পারছি না, কিন্তু ছোট ছোট অজস্র ফল ফলেছে। গাছগুলো খুব উঁচুও না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কী গাছ ?'

'বুনো জাম বলতে পারেন। কেউ বিশেষ খায় না। তবে খেয়ে দেখেছি, অবিকল জামের মতোই। স্বাদে, রঙেও।'

বললাম, 'বিষ-টিষ না তো ?'

তৃপ্তি তখন উঁচুতে উঠছে। বলল, 'তা হলে তো খেয়ে মরেই যেতাম। সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত।'

হাসতে হাসতে বলল। মনে হল, হাসির অন্তরালে, একটা বিষণ্ণ সুরও বাজছে। সত্যিকারের জ্বালা না থাকলে, এমন করে বোধহয় কেউ বলতে পারে না। ও আবার বলল, 'বিষফল কী আছে এ জঙ্গলে জানি না। তবে একরকম পোকা আছে, আমি কখনো দেখিনি, কামড়ালে সারা শরীর ফুলে যায়, তাতে অনেক লোক মরেও যায়। নিজের চোখেই মরতে দেখেছি।'

রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'বলেন কী! ভয় পেয়ে যাচ্ছি যে!'

তৃপ্তি হেসে উঠে বলল, 'আপনি বুঝি ভেবেছেন, জঙ্গলে গাছ আর ফুলই আছে ?'

'তা ভাবিনি। কিন্তু এমন মানুষ-মারা পোকার কথা কখনো শুনিনি।'

'জীবন-মরণের খেলা তো সবখানেই আছে।'

তৃপ্তি বলল, খুব সাধারণভাবে। আমার কানে বাজল অসাধারণ রূপে।

এবার চালুতে নামতে নামতে তৃপ্তি বলল, 'সাবধানে নামবেন।'

পাথর কাঁকরের উৎরাই নেমে গিয়ে, বন গভীর হয়ে উঠল। ঝিঁঝির ডাক কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়। বললাম, 'এমন জোর ঝিঁঝির ডাক কোথাও শুনিনি।'

তৃপ্তির পিছনটাই দেখতে পাচ্ছি। অস্বীকার করার উপায় নেই, বনে থেকে, ওর স্বাস্থ্যটিও যেন বনবালাদের মতো টলটলে, গতিটিও উচ্ছল। মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'এখানকার লোকেরা বলে, ঝিঁঝি ডাকে না কাঁদে।'

'কাঁদে?'

'হ্যাঁ। রায়তানা শব্দের মানে হল, কান্না।'

ঝিঁঝির ডাক যেন নতুন সুরে আমার কানে বেজে উঠল। এ কি সত্যি কান্না? নিরন্তর আর্ত কান্না! বনবাসীদের চিন্তা ধ্যান ধারণা বেশবাস, সবই অন্যরকম। আমাদের ঝিল্লিস্বর, তাদের কাছে কান্না। তবে, 'ঝিল্লিস্বর কাঁদায় রে নিশার গগন,' এমন পঙ্‌ক্তি যেন পড়েছি। আর বিজ্ঞান জানিয়েছে, পতঙ্গকুলের এ ডাকাডাকি কেবল প্রেম-কুহর। যেমন জোনাকির আলো কেবল মিলনের ইশারা, ডাহুক-ডাহুকির ডাক কেবল বিরহের কান্না।

'ওই দেখুন।'

তৃপ্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা একেবারে নিবিড় বনের ঠাণ্ডা ছায়ায়। সামনেই খানিকটা খোলা জায়গা, দূর্বাঘাসে ছাওয়া। সেখানে উপুড় করা রয়েছে দুটি লোহার, বিরাট নাকাড়া। একটি একটু ছোট, আর একটি তার চেয়ে অনেক বড়। গায়ে বড় বড় লোহার গজাল গাঁথা। ওপরের দিকটা দেখলেই বোঝা যায়, চিত করে বসানো যায়। আমি বললাম, 'এ তো নাকাড়ার মতো দেখাচ্ছে।'

তৃপ্তি বলল, 'তাই তো, নাকাড়া মানেই নাগরা, এখানকার লোকেরা বলে।'

'এর নিচে কি চামড়া আছে?'

'মনে হয় না। এখানকার লোকদের বিশ্বাস, উৎসবের সময়, আপনার থেকেই এ নাকাড়া বেজে ওঠে। কিন্তু দু-বছরের মধ্যে আমি কখনো শুনিনি।'

আমি সামনে এগোবার জন্য পা বাড়াতেই, তৃপ্তি আমার হাত ধরে ফেলল, 'এখান থেকেই দেখুন না, সামনে যাবার কী দরকার আছে।'

আমি থেমে গেলাম। তৃপ্তি একটু লজ্জা পেয়ে, আমার হাত ছেড়ে দিল। বলল, 'ভয় লাগে। ওরা বলে, একটা অজগর নাকি এই নাকাড়া দুটো পাহারা দেয়। সত্যি মিথ্যা জানি না, কিন্তু ভয় লাগে সত্যি।'

তৃপ্তির কথা শুনে ভয় যে আমারো না লাগছে, তা অস্বীকার করব না। আমার একটু স্পর্শ করে দেখতে ইচ্ছা করছিল। সে ইচ্ছা দমন করে বললাম, 'এ যদি ছোট নাগরা হয়, বড় নাগরা কোথায়?'

তৃপ্তি বলল, 'বড় নাগরা বলে কোনো জায়গা আছে বলে শুনিনি।'

তবে মাহাবুরু বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে বড় বড় পাথরের এবড়ো-খেবড়ো থাম এখনো দেখা যায়। সেখানে এরকম আরো কয়েকটি নাকাড়া আছে। মুণ্ডারা বলে, সেখানে নাকি ওদের রাজার বাড়ি ছিল।'

আমি যেন চোখের সামনে কল্পনায় দেখতে পেলাম, অমসৃণ পাথরের থামে মশালের আলো জ্বলছে। রাজবাড়িতে উৎসব হচ্ছে, বনের রাজার আরণ্যক উৎসব। এই রকম বড় বড় নাকাড়া বাজাচ্ছে, খালি-গা পেশিবহুল বলিষ্ঠ পুরুষ। যার গম্ভীর শব্দ পাহাড়ে জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তৃপ্তির গলা শুনতে পেলাম, 'কী ভাবছেন?'

চমকে উঠে শব্দ করলাম, 'অ্যাঁ?'

তৃপ্তি বলল, 'বিশেষ কিছু বোধহয় ভাবছিলেন, বাধা দিলাম।'

বললাম, 'না না, সেরকম কিছু না।'

কিন্তু এই কল্পনার পরেই, বনের গভীরে, আমার পাশে তৃপ্তিকে দেখেও যেন, আমার মন কোন্ এক দূর স্বপ্নের জগতে চলে যায়। সহসাই যেন একটি মুগ্ধতা আমার চোখে নেমে আসে। না না, জীবনের কোনো বাস্তবতাই ছকে বাঁধা হয় না। তা না হলে বিহার সরকারের ব্লক ডেভেলপমেণ্টের একটি নার্স, বনের গভীরে আমার পাশে দাঁড়িয়ে কেন? আমার সামনে কোন্ এক আদ্যিকালের লৌহ-নাকাড়া পড়ে আছে উপুড় হয়ে। লোকের বিশ্বাস, এক অজগর এই নাকাড়াদ্বয় পাহারা দেয়।

'যাবেন এখন?'

আবার সংবিৎ ফিরে পেয়ে, তৃপ্তির দিকে চেয়ে দেখি ওর ধুলামাখা স্নিগ্ধ মুখের ওপর যেন রক্তকুসুমের আভা পড়েছে। ওর দৃষ্টি নত। হয়তো আনমনে অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়েছিলাম। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, চলুন যাই।'

বন থেকে বেরিয়ে এসে, মাঠের পথ পেরিয়ে আবার আমরা কোয়েনার

উৎরাইতে এসে পড়লাম। বন ঘিরে এল দুদিক থেকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের বাড়ি কোথায় ?'

তৃপ্তি বলল, 'শুনেছি বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। আমার জন্ম দমদমে। আমার মা আর ভাইবোনেরা দমদমেই থাকে।'

তারপরে আর জিজ্ঞেস করার দরকার হয় না, ওর বাবা কোথায়। বোঝাই যায়, পিতৃহীনা। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি সকলের থেকে বড় ?'

'না, এক দিদি আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

আর তৃপ্তি এই গভীর জঙ্গল থেকে, দমদমের জীবনস্রোতকে বহমান রাখছে। মনটা ভার না হয়ে যায় না। দু'জনেই হাতে স্যাণ্ডেল নিয়ে, কোয়েনা পার হয়ে যাই। তৃপ্তি জিজ্ঞেস করল, 'এখানে ক'দিন থাকবেন ?'

'বোধহয় দু-দিন। তারপরে এদেলবায়, মোহনবাবুর কাছে।'

তৃপ্তি বলল, 'সেখানে আপনার বেশি ভালো লাগবে। সেখানে এই রকম নদীর ধারে, পাতার ঘরে থাকবেন। অনেক ময়ূর দেখতে পাবেন। সম্বরও চোখে পড়তে পারে।'

'আপনি সেখানে গেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

চলতে চলতে তৃপ্তি দাঁড়াল। সামনে একটি মাটির বাড়ি, অনেকটা সিংজীর বাড়ির মতোই। মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে ছোট ছোট দুটি ঘর দেখা যায়। দু-তিনটি গাছ বাড়িটাকে ঘিরে আছে। তৃপ্তি বলল, 'এ বাড়িতে আমি থাকি। আসুন না, পাঁচ মিনিট বসে যাবেন।'

আপত্তির কোনো কারণ দেখি না। এই দূর বনের গভীরে, তৃপ্তি ভৌমিক নামে এক তরুণী সেবিকার গৃহস্থালি দেখতে কেমন একটা কৌতূহল হচ্ছে। বললাম, 'আপনার অসুবিধা না হলে যাব।'

তৃপ্তি বলল, 'আমার সৌভাগ্য।'

বলে একরকম ছুটেই বাড়ির মধ্যে ঢুকল। ডাকলো, 'কয়ো, এই কয়ো।'

কয়ো। আর একটি নতুন নাম শোনা হল। আমি দরজা দিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকলাম। ঝকঝকে বটেই, কিছু শুকনো পাতা এখানে ওখানে ছড়ানো। একপাশে লাউমাচা, এবং এই ফাল্গুনেও কয়েকটি কচি লাউ ঝুলছে। তৃপ্তি ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। ব্যাগটা ঘরে রেখে এসে বলল, 'বাইরে বসবেন, না ঘরে ?'

বললাম, 'বাইরেই বসি।'

তৃপ্তি বলল, 'কয়ো, খাটিয়া বের করে দে।'

বাংলাতেই বলল। কয়ো নামে চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে খাটিয়া এনে পেতে দিল। গ্রাম্য বাংলায় যেমন ছেউটি মেয়ে বলে, কয়ো অনেকটা সেইরকম। মেয়েটির চোখ-মুখও বেশ ধারালো। আমার দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইল। তৃপ্তি বলল, 'একটু চা খান।'

বললাম, 'থাক্ না, আপনি এত ঘুরে-টুরে এলেন।'

'আমি চা করব না, কয়ো করবে। ও করতে পারে।'

বলে কয়োর দিকে চেয়ে বলল, 'কী রে। তুই যে হাঁ করে বাবুকেই দেখছিস। একটু চা কর।'

কয়ো হঠাৎ লজ্জা পেয়ে দৌড়ে চলে গেল। আমি খাটিয়ায় বসে বললাম, 'আপনি বসুন।'

তৃপ্তি খাটিয়ার এক পাশে বসল। ও আমাকে বনের কথাই বেশি শোনাল। বুরু মানে পাহাড়, শারজং মানে শালগাছ। আরো অনেক কথার মানে বলে দিল। গাছ, ফল, পাখি, পশু এবং বনবাসীদের আরাধ্য বোঙাদের কথা। এদের নাকি দেবতা দেবী বলে কিছু নেই, সবই অপদেবতা, অপদেবী। তাদেরই পূজা দিয়ে ওরা সন্তুষ্ট করে। সবই বোঙা। অনেক রকমের বোঙা আছে। বিবিধ কারণে তাদের পূজা দিতে হয়। ঘা-পাঁচড়া এখানে সংক্রামক ব্যাধি রূপে দেখা যায়। তখন এক বোঙার পূজা হয়। গাছ কাটার সময় আর এক বোঙা। বিয়ের সময় ভিন্নতর। কেবল সাতবহিনী নামে পরীরা আছে, তারাও অবিশ্যি অপদেবী। তাদের কাজ হচ্ছে, যুবক যুবতীদের মাথা খারাপ করে দেওয়া। তখন তারা হাসে কাঁদে। তাদের ভুলিয়ে নিয়ে বনের মধ্যে নিয়ে যায়। তারপর মেরে ফেলে।

আমি তৃপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইলাম, সে এসব বিশ্বাস করে কী না। জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি নাকি?'

তৃপ্তি একটু হেসে বলল, 'আসলে ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়লেই এসব হয়। মেয়েদেরই সাতবহিনী বেশি ধরে। এমনিতেই কেউ বেশি হাসলে, বিশেষ করে হাঁড়িয়া খেয়ে যখন মাতাল হয়ে হাসে, ওরা ঠাট্টা করে বলে, মেয়েটাকে সাতবহিনীতে পেয়েছে।'

রসিকতার মধ্যে সরল সৌন্দর্য আছে। কথা বলতে বলতে আমাদের চা পান হয়ে গেল। দূরের দাওয়া থেকে কয়ো হঠাৎ তার নিজের ভাষায় কী যেন বলে উঠল। তৃপ্তির মুখে কুসুমের ছটা লেগে গেল, ঝংকার দিয়ে বলল, 'দুর মুখপুড়ি।'

কয়ো আবার দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তৃপ্তির দিকে তাকালাম। তৃপ্তি নতমুখে, নিঃশব্দে হাসছে। মুখখানি লাজে লাজানো।

তৃপ্তি বলল, 'আসলে ওরা ভারি সরল, সরলভাবেই ঠাট্টাও করে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলল মেয়েটি?'

তৃপ্তি আরো লজ্জা পেল। ঠোঁট কাঁপল। তবু হঠাৎ কথা ফুটল না। অসুবিধা আছে বুঝে আমি অন্য দিকে তাকালাম। তৃপ্তি বলল, 'কয়ো আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তোমার বর ধরে নিয়ে এলে? ওকে মুখপুড়ি বলব না তো কী বলব বলুন তো?'

আমি হেসে বললাম, 'সত্যিই তো।'

আমার বলার ধরনেই বোধহয় তৃপ্তি শব্দ করে হেসে উঠল। কিন্তু ক্ষ্যাপা বাউলের মতো ভাবি, মন আছে, তোর মনের ভিতরে। সেই ভিতরের মনটা যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। দমদমে যার বিধবা মা ভাই বোনেরা রয়েছে, যাদের জন্য তৃপ্তি এই দূর জঙ্গলের নির্বাসনে পড়ে আছে, সেখানে বর ধরবে ও? সে সময় কোথায়, মন, কোথায়? তবে সেই যে কথা, 'মন আছে তোর মনের ভিতরে, তারে ছাখ্ না নেড়ে চেড়ে।' বর ধরে আনা তো আর সত্যি একটা যুবা পুরুষকে ধরে আনা না। তৃপ্তির এই যে কালো আয়ত চোখ, হঠাৎ একদিন কারোকে দেখে এই চোখে হয়তো রঙ ধরে যাবে। যে রঙ চুঁইয়ে মনে ঢুকবে। সে মনটা তার নিশ্চয়ই আছে। আপাতত তথাপি, কয়োকে আমিও মনে মনে বলি, 'দূর হ মুখপুড়ি।'

তৃপ্তি জিজ্ঞেস করল, 'ছোট নাগরায় কোথায় বেড়াবেন?'

বললাম, 'কিছুই তো জানি না। কোথায় আর যাব। বনে বনে একটু ঘুরে বেড়াব।'

'দেখবেন মারাংহোরোর পাল্লায় পড়বেন না।'

'সেটা আবার কী?'

'এখানকার লোকেরা হাতিকে মারাংহোরো বলে।'

দেখছি, আমার আর একটি তিপু জুটেছে। তিপুর ভাল নামটা কী? তৃপ্তি না তো? বললাম, 'আপনি এদের অনেক কথা শিখে গেছেন দেখছি।'

তৃপ্তি মুখ নিচু করে বলল, 'বলতেও পারি। ওরাও অনেক বাংলা কথা বোঝে। কয়ো তো বেশ ভালই বলতে পারে, বুঝতে পারে। সব থেকে সুন্দর হল ওদের গান।'

আমি ওকে সুরসতিয়ায় গানের কথা বললাম। তৃপ্তি বলল, 'সেটাও

অনেকে পারে। গান ওদের কথায় কথায়। কাজের সময়ও গান করে। উকুন বাছতে বসেও গান করে।'

কথাটা শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। তৃপ্তি বলল, 'তবে মেয়েমদ্দ, সবাই বড় হাঁড়িয়া খায়। খাবেই। আগে হাঁড়িয়া তারপরে ভাত। চাল যদি কম থাকে, তবে আর ভাত রাঁধবে না। হাঁড়িয়া বানিয়ে ফেলবে, তাই খেয়ে থাকবে। তবে হাঁড়িয়া খেলে পেটও ভরে, নেশাও হয়।'

একটু ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কখনো খেয়েছেন নাকি?'

তৃপ্তি অনায়াসেই বলল, 'খেয়েছি, তবে এমন বিচ্ছিরি গন্ধ আর স্বাদ, এক চুমুকের বেশি খেতে পারিনি। মাঘে পরবের সময় ওরা জোর করে খাওয়াতে চায়। মাঘে পরবের সময় ওরা একেবারে ক্ষেপে যায়। তখন ওরা কিছুই মানে না। যার যা প্রাণ চায়, সে তাই করে।'

'সেটা কী রকম?'

তৃপ্তির মুখে আবার কুসুমের ছটা লেগে যায়। মুখ নিচু করে। পায়ের আঙুল দিয়ে, মাটি ঘষতে ঘষতে বলল, 'এই আর কি, খুব হাঁড়িয়া খায়, মাদল বাঁশি বাজিয়ে নাচে, গান করে। আর যাকে যার প্রাণ চায়, তাকেই টেনে নিয়ে চলে যায়। তখন ওদের লজ্জা-শরম বলেও কিছু থাকে না। গায়ের কাপড়-চোপড় থাকে না। যেখানে-সেখানে—'

তৃপ্তি থেমে গেল। অনেকটা বলে ফেলেছে। আর বলবার দরকার হয় না। তৃপ্তি বলল, 'তবে ওই একটা দিনের জন্যই। সেদিন আমি ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকি।'

কারণ তৃপ্তি কার সঙ্গে মাঘে পরব করবে? কিন্তু দরজা-বন্ধ ঘরে, সেই অরণ্যক গণমিলন উৎসব কি ওর রক্তেও ঢেউ তোলে না? সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। দেখলাম তৃপ্তির দৃষ্টিতে অন্যমনস্কতা।

ওর এই অন্যমনস্কতা ভাঙতে ইচ্ছা করল না। হঠাৎ এক ঝলক বাতাস এল। চারদিক থেকে শুকনো পাতা উড়ে এল। আমাদের গায়ের কাছেও এসে পড়ল। তৃপ্তি যেন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, 'আপনাকে পেয়ে অনেক কথা বলে ফেললাম।'

বললাম, 'আমার শুনতে খুব ভাল লাগল।'

'আসলে কী জানেন, কারোকে তো পাই না। বাঙালীরা যারা আসে, কেউ থাকতে আসে না, বসতে আসে না, কাজের জন্য আসে, কাজ মিটলেই চলে যায়। তার মধ্যেই হয়তো দু-একটা কথা হয়। যাবার পথে কেউ হয়তো

লরি দাঁড় করিয়ে দুটো কথা বলে যায়। হঠাৎ কোনো জিনিসের দরকার পড়লে, কেউ হয়তো এনেও দেয়। তা ছাড়া আমার কথা বলবার কেউ নেই।'

নিষ্ঠুরতা বলে মনে হচ্ছে। মন চল যাই বন-ভ্রমণে, মনে মনে বলি, এমনি করে বনের হাতছানিতে আসতে ভাল লাগে। কিন্তু দিনের পর দিন, অসীম সময় পার হয়ে যায়, এমন নির্বাসনের কথা ভাবতে পারি না। তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে, চোখ ফেরাতে ভুলে যাই। ও একটু লাজুক হেসে মুখ নামিয়ে নেয়। এমন সময় দেখি, দরজার সামনে রতন এসে উপস্থিত। সে আমাকে দেখে হিন্দীতে বলল, 'খবর পেলাম আপনি নার্সদিদির ঘরে এসেছেন। আমি তো দেরি দেখে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখলাম, প্রায় পৌনে একটা বাজে। তৃপ্তি হিন্দীতে বলল, 'রতন, তোমার বাবুজীকে আমি রেখে দিচ্ছি, সিংজী সাহেবকে বলে দিও।'

রতন হেসে বলল, 'তা রাখুন না নার্সদিদি, কিন্তু আমি যে ওঁর খানা পাকিয়ে ফেলেছি।'

'কী পাকালে?'

'ডাল ভাজি মুরগীর মাংস আর ভাত।'

'বড়লোকের ব্যাপার। আমি ডাল ভাত ছাড়া কিছুই খাওয়াতে পারব না। তাহলে নিয়েই-যাও।'

বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি বললাম, 'ডাল-ভাতে আমার বড়ই রুচি।'

বলে উঠে দাঁড়ালাম। তৃপ্তিও উঠল, বলল, 'সত্যি? তাহলে কাল দুপুরে আমার এখানে খাবেন। খাবেন তো?'

বললাম, 'যেচেই তো নিমন্ত্রণটা নিলাম।'

তৃপ্তি বলল, 'ইস্! কিন্তু আমার কি সৌভাগ্য! মাকে চিঠিতে লিখে জানাব।'

বনে আর একটি পাগল মেয়ে জুটল। বিদায় নিয়ে রতনের সঙ্গে ফিরে গেলাম। দুপুরের খাবার পাট মেটবার একটু পরেই সিংজী এলেন জীপে চেপে। সঙ্গে রেঞ্জার বদরিকাপ্রসাদ। মনে হল দু'জনেই পান করেছেন। চোখ আরক্ত। বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সিংজী বললেন, 'আগামী কালটা নাগরায় থেকে একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখুন। পরশু সকালে, বদরিকা সাহেব আপনাকে নিয়ে এদেলবায় মোহনবাবুর কাছে পৌঁছে দেবেন। সেখানে

দু-একদিন থাকবেন। তারপরে থলকোবাদের ফরেস্ট বাংলোয় আপনার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখান থেকে কদলিবাদ, গুয়া, ঘাটঘুড়ি আর করমপোদা যাবেন। বাংলোর ব্যবস্থা বদরিকাপ্রসাদই করবেন। আমি এখন চলে যাচ্ছি রাউরকেলা, সেখান থেকে ট্রেনে যাব টাটা, আমার ছেলেকে দেখতে। আশা করি ফিরে এসে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। দু'জনে ঘণ্টা খানেক রইলেন। সিংজী রতনকে আমার বিষয়ে নানান নির্দেশ দিলেন এবং এক বোতল বিদেশী পানীয় রেখে গেলেন, বললেন, 'রাত্রে পান করবেন।'

ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

সিংজী বললেন, 'রেখে গেলাম। ইচ্ছা হলেই পান করবেন।'

বদরিকাপ্রসাদ লোকটিকেও ভাল লাগল। বয়স অল্প, বেশ হাসিখুশি লোক। গয়া জেলায় বাড়ি। ওঁরা বিদায় নেবার আধঘণ্টা পরে রতন বলল, 'চলুন ঘুরে ফিরে আসি।'

সে সময়ে তৃপ্তি এসে পড়ল। এখন ও একটা হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি পরে এসেছে। জামাটা লাল। মাথায় খোঁপা বেঁধেছে। আমাকে রতনের সঙ্গে বেরোবার উদ্যোগ করতে দেখে, জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে যাবে রতন?'

রতন বলল, 'এই এদিকে ওদিকে একটু যাব।'

তৃপ্তি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে আমার সঙ্গেই চলুন।'

আমি রতনের দিকে তাকালাম। সে বলল, 'তা যেতে পারেন, নার্সদিদি এখানকার সব জানেন।'

'এখানে জানার আর কি আছে? ওঁকে নিয়ে তারা মাচায় উঠব সেখান থেকে সব দেখব। চলুন।'

আমি তৃপ্তির সঙ্গে বেরোলাম। বেলা এখন সাড়ে তিন। ফাল্গুনের রোদে কোনো তেজ নেই, বাতাস উতলা। চারিদিকে কেবল পাতা ঝরে যাচ্ছে। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারা-মাচাটা কী?'

তৃপ্তি বলল, 'হাই ভিউ-ফাউণ্ডার বলতে পারেন। কাঠের তৈরি উঁচু মাচা, সেখান থেকে বহু দূরের বনজঙ্গল দেখা যায়।'

জঙ্গলের ধারে, খোলা জায়গায়, বেশ উঁচু তারা-মাচা। দু'জনে পাশাপাশি ওঠা যায়, তবু একটু সাবধানেই উঠতে হল। একেবারে উঁচুতে উঠে, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে মনে হল, পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন কোন এক দূর জগতে এসেছি। যেদিকে তাকাই, নানা বর্ণের সমারোহ। তার মধ্যে নীল আর শাদাই বেশি।

বনকে নীল দেখায়। সবুজেরও যে কত বর্ণবাহার, না দেখলে বোঝা যায় না। তা ছাড়া কুসুম তো আছেই। একদিকে তাকিয়ে মনে হল, সন্ত কাটা মাংসের মতো লাল পাহাড় অনেক দূরে। তার গা বেয়ে সারি সারি কী যেন চলেছে। জিজ্ঞেস করতে তৃপ্তি বলল, 'ওটা গুয়া রেঞ্জ, ওখানে আয়রণ ওরের খনি আছে, রোপওয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

তারা-মাচা থেকে নেমে, আমরা ছোট নাগরার গ্রামের অন্য প্রান্তে গেলাম। সেখানে মেয়ে পুরুষ সবাই তৃপ্তিকে চেনে। একটি মেয়ে ময়ূরের বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৃপ্তি নিজের কোলে নিয়ে ময়ূরের বাচ্চাটিকে আদর করল। করলে কী হবে, বাচ্চাটির বড় ভয়, নেমে যেতে চায়। আমিও একবার হাতে নেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

সেখান থেকে বনের গভীরে এসে, কোয়েনার ধারে চলে এলাম। সহসা একটি মদির গন্ধে নিশ্বাস ভরে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ফুলের গন্ধ?'

তৃপ্তি একটি গাছ দেখিয়ে বলল, 'তিলুয়া।'

ছোট ছোট ফুল, যেন কাগজের মতো পাতলা, তারার মতো পাপড়ি। রঙটা হলদে-শাদায় মেশানো। গাছে হাত বাড়িয়ে কয়েকটা ফুল নিলাম। তৃপ্তি আমার হাত থেকে দুটি ফুল নিয়ে, দুই কানে এমন ভাবে লাগিয়ে নিল, ঠিক যেন দুটি কানপাশা। বলল, 'এখানকার মেয়েরা পরে।'

মুহূর্তেই যেন তৃপ্তির রূপ বদলে গেল। বললাম, আপনাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।'

তৃপ্তির মুখে লজ্জার ছটা লেগে গেল। মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি আবার সুন্দর নাকি?'

বললাম, 'আমি যে তাই দেখছি।'

তৃপ্তি আমার চোখের দিকে, একবার ওর আয়ত চোখ মেলে তাকাল। তারপর যেন একটু ছায়া ঘনাল মুখে, আবার ছায়া অপসারিত হল। হেসে মুখ ফেরাতেই, হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে একদিকে আঙুল দেখাল। দেখলাম, একটি নীল রঙ গাভী কোয়েনার ওপার থেকে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। পঞ্চাশ হাত দূরেও না। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। চকিতে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিড়িয়াখানার বাইরে, বনের মধ্যে এই প্রথম আমার পশু দর্শন। মনে হল যেন ময়ূরের মতো চকচকে নীল তার রঙ।

তৃপ্তি বলল, 'জল খেতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।'

বললাম, 'বেচারির তৃষ্ণা মিটল না।'

তৃপ্তি বলল, 'এখানে মিটল না, দূরে কোথাও গিয়ে মেটাবে।'

বলে সহসাই যেন ওর খেয়াল হল, আমার হাত ছেড়ে দিল।

পরদিন দুপুরে কয়ো আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। যেতে যেতে বলল, 'দিদি আজ সকাল থেকে রান্না করেছে।'

গিয়ে দেখলাম, তৃপ্তির স্নান শেষে চুল খোলা, এমনি আঁচড়ে নিয়েছে। কপালে একটি লাল টিপ পরেছে, লালপাড় শাড়ির সঙ্গে বাসন্তী রঙের জামা গায়ে। আমাকে দেখে যেন কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল। ডাকল, 'আসুন।'

ওর পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলাম। খাটিয়ার বিছানা। একটি ছোট টেবিল, একটি চেয়ার, ছোট একটি আলনায় জামা-কাপড়। মাটির দেওয়ালে একটি আয়না ঝোলানো। পাশের কুলুঙ্গিতে সামান্য টুকিটাকি প্রসাধনের জিনিস। লাল মাটির মেঝে চকচক করছে। সব মিলিয়ে, তবু যেন কোথায় একটা অসামান্যতা ছড়িয়ে আছে। তৃপ্তি বলল, 'গরীবের ঘর।'

বললাম, 'কিন্তু মনটা যে ধনী, তা যেন ঘর দেখেই বোঝা যায়।'

তৃপ্তি হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে তো আমি কথায় পারব না।'

বললাম, 'কারণ আপনাদের কাছেই শিখি, গুরু-মারা বিদ্যা যে!'

তৃপ্তি হেসে উঠল। বলল, 'আমাকে 'তুমি' করে বলবেন।'

'চেষ্টা করব।'

তারপরে ও আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে, ঘটি থেকে হাত ধোবার জল ঢেলে দিল। ঘরের মেঝেয় আসন বিছিয়ে, কাঁসার গেলাসে জল গড়িয়ে দিল। পাশের ঘর থেকে, ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাত বেড়ে এনে দিল। পাতের পাশে পেঁয়াজ দিয়ে পোস্তবাটা। তারপরে দিল মোচার ঘণ্ট আর ডাল। বলল, 'কয়ো কোথা থেকে মোচা এনে দিয়েছে।'

তারপরে যখন মাগুর মাছের ঝোল দেখলাম, অবাক না হয়ে পারি না। তৃপ্তি বলল, 'কোয়েনার কোথাও কোথাও মাগুর বা ল্যাটা মাছ পাওয়া যায়। কয়োর দাদাকে বলে রেখেছিলাম। ও সেই অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে গিয়েছিল। পাঁচটা মাগুর মাছ পেয়েছে।'

খেতে গিয়ে তৃপ্তির দিক থেকে যেন মুখ ফেরাতে পারি না। সব শেষে দিল ঘন দুধ ভরা বাটি। খাবার পরে বলল, 'একটু বিশ্রাম করুন, আমি খেয়ে আসি।'

'এত খাওয়ালেন, তারপরে আর বিশ্রাম না করে উপায় কী?'

তৃপ্তি ওর বিছানাটাই একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে দিল। আমি চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলাম, ও বলে উঠল, 'না না একটু গড়ান, আমি আসছি। আর এর পরে কিন্তু 'আপনি' চলবে না।'

বলে বেরিয়ে গেল। আর এই গভীর বনের একটি ঘরে, গভীর তৃপ্তির মধ্যেও, মনটা কেন যেন ভারি হয়ে উঠছে। একটু পরেই খেয়ে এসে, তৃপ্তি বলল, 'কাল সকালে, আপনার সঙ্গে যদি আমি এদেলবায় যাই?'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'খুব ভালো লাগবে।'

'সত্যি?' তৃপ্তি আমার চোখের দিকে দেখল।

'তোমাকে মিথ্যা বলতে পারব না।'

সহসা একটি লজ্জা আর খুশির ঝলকে, ওর মুখ অপরূপ হয়ে উঠল। সম্ভবত সহসাই আমার 'তুমি' সম্বোধন ওর এই অভিব্যক্তির কারণ। কারণ, পরমুহূর্তেই, ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়েও, তাকাতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিয়ে, নিজের শাড়ির আঁচল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বুঝতে পারছি, কেবল লজ্জা না, একটা আবেগের ধাক্কাও বোধহয় ওকে সামলাতে হচ্ছে।

আমি উঠে বসে বললাম, 'বসো।'

তৃপ্তি চেয়ারে বসতে গেল। আমি খাটিয়ার বিছানার এক পাশে সরে গিয়ে বললাম, 'এখানেই বসো না।'

তৃপ্তি আমার মুখের দিকে এবার তাকালো। বলল, 'না, আমি চেয়ারে বসছি। আপনি শুয়ে শুয়ে কথা বলুন কিংবা, তার কী দরকার? আমি বরং বারান্দায় বাইরের খাটিয়ায় বসি। আপনি বিশ্রাম করুন।'

আমি ঠোঁট টিপে হেসে বললাম, 'তার মানে, তুমি একটি দিবানিদ্রা দেবার তাল করছ?'

তৃপ্তি যেন চমকে উঠে, অবাক স্বরে বলল, 'ওমা, না না, আমি মোটেই দিনের বেলা ঘুমোই না। কয়োকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

'কয়োকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। তা হলে তুমি ভেবেছ, আমার একটু দিবানিদ্রা দেওয়া দরকার, তাই না?'

তৃপ্তি কী জবাব দেবে, ভেবে না পেয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, 'কিন্তু দিনের বেলা ঘুমোবার অভ্যাস আমার নেই। তুমি বসো।'

তৃপ্তি এবার সহজভাবেই, খাটিয়ার এক পাশে বসল। বলল, 'তা হলে আপনি আর একটু আরাম করে বসুন।'

তা-ই করলাম। আমি পাশ ফিরে কনুইয়ে ভর দিয়ে, আধশোয়া হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ওর ঠোঁটে অর্থপূর্ণ হাসি, দৃষ্টি নত। কিছু না বলে, আমি ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে রইলাম। ও তাকালো আমার দিকে, আবার দৃষ্টি নত করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কী?'

তৃপ্তি মুখ না তুলেই বলল, 'আপনার সঙ্গে কেন এদেলবায় যেতে চাইলাম, জিজ্ঞেস করলেন না তো?'

'কোনো কারণের কথা আমার মনে আসেনি। ভাবলাম, তুমিও নিশ্চয়, বেড়াতেই যাবে।'

তৃপ্তি বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু আমি তো এদেলবায় আগেই গিয়েছি। এবার যাবো আপনার সঙ্গে। এদেলবার জঙ্গল আপনাকে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। মোহনবাবু ইজারাদার মানুষ, উনি গাছ কাটার জন্য কুলি রেজাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আমি বেড়াবো আপনাকে নিয়ে।'

বলে, তৃপ্তি যেন সম্মতি পাওয়ার জন্য জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালো। কতোটা যে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি, ওকে সে কথা বলতে পারছি না। কেবল বললাম, 'সত্যি। শুনে খুব ভালো লাগছে, ভাবতেও।'

আবার আগের মতোই খুশি আর লজ্জার ঝলক লেগে গেল তৃপ্তির মুখে।

সকাল আটটার সময় রেঞ্জার বদরিকাপ্রসাদ জীপ নিয়ে এলেন। আমিও প্রস্তুত। তাঁকে তৃপ্তির কথা বলতে দেখলাম, খুশিই হলেন। রতনকে বললেন, তৃপ্তিকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আসতে। কিন্তু তার দরকার হল না। তৃপ্তি নিজেই এল। কাঁধে ব্যাগ। সঙ্গে কয়ো, তার হাতেও একটা চামড়ার ব্যাগ ঝোলানো। এসে ম্লান হেসে বলল, 'যাওয়া হল না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

তৃপ্তি বলল, 'একটি মুণ্ডা বউয়ের ব্যথা উঠেছে। প্রসব হ'বে। দুদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে।'

আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। ওর চোখ দুটো হঠাৎ টলটলিয়ে উঠল। আমি কাছে গিয়ে ডাকলাম, 'তৃপ্তি।'

তৃপ্তি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, 'মাত্র তো একটা দিন, তবু কেমন যেন

হয়ে গেল। তবে, আপনি এদেলবায় থাকবেন, সন্তান প্রসব করিয়ে, আমি কারোর কোনো লরিতে চলে যাব।'

বললাম, 'তখনো যদি কারোর প্রসব-যন্ত্রণা ওঠে ?'

তৃপ্তি জবাব দিতে পারল না। সংসারের নিরন্তর প্রসব-যন্ত্রণা, তৃপ্তি কি তা শেষ করে কোনো দিন আসতে পারবে। বললাম, 'চলি। তুমি এসো।'

ও নিচু হয়ে হঠাৎ প্রণাম করল। আমি তাড়াতাড়ি ওর দুটি হাত চেপে ধরলাম। ওর চোখ আবার ভিজে উঠেছে। ডাকলাম, 'তৃপ্তি !'

তৃপ্তি সরে গিয়ে বলল, 'গাড়িতে উঠুন।'

উঠতেই হবে। বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে জীপে উঠলাম। এঞ্জিন গর্জে উঠল।

তৃপ্তি রক্তকুসুমের রক্তাভায় দাঁড়িয়ে। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। ওকে আর দেখতে পেলাম না। জীপ বাঁক নিয়ে, গভীর বনের চড়াইতে উঠতে লাগল।

ফরেস্ট রেঞ্জার বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে চলেছি। যাত্রা এদেলবা। জীপ গাড়ি গভীর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে, পাহাড়ের ওপর উঠছে। বদরিকাপ্রসাদ ইংরেজিতে বললেন, 'এখানকার সব জায়গার নাম, মুণ্ডা বা ওরাওঁ ভাষার। প্রত্যেকটা নামেরই একটা মানে আছে। আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি, সে জায়গার নাম এদেলবা। মুণ্ডা ভাষায়, এদেল মানে শিমুল, আর বা মানে ফুল— অর্থাৎ শিমুলফুল। তার মানে, সেখানে জঙ্গলের মধ্যে, মুণ্ডাদের একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামের নাম 'শিমুলফুল।'

শোনা মাত্র মনে হলো, আমার শ্রবণের ভিতর দিয়ে, অনুভূতির মধ্যে, একটি স্বপ্ন ছুঁইয়ে চারিয়ে গেল। গ্রামের নাম কী? না, শিমুলফুল। বাঙলার অনেক গ্রামের অনেক জায়গার, অনেক মিষ্টি নাম শুনেছি। যেমন গ্রামের নাম সন্ধ্যা। হুগলি জেলারই কোন্ এক গ্রামের নাম যেন। নদীর নাম কুন্তী। সেও হুগলি জেলারই এক নিরালার ক্ষীণ স্রোতস্বিনী। তার পারাপারের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে, পড়ন্ত বেলার সেই সূর্যালোকে কথা মনে পড়ে যায়। কুন্তীর দু'পাশের চড়ায় রবিশস্যের গায়ে বেলা শেষের ম্লানিমা। হয় তো এমন মিষ্টি বাঙলার অনেক জায়গায় অনেক আছে। যেমন মনে পড়ে যাচ্ছে, কোচবিহারের একটি গ্রামের নাম, যেখানে একদা গিয়েছিলাম। গ্রামের নাম চ্যাংড়াবান্ধা। হঠাৎ শুনলে, নামের অর্থ করা দায় হয়ে ওঠে। যে দেশের যেমন কথা। সেখানে চ্যাংড়া মানে, যুবক—যুবা পুরুষ। যেখানে যুবক বাঁধা থাকে, তার নাম চ্যাংড়া-বান্ধা কিন্তু কেন বাঁধা থাকে? যুবকরা যে কারণে বাঁধা পড়ে। নিশ্চয়ই বিপরীত কিছু আছে। যুবক বাঁধা পড়ে যুবতীর কাছে। সেইজন্য সেই দেশে গান আছে :

চ্যাংড়াবান্ধার রেশমী চুড়ি
পাইসা পাইসা দাম।
তাহার মধ্যে লিখা আছে
চ্যাংড়া বন্ধুর নাম॥

চ্যাংড়া বন্ধু মানে, যুবক বন্ধু, যে গায়, সে নিশ্চয়ই যুবতী, কারণ তার চুড়ির গায়ে, চ্যাংড়া বন্ধুর নাম লেখা আছে। মিষ্টি নামের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে, স্মৃতির ভাণ্ড হাতড়াতে গেলে, ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাবে। তেমন মিষ্টি নামের সংখ্যা বিস্তর। কিন্তু ভারতের এই নিবিড় গভীর অরণ্যের একটি গ্রামের নাম শিমুলফুল, শুনেই হঠাৎ মনের মধ্যে, বিস্ময় খুশি ঝলকের সঙ্গে, রঙ চলকে ওঠে। প্রাণে বেজে ওঠে দুটি কলি, শিমুল পাগল হইয়া মাতে। অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে? সেই গ্রামখানি কি লালে লাল? শিমুলের রক্তচ্ছটায়, রক্ত চোঁয়ায় কি সেখানকার বনে বনে, মৃত্তিকায়, পাহাড়ী ঝর্ণায়, মানুষের মনে?

যাই, দেখি। ঘর ছাড়া প্রাণ এখন আমার অরণ্যের ডাকে পাগল। বনের ডাকে বাজে। তার ডাক শুনেছি অনেকদিন, দেখেছি হাতছানিও। বলতে পারো, সেই গানের মতো, 'আমার মন পাগল হইল রে, গৌরাঙ্গ রূপ দেখে।' কিন্তু যাই কেমন করে। তার আগে যে সেই গানখানি আছে, 'যাই যাই মনে করি/যাইতে না পারি/মহামায়া আমার পিছনে ধায়।'...

আমি বিবাগী বৈরাগী বাউল না, তবু কোন্ বাউলের একতারা সদাই বাজে আমার শ্রবণে। সুরে বাজে; 'মন চলো যাই ভ্রমণে। কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।'...

তথাপি, মহামায়া কি আর এমনি বলেছে। সে ঘরছাড়ার ডাক বোঝে না। সে মুক্তাঙ্গনের অনুরাগ বোঝে না। দশের সঙ্গে এক আমি, দশজনের সঙ্গে ঘর। ডাক শুনে পাগল হয়ে ছুটলেই হলো? সব খেলায়ই দান দিতে হয়। দান দিয়ে যাবে না? ছক পেতে বসেছ, খেলা সাঙ্গ করো। দান শেষ করে, ঘর ছাড়ার খেলা খেলতে যাও।

ঘর ছাড়ার কি কোন খেলা আছে? আছে বোধহয়। নানা রূপের নানা খেলা, নানান সময়ে। শিশু যে খেলা খেলতে ভালোবাসে, খেলার ডাক শুনলে সে ছোটে। বন আমাকে খেলতে ডেকেছে, তাই আমি বনে ছুটে এসেছি। আমি তাপস নই, তপশ্চর্যা করতে আসিনি। আমার জ্ঞান নেই, তবে আমার কিসের ধ্যান? না, আমার কোনো ধ্যান নেই যে, গভীর বনের মহীরুহের তলে ধ্যানে বসবো। আমার একটা ধ্যান আছে, খেলা। অরণ্য আমাকে খেলতে ডেকেছে, তার নিবিড় গভীর রূপসাগরে। এ খেলার নিয়মকানুন, সব আমার জানা নেই। খেলতে খেলতে জানবো। জানতে জানতে খেলবো। সে আমাকে যেমন করে খেলা দেবে, আমি তেমনি করে খেলবো। খেলতে খেলতে

আঘাত যদি লাগে, চোখের কূল ছাপিয়ে আসে জল, খেলার কানুন মেনে চলবো।

সেই খেলা খেলতে এসেছি, তার আগে, ঘরের খেলার দান দিয়ে আসতে হয়েছে। এখন বনের খেলা।

বনের নাম সারেণ্ডা খণ্ড।

ধলভূমগড় পেরিয়ে এসে, ছোটনাগপুরের সীমানায়। প্রথম এসে যে ইস্টিশনে নেমেছিলাম, তার নাম জরাইকেলা। ভৌগোলিক সীমারেখা যদি টানতে চাও, ইস্টিশনের অর্ধেক বিহারে, অর্ধেক উড়িষ্যায়। ইস্টিশনের গায়ে কোনো দাগ কাটা নেই। তবে দলিল দস্তাবেজে এই রকম লেখা আছে।

জরাইকেলায় পৌঁছুবার অনেক আগেই, সেই মনোহরপুরেরও আগে থেকেই বনকে পেয়েছিলাম, যে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। তখনই আমার মনোহরণ, তারপরে পুরোপুরি নয়নহরণ তখন হয়েছিল, যখন হাঁসুয়া বাঁকের ঝলক দেখেছিলাম, সোনালি বালুচরের মধ্যে, যার বুকে জড়াজড়ি করা বিশাল কালো পাথরের চাংড়া। যেন স্রোতের বুকে গজেন্দ্রগণ শুঁড়ে শুঁড় জড়িয়ে জলকেলি করছে। মনোহরণ নয়নহরণ কেবল না, বাক্যহরণও হয়েছিল। গাঙ্গুলিমশাই বলেছিলেন, 'নদীর নাম কোয়েল।'

নদীর নাম কোয়েল! তখনো গ্রামের নাম শিমূলফুল শুনিনি, নদীর নাম শুনেই শ্রবণ ভরে উঠেছিল। রূপের তো কথাই নেই। চলন্ত গাড়ি থেকে, অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে, সোনার কূলে রূপোর নদীর হাঁসুয়া গতি দেখেই মনে হয়েছিল, লাখো লাখো যুগ হিয়াতে রাখলেও, রূপমুগ্ধ হিয়া জুড়াবে না। রেলগাড়ি থেকে তার কলকল ধ্বনি শুনতে পাইনি, নাম শুনেই মূর্ছা! কোয়েল! তার মানে কি, কোকিল নাকি? তার কলধ্বনিতে কি সেই বিহঙ্গটির ডাক বাজে? গাঙ্গুলিমশাই বলেছিলেন, 'জরাইকেলায় গিয়ে, কোয়েলের ধারে যেতে পারবেন।'

যেতে পেরেছিলাম, কিন্তু তার আগে গাঙ্গুলিমশাইয়ের পরিচয়টিও একটু বলে নিই। মহাশয় আমার সহযাত্রী হয়েছিলেন, ইস্পাতগড় টাটানগর থেকে। সঙ্গে প্রৌঢ়া গিন্নী, যাঁর মাথায় অনেকখানি ঘোমটা। হাতের কাছে পান সাজবার সরঞ্জাম, আর পানের গোছা। একটু পরে পরেই, ছোট ছোট খিলি সেজে, একটি স্বামীর দিকে, আর একটি ঘোমটা টেনে নিজের মুখে। সঙ্গে কিশোরী কন্যা তিপু। স্বর্ণলতার মতো চিকন নরম আর রোদের ঝিলিকে

ঝলকানো যেন। মাথায় ছিল বাসী বিনুনি। পোষাকের মধ্যে সামান্য ডুরে শাড়ি। ডাগর চোখের কালো তারায়, হাসির ঝিলিক।

মহাশয় যে পরিচয়ে গাঙ্গুলিমশাই বা মেয়ের নাম তিপু, তা আমার জানবার কথা না। জানালেন উনি নিজেই, কারণ আর কিছু না, ম্যাচ্‌বাত্তি—অর্থাৎ দেশলাই। তাঁর বিড়ি বারে বারেই নিভে যাচ্ছিল। নিজের দেশলাইয়ের কাঠিও খতম, অতএব, দেশলাইয়ের খোঁজ করতে গিয়েই, দু'এক কথার পরে জানা গিয়েছিল, তাঁর নাম। তাঁরও গন্তব্য ছিল জরাইকেলা। সেখানে কোয়েলের কাছাকাছিই তাঁর একটি কুটির আছে। ইস্পাতগড় টাটানগরে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাস। চাকরি-বাকরি না, ছোটোখাটো ব্যবসা আছে। মুদী দোকান, জ্বালানি কাঠের একটা গোলা। তাতেই কোনো রকমে দিন গুজরান হয়ে যায়। জরাইকেলায় বাসের কারণ, গাঙ্গুলিমশাই এক সময়ে নাকি বনের ইজারাদার ছিলেন, সে সময়ে জরাইকেলায় একটি বাসস্থান করেছিলেন। কিছুদিনের জন্য সেখানে থাকতে যাচ্ছেন।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটিকে দেখলে মনে হবে, তাঁর মতো বিরক্ত অসন্তুষ্ট আর কেউ নেই। তার কারণও ছিল। টাটানগরের কোথাও নাগাই নামে একজন বিড়ি প্রস্তুতকারক আছে, যার বিড়ি দিয়ে তিনি ধূমপান করে থাকেন। সেই নাগাই তাঁকে ঠকিয়েছে, বিড়িতে তামাকের অভাব, এবং ভাল করে নাকি স্যাঁকা হয়নি। তার ওপরে ম্যাচ্‌বাত্তি—অর্থাৎ দেশলাই। তামাকের অভাবে বিড়ি বারে বারে নিভে যাচ্ছিল, ফলে বারে বারে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে হচ্ছিল, কিন্তু গণ্ডা গণ্ডা কাঠি জ্বলেই নিভে যাচ্ছিল, তাহলে তিনি বলবেন না কেন, 'শালাগোর ব্যবসা দেখিছেন, অ্যাঁ? এই করেই বাঙালীর ব্যবসা ডোবে। এত ফাঁকি দিলে হয়?'

বাতাসের কথা তাঁর খেয়াল ছিল না, ধরাবার কায়দাটিও তাঁর নিজস্ব, তার ওপরে বারে বারে নিভে যাওয়া বিড়ি যে কখন ঘুনসিতে এসে ঠেকেছিল, এবং ধরবার কোনো উপায় ছিল না। অতএব দোষ তো বিড়ি আর দেশলাইয়েরই। নাগাই বিড়ি প্রস্তুতকারক একটি জুয়াচোর, দেশলাই কোম্পানিগুলোও তাই। কিন্তু দেশলাই কোম্পানি যে বাঙালীর, তা উনি জানলেন কেমন করে? কেমন করে আবার? বাঙালী কোম্পানির না হলে, ওরকম বারে বারে নিভে যায়?

জবাব শুনে আমি আর কথা বাড়াতে চাইনি, কিন্তু লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল কন্যা। তিপু যখন দেখছিল, আমার দেশলাইটি ওর বাবা ধ্বংস করে চলেছেন, আর ম্যাচ্‌ কোম্পানিকে গালাগালি দিয়ে চলেছেন, তখন প্রৌঢ়-পুত্রটিকে

কিশোরী-মাতা ধমক না দিয়ে পারেনি ! 'বাবার যা কাণ্ড ! সেই তখন থেকে দেখতে পাচ্ছি, ঘুন্‌সি পোড়ানো বিড়িটা ধরাবার জন্য, দশ গণ্ডা কাঠি পুড়িয়ে নষ্ট করলে।'

মহাশয়ের তখন কিছু কিঞ্চিৎ ধ্যান হয়েছিল, পোড়া বিড়িটা চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে, গিন্নীর দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'একটা পান দাও গো।'

বিড়ি আর পান। গিন্নী পানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলছিলেন। ইতিমধ্যে তিপুর সঙ্গে আমার খোলাখুলি কথাবার্তা না হলেও, বাবার বিড়ি দেশলাইয়ের পর্বে, দৃষ্টি আর হাসি বিনিময় হচ্ছিল। আসল মজাটা আমরাই ভোগ করছিলাম। তার সঙ্গে ছিল, অরণ্যের রঙবাহার। অরণ্যের কথা অনেক শুনেছিলাম, ছবিতে তার অনেক রঙ দেখেছিলাম, বাস্তবে অরণ্যের এমন বর্ণসমারোহ যে দেখতে পাবো, ভাবিনি। মনে হয়েছিল, আমার চোখে যেন একটি বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র লাগানো রয়েছে। সে যেন আপনি আপনি ঘুরে যাচ্ছিল, আর অরণ্যের নানা বর্ণ, নানারূপে সেজে উঠছিল।

তার মধ্যেই গাঙ্গুলিমশাইয়ের পরিচয় আস্তে আস্তে পরিস্ফুট হচ্ছিল। তাঁর আদি বাড়ি ছিল যশোরে। সেটা তাঁর কথার টানে আর উচ্চারণেই জানা যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি আমার মনোহরণ করেছিলেন, একটি কথায়, 'বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়—নাম শুনেছেন তো, সেই যে বই লিখতেন, তিনি আমার জরাইকেলার বাড়িতে দুই রাত বাস করেছিলেন।'

কথা শুনে, গাঙ্গুলিমশাইয়ের দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারিনি। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়! তাঁর বাড়িতে! উনি যে তীর্থক্ষেত্রের মন্দিররক্ষক পূজারী, তা কে জানতো? যিনি বিড়ি দেশলাই নিয়ে তিতিবিরক্ত, গিন্নীর কাছ থেকে কেবল পান চেয়ে চেয়ে খাচ্ছিলেন, তিনি যে বিভূতি বন্দোপাধ্যায়ের আতিথেয়তা করেছেন, কথাটা ভাবতে সময় লেগেছিল। তখন তাঁর গোটা পরিবারই আমার কাছে তীর্থক্ষেত্রের মানুষ।

তারপরে জরাইকেলায়, আমি যাদের অতিথি হয়েছিলাম, দেখেছিলাম, সেই বাঙালী পরিবারের সঙ্গে, গাঙ্গুলি পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তিপুর নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম সেখানেই, ও আমাকে নিয়ে যাবে কোয়েলের ধারে। দুপুরটা কোনো রকমে কেটেছিল, বিকালেই তিপু এসেছিল, আমাকে নিয়ে যেতে। নিয়েও গিয়েছিল কোয়েলের ধারে। সঙ্গে ছিল নিতু। আমি যে বাড়ির অতিথি, নিতু সেই বাড়ির হাসকুটে প্রাণবন্ত আঠারো উনিশ বছরের

ছেলে। অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি, তিপু ওর কিশোরী বান্ধবী। দু'জনের হাসি খুনসুটি ঝগড়া দেখেই তা বোঝা গিয়েছিল।

কোয়েলের ধারে গিয়ে, মুগ্ধপ্রাণ, কথা ভুলে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের কোল থেকে সহসা কোয়েল বেরিয়ে এসে, হাঁসুয়া বাঁকে বহে চলেছে, হারিয়ে গিয়েছে, অন্তমুখী বাঁকে, ওপারের আর এক অরণ্য সীমায়। নিতুর মুখে শুনেছিলাম, সেই অরণ্যের নাম পোড়াহাট ডিভিসন। আর, প্রায় নগ্ন একটি মুণ্ডা বৃদ্ধ, নদীর চরে বসে, কাঠি দিয়ে কী খোঁচাচ্ছিল? তিপু বলেছিল, 'সোনা। ওদের 'সোনাখোঁচা বলে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সোনা? কিসের সোনা?'

তিপু হেসে ঢলে পড়ে বলেছিল, 'কিসের সোনা আবার? সোনা—যে সোনা দিয়ে হার চুড়ি দুল তৈরি হয়। সেই সোনা।'

তার মানে স্বর্ণ, নদীর চরায়? হ্যাঁ, সোনা, নদীর কূলে, নদীর জলে। কোয়েল স্বর্ণপ্রসবিনী-স্বর্ণবাহিনী। সোনাখোঁচারা বালির সঙ্গে সেই সোনা খুঁচিয়ে তোলে, তারপরে জরাইকেলার মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর কাছে, সেই বালি সের দরে বিক্রি করে। এক সের বালিতে কতোখানি সোনা আছে, সোনাখোঁচা মুণ্ডারা তা জানে না। বালি থেকে সোনা বের করবার লোক আলাদা। এক সের বালিতে, এক আনা থাকতে পারে, আধ আনা থাকতে পারে। কে বলতে পারে, দু' আনা তিন আনাও থাকতে পারে। কিন্তু বালির সের চার আনার বেশি না। তাও এমন বালি না যে, কোয়েলের চর থেকে, তুলে এনে দিলেই শেঠজী সেই বালি কিনে নেবে। বালি যাচাইয়ের লোক আছে। সোনা-খোঁচারাও জানে, কোন্‌খানের কোন্ বালিতে সোনা মিশে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে, হয়তো তেমন বালি দু' সেরের বেশি সংগ্রহ হয় না। সারা দিনের বালি খুঁচিয়ে সোনা সংগ্রহের আয় মাত্র আট আনা।

অবিচারের জন্য কষ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু ভারতের নদীর বালিতে যে সোনা মেলে, এ সংবাদে আমি অবাক যতো, খুশি ততো। সোনার বাঙলা না কেবল, সত্যি সত্যি সোনার ভারত!

প্রমাণ একেবারে হাতে কলমে।

তারপরে তিপু আর নিতুর সঙ্গে গাঙুলিমশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। গাঙুলিমশাই তার কাঁচা মাটির উঁচু দাওয়ার একটি জায়গা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'তিপুর মা এখানে আসন পেতে দিত, বিভূতিবাবু এখানে বসতে ভালোবাসতেন। এখানে বসে বসে, চুপ করে বনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।'

দেখেছিলাম, দাওয়ার সেখান থেকে, লাল আগুনের শিখায় ভরা আকাশমুখো কুসুম গাছ। মনে হয়েছিল, আমার রক্তে আগুন লেগে গিয়েছে। তারপরে অর্জুন, অশ্বগন্ধা, গাব, লুদাস, করণ্ডের মিলেমিশে যাওয়া, নানা বর্ণের মহীরুহের ওপারে গভীর শালবন, যার ডালে ডালে ফুলের ছড়াছড়ি। মাথার ওপরে আকাশ। তারপরে, আর তো কিছু বলার থাকে না, থাকতে পারে না। তখন বনের সঙ্গে আপন মনের খেলা, অনুভূতির সঙ্গে, দু'জনের মিশে যাওয়া।

গাঙ্গুলিমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি কি করতেন তখন?'

গাঙ্গুলিমশাই দূর বনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ইজারাদারি ছাড়বার পরে, এখানে আর তো কিছু করতে আসি না। এই জঙ্গল আমায় একটা গোলমাল করেছে। কিছুদিন পরে পরেই না এসে থাকতে পারি না। বিভূতিবাবুর মতন বসে থাকতে পারি না, উনি ধ্যানী মানুষ, ধ্যান করতেন। আমি কি দেখেছি জানেন, আমাদের মতন বনেরও প্রাণ আছে, আমাদের যেমন আলাদা আলাদা চেহারা, তাদেরও তাই। এক একজনকে হাসলে, এক একরকম দেখায়, কাঁদলেও তাই। গাছ কথা বলে, আপনি জানেন?'

আমি গাঙ্গুলিমশাইয়ের দিকে সংশয় বিস্মিত চোখে তাকিয়েছিলাম উনি কি সুস্থ মস্তিষ্কের লোক? পরে বুঝেছিলাম, শুধু সুস্থ না, বিড়ি দেশলাই নিয়ে যে বিরক্ত লোকটিকে দেখেছিলাম, আসলে তিনি এক অরণ্যপ্রেমিক। যিনি গাছের হাসি কান্না কথা, সবই বোঝেন, এবং বিশ্বাস করেন গাছেরা সজীব। তারপরে বুঝেছিলাম, কেন তিনি বনের ইজারাদারিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। নিজেকে তিনি হত্যাকারী খুনী ভেবেছিলেন। বলেছিলেন, 'অনেক প্রাণী হত্যা করেছি, আর পারলাম না। চোখের সামনে, জ্যান্ত প্রাণীগুলোকে হত্যা হতে দেখে, আর সইতে পারিনি। আমি তাদের কান্না শুনেছি, অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছি, আর না।'

বলতে বলতে, ওঁর প্রৌঢ় রাঙা চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। তখন মনে হয়েছিল, গাঙ্গুলিমশাই অরণ্যপ্রেমিক নন, অরণ্যেরই আর একটি মনুষ্যরূপী সত্তা। তিনি অরণ্যের আত্মীয়, বনের ভাই। সেইখানে শিল্পীপ্রেমিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর তফাত। গাঙ্গুলিমশাই আমার কাছে একটি মুগ্ধ বিস্ময়। তাঁকে আমি আগে চিনতে পারিনি।

চেনা কি যায়? চেনা কি এতই সহজ? আমাদের বড় অহংকার, মনে করি, এক রূপে দেখেই মানুষকে চেনা যায়। কিন্তু কভো যে তার

রূপান্তর, সে খোঁজ করি না। যখন খোঁজ পড়ে, তখন কথা হারিয়ে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্রের কাছে করজোড়ে বসে থাকি। হাসতে গিয়ে, চোখের জলে সব যেন ঝাপসা হয়ে যায়। সে অনির্বচনীয়তা, হাসির থেকে মধুর, গভীর। মনে মনে বলি, 'নমস্কার অজানাকেই। প্রণাম অপরিচয়ের বিস্ময়কে।'

জরাইকেলার অবস্থানটা, আধুনিক ভারতের একটি ইস্টিশনের নামেই বোঝা যায়। জরাইকেলা ইস্টিশনের যে-অর্ধেক বিহার ছাড়িয়ে উড়িষ্যায় পড়েছে, তারপরে গাড়িতে করে ছুট দিলেই, প্রথম ইস্টিশনের নাম দেখা যাবে ভালুলতা। তারপরে বিস্‌রা। জানি না, মুণ্ডা জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিদ্রোহী, যোদ্ধা, বিস্‌রা মুণ্ডার নামের সঙ্গে ইস্টিশনের নামের কোনো যোগসূত্র আছে কী না। রাঁচি অঞ্চলের অরণ্যের অধিবাসী বিস্‌রা মুণ্ডা, উনবিংশ শতাব্দীতে, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বনে পাহাড়ে লড়াই চালিয়েছিলেন অনেক দিন। ব্রিটিশ সিংহকে তিনি উদ্বিগ্ন করেছিলেন, বিদ্রোহ দমনের জন্য, সেই সিংহকে নানা কৌশলে লড়তে হয়েছিল। সেই থেকে বিস্‌রা মুণ্ডা এক ইতিহাস।

ইতিহাসের পাতায় তাঁর বিদ্রোহ কাহিনী। অনেক কিংবদন্তীর তিনি নায়ক। আজও ছোটনাগপুরের পাহাড়ে, জঙ্গলে, অনেক ছড়া আর গানে, বিস্‌রা মুণ্ডার নাম উচ্চারিত। কিন্তু ভারতের সামগ্রিক জীবনে যা চির উপেক্ষিত, ইতিহাসেও, অতএব তা সমানভাবেই উপেক্ষিত। অরণ্য পর্বতের বিদ্রোহের সঙ্গে, ভারতের সমতল ভূমির বিদ্রোহ কখনো যোগ দেয়নি। এই চিরবিচ্ছিন্নতা, ভারতের প্রতি এক অভিশাপ। অরণ্য পর্বত যদি এক সঙ্গে মিলতে পারতো, কে জানে, আজকের ভারতের ইতিহাস অন্য কথা বলতো কী না।

থাক সে কথা। আমি ইতিহাসের পথ ধরে আসিনি। বনের সঙ্গে খেলা আমার। অরণ্যের ডাকে এসেছি। বনের কথা বলি। বিস্‌রা ইস্টিশন দেখেছি, মনের কোনো দোষ নেই। সেই ঐতিহাসিক যোদ্ধার কথা মনে এসেছিল অনিবার্যভাবে। কেতাবে পড়া ছিল কী না! বিস্‌রা ইস্টিশনের পরেই, বাণ্ডামুণ্ডা, যেখানে জঙ্গল কেটে চলেছে, নতুন ইতিহাসের পথ তৈরির কাজ। দেখে এসেছি, সেখানে চলেছে পাশাপাশি অনেকগুলি রেললাইন পাতার কাজ, কারণ বাণ্ডামুণ্ডার পরেই, ইস্টিশনের নাম রৌরকেলা, আজকের অতি চেনা নাম,

উড়িষ্যার ইস্পাতগড়। দেখেছি, মুণ্ডা ওরাওঁ মেয়েরা সেখানে, অঙ্গুলাঙ্গুল করে চুল বেঁধেছে, ইংরেজিতে যাকে বলে নাকি হর্সটেল। নাগরিকাদের মতন তাদের শাড়ির বাঁধুনি, তাও আবার কলে বোনা রঙীন শাড়ির। তিপুর মুখে শুনেছিলাম, বনের মেয়েদের নিজেদের কাপড়ের নাম শাড়ি না, কিচ্‌রি। বনের তাঁতীরা নিজেরা বোনে। মোটা জমিনের ওপরে, লাল মোটা সুতোর একটি মোটা রেখা। এক খণ্ড না, দু'খণ্ড। একটি কোমরে জড়াবার জন্য, আর একটি গায়ে। বাণ্ডামুণ্ডার কর্মী মেয়েদের গায়ে সে কিচ্‌রি দেখিনি, বরং গায়ে তাদের রঙ-বেরঙের জামা, পায়ে স্যাণ্ডেল, ফট্‌ফট্ চলা, তথাপি পায়ে আলতা, মাথায় ফুলেল তেল। অনেকের তাতে হয়নি, ওষ্ঠরঞ্জনী দিয়ে ঠোঁট রাঙিয়েছে, কপালে তারই ফোঁটা, মুখে পাউডারের প্রলেপ। ডিয়েং-এ তাদের বিতৃষ্ণা, ডিয়েং—যাকে বলে হাঁড়িয়া পচুই, জন্মের থেকে যা খেয়ে তাদের দেহের পুষ্টি, মনের রঙ।

বাণ্ডামুণ্ডায় তারা ছবির কাগজ লাগানো, রঙ-বেরঙের বোতল থেকে সুরা পান করে। বাবুদের কাঁধে হাত দিয়ে বেহেড, নয় তো জার্মান সাহেবের গললগ্ন হয়ে, খিলখিল হাসে, তাও দেখেছি। তাদের আরণ্যক মিঠে স্বরে, হিন্দী ছবির গান শুনেছি।

শুনলে মনে হবে, মান্ধাতা আমলের বুড়োর মতো কথা বলছি। কিন্তু তা না। বাণ্ডামুণ্ডায় যে বনবালারা খাটতে গিয়েছে, কিছুদিন আগেও তারা ছিল, গভীর অরণ্যের আদিবাসী। তাদের ছিল শিকার, আদিম প্রথার চাষ, নানান বনজ খাদ্য, নানান অপদেবতার (বোঙা) পূজাপাটের রাজ্য নিয়ে বাস। তারপরেই হঠাৎ বাণ্ডামুণ্ডায় গিয়ে একেবারে আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ। যার বাইরের চিত্রটা দেখলেই, ভিতরের চরিত্রটা বোঝা যায় না। গভীর অরণ্য থেকে, সেই জগতের যোগযোগের মাঝখানে থেকে যায় অনেক সময় আরও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তার কোনোটাই সেই বনবালাদের হয়নি, হয়নি বলেই বাণ্ডামুণ্ডায় বনবালাদের সেই রকম দেখেছিলাম। তারা কেবল নিজেদের অস্তিত্ব হারায়নি, আধুনিক জগৎ তাদের সবটুকু শোষণ করে নিয়েছে।

কিন্তু আবার আমি শিবের গীত গাইতে আরম্ভ করেছি। আমার ধান ভানা রইলো পড়ে। জরাইকেলার অবস্থানটা বোঝাতেই, এত কথা।

আমার সৌভাগ্য, গাঙ্গুলিমশাইয়ের ঘরের দাওয়ায় আমি বসতে পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। তিপু তার আগেই বলেছিল, ও আমাকে কোয়েলের ছোট ছোট মাছের ঝাল খাওয়াবে।

কথা রেখেছিল। কোয়েলের ছোট মাছের সে স্বাদ ভোলবার না। ভোলবার না, তিপুর সঙ্গে. নিতুর সঙ্গে, জরাইকেলার সামটা ব্লকের বনে বনে বেড়ানো।

জরাইকেলাতেই আলাপ হয়েছিল, বিরাট ব্যবসায়ী আর জঙ্গলের মস্ত ঠিকাদার সিংজী সাহেবের সঙ্গে। আর বনের ইজারাদার মোহনবাবু। বলতে গেলে এখনো আমি, সারেণ্ডা অরণ্যের এই গভীরে তাঁদেরই অতিথি। আর ভোলা সম্ভব না, জরাইকেলার উইলসন সাহেবকে। যিনি একদা ছিলেন, তাঁর যৌবনে ডি. এফ. ও.। ছিল খাস বিলিতি মেমসাহেব বৌ। কিন্তু মেমসাহেবের সঙ্গে জীবনযাপন তাঁর কপালে সয়নি। মুণ্ডা ওরাওঁদের সঙ্গে, অতিরিক্ত মেলামেশা, মেমসাহেব মেনে নিতে পারেননি, তাই তিনি তাঁর সাগরপারের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। সাহেবের কাছে, ছেলেমেয়েদের কারোকে রেখে যাননি। একাকী সাহেবের বয়সও তখন কম না। তিনিও ইচ্ছা করলে বিলাতে চলে যেতে পারতেন, কিন্তু বন তাঁকে ছাড়েনি। বনের মায়ায় তিনি বশীভূত হয়েছিলেন। এখন তাঁর ঘরে, কৃষ্ণকালো মুণ্ডা গৃহিণীর কোল জুড়ে গোরা ছেলের খেলা। উইলসন সাহেবের চাকরি গিয়েছে অনেকদিন। এখন জরাইকেলাতে তিনি কাঠ চেরাইয়ের কল খুলে বসেছেন। বাস করেন মাটির ঘরে। মুণ্ডা বৌয়ের হাতের রান্না ভাত খান পরিতোষ করে। আর ব্রাণ্ডি হুইস্কিতে আকাঙ্ক্ষা নেই, বৌয়ের সঙ্গে মদ্‌গম্‌ খেয়েই রসে বশে আছেন। মদ্‌গম্‌ হলো মহুয়ার রস।

সাহেবকে ভারি ভাল লেগেছিল। বসে বসে অনেক গল্প করেছিলেন। তারপরে জোর করে, চায়ের মতো একটু গরম মদ্‌গম্‌ খাইয়ে দিয়েছিলেন।

তবে উইলসনের কথাতেই, জরাইকেলার সব কথা শেষ হয়ে যায় না। অতি বড় রইস্‌ আদমি সিংজীর পরিচয় একটু না দিলে নয়। চালে তিনি আমীর মানুষ। মেজাজখানিও তাই। জরাইকেলায় বিজলীবাতির আশা নেই, তাঁর গৃহে হ্যাজাকের আলোর ঝলক। প্রথম পরিচয়ের সন্ধ্যাতেই, ফরাসের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে, আলবোলার নল মুখে দিয়ে, নোকরকে সুরা আনবার আদেশ দিয়েছিলেন। গভীর বনের এক ছোট লোকালয়ে, সিংজীর ফরাসে পরিবেশিত হয়েছিল, বিদেশের শ্রেষ্ঠ দামী সুরা। অবাক হওয়ার সঙ্গে, সংকুচিত হয়ে, পানে আপত্তি প্রকাশ করেছিলাম। সিংজী বলেছিলেন, 'মেহমান হয়ে, আমার সম্মান একটু রাখুন, আমি আপনার জুতা মাথায় করে বইবো।'

তারপরে আর কথা চলেনি, সহযোগিতা করতেই হয়েছিল। মোহনবাবু

মানুষটি আপাতদৃষ্টিতে অমায়িক, মিষ্টভাষী, সুপুরুষ। পরেও তাঁর কোনো ব্যতিক্রম দেখিনি, কিন্তু সুরাসক্তিটা পূর্ণ মাত্রায় ছিল। সিংজীর গৃহেই প্রথম দেখেছিলাম, তাঁর কাছেই, সিংজী সম্পর্কে নানান বিস্ময়কর কাহিনী শুনেছিলাম। সিংজী ধনবান। বনের ইজারা ছাড়াও, টাটানগর থেকে রৌরকেলা পর্যন্ত তাঁর নানা ব্যবসা। বিস্তৃত তাঁর পরিচয়, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তিনি। আমার অরণ্য ভ্রমণের দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন।

জরাইকেলা ছেড়ে এসেছিলাম মোহনবাবুর সঙ্গে, তাঁর ট্রাকে। তিনি চলেছিলেন এদেলবায়, এখন যেখানে চলেছি বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে। কিন্তু সিংজীর নির্দেশে, মোহনবাবু আমাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, ছোট নাগরায়। যেখান থেকে, এখন আমার যাত্রা, এদেলবার দিকে।

জরাইকেলা থেকে আসবার সময়, তিপুর ঝাপসা চোখের দিকে তাকিয়ে বলে এসেছিলাম, ফেরার পথে জরাইকেলা হয়ে ফিরবো। এখন জানি না, সে কথা থাকবে কী না। বনের সঙ্গে খেলতে খেলতে, কোথায় আমার সেই খেলা সাঙ্গ হবে, এখন আর আমি তা জানি না। কে জানে, তিপুর কাছে হয় তো চিরদিনের জন্য মিথ্যুক হয়েই থাকতে হবে।

ছোট নাগরায়, বন আমার জন্য রেখেছিল একটি পরম বিস্ময়। হ্যাঁ, পরম বিস্ময়ই বলতে হবে। যা একেবারেই অভাবিত, অচিন্ত্যনীয়, তা ঘটলে তো পরম বিস্ময়ই বলতে হয়। সেই পরম বিস্ময়ের নাম, তৃপ্তি ভৌমিক, দমদমে যার বাড়ি। জন্ম পূর্ববঙ্গে, ছেলেবেলায় দেশ বিভাগের পরে, বাবা মায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। ছোট নাগরায় কোয়েনা নামে পাহাড়ী নদী পেরিয়ে প্রাক্ দ্বিপ্রহরে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, বনের ফাঁকায়। বন যেখানে সাত রঙে সেজে, আমার চারপাশে। তখনই হঠাৎ দেখা পেয়েছিলাম তৃপ্তি ভৌমিকের। লাল পাড় শাড়ি পরা, সামান্য সাদা কাপড়ের একটি জামা, কাঁধে একটি ব্যাগ ঝোলানো। দেখেছিলাম গৈরিক তার গায়ের রঙ, কালো ডাগর দুটি চোখ, রূপসী না, শ্রীময়ী স্নিগ্ধা। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। এক বিনুনি ঝোলানো, রুখু চুলে, মুখে ধুলার ছাপ। ধুলা পায়ে সামান্য দুটি স্যাণ্ডেল, অহংকার, বর্জিত, হাতে একটি ঘড়ি।

শালীনতা রক্ষা করতে, মুখ ফেরাতে গিয়েই, সেই কথাটি ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল, 'আপনি কি বাঙালী?'

আমি যেন শুনেছিলাম, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

সেই ঝিঁঝি ডাকা, ছোট নাগরার অরণ্য গভীরে, আমার সেই রকমই মনে

হয়েছিল। তারপরে নিজের বেশভূষার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, বাঙালীর ধুতি পরার ধনরনটা, একান্ত বাঙালীর, এক নজরে চেনা যায়। আমাকে বিস্মিত সম্মতি জানিয়ে, জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল, 'হ্যাঁ। আপনিও বাঙালী?'

তৃপ্তি ভৌমিক তার হাসি আর ঘাড় ঝাঁকানোতে তা বুঝিয়ে দিয়েছিল। তারপরে ক্রমে ক্রমে পরিচয়। তৃপ্তি, এই অরণ্যের মধ্যে, ব্লক হেল্‌থ সেণ্টারের নার্স, চাকরিটা বিহার সরকারের। বাঙালী মেয়ে হয়ে, বিহার সরকারের এই চাকরিটা পাওয়ার কারণ, এখানে চাকরি করার স্বীকৃতি। এই গভীর জঙ্গলে বারো মাস কেউ চাকরি করতে আসতে চায় না। মাসে একদিন, বনের ইজারাদারদের গাড়িতে, বড় জামদায় গিয়ে, মাসের মাইনে নিয়ে আসতে হয়। তখনই, সারা মাসের চাল ডাল তেল নুন, যাবতীয় জিনিস কিনে নিয়ে আসতে হয়। ছোট নাগরার পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোনো দোকানপাট কেনাবেচার ব্যাপার নেই।

শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, তবে নাকি বাঙালীরা কর্মে বিদেশ-বিমুখ? তৃপ্তি ভৌমিক যেন, তারই একটি নীরব কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব প্রতিবাদ। ছেলে না, একটি মেয়ে, বিধবা মা আর ছোট ভাইবোনদের জীবনের দায়িত্বে, সারেণ্ডা অরণ্যের গভীরে। মুগ্ধ বিস্ময়ে, তৃপ্তির দিকে না তাকিয়ে পারিনি।

তারপরে, তৃপ্তি প্রথম আলাপেই, আমাকে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল, আদিম রাজ্যের সেই উপুড় করা দুটি নাকাড়া। লোহার চালাই করা বিশাল নাকাড়া, দেখলেই বোঝা যায়, কোনো এক কালে সেই নাকাড়া যখন বাজতো, তখন এই পাহাড় অরণ্য এক আদিম উল্লাসে চঞ্চল হয়ে উঠতো। প্রথম দিনেই, তৃপ্তি ওর লাল মাটির নিচু পাঁচিল ঘেরা, লাল মাটির গৃহাঙ্গনে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে ওর দাসী এবং সখী মুণ্ডা মেয়ে কয়ো ছিল যে তার নিজের ভাষায় ঠাট্টা করে তৃপ্তিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি জঙ্গল থেকে বর ধরে নিয়ে এলে দিদি।'

আমি বুঝতে পারিনি, তৃপ্তি চকিত লজ্জা স্ফুরিত ধমকে বলে উঠেছিল, 'দূর হ মুখপুড়ি।' তারপরেও ও আমাকে কথাটা বলেছিল, এবং এ কথাও বলেছিল, বনের এই সব মানুষেরা ভারি সরল। যা মনে আসে, মুখেও তা অনায়াসেই ভাষে। তৃপ্তি বলেছিল, কয়োর কথায়, আমি যেন কিছু মনে না করি।

আমার মনে করার কিছু ছিল না। লজ্জা পাবার কথা তৃপ্তির, পেয়েও ছিল, কিন্তু কয়ো নামে দাসী বা সখী মেয়েটিকে ও ভালোবাসে, তার সরলতায় বিশ্বাস

করে। কয়োর কথায় ও বরং মজা পেয়েছে, কোনো মালিন্য ওর মনকে স্পর্শ করেনি।

প্রথম দিনের দেখায়, তৃপ্তি চা দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল, ওর বনের বাসায়। অনুরোধ ছিল দ্বিতীয় দিনের দ্বিপ্রাহরিক আহারের। সৌভাগ্য বলতে হবে। সারেণ্ডা অরণ্যের গভীরে, একটি বাঙালী মেয়ের হাতে, বাঙলা রান্না খাবার জুটবে, সেটা আশাতীত। জীবনের বাস্তব এবং বিস্ময়গুলো এই রকম। সংসারে বাস্তব বাস্তব করে যারা দিনরাত্রি গলাবাজি করে, তাদের কাছে, এই তৃপ্তি ভৌমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎটা নিতান্ত কল্পকাহিনী বলে মনে হতে পারে। এক শ্রেণীর দুঃখী লোক আছে, যাদের ঠোঁটের কোণ বাঁকা, চোখে অবিশ্বাসের হাসি। দুঃখের মধ্যেও, জীবনের সরসতা যাদের কখনো স্পর্শ করেনি, কটু হেসে জিজ্ঞেস করে, 'ওহে কালকূট, যেখানেই যাও, সেখানেই একটি মেয়ে কোথা থেকে আসে? আমাদের জীবনে তো এ রকম আসে না?'

যেন মেয়েরা সংসারের এক এক অত্যাশ্চর্য ডুমুরের ফুল, তাদের দেখা সহজে মেলে না। অথচ জানি, ঘরে বাইরে, সর্বত্র নারী পুরুষ এক সঙ্গে চলেছে। আমার মতো, সেও সর্বত্র। দেখা না পাবার কী আছে। দেখা পাওয়াটা একদিক থেকে ভাগ্য বলতে হবে, আর সেই ভাগ্যের জন্য দরকার, চোখ আর মন। নিজের বাইরের দরজাটা তো বটেই, ভিতরের দরজাটাও খুলে রাখা দরকার। যদি কেউ উঁকি দেয়, সে যেন প্রবেশ নিষেধের নোটিশ দেখতে না পায়। বিচিত্র আর বিস্ময়কর ঘটনা, মানুষের জীবনেই ঘটে। কল্পকাহিনী সেখানে অতি তুচ্ছ, মানুষের জীবন তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর, ব্যাপক, বিচিত্র।

তৃপ্তির নিমন্ত্রণে সুখী হয়েছিলাম। ওর সামান্য ব্যঞ্জন, অসামান্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল, পরের দিনের দুপুরটিতে। ফাল্গুন মাসে, শালের পাতা ঝরে যায়, ফুল দোলে। কুসুমের রাঙা ঝলক যেন আকাশকেও রাঙিয়ে দেয়। ছোট নাগরার সেই দুপুরটিকে ভোলা যায় না। প্রবাসিনী এক বাঙালী মেয়ে, তার ঘরের কাঁচা মাটির নিকনো মেঝেয় বসে, আমাকে পরিবেশন করেছিল। আসনে বসে আমি খেয়েছিলাম। তার মধ্যে অনেক কথা ও বলেছিল। ওর বনের জীবনের কথা। বনকে ও আস্তে আস্তে, দিনে দিনে ভালোবাসতে শিখেছে, তার সঙ্গে বনের মানুষদের। এদের অপরিসীম দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর ব্যাধির কথা বলেছিল। বলেছিল, মাসে একদিনের জন্যও ডাক্তারের দেখা পাওয়া কঠিন। ওষুধের ভীষণ অভাব। তৃপ্তির নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়, যখন

প্রয়োজনের সময়, ঠিক অসুখের জন্য, ঠিক ওষুধ দিতে পারে না। কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা ওর দ্বারা সম্ভব হয় না। মাসে একবার যখন বড় জামদায় যায় মাইনে আনতে তখন যতোটা পারে, ওষুধ নিয়ে আসে। তাও বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। শহরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেই যেখানে ওষুধ ঠিকমতো পাওয়া যায় না, সেখানে এই গভীর বনের মধ্যে, বনবাসীদের জন্য নিয়মিত ওষুধ পাওয়া যাবে, সে আশা দুরাশা।

দু'দিন ছোট নাগরায় ছিলাম। ছোট নাগরার বনের গভীরে, কোয়েনার ঝিঁঝি ডাকা ঠাণ্ডা অন্ধকার ঝোপঝাড় তীরে তীরে, তৃপ্তি আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। তারার মতো দেখতে তিলুয়া নামে ফুলের আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ, সেই ফুল দিয়ে তৃপ্তি ওর কানের ফুল করে পরেছিল। ছোট গাছে, থোকা থোকা লাল ফুল, নাম মধুফুল, অরণ্যবাসীরা বলে। ইচ্ছা করেছিল, সেই ফুল নিয়ে, তৃপ্তির চুলে গুঁজে দিই। পারিনি, সংকোচ হয়েছিল, ওর শ্বেত সিঁথির রেখা কি কোনোদিন রক্তিম হবে না? জীবনটা কি কেবল জীবিকার জন্যই কেটে যাবে?

তৃপ্তির মন সম্ভবত একটু মেদুর হয়েছিল। আমি এদেলবায় যাবো শুনে, স্থির করেছিল, আমার সঙ্গে যাবে। মোহনবাবু ওর যথেষ্ট পরিচিত, এদেলবা, এবং সারেণ্ডার অনেক জায়গাই ওর চেনা। যাওয়ার কোনো অসুবিধা ছিল না। ও আমাকে বন ঘুরিয়ে দেখাবে, এই ওর ইচ্ছা।

যাবার সময়, রেঞ্জার বদরিকাপ্রসাদ এলেন জীপ নিয়ে। নির্দেশ ছিল সিংজীর। দাঁড়িয়েছিলাম তৃপ্তির অপেক্ষায়। ও এসেছিল সময় মতোই, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, সঙ্গে কয়ো ছাড়াও একটি মুণ্ডা পুরুষ। এসে বলেছিল, আমার সঙ্গে ও যেতে পারছে না। একটু দূরে, একটি বনবধূর প্রসববেদনা উঠেছে, ও প্রসব করাতে যাচ্ছে। তবে দু'এক দিনের মধ্যেই, কারোর গাড়িতে ও এদেলবায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

না যেতে পাবার জন্য, ওর নিরাশায় চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছিল, কিন্তু নবজাতকের আহ্বান অস্বীকার করতে পারেনি। আমি অবাক হয়ে তৃপ্তি ভৌমিকের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর ভেবেছিলাম, যার জীবনে ফুল ফোটেনি, সে কতোকাল প্রসূতির সেবা করবে? সংসারের নিরন্তর প্রসব-যন্ত্রণা, তৃপ্তি কি তা শেষ করে কোনোদিন আসতে পারবে?

গাড়ি চালাচ্ছেন বদরিকাপ্রসাদ নিজেই। যতোই এগিয়ে চলি, পাহাড়ে উঠি, আবার নেমে আসি, বন যেন গভীরতর নিবিড়তর হয়ে ওঠে, আর তার রঙের ঝলক ঝলকে উঠতে থাকে। আগে জানতাম, বনের রঙ সবুজ। ভুল জানতাম। বনের রঙের কোনো শেষ নেই। একলা কুসুমই অনেকখানি। দাবাগ্নিতে বন জ্বলে যায়। কিন্তু কুসুমও যেন সমস্ত অরণ্যে, আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তার ঊর্ধ্ববাহু শিখা আকাশের দিকে। গাছে গাছে নানা বর্ণের ফুলের অন্ত নেই। পাতাবিহীন শাখায় শাখায়, হলুদ নীল সাদা বেগুনি লাল ফুলে ফুলে ভরা। মাঝে মাঝে, অবাক করে দিচ্ছে, পাহাড়ী মৃত্তিকা। এক এক জায়গায় তার এক এক রকম রঙ। হলুদ নীল লাল ধূসর শাদা।

বদরিকাপ্রসাদ ইংরেজিতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। গাড়ি তিনি খুব জোরে চালাচ্ছিলেন না। জোরে চালানো সম্ভবও ছিল না। বিশেষ করে ওপরে ওঠবার সময়। এক জায়গায় নীল মৃত্তিকা দেখে, বিশ্বাস করতে পারিনি, সে রঙ প্রাকৃতিক। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কি সত্যি প্রাকৃতিক রঙ?'

বদরিকাপ্রসাদ বললেন, 'হ্যাঁ, নেমে দেখবেন?'

বললাম, 'অসুবিধা না থাকলে দেখতে চাই।'

বদরিকাপ্রসাদ হেসে বললেন, 'এতে আমার অসুবিধার কী আছে। আপনার যখন যা ইচ্ছা হবে, বলবেন। আপনি সিংজী সাহেবের মেহমান, আমাদেরও।'

বদরিকাপ্রসাদ রাস্তার এক ধারে গাড়ি দাঁড় করালেন। আমি নেমে গিয়ে, নীল পাহাড়ের গায়ে হাত দিলাম। পাথর না, মাটি, কিন্তু পাথরের মতোই প্রায় শক্ত। বদরিকাপ্রসাদ কয়েকটি ছোট ছোট নীল মাটির খণ্ড তুলে নিলেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই সব রঙীন মাটি নিয়ে, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, যদি বাড়ি ঘর রঙ করা যায়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাজে লাগানো যায়নি।'

সংসারের তাই নিয়ম, প্রকৃতি থেকে সে রূপ রস নিয়ে, নিজেকে একরকম ভাবে সাজায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি কখনো সার্থক হয়, তখন এই পাহাড়ে অরণ্যে গর্জন করে ছুটে আসবে ট্রাক লরি। শাবল গাঁইতির আঘাতে রঙীন মৃত্তিকা যাবে কারখানায়, নগরে নগরে। তখন আর বনপাহাড়ের রঙ-মৃত্তিকা আর থাকবে না।

বনপাহাড়ের মুগ্ধতা থেকে, সংসারের প্রয়োজনের মূল্য বেশি। তবু মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করে। লোকে বলে, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশু মাতৃক্রোড়ে। কিন্তু সেই মানানসই রূপ বজায় রাখা বড় কঠিন। নীল খণ্ড কটি নিয়ে গাড়িতে ওঠবার আগেই, বদরিকাপ্রসাদ ভুরু কুঁচকে আশেপাশে তাকালেন। তাঁর নাকের পাটা ফোলা। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু গন্ধ পাচ্ছেন?'

ঘ্রাণের বিষয়ে সচেতন ছিলাম না। গন্ধ নেবার চেষ্টা করে, একটি বনজ গন্ধ ছাড়া আর কিছুই আমি পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের গন্ধ বলুন তো?'

বদরিকাপ্রসাদ বললেন, 'মনে হচ্ছে বাঘের। উঠুন, গাড়িতে উঠে পড়ুন!'

এর পরে আর কথা চলে না। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসলাম। মুহূর্তের মধ্যেই, একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় চকিত হয়ে উঠলো। এতক্ষণের দর্শনেন্দ্রিয় আর অনুভূতির মধ্যে ছিল একটি মুগ্ধতা। কিন্তু যাকে দেখে মুগ্ধ হই, ভুলে যাই, তার গভীরে বসবাসকারী আরো অনেকে আছে, যারা শেষ পরোয়ানা নিয়ে হাজির হতে পারে। এ অরণ্যের সেও হয় তো একটি সৌন্দর্য, মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে কালান্তক। রূপের মধ্যে, সর্বনাশও এমনি করেই মিশে থাকে। কখন কী ভাবে তার আবির্ভাব হবে, কেউ বলতে পারে না।

বদরিকাপ্রসাদ ততক্ষণে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ঘ্রাণ দেখছি বেশ তীব্র।'

বদরিকাপ্রসাদ বাইরের দিকে, আশেপাশে তাকাচ্ছিলেন। হেসে বললেন, 'বনে বনে ঘুরে, এখন ওটা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একটু সাবধান থাকতেই হয়, অনেক সময় একা একাই ঘুরতে হয় কী না!'

বললাম, 'আমি তো গন্ধ পেলাম না?'

বদরিকা বললেন, 'না পাবারই কথা, আপনি তো কোনো জানোয়ারের বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। তা ছাড়া, আপনি হয় তো খেয়াল করেননি, আমরা যেখানে নেমেছিলাম, সেখানে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা ছিল। পাখি পতঙ্গ কিছুই ডাকছিল না। গন্ধটা খুব হাল্‌কা ছিল, হয় তো অনেক দূর থেকেই এসেছিল, তবু সাবধান হওয়া ভাল।'

আমার অভিজ্ঞতায়, বাঘের গন্ধ, একমাত্র চিড়িয়াখানা আর সার্কাসের বেষ্টনীতে। বনের বাঘের গন্ধের মধ্যে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কী না, জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কখনো বন্য বাঘ দেখেছেন?'

বদরিকা বললেন, 'দেখেছি দু'একবার, দূর থেকে। সামনাসামনি কখনো পড়তে হয়নি। তবে এ জঙ্গলে বাঘ কমই আছে। বড় জানোয়ার বলতে, হাতিই বেশি আছে। জানোয়ারের আক্রমণ বলতে, এখানে হাতির দ্বারাই মানুষ বেশি আক্রান্ত হয়, মরেও।'

গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে, বদরিকাপ্রসাদ রেঞ্জার মহাশয়ের কথাগুলো কেমন যেন বুক গুরগুরিয়ে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাবে আক্রমণ করে?'

'কোনোরকম আটঘাট বেঁধে আক্রমণ করে না। চিরকাল ধরেই জঙ্গলের মানুষ আর পশুরা এখানে, বলতে গেলে পাশাপাশি বাস করছে। নিশ্চিন্ত হাতির সামনে, হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে, সে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, সে জন্যেই আক্রমণ করে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে?'

বদরিকা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে, আবার সামনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'কী আর, শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে, পাহাড়ের গায়ে আছাড় মারে, নয় তো নিচের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, পায়ে পিষেও ফেলে অনেক সময়।'

'তার মানে, মৃত্যু?'

'নিশ্চিতরূপেই। ক্রুদ্ধ হাতির শুঁড়ে একবার ধরা পড়লে বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না।' বদরিকা বললেন প্রায় নির্বিকারভাবেই। আবার বললেন, 'তবে জঙ্গলের মানুষেরাও খুব সাবধান থাকে। হাতির সামনে হঠাৎ পড়ে গেলে, কী ভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়, সেটাও তারা ভাল জানে। কিন্তু হাতির মেজাজের কথা কিছু বলা যায় না। সামনে মানুষ পড়লেই যে সে আক্রমণ করবে, তার কোনো স্থিরতা নেই। অনেক সময় শান্তভাবেই হয় তো চলে যায়, মোটে ভ্রূক্ষেপ করে না। পাগলা হাতি ছাড়া কখনোই অকারণ মানুষকে তারা আক্রমণ করে না। কেবল দল বেঁধে ক্ষেতের ফসল খেতে আসে। তখন টিন পিটিয়ে, হল্লা করে, নানানভাবে হাতির দলকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে।

হাতি কম দেখিনি জীবনে। চিড়িয়াখানা বা সার্কাস ছাড়াই ছেলেবেলা থেকে অনেক জায়গায় পোষা হাতি দেখেছি। সেকালের জমিদার বাড়ি, বা কোনো মিছিলে। তার মধ্যে সব থেকে ভাল লেগেছিল, প্রয়াগের কুম্ভ মেলায়, হাতির পিঠে নাগা সাধু দেখে। সম্পূর্ণ নগ্ন সাধু, উন্মুক্ত কৃপাণ তাদের হাতে, মিছিল করে যেতো হাতি ঘোড়ার পিঠে বসে। নাগা সাধু না, যেন সশস্ত্র যোদ্ধা।

কিন্তু বন্যহস্তী কখনো দেখিনি। এখন এই গভীর বনের মধ্যে, চিন্তাটা উদয় হতেই, বাঘের থেকে উদ্বেগটা কম হলো না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এ সময়ে কি জঙ্গলে হাতি বেরোতে পারে?'

বদরিকা বললেন, 'যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো পাহাড়ী মোড়ের বাঁকে।'

বুকের মধ্যে কাঁপ দিল যেন। বললাম, 'বলেন কী? কী করবেন তা হলে?'

বদরিকা হেসে বললেন, 'লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে দূর থেকেই চোখে পড়ে, পালাবার সময় পাওয়া যায়। আমার জীবনে একবারই হয়েছে, জীপ নিয়ে হাতির মুখোমুখি পড়ে গেছলাম।'

প্রায় আঁতকে উঠি, 'সর্বনাশ! কী করলেন?'

বদরিকা বললেন, 'করার কিছু ছিল না, সেই বিশাল হাতি একেবারে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ী রাস্তায় পিছনের ঢালুতে ব্যাক করা বিপজ্জনক। ফিরলেও হাতি তাড়া করতো, সেটা আরো মারাত্মক। সামনে যাবার কোনো প্রশ্নই ছিল না। গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে, চুপ করে বসেছিলাম।

'তারপর?'

'তারপর আর কী, তারপর চললো আমার অগ্নিপরীক্ষা, আর সেই প্রাগৈতিহাসিক পশুর পরীক্ষকের ভূমিকা।' বদরিকা হাসলেন, আবার বললেন, 'হাতিটির মুখ আমার দিকে ছিল না, দেওয়ালের মতো রাস্তা জুড়ে সে দাঁড়িয়েছিল। সে এক চোখ দিয়ে আমাকে দেখছিল, কিন্তু একেবারে স্থির। শুঁড় কান ল্যাজ কিছুই নড়ছিল না, যেন পাথরের মূর্তি। আমিও পাথর। তার একটি দাঁত আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। গাড়ির এঞ্জিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দৃষ্টি হাতির দিকে। হাত যেরকম স্টিয়ারিং-এর উপর ছিল, সেইরকমই রেখেছিলাম, কেন না, আমাকেও হাতির মতোই স্থির থাকতে হবে। এটাই সাধারণ নিয়ম, হাতির সামনে পড়লে, হাতি যদি আক্রমণ করতে উদ্যত না হয়, তা হলে তার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। আসলে সে জানতে চায়, শত্রু হিসাবে আমার উদ্দেশ্য কী? আক্রমণ? অথবা আপোসে পাশ কাটানো? নড়তে চড়তে দেখলেই সে সন্দিহান হয়ে ওঠে, তখন ঝটিতি আক্রমণ করে বসতে পারে। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ একেবারেই ওরা পছন্দ করে না, বিরক্ত হয়, রেগেও যায়। তবে স্থির হয়ে বসে থাকলেও, আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম, হাতি যদি হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে, কী ভাবে পালাবো। দুটি মাত্র রাস্তা আমার ছিল। এক নম্বর, ডান দিকে নেমে পড়েই রাস্তার ধারের ঢালুতে নেমে পড়া। হাতি ঢালুতে নেমে আক্রমণ করতে পারে না।

ঢালুতে সে পারতপক্ষে নামতেই চায় না, কারণ বাধা তার বিশাল ওজনের শরীর, গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। দু' নম্বর ছিল, নেমেই পিছন দিকে দৌড় দেওয়া।'

বদরিকা গাড়ি চালাতে চালাতে, অদ্ভুত এক রুদ্ধশ্বাস ঘটনা ব্যক্ত করছেন, কিন্তু বলছেন অত্যন্ত সহজভাবে। আর আমি তাঁর হস্তীকাহিনী শুনতে শুনতে, প্রত্যেকবার পাহাড়ী মোড়ের দিকে, ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছি। একবার যখন শুনেছি, 'যে কোনো মুহূর্তেই' নাকি তার দেখা পাওয়া যেতে পারে। শুনছিও সেই ঘটনাই।

বদরিকা বলে চলেছেন, 'অবিশ্যি যতোটা সহজে পালাবার পন্থা ভাবছি, ততোটা সহজ নয়। হাতি দেখতে যতো বিশালই হোক, সে অত্যন্ত দ্রুতগতি। নিমেষের মধ্যেই সে হয় তো আমাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ফেলতে পারে। আর যদি আমি পালাতেও পারি, জীপটা দুমড়ে সে পাহাড়ের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, এটাও আমি জানতাম। সবটাই নির্ভর করছিল, আমি কতো তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটতে পারি। নিচের ঢালুতে অথবা পিছনের আঁকাবাঁকা পথে। আঁকাবাঁকা রাস্তাও, হাতির পক্ষে খুব প্রশস্ত না, মোড় বেঁকতে তার সময় লাগে।'

এ সব জানা না থাকলেও, হাতি তার বিশাল শরীর নিয়ে যে অত্যন্ত দ্রুত ছুটতে পারে, ওটা আমার কেতাবী জ্ঞান ছিল। অল্প বয়সে পড়েছি, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'যূথপতি'। কিন্তু যূথপতি পড়ে, ছেলেবেলায় হাতিদের আমি ভালোবাসতে শিখেছিলাম। এখন এই অরণ্য গভীরে, তার যে কোনো মুহূর্তে আর্ভিবের আশঙ্কায়, সে ভালোবাসার বোধ বড়ই ক্ষীণ হয়ে আসছে। আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রসাদজী, আগে বলুন, হাতি আপনাকে আক্রমণ করেছিল কী না।'

বদরিকা হেসে বললেন, 'না। করলে হয়তো আজ আপনার সঙ্গে, এভাবে দেখতে পেতেন না। সে আমাকে আধ ঘণ্টার ওপরে বসিয়ে রেখেছিল, নিজেও নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। সেই ঝকঝকে দুই দাঁতওয়ালা হাতি নিজে যেমন নির্ভীক ছিল, তেমনি তার মহত্ত্বও ছিল,। সে যখন নিশ্চিন্ত হয়েছিল, আমি মোটেই তার শত্রুতা করতে আসিনি, তাকে আক্রমণ বা বিরক্ত করার কোনো উদ্দেশ্যই আমার নেই, তখন সে অত্যন্ত ধীরে ধীরে, আমার বাঁদিকের নিচু চড়াইয়ের ওপর দিয়ে, শাল বনের মধ্যে ঢুকে গেছলো।'

বাঁচা গেল, স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। বললাম, 'আমাদের সামনে যদি কোনো হাতি পড়ে, সেও যেন নির্ভীক আর মহৎ হয়।'

বদরিকা হেসে উঠলেন, বললেন, 'সেটা আশা করাই ভাল। তবে দৈবদুর্ঘটনার কথা বলা যায় না, তার জন্য সজাগ থাকাই উচিত। যেমন, শহরের রাস্তায় চলতে ফিরতেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রেখে, সাবধানে চলতে হয়, তা না হলে গাড়ি চাপা মরতে পারি।'

বদরিকার কথায়, চকিতেই আমার চোখে ভেসে উঠলো, কলকাতার রাস্তায় দ্রুত ধাবমান বিশাল দোতলা বাস। তার নিচে চাপা পড়লে, হাতির পায়ে পিষ্ট হওয়ার থেকে, কিছু কম মর্মান্তিক না। কিংবা দ্রুত গতি ট্রাম। কবি জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়ে গেল, যিনি ট্রামের তলায় চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলেন। মনে পড়ে যায়, তার কিছুদিন আগেই গর্জিত ক্রুদ্ধ ট্রামের আক্রমণের উপরে তিনি একটি কবিতাও লিখেছিলেন। যেন ভবিষ্যতের ছবিটা তিনি আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। আমি বললাম, 'খুব ঠিক কথা বলেছেন। আমরা অনেক সময়েই ভয়ংকরতা ভুলে যাই। মনে করি, বনেই বুঝি পদে পদে বিপদ, কিন্তু শহরে বিপদের সম্ভাবনাও কম না।'

বদরিকা বললেন, 'হয় তো বেশি-ই। শহরের বিপদের কথা আমাদের মনে থাকে না, কারণ শহরে বাস করতে আমরা অভ্যস্ত, বিপদ কাটিয়ে চলতে জানি। বনের পশু বা, এমন কি এই সব বনের গভীরে যে সব মানুষরা যুগ যুগ বাস করছে, তারা শহরের রাস্তায় পড়লে, নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়বে।'

কথা বলতে বলতে, বদরিকাপ্রসাদ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠছিলেন। তিনি যে কিছুটা শহরবিমুখ, তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু তিনি আস্তে আস্তে এমন গম্ভীর হয়ে উঠলেন কেন। গাম্ভীর্যের মধ্যে কোনো রুক্ষতা নেই, তথাপি গম্ভীর মুখে চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে যাবার মধ্যে, তাঁকে অন্যরকম লাগছে।

আমরা এখন অনেক উঁচুতে, আমাদের বাঁ দিকে, কোয়েনা বয়ে চলেছে। নিচে একটি সর্পিল নীল রেশমী ধারা, রোদে চলকায়। দূরের উঁচু থেকে তার কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে পাই না, কাছে গেলেই, তার আরণ্যক গান বেজে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই গভীর বনের সবখানি জুড়ে, সে গান করে চলেছে। সুর যদি বা জানা গিয়েছে, ভাষা কোনোদিনই বোঝা যায়নি। নিরন্তর সে তার নিজের ভাষায় বেজে চলেছে। মনে হয়, কোয়েনা যেন এই বিশাল বন পাহাড়কে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। যেখানেই যাই, কোয়েনা সবখানেই আছে। যখন নিচের দিকে নামি, তখন সে কাছেই চলকে ওঠে। আবার উঁচুতে উঠতে উঠতে, হঠাৎ হারিয়ে যায়, আবার হঠাৎ-ই দূরের নিচে চিকচিক করে ওঠে।

বদরিকাপ্রসাদ বললেন, 'আমার জীবনে একটা বড় অপরাধ এই সারেণ্ডার জঙ্গলেই ঘটেছিল। আপনি জরাইকেলা থেকে আসার সময়, সাম্‌টার ওপর দিয়ে এসেছিলেন, মনে আছে?'

একটু অবাক কৌতূহলিত চোখে, বদরিকার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আছে।'

বদরিকা বললেন, 'তা হলে নিশ্চয়ই মনে আছে, সাম্‌টা অনেকটা সমতল অঞ্চল?'

বললাম, 'হ্যাঁ। আমি সাম্‌টা নালাও দেখেছি।'

বদরিকা ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, 'নালাটা জঙ্গলের মধ্যে, তার ওপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। আমি সেদিকটার কথা বলছি না, গ্রামের কথা বলছি। বছর দুয়েক আগের ঘটনা। সিংজী সাহেব কী রকম জেদী লোক, আপনি হয় তো ঠিক জানেন না।'

বললাম, 'কতোটা জেদী, সেটা ঠিক বলতে পারবো না, তবে মনে হয়েছে, তিনি যা করতে বদ্ধপরিকর, তা করবেনই।

বদরিকা বললেন, 'ঠিক তাই। বছর দুয়েক আগে, একটা বিশেষ কাজে, আমি করমপোদায় গেছলাম। সেখানে সিংজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি সাধারণত মদ্যপানে অভ্যস্ত না। কিন্তু সিংজী কিছুতেই ছাড়েননি, তাঁর সঙ্গে আমাকে পান করতেই হয়েছিল। আর, পানের মাত্রাও একটু বেশি হয়ে গেছলো। কিন্তু সেদিনই আমার সাম্‌টার অফিসে ফেরার কথা। দিনের বেলাতে পান করে, জীপ নিয়ে আমি সাম্‌টার পথে বেরিয়েছিলাম। অন্ধকার হয়ে আসার আগেই যাতে ফিরতে পারি, সেটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যটা মোটেই ভাল ছিল না। মদ্যপান করে, দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আসার মধ্যে অনেক বিপদ ছিল। হয় তো পাহাড়ের নিচে ছিটকে পড়ে, মারা যেতে পারতাম। কিন্তু মারা পড়িনি, মেরে ফেলেছিলাম।'

বদরিকা চুপ করলেন। আমি যেন তাঁর কথার অর্থ না বুঝে, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মেরে ফেলেছিলেন?'

বদরিকা বললেন, 'হ্যাঁ, একজনকে না, দু'জনকে মেরে ফেলেছিলাম। দুটি অল্প বয়সের মেয়েকে।'

সম্ভবত সেই দৃশ্যই বদরিকার চোখের সামনে ভাসছিল। একটা আবেগকে দমন করার অভিব্যক্তি তার মুখে। ঠোঁটের ওপর চাপ দিয়ে, নিঃশব্দে কয়েক সেকেণ্ড, আস্তে আস্তে গাড়ি চালালেন, তারপরে বললেন, 'বিকেলের মধ্যেই

আমি সাম্‌টায় পৌঁছেছিলাম। সমতল রাস্তা পেয়ে আমি তখন আরো দ্রুতগামী। আমি দূর থেকেই, মেয়ে দুটিকে দেখতে পেয়েছিলাম। হর্নও দিয়েছিলাম। নিশ্চিন্ত ছিলাম, ওরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবে। কিন্তু মেয়ে দুটি হঠাৎ কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, কেন, তা আজো আমার অজানা। গাড়ির সামনে মুরগী পড়লে যেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, ওদের অবস্থা যেন সেইরকম। কোন্ দিকে যাবে, যেন ঠিক করতে পারছিল না, কেবল ছুটোছুটি করছিল। অথচ সরে যাবার জায়গা প্রচুর ছিল, এবং আমার তখনো স্থির বিশ্বাস, ওরা নিশ্চয়ই সরে যাবে। আমার স্থির বিশ্বাসটা তখন মস্তিষ্কে বিঁধে গেছে। কেন, তাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ওটাকে বলে দ্রব্যগুণ। সে বস্তু যদি আমার পেটে না থাকতো, রক্তে ক্রিয়াশীল না থাকতো, তা হলে স্থির বিশ্বাসের পরিবর্তে, দ্বিধা করে আমি গাড়ি থামিয়ে দিতাম। তা দিইনি, বরং যে বেগে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, সেই বেগেই ছুটেছিলাম, আর চকিতেই দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। মেয়ে দুটি পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, হাত ধরাধরি করেছিল। গাড়িতে একটা ঝাঁকুনি, আর একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলাম, গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলাম। কিন্তু তখন যা ঘটবার, তা ঘটে গেছে, মৃত্যু অচিরাৎ।'

বদরিকা চুপ করলেন। জীপ চালাচ্ছেন আস্তে, সর্পিল উৎরাইয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?'

বদরিকা বললেন, 'তারপরে অনেক কিছুই ঘটতে পারতো ঘটেনি। পুলিশের কাছে আমি নিজেই আত্মসমর্পণ করেছিলাম। আমাকে সবাই চিনতো, আমি অধিকাংশ মানুষের প্রীতিভাজন, কোনো মানুষের সঙ্গে আমি কখনো খারাপ ব্যবহার করিনি। জঙ্গলের আদিবাসীই হোক, আর বিহারী ও ওড়িয়া হোক, সকলের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। সেটাই আমাকে বাঁচিয়ে দেয়। তা ছাড়া মেয়ে দুটির বাবারা আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা রুজু করতে চায়নি, পুলিশও আমাকে রেহাই দিয়েছিল, এবং সৌভাগ্য, তার জন্য পুলিশকে আমার কোনোরকম ঘুষ দিতে হয়নি। মেয়ে দুটি ছিল কুরমি জাতির মেয়ে, তাদের বাবাদের কিছু টাকা দিয়েছিলাম। সে টাকা সামান্যই। টাকা দিয়ে, কোনো জীবনের মূল্যই হয় না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়ে দুটির বয়স কতো ছিল?'

বদরিকা বললেন, 'সেটা বিশেষভাবেই মনে গেঁথে আছে, বছর পাঁচ-ছয় বয়স। আমার একমাত্র মেয়ের বয়সও তখন তাই ছিল। নিজের মেয়েকে

অরণ্যের আদর করতে গেলেই, সেই কুরমি মেয়ে ছুটির কথা মনে পড়ে যেতো, কেন না, আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ ছিল, আমি হত্যা করেছি। সেই অপরাধবোধটা আমার আজও যায়নি।' ·

বদরিকা একটি লম্বা নিশ্বাস নিলেন, কিন্তু অনায়াসে নিশ্বাস ত্যাগ করতে পারলেন না। তাঁর বুকের খাঁচার মধ্যে যেন তা ফানুসের মতো ফুলে উঠলো। কথাটা উঠেছিল দৈব দুর্ঘটনা নিয়ে, জঙ্গলে বা শহরে। সন্দেহ নেই কুরমি মেয়ে ছুটি দুরন্তগতি গাড়ি দেখে ভয়চকিত বিভ্রান্তিতে, আত্মরক্ষার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। আচমকা কালান্তক বন্য পশু দেখলে, শহরের মানুষেরও একই অবস্থা হতে পারে। আত্মরক্ষার উপায় ভাবনা, ভয়ের গ্রাসে বিলীন হয়ে যাওয়া, কিছুমাত্র আশ্চর্য না। কিন্তু আমি ভাবছি বদরিকাপ্রসাদের কথা। আমরা মনে করি, মানুষ কেবল পুণ্যের মধ্যেই সুন্দর আর মহৎ। সেটা বোধহয় সব সত্যি না। পাপবোধের মধ্যেও, মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। বদরিকাপ্রসাদকে দেখে, আমার তাই মনে হচ্ছে। দুর্ঘটনা-দুর্ঘটনা-ই। উনি নিশ্চয়ই ঘাতক নন, হত্যাও করেননি। কিন্তু ওঁর মনুষ্যত্ববোধের মধ্যে, মানবিকতায় সেই স্বরূপ জাগ্রত, দুর্ঘটনা যে ভাবেই ঘটুক, নিজের দায়িত্বকে তিনি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করতে পারেন না। এই 'বোধযুক্ত' মানুষের সংখ্যা, পৃথিবীতে বিরল।

আমি বললাম, 'কিন্তু, এতো গভীরভাবে মনে রেখেই বা কী হবে, কষ্টই পাবেন।'

বদরিকা বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'জানি, তবু মন থেকে যেতে চায় না। এখনো জীপ চালাই, কিন্তু মদ্যপান করে কদাচ না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এটিই কি সেই জীপগাড়ি?'

বদরিকা হেসে বললেন, 'না, নিশ্চিন্ত থাকুন, এটাই সেই ঘাতক জীপ না।'

বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমরা এদেলবায় ঢুকেছি। বাঁদিকের নিচে লক্ষ্য রাখুন, কোয়েনা নদীর ধারে, মোহনবাবুর অস্থায়ী পাতায় ঘর দেখতে পাবেন। আমাদের সামনে এদেলবা গ্রাম।'

আমরা শিমূলফুলে ঢুকলাম, এ কথাই আমার প্রথম মনে হলো। এদেল মানে শিমুল, বা মানে ফুল। গ্রামের নাম শিমুলফুল। অথচ শিমুল গাছ তো তেমন দেখি না। শাল, করম, অর্জুন, সেগুন আর প্রচুর কাঁঠালি চাঁপা ফুলের গাছ। এদেলবা যেন চম্পাগন্ধা, বাতাসে ফুলের গন্ধ। তা ছাড়াও আছে, নাম

না জানা, নানা গাছ, যাদের ডালপালা নানান রঙীন ফুলে ভরা। তার মধ্যে আমার চেনা তিলুয়া, যার ফুল দিয়ে, তৃপ্তি কানের ভূষণ করেছিল।

সামনেই দেখতে পাচ্ছি কিছু মাটির ঘর। রঙ দেখলে মনে হয়, লাল রঙে ঘরের দেওয়াল রাঙানো। আসলে মাটির রঙেরই ঝলক। এখানে ওখানে কয়েকটা গরু বাঁধা। ছাগল চরছে আশেপাশে। প্রায় নগ্ন একটি বৃদ্ধ মুণ্ডা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, আমাদের দিকে দেখছে, এবং যেন চেনে, এমনিভাবে হাসছে। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার জানালো। বদরিকা মাথা নাড়লেন, আমি কপালে হাত ছোঁয়ালাম। এ সময়েই আমার চোখ পড়লো বাঁ দিকে। প্রায় দুশো ফুট নিচে কোয়েনা নদী, বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে, বন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে হারিয়ে গিয়েছে, গভীর বনের মধ্যে। নদীর জলের কাচস্বচ্ছ নিচে, রক্তিম মাকড়া পাথর স্পষ্টই দেখা যায়। জল বোধহয় এক হাঁটুও হবে না। নদীর ওপারের পাহাড়ে, অনেকগুলো বিশাল বনস্পতির ঘন ছায়া, তারপরেই নিচু হয়ে, অনেকটা উপত্যকার মতো নেমে এসেছে কোয়েনার জলে। এপারটা সম্পূর্ণ আলাদা, যেন সবুজ মখমল পাতা সমতল, কয়েকটি শাল চম্পা আর দেবদারু গাছ। নদীর ধারে, একটু উঁচু জায়গায়, বড় একটি পাতার ঘর। নিচুতে অনেকগুলো পাতার তৈরি ছোট ছোট দোচালা ছাউনি। তার পাশে পাশে, মাটি খুঁড়ে উনোন করা হয়েছে। ছাই আর পোড়া কাঠ জ্বালিয়ে দেয়, ওখানে রান্না হয়।

বদরিকা বললেন, 'আমরা ঘুরতে ঘুরতে ওখানেই নেমে যাবো। ছোট ছোট পাতার ঘর যেগুলো দেখছেন, ওগুলো মোহনবাবুর গাছ কাটার কুলীকামিনদের। ওদের ভাষায়, পাতার ঘরগুলোকে বলা হয় গুইয়ো।'

'গুইয়ো ?' আমি উচ্চারণটা ঠিক করে নেবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম।

বদরিকা বললেন, 'হ্যাঁ, গুইয়ো মানে পাতার ঘর।'

এর নাম ভাষা। বিশেষ শব্দের মূলটা থাকে, এক একটি ভাষার আদিতে। আমি জানি না, মুণ্ডারি ভাষার আদি কী। বুঝতে পারছি, আমরা ক্রমে চক্র দিয়ে বাঁ দিকে নেমে চলেছি। ইতিমধ্যে শিমুলফুল গ্রামের আরো কয়েকজন অধিবাসীকে দেখতে পেলাম। একটি গৃহের গাছের নিচে, মা বুক খুলে শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে। যেন কচি ঘাসের মাঠটিতে গোবৎস চরে বেড়াচ্ছে। মায়ের জিজ্ঞাসু কৌতূহলিত দৃষ্টি জীপের দিকে। বাড়ির উঠোনের ধারে উনোনে হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না করছে একটি যুবতী, তার সামনে বসে এক খালি গা নেংটি পরা জোয়ান। নিজেদের মধ্যে হেসে কথা বলতে বলতেই

রাস্তার ওপর জীপগাড়িকে একবার দেখে নিল। তারপরেই হঠাৎ ঘন গাছপালা নিবিড় হয়ে এলো। ঝিঁঝির ডাক শোনা গেল। শুকনো পাতায় খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে তাকাই, আর মনে হয় যেন বিশ্বের পরমাশ্চর্য আমার চোখের সামনে। হাত দুয়েক দূরেই, একটি ময়ূর। ঠোঁট দিয়ে মাটিতে কী খুঁটছে। সুদীর্ঘ পুচ্ছ মাটিতে লুটোচ্ছে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, যেন গৃহস্থের মুরগী উঠোনে দানা খুঁটে খাচ্ছে। আমি বলে উঠলাম, 'এ কি বন্য ময়ূর?'

বদরিকা বললেন, 'হ্যাঁ। এদেলবার এই অংশে প্রচুর ময়ূর আছে, অনেক দেখতে পাবেন।'

আমি প্রায় শিশুর উত্তেজনায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ধরা যায় না?'

বদরিকা বললেন, 'নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু আপনার আমার মতো আনাড়ী পারবে না।'

বললাম, 'কেন, এই তো একেবারে হাতের সামনেই রয়েছে। মনে হচ্ছে নেমে হাত বাড়ালেই ধরা যায়?'

বদরিকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'চেষ্টা করে দেখবেন?'

বদরিকার হাসিতে যেন রহস্য মাখানো। জিজ্ঞেস করলাম, 'নামলেই বোধহয় ভয় পেয়ে পালাবে?'

বদরিকা বললেন, 'মোটেই না। ওর চলাফেরা ভাবভঙ্গি দেখে কি আপনার মনে হচ্ছে, ও ভয় পেয়েছে? ভয় পেলে, গাড়ি দেখে, তার শব্দ শুনেই পালাতো। সেদিক থেকে বলতে পারেন, এ বনে ময়ূরেরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের দৃষ্টি খুব সজাগ, মারণাস্ত্র খুব ভাল চেনে। আপনার হাতে যদি 'সার আসার' দেখতে পেতো, চোখের পলকেই অদৃশ্য হয়ে যেতো।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সার আসারটা কী?'

বদরিকা হেসে বললেন, 'তীর ধনুক। মুণ্ডারা সার আসার বলে। ওরা সাধারণত তীর ধনুক দিয়েই ময়ূর বা বন্য মোরগ শিকার করে। সে জন্যই, বনের পশু পাখিরাও তীর ধনুক ভালভাবেই চেনে। অবিশ্যি বনের মানুষরা অনেক সময় ফাঁদ পেতেও ময়ূর ধরে।'

আমি অবাক হয়ে দেখছি, ময়ূরটার যেন কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, আমাদের নিয়ে। কয়েক হাত দূরেই সে নিজের মনে চরে বেড়াচ্ছে। দুটো মানুষ, একটা গাড়ি যেন ওর কাছে কিছুই না। সত্যি, বসে থাকতে পারলাম না, জীপ থেকে নেমে পড়লাম। পায়ে পায়ে ময়ূরটার কাছে এগিয়ে গেলাম।

আমি যখন তার দু' তিন হাতের মধ্যে, তখনো সে খুঁটে খেতেই ব্যাপৃত। উত্তেজনায় আমার বুকের তাল ভতর হলো, আমি প্রায় নিশ্চিত হয়ে, নিচু হয়ে ঝটিতি হাত বাড়ালাম। মনে হলো, প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছি, কিন্তু নিমেষের মধ্যেই, ময়ূর আমার ডান দিকে, হাত পাঁচেক দূরে সরে গিয়েছে। আমি আশা ছাড়তে পারলাম না, ডান দিকে ফিরে, হাত বাড়িয়ে, প্রায় ঝাঁপ দেবার মতো লাফিয়ে পড়লাম। কিন্তু চোখের পলকেই, ময়ূর আমার বাঁ দিকে, চার পাঁচ হাত দূরে।

বদরিকা গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন, শিশুর খেলা দেখছেন। কিন্তু আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। দু' বারই মনে হলো, যেন ধরেই ফেলেছি, অথচ অধরা ময়ূর নিমেষেই আমার নাগালের বাইরে। কিন্তু সে কখনোই অনেক দূরে যাচ্ছে না। নির্ভয় স্বাচ্ছন্দ্যে সে তার নিজের কাজ করে চলেছে।

বদরিকা বললেন, 'আপনি অনেক চেষ্টা করতে পারেন, পারবেন না। ও আপনাকে ছুটিয়ে ছুটিয়ে ক্লান্ত করে দেবে, এইরকম ঘুরে ঘুরে বেড়াবে আপনারই আশেপাশে, কিন্তু ওর একটি পালকও স্পর্শ করতে দেবে না।'

সে বিষয়ে এখন আর আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবু যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যার ছায়া স্পর্শ করতে পারছি, তার গায়ে স্পর্শ করতে পারছি না। ময়ূর তো নয় এ যেন মায়ার হরিণ। স্বর্ণ মারীচ। কয়েক মুহূর্ত হতাশ চোখে অপরূপ ময়ূরটির দিকে তাকিয়ে থাকি, তারপরেই নিজের বালখিল্যতায় নিজেই হেসে উঠি। কেন মাতি এই ধরা বাঁধার খেলায়? আমার হাতের পাঞ্জায়, বুক চেপেও যদি আদর করে ধরি, পাখিটির সেই বন্দীদশার রূপটিই আসল না। বনের এই অঙ্গনে, এই যে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাদ্য খুঁজছে, এটাই আসল রূপ। যার যেখানে ঠাঁই। আমার নিতান্ত মানুষিক লোভ, সুন্দরকে অসুন্দরই করবে।

ময়ূরটিকে দেখতে দেখতেই, জীপের কাছে ফিরে যাই। বদরিকা হেসে বললেন, 'এখানেই এখন থাকবেন, অনেক ময়ূর আপনার আশেপাশে এমনি করে ঘুরে বেড়াবে। হয়তো আপনার পাতার ঘরের সামনে এসেও আপনাকে লোভ দেখাবে, কিন্তু ধরা কিছুতেই দেবে না।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, 'আমি আর ধরতে চাই না। উত্তেজিত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই, কিন্তু বনের পাখিকে কব্জা করার ইচ্ছাটা মোটেই ভাল না।

বদরিকা হেসে উঠে, ঠাট্টা করে বললেন, 'আঙুর ফল তা হলে টক বলছেন?'

আমিও হেসে বললাম, 'এ কথা বলতে পারেন, আমি কিন্তু সেই ভেবেই বলিনি। হঠাৎ উত্তেজনার মধ্যে হতাশ হয়েছি নিশ্চয়ই, কিন্তু তারপরেই ময়ূরটির দিকে তাকিয়ে, নিজের ইচ্ছাটাকে ধিক্কার না দিয়ে পারলাম না। মনে হলো, বন্যেরা বনেই সুন্দর।'

বদরিকা বলে উঠলেন, 'আমি কিন্তু আপনাকে ঠাট্টা করেছি।'

বললাম, 'সেটা বুঝেছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বদরিকা হাসতে হাসতে গাড়ির এঞ্জিন চালু করলেন। ময়ূরটি এক পলকের জন্য চমকে তাকালো, তারপরেই আবার খুঁটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। গাড়ি এগিয়ে চললো। আস্তে আস্তে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে, গাড়ি নেমে এলো সমতল সবুজ মাঠে, বড় বড় শাল সেগুনের ছায়ায়। জীপ এসে দাঁড়ালো একেবারে মোহনবাবুর পাতার ঘরের কাছে। কারোর কোনো সাড়া শব্দ নেই। ঝিঁঝি ডাকা নিঝুমতার মধ্যে কেবল কোয়েনার কুলুকুলু গান।

বদরিকা বললেন, 'মনে হচ্ছে, এখানে কেউ নেই। সবাই গাছকাটার জায়গায় চলে গেছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কোথায়?'

বদরিকা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, 'মোহনবাবু এখানে যখন আস্তানা করেছেন, নিশ্চয় আশেপাশের কোনো জঙ্গলেই হবে। কিন্তু না জেনে, শুধু শুধু ঘোরা যাবে না। সঠিক জঙ্গল না জেনে, এসব জায়গায় অকারণ ঘুরতে হয়।'

বদরিকা এগিয়ে গেলেন মোহনবাবুর বড় পাতার ঘরের দিকে। একটু নিচেই কোয়েনার বালুচরের ওপরে অনেক কয়টা ছোট ছোট দোচালা পাতার ঝুপড়ি। সেগুলো কোনো খুঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে নেই। দেখলেই বোঝা যায়, নিচু হয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। ওপর থেকেই দেখেছিলাম, কুলী রেজাদের পাতার খুপরি। মোহনবাবুর পাতার ঘরটি বেশ বড়, আর মাথার চালাটাও উঁচু। বালুচরের ডান দিকেও একটি বড় পাতার ঘর রয়েছে। সেটা কার ঘর, কে জানে। তবে সে ঘরটাই সব থেকে বড় মনে হচ্ছে।

সমস্ত জায়গাটিকে অনেকটা তপোবনের মতো লাগছে। তপোবনই বলতে হবে। তপস্বী তপস্যায় বসে গেলেই হয়। ডানদিকে, কোয়েনার ওপারে রক্তিম আর কালো পাথরের পাহাড় আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, আর পাথরের খাঁজে খাঁজে শিকড় ছড়িয়ে উঠেছে বিশাল মহীরুহ। আরো অজস্র

অনেক গাছ, যাদের পাতায় নানা রঙের খেলা, ফুলে নানা বর্ণের ঝলক। বন পাহাড়ে যে এতো নানা বর্ণের কল্‌কী ফুলের গাছ থাকে, আগে জানা ছিল না। কিন্তু ওপারের পাহাড়টা, আমার মুখোমুখি হঠাৎ-ই যেন নেমে এসেছে, আর বাঁকানো পিঠের মতো একটা উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। তার কোল দিয়ে কোয়েনা একটা বাঁকের মুখে উধাও। উঁচু পাহাড়টার কোল ঘেঁষেও, অর্ধ-বৃত্তাকারে কোথায় যেন কলকলিয়ে ছুট দিয়ে, কোয়েনা চলে গিয়েছে চোখের আড়ালে। আমার ইচ্ছা করে, কোয়েনার এই হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া লুকোচুরি খেলার সঙ্গে মেতে যাই। আমিও ছুটে ছুটে তাকে খুঁজে বের করি।

বদরিকা মোহনবাবুর দরজার সামনে থেকে বললেন, 'ঘরের আগল তো দেখছি শক্ত করে বাঁধা। কিন্তু এই পাতার শিবির তো, কারোর পাহারায় না রেখে, মোহনবাবু যেতে পারেন না।'

আমি বদরিকার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কেন?'

বদরিকা বললেন, 'নিশ্চয়ই মোহনবাবুর বিরাট ভাঁড়ার এখানে আছে। সমস্ত কুলীকামিনদের চাল আটা খাবার-দাবার, নিজেদের খাবার-দাবার তেল ঘি মসলা সবই তো মজুদ রাখতে হয়। রোজ রোজ তিরিশ মাইল দূর থেকে সে সব আনা যায় না!'

ভুলেই গিয়েছি, আমরা আছি, এমন একটা গভীর বনের মধ্যে, যেখানে থাকতে হলে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হয়। যেমন সমুদ্র যাত্রা করতে হলে, খাদ্য আর পানীয় মজুদ রাখতেই হয়। এখানে হয়তো পানীয় মজুদ রাখতে হয় না, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে পাকা ইঁদারা আছে।

বদরিকাপ্রসাদ এবার ইংরেজি ছেড়ে, দেশীয় বচনে হাঁক দিলেন, 'হেই, ইধার কোই হ্যায়?' বলতে বলতে, নিচের দিকের ঝুপড়িগুলোর সামনে নেমে গেলেন। এ সময়ে আমার চোখে পড়লো, ডা-দিকের বড় পাতার ঘরের বেড়ার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠলো। মাঝ-বয়সী খালি গা লোকটির পরনে একটা ময়লা হাফ প্যাণ্ট, গলায় কালো কারের সঙ্গে ঝোলানো একটি ক্রস্‌ চিকচিক করছে। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা, ভাবলেশহীন মুখ, ছোট ছোট চোখ দুটি লাল। মনে হয় পাথরের মুখ, কোনো অভিব্যক্তি নেই। তার দৃষ্টি আমার দিকে। লোকটার ভাব ভঙ্গি বুঝতে পারি না, একটু অস্বস্তি বোধ করি।

বদরিকারও চোখ পড়ে লোকটার দিকে। তিনি হাঁকলেন, 'এই, তুম কৌন হ্যায়?'

মুহূর্তে যেন একটা ম্যাজিকের মতো, সেই ভাবলেশহীন মুখে অত্যাশ্চর্য হাসি ফুটে উঠলো। চোখ নেই, নাক নেই, বত্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত, গালে অনেকগুলো ভাঁজ। প্রায় কয়েক সেকেণ্ড সেই অবস্থায় থেকে, সে কপালে হাত ঠেকিয়ে নিচু হতে গিয়ে, টলে পড়তে গিয়ে টাল সামলালো। বদরিকা বললেন, 'হুঁম্! বুঝেছি।'

আমি বদরিকার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। বদরিকা বললেন, 'বুঝতে পারছেন না, হাঁড়িয়া খেয়ে, মাতাল হয়ে গেছে। বোধহয় আড়ালে আবডালে কোথাও পড়েছিল, ডাক শুনে এগিয়ে এসেছে।'

আমি লোকটির দিকে ফিরে তাকালাম। হাসিটি মুখে অমলিন। কপালে হাতটি ঠেকানোই আছে, যেন কাঠের সেপাই। যো হুকুম ভাব। আমার হাসি পেল।

বদরিকা ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুম দারু পিয়া?'

লোকটি প্রায় হেসে গুডিয়ে বললো, 'হবোয়া।'

বদরিকা আবার ধমক দিলেন, 'হবোয়া ক্যায়া, তুম জরুর পিয়া।'

লোকটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে একরকম ভাবেই বললো, 'হঁ হঁ, জরুর পিয়া।'

বলেই যেন গল্‌গল্ করে হাসতে লাগলো, আর বাতাস লাগা কচি ডালের মতো দুলতে লাগলো। বদরিকা গলা নামিয়ে আমাকে বললেন, 'এদের কাছে এটা কোনো অন্যায় না, খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তা ছাড়া একলা চুপচাপ বসে করেই বা কী। খানিকটা পান করে ব্যোম্ হয়ে পড়েছিল।'

বলে আবার লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্যায়া নাম হ্যায় তুমহারা?'

লোকটা যেন হাত নেড়ে নাম বলবার চেষ্টা করলো, তারপরে উচ্চারণ করলো, 'হোরো হোরো।'

বদরিকা বললেন, 'হোরো?'

লোকটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হোরো, অই অই হোরো।'

'তুম্ মোহনবাবুকা কাম করতা হ্যায়?'

হোরো ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'মোহনবাবুকা।'

জবাবের ভঙ্গিটি অদ্ভুত। বদরিকা জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কৌন্ জঙ্গলমে কাম হোতা হ্যায়, জানতা?'

হোরো ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'জান্‌তা। এহি বোলক, পাঁচোয়া লাট।'

বদরিকা কয়েক সেকেণ্ড ভেবে, আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ি উধার যাতা হ্যায় না?'

হোরো জবাব দিল, 'গাড়ি উধার যাতা।'

বদরিকা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে বসে থেকে কী হবে, চলুন গাছ কাটা দেখা যাক। বনের মধ্যে গাছ কাটা দেখেছেন কখনো?'

বললাম, 'না, চলুন দেখে আসি।'

যাবার আগে বদরিকা হোরোর দিকে, গম্ভীরভাবে বললেন, 'ঠিকসে দেখ্‌ ভাল্‌ করো, দারু পিকে মত্‌ শো যাও।'

হোরো গলগল করে হাসলো, কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'আপন রেঞ্জার সাব না?'

বদরিকার গোঁফের ফাঁকে হাসি, মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'হাঁ।'

হোরো আবার জিজ্ঞেস করলো, 'সাম্‌টা বোলক না?'

বদরিকা ফিরে চলতে চলতে শব্দ করলেন, 'হুঁম্‌।'

হোরো চিৎকার করলো, 'সালাম সাব।'

বদরিকা কোনো জবাব দিলেন না, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, জীপের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'এখন সামনে থাকলেই বকবক করবে। দ্রব্যগুণের মাহাত্ম্য যাকে বলে।'

হোরো লোকটিকে আমার ভাল লেগেছে। প্রথমে তার মুখ দেখে, একটু যেন ভয়ই পেয়েছিলাম। সেই মুখে যে এরকম একটি হাসি ফুটতে পারে, ভাবতে পারিনি। তার সারল্য প্রশ্নাতীত, কথার ভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছে। জীপে ওঠবার আগে, আর একবার পিছন ফিরে তার দিকে তাকালাম। সে সেই হাসি মুখটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বন পাহাড়ের ভিতরে, কোনো রাস্তাই পিচ্‌ বাঁধানো না। শক্ত পাথর মাটির দুরমুশ করা রাস্তা। ভারী ভারী ট্রাক কাঠ বোঝাই করে অনায়াসে চলে। কিন্তু বদরিকা এবার যে পথে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন, তা অনেকটা সুড়ং-এর মতো। বন গভীরতর, প্রায় অন্ধকার। অসূর্যম্পর্শ ভূমি ভেজা। কোনোরকমে কাটানো রাস্তা, বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়ানো। খানে খানে খানা খন্দ। গাড়ি সাবাধনে চালাতে হচ্ছে। উঁচু নিচু মোড় আর বাঁক ফেরা কিছুটা অন্তর অন্তরই। তারপরেই হঠাৎ চোখে পড়ে, জঙ্গলের এক পাশে মোহনবাবুর লরী দাঁড়িয়ে। উঁচুতে অনেকের গলার স্বর, গাছের গোড়ায় একাধিক কুড়োলের আঘাতের শব্দ। বদরিকা যেখানে গাড়ি দাঁড় করান, তারপরে আর এগোবার

রাস্তা প্রায় নেই। খানিকটা চড়াই নামলেই, একটি পায়ের পাতা ডোবানো নালা, তার ওপরেই কয়েক শো ফুট ওপরে, গাছ কাটা চলছে।

বদরিকার সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। বদরিকা ওপরের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'উঠতে পারবেন তো?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

বদরিকা একবার ধুতি পাঞ্জাবি আর পায়ের চপ্পলের দিকে দেখলেন। তিনি ট্রাউজার শার্টের সঙ্গে বুট পরেছেন। আমি বললাম, 'আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

বদরিকা এগোতে এগোতে বললেন, 'জানি। মোহনবাবু তো ধুতিতে কাছা এঁটেই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কাজ করেন। সবই অভ্যাসের ব্যাপার।'

তা বটে, কিন্তু নালাটা পার হওয়া যায় কেমন করে। বদরিকা লাফিয়ে পার হলেন। ওঁর পায়ে বুট। চপ্পলে একটু অসুবিধা। তবু দিলাম লাফ, বদরিকা আমাকে ধরে নিলেন। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অনেকে আমাদের দিকে দেখছে। কে একজন ধমক দিয়ে, তাদের কাজে লাগিয়ে, নিজেই আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। মোহনবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না, এদেলবায় আমি যাঁর অতিথি। পাহাড়টা তেমন খাড়াই না, কিন্তু ওপরে ওঠবার পথ বলে কিছু নেই, জায়গা বুঝে পা দিয়ে উঠতে হচ্ছে। একটু অমনোযোগী হলে পতনের সম্ভাবনা, আর পতন মানেই হাড়গোড় নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কার কারণ আছে।

হঠাৎ এক সঙ্গে অনেকগুলো স্বর চিৎকার করে উঠলো, তারপরেই প্রচণ্ড একটা শব্দ, মূল থেকে ছিন্ন হওয়া গাছের গুঁড়ির। তারপরেই গাছটির পতনের শব্দও শোনা গেল। আমরা ওপরে উঠে দেখলাম, সেখানে আর খাড়াই নেই, উপত্যকার মতো অনেকখানি অঞ্চল, গভীর বন। সবই প্রায় শাল। সূর্যালোকের প্রবেশে বিশেষ বাধা। বদরিকা আমাকে নিয়ে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ালেন। যে কোনো মুহূর্তেই গাছ কাটাদের সমবেত চীৎকারের সঙ্গে, বিশাল মহীরুহ, ছিন্নমূল হয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে পারে। পড়লে যা হতে পারে, সেই পরিণতি নিয়ে চিন্তা না করাই ভাল। কেন না, তারপরে আর চিন্তা করার কিছু থাকে না।

আমাদের আসতে দেখেই, অনেকে দেখছিল। এবার যেন সাময়িক কর্মবিরতিও দেখা গেল। সকলেই প্রায় আমাদের দিকে দেখছে। এ সময়ে,

মোহনবাবু কোথা থেকে, আমাদের সামনে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একেবারে জঙ্গলে চলে এসেছেন?'

বললাম, 'জঙ্গলের বাইরে আর কোথায় আছি। চারদিকেই তো জঙ্গল।'

মোহনবাবুর ফর্সা মুখ এখন একটু লাল, ঘামছেন। বললেন, 'তা হলেও, এরকম জঙ্গলে বেশিক্ষণ থাকা কষ্টকর। ছোট নাগরা থেকে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

বলতে বলতে তিনি বদরিকাপ্রসাদের দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'আমার সৌভাগ্য, প্রসাদজীর সঙ্গ পেয়েছি। সারাটা পথ কেমন করে এলাম, জানতেই পারিনি।'

বদরিকা এবার হিন্দীতে মোহনবাবুকে বললেন, 'উনি তো আর এখন আপনার একলার মেহ্‌মান নন, আমাদের সকলের।'

মোহনবাবু হাত বাড়িয়ে, বদরিকার একটি হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। মোহনবাবুর এখন আর ঝোলানো কোঁচা নেই। কোঁচা পশ্চাদ্দেশে গিয়ে এখন মালকোঁচা হয়েছে। গায়ে অবিশ্যি মটকার পাঞ্জাবি আছে। কিন্তু হাতা গুটানো। তিনি এমনিতেই দেখতে সুপুরুষ, এখন যেন বয়সের থেকেও অনেক বেশি যুবক দেখাচ্ছে। কিন্তু তিনি কি এর মধ্যেই কিঞ্চিৎ পান করেছেন? গন্ধে যেন তাই মালুম দেয়? জরাইকেলায় প্রথম দিন সন্ধ্যারাত্রে, সিংজীর বৈঠকখানাতেই ওঁকে পান করতে দেখে মনে হয়েছিল, মহাশয়ের ও দ্রব্যটিতে বিলক্ষণ আসক্তি আছে। জঙ্গল ঘুরে কাজের সময়ও যে গলা ভেজান, এটা জানা ছিল না।

এ সময়ে সুরীন এসে সামনে দাঁড়ালো, হেসে হাত তুলে আমাকে আর বদরিকাকে নমস্কার জানালো। আমাকে বললো, 'যাক, এসে গেছেন তা হলে?'

বললাম, 'না এসে থাকি কেমন করে বলুন। এই বনকে আপনারা একলা ভোগ করবেন, তা কি হয়?'

মোহনবাবু জবাব দিলে, 'আমাদের ভোগ করা তো দেখছেন। নিজের হাতে গাছ কাটি না বটে, কিন্তু সঙ্গে থাকতে হয়, কাজ করতে হয়। আইন-কানুনের অনেক ঝামেলা। যে গাছে মার্কিং রেঞ্জারের মার্কা দেওয়া নেই, সে গাছে যদি কোনো কুলী ভুল করেও কুড়োল বসায়, ইজারাদার হিসাবে আমার নাম উঠে যাবে ব্ল্যাক লিস্টে। জঙ্গল থেকে বিদায়। কোথাও আর টেণ্ডার দিতে পারবো না। তা ছাড়া, আস্তানা ছেড়ে বেরিয়েছি কখন জানেন? সেই অন্ধকার থাকতে।'

এত কথা জানা ছিল না। সংসারে কোনো কাজটাই খুব সহজ না। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যাদের চলে, তাদের চলে, তারা কোটিকে গোটিক। অধিকাংশকেই নিজের নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়।

স্বরীন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'হেই যোশেফ, ক্যায়া হুয়া? কাম বন্ধ্ হো গয়া?'

যোশেফ! এখানে আবার সাহেব এলো কে? নরনারী সবাইকেই তো বনবাসী দেখছি। আছে, তার মধ্যেও সাহেব আছে, যদি নামেতেই সাহেব হয়। যার নাম যোশেফ সে খাকি হাফ প্যান্টের মধ্যে, ধূসর রঙের হাফ শার্ট গুঁজেছে। তার পায়ে দেখছি, মোটরের টায়ার কাটা স্যাণ্ডেল। সে হঠাৎ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে চেঁচিয়ে উঠলো, 'হেই হেই, ক্যায়া দেখতা হ্যায়? সিনিমা দেখতা হ্যায়? কাম করো, কাম করো।'

মেয়ে পুরুষের হাসি কথাবার্তার মধ্যে, আবার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। ঝপাঝপ কুড়ালের আঘাত পড়তে থাকে। একদল পতিত বনস্পতির ডালপালা কাটছে। আর একদল বড় গুঁড়ি দড়ি বেঁধে পাহড়ের নিচে নামাচ্ছে, লরীতে তুলবে বলে। অন্য দল মহীরুহের গোড়ায় কুড়োল কোপাচ্ছে। একটা আশ্চর্য দেখি, এই নিবিড় বনের মধ্যে, বেশ গরম। আমিও ঘেমে উঠছি। তার কারণ বোধ হয়, ঠাস বুনোট বন। বরং সূর্যালোকের ফাঁকায় হাওয়া বহে, সেখানে শরীর জুড়ায়।

মোহনবাবু বললেন, 'স্বরীন তোমার তো আর তা হলে এখানে থাকা চলে না। এখন সব থেকে বড় দায়িত্ব তোমার।'

স্বরীন আমার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসলো। মানুষটি হয় তো সে মোহনবাবুর থেকেও বয়সে কিছু বড়। তাতে কিছু আসে যায় না। স্বরীন হলো জরাইকেলার মোটর মেকানিক। মোটর মেকানিক ছাড়া, এ অঞ্চলে কাজ চলে না। কখন কোন্ গাড়ি বিগড়ে বসে থাকবে, সেজন্য কলকাতা বা টাটা বা রৌরকেল্লার মুখ চেয়ে বসে থাকা যায় না। তথাপি, শুনেছি, বর্ষাকালে, কলকাতার মোটর মেকানিকদের এখানে ডেকে নিয়ে আসা হয় মোটা মজুরি দিয়ে। জুন জুলাই আগস্ট, তিন মাস বনের গাছ কাটা আইনের দ্বারা বন্ধ। সে সময় যে কেবল গাছেরাই বাড়ে, তা না। ট্রাক লরী চলবার মতো অবস্থাও রাস্তা-ঘাটের থাকে না। তখন লরীগুলোর মেরামতি কাজ চলে।

একলা স্বরীন আর কতো লরী মেরামত করবে। তবে, সে হলো বারো

মাসের লোক। তার মেরামতি কাজ বারো-মাসই চলে। মোহনবাবু ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মাঝ পথে গাড়ি খারাপ হলে যেন পথে পড়ে থাকতে না হয়।

মোহনবাবু সুরীনের কোন্ দায়িত্বের কথা বলছেন? আমার দিকে তাকিয়ে সুরীনের সলজ্জ হাসিরই বা কারণ কী? মোহনবাবু নিজেই তার জবাব দিলেন, 'সুরীন আজ আপনাকে মুরগী পাতুরি খাওয়াবে।'

'মুরগী পাতুরি? কস্মিনকালেও কুক্কুটরন্ধনের এমন নাম শুনিনি। মাছের পাতুরি হয় জানি, মুরগীর পাতুরি বস্তুটি আবার কেমন? বললাম, 'মুরগী পাতুরির কথা কখনো শুনিনি তো?'

মোহনবাবু বললেন, 'শোনেননি, আজ একেবারে স্বাদ নিয়েই দেখবেন। সুরীন অনেক কিছুই রাঁধতে জানে, তার মধ্যে মুরগী পাতুরি একটি।'

সুরীন বললো, 'তা হলে আমি চলে যাই, বেলা তো কম হলো না।'

মোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি চলে যাও। আমরা একটু পরে যাচ্ছি।'

দায়িত্বপরায়ণ সুরীন আর দেরি করলো না, আর একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে, নমস্কার করে চলে গেল। সুরীনের বিনয়, নমস্কার বারে বারে দেখতে হয়। জরাইকেলাতেও দেখেছি, দিনে যতোবারই দেখা হোক, নমস্কার আর হাসিটি ঠিক আছে।

সুরীন বিপত্নীক, দুটি না তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে। এখনো সে ঘরে কোনো ঘরনী আনেনি, কিন্তু এক রকমের ঘরনী তার আছে। জরাই-কেলায় আমি যে-বাড়ির অতিথি ছিলাম, সেই বাড়িতে সংসারের রান্নাবান্না দেখাশোনা যাবতীয় যে করে, তার নাম জেমা, একটি মুণ্ডা যুবতী। সে বাড়িতে এখন মহিলা বলতে কেউ নেই, জেমা ছাড়া। জেমা ওর জন্ম থেকে সে বাড়িতে আছে। তার মা যখন সে বাড়িতে কাজ করতো, তখন সে বাড়ির ইজারাদার পরিবারটি ছিল জমজমাট, লোকও ছিল অনেক। তারপরে কালের প্রবাহেই, সংসারের নানান ডালপালা, নানা দিকে ছড়িয়ে গিয়েছে। ইজারা-দারি গিয়েছে, এখন কিছু জমি আর লরীর ব্যবসা। বাড়িটিও বিরাট। দেখাশোনার জন্য আছে দুই ভাই, গোপাল আর নিতু, দু'জনেই অবিবাহিত। বাকি সব কলকাতায়।

জেমা কেন সেখানে? তার তো এতদিনে বিয়ে হয়ে, ছেলেমেয়ের মা হয়ে, কোনো জঙ্গলে থাকার কথা। না, তা হয়নি। তবে জেমার বিয়ে হয়েছিল এক মুণ্ডা জোয়ানের সঙ্গেই। বিয়ের পরে বোঝা গিয়েছিল, বাঙালী পরিবারে

জন্ম থেকে মানুষ হয়ে, বাঙালী আচার আচরণে অভ্যস্ত, আর খাদ্য খেয়ে, সে একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। স্বামীর ঘর সে করতে পারেনি, ফিরে এসেছিল সেই বাড়িতেই। স্বামী ছেড়ে আসাটা এই বনের সমাজে, তেমন একটা কিছু অভাবনীয় ব্যাপার কিছু না। সাবেক কালের বুড়ো কর্তার কাছে তার প্রার্থনা ছিল, সে চিরদিন তাঁর বাড়িতে থাকবে, কাজ করবে, অন্য কোথাও যাবে না।

কর্তা রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু জানতেন না, ভবিষ্যতে একদা, সেই মুণ্ডা মেয়েটিই তাঁর জরাইকেলার সংসারের কর্ত্রী হয়ে উঠবে। জেমার সেই কর্ত্রীরূপ আমি দেখে এসেছি। কর্ত্রী বলতে, কর্তৃত্ব সে কিছুই করে না। অথচ তাকে বাদ দিয়ে, কিছুই চলে না। গোপাল তাকে বোনের মতো দেখে, নিতু দিদির মতো। সে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্যতা জেমার আছে। তার কালো সুশ্রী চেহারার মধ্যে আমি একটি বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখেছি। তার অভ্যর্থনায় শুধু মুগ্ধ হইনি, তার হাতের স্বাদু বাঙালী ব্যঞ্জনের স্বাদে রসনাও তৃপ্ত করেছি।

সেই জেমার সঙ্গে যে সুরীনের সম্পর্কটি কেমন, তার সঠিক ব্যাখ্যা কেমন করে করা যায়। জানি না। দেখেছি, সুরীন রান্না ঘরে বসে বসে জেমার সঙ্গে গল্প করে। তাদের কথাবার্তা হাসির টুকরো কানে এসেছে। অথচ, আমাদের সামনে এলেই, জেমা সুরীনের দিকে সহজভাবে তাকাতে পারে না। তার চোখের দৃষ্টি বদলে যায়, ভাষা আর স্বরের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি।

নিতুর মুখেই শুনেছি, জেমা তার বাড়ির কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে যায় সুরীনের বাড়িতে। রান্নাবান্নায় সাহায্য করে আসে। সুরীনের ছেলেমেয়েদের নাইয়ে ধুইয়ে আসে। দুপুরবেলা নিতু আর গোপালকে খাইয়ে সুরীনের বাড়ি গিয়ে, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে আসে। সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যায়, নিজের শত কাজের মধ্যেও। সুরীনের সংসারের দায়িত্ব সে এভাবেই পালন করে চলেছে।

এবার ভাবো, জেমা সুরীনের সম্পর্ক কী? সেই বাউল গানের কথা মনে পড়ে যায়, 'আমি না হবো সতী, না হবো অসতী, স্বামীর ঘর তো করবো না।' সুরীন-জেমা, সেই বাউল গানের রহস্তে বিরাজ করে নাকি, কে জানে?

তবু জেমার আরণ্যক সুগঠিত শরীরের দিকে তাকিয়ে, মনের মধ্যে একটা করুণ জিজ্ঞাসা জাগেই। ওর জীবনে ফুল কি ফুটবে না? ফল কি ধরবে না? কার কাছে এ জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাবে, জানি না।

মোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, এত অন্যমনস্ক কেন?'

সচকিত লজ্জায় হেসে বললাম, 'না না, অন্যমনস্ক হবো কেন?'

মোহনবাবু বললেন, 'জানি, আপনি সুরীনের কথা ভাবছিলেন।'

আমি বদরিকার দিকে একবার তাকিয়ে হেসে বললাম, 'ঠিকই বলেছেন। লোকটিকে আমার সত্যি ভাল লেগেছে।'

মোহনবাবু বললেন, 'আপনার হয় তো এমনিতে দেখে ভাল লেগেছে। আমি আমার জীবনে এমন সৎ বিশ্বাসী অথচ গরীব মানুষ কখনো দেখিনি। আর সুরীন অত্যন্ত সরল। মেকানিক হিসাবেও বেশ ভাল। লোকে ওকে প্রচুর খাটায়, কিন্তু পুরোপুরি মজুরীটুকু দেয় না। ও তার জন্য বিবাদ করে না। এ নিয়ে অনেকদিন বলেছি। হাসে, চুপ করে থাকে।'

সুরীন হলো, সেই জাতের মানুষ, নিজের কাজে যার গাফিলতি নেই, বিরোধ থেকে দূরে। নিজের মনের জগতে বিরাজ করে, সেই জগতেই তার চলাফেরা। এমন লোকেরা অনুভূতিশীল মানুষের স্নেহ পায়, স্বার্থান্বেষীদের কাছে জোটে বিদ্রূপ, কারণ ও যে নির্বিরোধী ভাল মানুষ। আমি ভাবি অন্য কথা। সুরীন ওর যে মনের জগতে চলে ফিরে বেড়ায়, সেই জগতে জেমা নাম্নী বঙ্গ-মুণ্ডানীর অবস্থানটি কেমন, এবং কোথায় ?

হঠাৎ গানের সুরে, বাঁ দিকে তাকাই। ঘাড় বাঁকিয়ে একটি মেয়ে, আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছে। হাতে তার একটি ধারালো কাটারি, যার শাণিত ঝলক যেন তারই কালো চোখে। মুখখানি চিনি চিনি মনে হচ্ছে, অথচ চিনতে পারছি না। সে একবার যেন ঘাড়ও দোলালো, তার পরে খিলখিল হেসে, কষ্টিপাথরের শরীরে, প্রাণ-সঞ্চারি লহরী তুলে, কাটারি দিয়ে মহীরুহের ডালপালা কাটতে লাগলো।

মোহনবাবু বললেন, 'চিনতে পারলেন না? এ তো সেই সুরতিয়া, জরাইকেলা থেকে আসার সময়, লরীতে উঠেছিল।

মনে পড়ে গেল। জরাইকেলা থেকে ছোট নাগরার পথে, সুরতিয়াকে দেখেছিলাম। সে একলা ছিল না সঙ্গে ছিল ওর দিদি সোমারি, সোমারির স্বামী শুক্রম। নামের সঙ্গে মানে আছে, একজনের জন্ম সোমবারে, আর একজনের শুক্রে। কিন্তু সুরসতিয়া নামটি খাঁটি মুণ্ডা বলে মনে হয়নি। এ নাম যেন সমতলের গ্রাম জনপদের, মুণ্ডা ওরাওঁরা যাদের দীখু বলে। হয়তো সরস্বতী থেকে সুরসতিয়ার আটপৌরে উচ্চারণ। মোহনবাবুর লরীতে আসবার সময় দেখেছিলাম, প্রায় নেংটি পরা একটি শিকারী পুরুষ, হাতে তার তীর ধনুক, সঙ্গে দুই সঙ্গিনী। প্রথমে মোহনবাবুরই চোখে পড়েছিল, চিনতে পেরেছিলেন, ওরা তাঁরই ঠিকাদারীর অধীনস্থ কুলী আর রেজা। এদেলবায় যাদের পাতায়

ঘর তৈরি করার কথা, তারা স্বচ্ছন্দে শিকারে বেরিয়ে পড়েছিল। মোহনবাবু লরী থামিয়ে, ওদের বকে ধমকে তুলে নিয়েছিলেন। আমি ইচ্ছা করেই, লরীর পিছনে সুরীনের সঙ্গে বসেছিলাম, খোলা আকাশের নিচে বন দেখতে আসবো বলে।

সুরসতিয়া ওর দিদি আর ভগ্নিপতির সঙ্গে, পিছনেই উঠেছিল। সোমারির খাটো কাপড়ের কোঁচড়ে ছিল, নিহত রক্তাক্ত একটি বনমোরগ। তিনটি টায়ারের মাঝখানে ওরা বসেছিল। শুক্রম অনায়াসে ওর যুবতী পত্নী সোমারির কোমর জড়িয়ে ধরে বসেছিল। সুরসতিয়ার খাটো উদাস আঁচলের কাছে যেন পাথরের মূর্তির বুকে রোদ পড়েছিল। আমার দৃষ্টি কেঁপে গিয়েছিল যেন। ভেবেছিলাম, কোণারকের শিল্পীরা কি এই সব মূর্তি দেখেছিল। ভাস্কর্যে যেন এদেরই দেখেছিলাম মন্দিরের গায়ে।

নামধামগুলো বলে দিয়েছিল সুরীন। সুরসতিয়া ছোট, বোধহয় সতরো আঠারো, তার চেয়ে কিছু বেশি সোমারি। শুক্রম সোমারির থেকে বিশেষ বড় না। একটু পরেই, সুরসতিয়ার একটা করে গানের কলি গুনগুনিয়ে উঠেছিল, আর দুই বোন আমার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল। তারপরে এক সময়ে দুই বোনই গুনগুন করে এক এক কলি গাইছিল, আর আমাকে দেখে দেখে হাসছিল। ব্যাপার যখন কিছুই বুঝতে পারছি না, তখন সুরীন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, ওরা আমার সিগারেটের টিন আর সিগারেট খাওয়া নিয়ে, গান করছিল, যার ভাষাটা ছিল এইরকম, 'অচেনা নতুন এক ইজারাদার দেখছি। তার ধুমপানের গন্ধটি মিঠে। বাবুর হাতের টিনে মনে হয় অনেক সিগারেট আছে, বাবু বেশ খানদানি। এমন মিঠা গন্ধের সিগারেট, বাবু কি আমাদের দিতে পারে না? একলা খাওয়াতে কোনো সুখ নেই।'

খুব অবাক হয়েছিলাম, যখন সুরীনের কাছে শুনলাম, গানগুলো তখনই তৈরি করে ওরা গাইছিল। অনেকেই নাকি এরকম পারে। অনেকটা কবিগানের মতোই, তাৎক্ষণিক সৃষ্টি! ওদের সিগারেট দিয়েছিলাম। তারপরে সুরসতিয়া আমার দিকে তাকিয়ে, বোনের দিকে ফিরে হেসে হেসে গান গেয়েছিল, যার অর্থ; 'মানুষটার মন বড় দরাজ। আমি চাইলে বোধহয় একটা পুরো পাহাড় দিয়ে দেবে। মানুষটার মন বেশ ভাল।'

অদ্ভুত গান, পুরো একটা পাহাড়ের আকাঙ্ক্ষা সুরসতিয়ার। আসলে সেটাই বোধহয় এদেশের প্রার্থনা, একটা পাহাড় মানে, ভূমি আর বনসম্পদ লাভ। গান শুনে অবাক না হয়ে পারিনি, তার চেয়ে বেশি মুগ্ধতা। স্বীকার না করে উপায়

নেই, সুরসতিয়া যখন আমার দিকে তাকিয়ে, আবার ওর দিদির চোখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল, মনে হচ্ছিল, আমাকে যেন ও ওদের আদিম মন্ত্রে মুগ্ধ করছে। সুরসতিয়া যেন এই গভীর বনের উল্লাস আমার রক্তে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ছোট নাগরা থেকে, ওদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। কথা ছিল এদেলবায় আবার দেখা মিলবে। সুরসতিয়া গান গেয়ে, হেসে, জানিয়ে দিল, এই সেই প্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। আমি কুলী রেজাদের ভিড়ে সোমারি আর শুক্রমকে খুঁজলাম। দেখতে পাচ্ছি না।

বদরিকাপ্রসাদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে কি ওই মেয়েটি চেনে?'

তিনি চোখের ইশারায় সুরসতিয়াকে দেখিয়ে দিলেন। বললাম, হ্যাঁ।'

'আপনি কি ওকে কখনো সিগারেট দিয়েছিলেন?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে জানলেন?'

বদরিকা হেসে বললেন, 'মেয়েটি গান গেয়ে, সে কথাই বললো।'

কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বললো?'

বদরিকা বললেন, 'ও বলছে, এই যে আমার সেই সিগারেটবাবু এসেছে। কিন্তু বাবু আমাকে এখনো দেখতে পায়নি।'

আমি অবাক আনন্দে সুরসতিয়ার দিকে তাকালাম। পাতার আড়ালে ওর মুখ, কিন্তু চোখ দুটি আমার দিকে। যেন ইচ্ছা করেই মুখখানিকে একটু আড়াল করার চেষ্টা, লুকোচুরি খেলা। চোখে হাসির ঝিলিক। ওর দুই কাঁধই খোলা, সেখানে রোদ পড়েছে যেন কোমল কষ্টিপাথরের গায়ে। বোধহয় কাজের সুবিধার জন্য, বুক ঢেকে, আঁচল কুক্ষিতলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে, আবার বুকের এক পাশেই গুঁজে দিয়েছে। ওর সঙ্গিনী কর্মরত মেয়েরা, ওকে দেখছে, আমাকে দেখছে, আর হাসাহাসি করছে।

মোহনবাবু বললেন, 'আমি আবার ওদের মুণ্ডা ভাষার মুণ্ডুও বুঝি না। প্রসাদজী না থাকলে, আপনাকে বুঝিয়ে বলবার কেউ ছিল না।'

বদরিকা বললেন, 'আসলে মেয়েটি নিজের উপস্থিতি জানাবার জন্যই, গান গেয়ে উঠেছিল।'

মোহনবাবু বললেন, 'সুরসতিয়া মেয়েটা বেশ ভাল, চালাক-চতুর, কিন্তু পাজী আছে।'

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই নাকি?'

মোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। আমার কাজ করে, দলের ছেলেরা সবাই ওর পেছনে ঘুর ঘুর করে। ও সবাইকেই তাল দিয়ে চলেছে, কিন্তু কারোর কাছে ঘেঁষে না, ঘেঁষতেও দেয় না। রীতিমতো কমপিটিশন চলছে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কমপিটিশন ? কিসের ?'

'কমপিটিশন একটাই, তাকে বিয়ে বলুন, আর প্রেমই বলুন।' মোহনবাবু বললেন।

বদরিকা বললেন, 'সেটাই তো নিয়ম। না খেললে আর মিলনের মজা কোথায় ? কিন্তু মোহনবাবু, আমি এবার যাই। আমাকে বড় জামদায় যেতে হবে, আজই আবার ফিরতে হবে।'

মোহনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব! না খেয়ে আপনি কোথাও যাবেন না। সুরীন চলে গেছে, এক ঘণ্টার মধ্যে ওর রান্না শেষ হয়ে যাবে।'

বদরিকা বিব্রতভাবে হেসে বললেন, 'আপনার কাছে খেয়ে, তারপরে বড় জামদায় গিয়ে আজ সন্ধের মধ্যে আমি আর ফিরতে পারবো না।'

মোহনবাবু বললেন, 'একটা রাত থেকে যাবেন বড় জামদায়। আপনাদের এতো তাড়াহুড়ো কিসের ? এখন সিংজীর কথা বলুন, তিনি কবে আসবেন ?'

'বদরিকা বললেন, 'যে কোনোদিন আসতে পারেন, আমাকে সেইরকমই বলে দিয়েছেন।'

আমার আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা শুনতে ইচ্ছা করছিল না। চারপাশে ঘুরে দেখতে ইচ্ছা করছে। মোহনবাবুকে বললাম, 'আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখবো ?'

মোহনবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখবেন। আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আপনারা কথা বলুন, আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি।'

মোহনবাবু বললেন, 'দেখুন, তবে একটু সাবধানে। যেখানে গাছ কাটা হচ্ছে, সেখানে লক্ষ্য রাখবেন, গাছটা কোন্‌দিকে পড়ে। আর যেখান থেকে গাছের গুঁড়ি ঠেলে গড়িয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে সেদিকেও খুব সাবধান।'

আমি চলতে চলতে বললাম, 'লক্ষ্য রাখবো।'

সামনের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে, আমার প্রথমেই, আবার দৃষ্টি গেল সুরমতিয়ার দিকে। এখন ওর মুখ পাতার আড়ালে লুকানো নেই। ডালের

গায়ে কাটারির কোপ দিচ্ছে, কিন্তু দৃষ্টি সেদিকে নেই। কৌতূহলিত চোখে, তাকিয়ে আছে, আমার দিকে।

পিছন থেকে মোহনবাবু বললেন, 'আপনি একটু সুরসতিয়ার সঙ্গে দেখা করে যান, ও আমার জন্যই বোধহয় আসতে পারছে না, আমার কাজেও ফাঁকি দিচ্ছে।'

বলে হেসে উঠলেন। আমিই যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। কিন্তু লজ্জার অবকাশ সুরসতিয়ার নেই। এই হচ্ছে বনের মানুষের বন্য সরলতা। তার লুকোছাপার কিছু নেই। সে তার নিজের মতো করেই, নিজের উপস্থিতির সংবাদ দেয় এবং অনায়াসেই দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। আমি যে ওর সিগারেটবাবু। ওকে চোখে পড়েনি বলে, গান গেয়েই সেটা শুনিয়ে দিয়েছে।

আমি ওর দিকে এগোতে গিয়ে, খানিকটা এগিয়ে থমকে গেলাম। কী করে ওর কাছে যাবো? ও তো রয়েছে এক পতিত বৃহৎ বনস্পতির ডালপালার গভীরে। কিন্তু তার জন্য আমাকে ভাবিত হতে হলো না। ও কাটারির অগ্রভাগ ডালের গায়ে কোপ দিয়ে বসিয়ে, ডালপালা সরিয়ে, উঁচু নিচু হয়ে, নানান ভাবে, আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর কপালে, নাকে, চিবুকে ঘাম জমেছে। কিন্তু কাজ করতে আসা মানে তো কেবল কাজই না, প্রসাধনেরও প্রয়োজন আছে। অতএব খোঁপায় গোঁজা এক গুচ্ছ শাদা ফুল রয়েছে, যদিও রোদে এখন কিঞ্চিৎ মলিন। ফুলের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি সবুজ পাতাও আছে। ফুলের নাম জানি না। ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে, সাদা দাঁতের ঝিলিক দিয়ে হাসলো। একটু লজ্জার ছটা আছে মুখে কিন্তু তা লজ্জাবতী লতার মতো গুটিয়ে যাওয়া না। আমার মুখের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে, তার নিজস্ব হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, 'চলা যাতা?'

বললাম, 'না। আমি একটু তোমাদের কাজ দেখছি।'

সুরসতিয়া ঘাড় কাত করে আমার কথা শুনলো, হাসি মুখেই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'কাজ দেখ্‌সি ক্যায়া?'

হেসে ফেললাম, বুঝলাম, আমার খাঁটি বাঙলা কথা ও বুঝতে পারেনি। তবে সুবিধা একটাই, হিন্দী আমার বা ওর কারোরই মাতৃভাষা না। অতএব ব্যাকরণের ভুল নিয়ে, আমাদের মধ্যে কথা বিনিময়ের অসুবিধা হবে না। বললাম, 'চলা নহি যাতা, তুম্ লোগ্‌কা কাম দেখতা।'

সুরসতিয়া ঘাড়ে একটা জোরে, ঝাঁকুনি দিয়ে হাসলো। অর্থাৎ আমার কথা বুঝেছে। জিজ্ঞেস করলো, 'তুম্ হিঁয়া রহেগা? এদেলবা?'

যেন মাথা দুলিয়ে ও নিজেকেই দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম, 'হাঁ, রহেগা।'

সুরসতিয়ার চোখে ঝিলিক, জিজ্ঞেস করলো, 'গাড়া কিনার গুইয়ো মে?'

গুইয়ো শব্দের মানে, বদরিকাপ্রসাদের কাছে জেনেছিলাম, পাতার ঘর। কিন্তু গাড়া কিনারাটা কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম, 'গাড়া কিনার কহাঁ?'

সুরসতিয়া হাত তুলে একদিকে দেখিয়ে বললো, 'কোয়েনা গাড়া কা কিনার মে গুইয়ো বানায় না?'

কোয়েনা গাড়া! অর্থাৎ কোয়েনা নদীর ধারে পাতার ঘরের কথা বলছে। বললাম, 'হাঁ হাঁ, কোয়েনাগাড়া কিনার গুইয়ো মে রহেগা।'

সুরসতিয়া চোখে ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো। হাসি মুখে হাত চাপা দিয়ে, ঝুঁকে পড়লো। আমার কথায় হঠাৎ হাসির কী ছিল বুঝতে পারলাম না। আমিও হেসেই জিজ্ঞেস করলাম, 'হাসতা কাহে?'

সুরসতিয়ার কৃষ্ণ কালো মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, বললো, 'খুশি লাগতা না?'

কথার শ্রী অদ্ভুত। খুশি লাগতা না? মানে কী? খুশি লাগছে না? সুরসতিয়া তর্জনী দিয়ে আমার দিকে দেখিয়ে বললো, 'তুম গুইয়ো মে রহেগা, হামকা খুশি লাগতা।'

বলে তর্জনীটি নিজের বুকে ঠেকালো। কথা বুঝে নিতে হবে। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হাঁ হাঁ, হাম ভি খুব খুশি। তুম কা দিদি অর শুক্রম কহাঁ?'

সুরসতিয়া বাঁ হাত তুলে দেখিয়ে বললো, 'উধার মে কাম করতা।'

আমি বললাম, 'বাদ মে দেখা হোগা। অভি হম ঘুমকে দেখতা।'

সুরসতিয়া ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো, কিন্তু ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'হাসতা কাহে?'

সুরসতিয়া ভুরু কুঁচকে, ঘাড় নেড়ে বললো, 'খুশি লাগতা না?'

তাও তো বটে, খুশি লাগছে না? আর খুশি লাগলে তো এরকম করে হাসতেই হয়। ওর কাছ থেকে চলে যাবার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'সিগারেট পিয়েগা?'

ও ঘাড় নেড়ে বললো, 'অভি নহি। সাঁজ মে পিয়েগা।'

বলে ওর কালো চোখের তারায় ঝিলিক দিল। আমি অন্য দিকে গেলাম। যাবার সময় লক্ষ্য পড়লো, অনেক জোয়ান-জোয়ানীরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে, হাসাহাসি করছে। একটি প্রকাণ্ড মহীরুহের গোড়ায়, তিনটি কুড়াল চলছে এক সঙ্গে, তিন দিক থেকে। গাছটির ওপর দিকে, মোটা দড়ি বেঁধে,

দূরে কয়েকজন টেনে ধরে আছে। সময় হলেই টান দেবে। নিহত বনস্পতি ভূতলে পড়বে।

গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বৃক্ষের হাসি কান্না শুনতে পান, বৃক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। সে কথা মনে হলে, একে বলতে হয় বৃক্ষমেধ। গাঙ্গুলিমশাই হলে বোধহয়, এই মরণোন্মুখ বিশাল বৃক্ষের মৃত্যু আর্তনাদ শুনতে পেতেন। আমি পাই না। তাঁর মতো এমন গভীর আরণ্যক অনুভূতি আমার নেই। তবে এ কথা মনে হয়, যে বৃক্ষটিকে কাটা হচ্ছে, তার বয়স সম্ভবত শতবর্ষ, কিংবা তারো বেশি। এই বনের শত শত বৎসরের অনেক প্রাকৃতিক উত্থান পতনের সাক্ষী এই সব বনস্পতিরা। যাদের দেখলেই ঋষির মতো, বৃদ্ধ গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ মনে হয়।

কাঠুরিয়াদের মধ্যে একজন হঠাৎ কোপানো থামিয়ে আমার দিকে তাকালো। খালি গা, গলদঘর্ম লেংটি পরা কাঠুরিয়া হেসে, কপালে হাত ঠেকালো। দেখলাম, শুক্রম। সুরসতিয়ার ভগ্নীপতি। চিনতে পারিনি। তাকে প্রথম দেখেছিলাম, তীর ধনুক হাতে, শিকারীর বেশে। তারপরে নিতান্ত বনবাসী স্বামী, যে সারির পিছনে, যুবতী স্ত্রীকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। লজ্জার অবকাশ কারোরই ছিল না। তাদের কাছে জীবনটা এই রকমই। এখন সে কুঠার হাতে কাঠুরিয়া। আমি কপালে হাত ঠেকিয়ে বললাম, 'শুক্রম না?'

শুক্রম জবাব দিল, 'হাঁ তো। তুম কব আয়া বাবু?'

বললাম, 'থোড়া আগে'।'

তারও সুরসতিয়ার মতোই জিজ্ঞাসা, 'রহেগা?'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম। সে বললো, 'বহুত আচ্ছা।'

ইতিমধ্যে অন্য কাঠুরিয়ারাও আমার দিকে, আর জিজ্ঞাসা নিয়ে দেখছিল। আমি সরে গেলাম। চারদিকেই বৃক্ষমেধের বিরাট যজ্ঞ চলেছে। কর্তন পতন ক্ষেপন, সেই সঙ্গে সকলের নানা স্বরের চিৎকার, বনভূমি সচকিত। আমি ঘুরতে ঘুরতে, একটু ওপরের দিকে গেলাম। ওপরের দিকে বন একটু ফাঁকা, পায়ের তলায় অজস্র ঝরাপাতা, মাটি দেখা যায় না। এক এক জায়গায়, এক ধরনের লম্বা ঘাস, হলুদে সবুজ মেশানো। ঘাসের গা থরথরে। হঠাৎ চোখে পড়লো, একটি গাছতলার ছায়ায়, ঘাসের ওপরে একটি লোক শুয়ে আছে। খাকী হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্ট তার গায়ে। কোমরে চওড়া বেল্ট, সামনের দিকে পেতলের তক্‌মায় কিছু খোদাই করে লেখা আছে। লোকটি কাত হয়ে

শুয়ে থাকার জন্য, লেখা পড়তে পারছি না। তার কোলের কাছে একটি কুঠার। কুঠারের হাতলের কাঠটি চকচকে, কুঠারের লোহার ফলাও ঝকঝকে, একেবারে সাধারণ কুঠারের মতো না।

আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ই লোকটি চোখ মেলে তাকালো। আরক্ত চোখ। আমাকে দেখেই সে উঠে বসলো। না দাঁড়িয়েই কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করলো। প্রায় হোরোর মতোই, নাক চোখ বিহীন একটি হাসি দেখা গেল তার মুখে। আমিও কপালে হাত ঠেকিয়ে, প্রত্যুত্তরে দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুম কৌন হ্যায়?'

সে বললো, 'হম ফরেস্ট গার্ড হ্যায়। ইয়ে হ্যায় হমারা সরকারি তবলা।'

বলে কুঠারটা হাতে তুলে দেখালো। দেখাচ্ছে কুঠার, বলেছে তবলা, তার মানে কী? কুঠার দিয়ে কর্তন হয়, তবলায় বাদন। জিজ্ঞেস করলাম, 'তবলা ক্যায়া হ্যায়?'

ফরেস্ট গার্ডের মুখে সেই অনির্বচনীয় হাসি, বললো, 'ইসকো হমলোগ তবলা কহতা হ্যায়, তবলা। আপ-লোগ্‌কা কুঠার। না?'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইস্‌কো মুণ্ডামে তবলা কহতা হ্যায়?'

সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'জী। এ হ্যায় সরকারি তবলা, ফরেস্ট গার্ডকা লিয়ে।'

বলে সে তার কোমরের বেল্টের তকমা দেখিয়ে বললো, 'ইসমে জঙ্গল অর হমারা ব্লক কা নাম লম্বর লিখ্‌খা হ্যায়। আপ কাহাসে আয়া বাবুজী?'

বললাম, 'কলকাতা সে।'

'জঙ্গলকা ইজারা লেনে খাতির?'

নতুন বাবু দেখলে, সকলের একটাই ধারণা, একটিই জিজ্ঞাসা। হেসে বললাম, 'নহি। হম জঙ্গল ঘুমনে আয়া।'

ফরেস্ট গার্ডের মুখে আবার সেই নাক চোখ ঢাকা পড়া হাসি, ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'আপ মোহনবাবুকা মেহ্‌মান হ্যায়?'

বললাম, 'হ্যাঁ, আভি মোহনবাবুকা মেহ্‌মান হ্যায়। সিংজী সাহাব আনে সে, উনকো মেহ্‌মান হো যায়েগা।'

আমার কথা শেষ হতে পেল না, ফরেস্ট গার্ড উঠে দাঁড়িয়ে, আর একবার আমাকে সেলাম ঠুকে বললো, 'আই বাপ্‌, আপ সিংজী সাবকা মেহ্‌মান? জঙ্গল মে সিংজী সাবকো সবকোই বহুত ইজ্জত দেতা হ্যায়।'

সিংজী সাহেব দেখছি, বনের জগতের সবখানেই একটি বিশেষ চরিত্র।

কেবল যে সম্মান, তা না। সিংজী সাহেবকে ঘিরে, একটা ভয় মেশানো সম্ভ্রম সর্বত্র। ব্যক্তিটিকে দেখে, আমিও কিছুটা তাই অনুমান করেছিলাম। তা ছাড়া, মোহনবাবুর কাছে, ইতিমধ্যেই তাঁর বিষয়ে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কথা শুনেছি। তার মধ্যে সিংজী নিজের ট্রাজেডিটাই এখনো পর্যন্ত আমার কাছে বড় বলে মনে হয়েছে। তাঁর একমাত্র সন্তান পোলিওতে ভুগছে, ছেলেটি চলতে ফিরতে পারে না। ওঁর স্ত্রী থাকেন টাটায়। ছেলের কথা যখন বলেছিলেন, মনে হয়েছিল তার স্কচ্ হুইস্কি ঝলকানো চোখের কূলে যেন একটি অসহায় পিতার কান্না থমকে আছে। আর একটি মেয়ের কথাও শুনেছি, যার নাম সীমা। সীমা একটি ওড়িয়া-বাঙালী সংমিশ্রিত ভারতীয় মেয়ে, যার রূপ যৌবন নাকি পুরুষ মাত্রেরই রক্তে দোলা দেয়। সে নাকি নাচ গানও জানে। সিংজী সাহেব তাকে কটক থেকে এনে রাউরকেলায় রেখেছেন। মোহনবাবুর ভাষায়, 'প্রেমিকা বা কংকোবাইন' যা খুশি ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সেই সীমাকে ভাল লেগেছে এক জার্মান সাহেবের, রাউরকেলার ইস্পাতগড়ে যার প্রতাপ প্রতিপত্তি অখণ্ড। সিংজী সাহেবের স্টীলের কণ্ট্রাক্টরি ব্যবসাও ছোটোখাটো না। অগত্যা, অনিবার্যভাবেই, সীমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে সেই জার্মান সাহেবের হাতে। কারণ, মোহনবাবুর ভাষায়, 'জগৎটা চলেছে, গিভ অ্যাণ্ড টেক পলিসিতে।'

আমি ফরেস্ট গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমলোগ্ সিংজী সাহেবকো সবকোই বহুত মান্‌তা।'

ফরেস্ট গার্ড সিংজী সাহেবের উদ্দেশেই কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'হাঁ বাবুজী, সবকোই মানতা। ডিফো তক উনকো বহুত মানতা।'

ডিফো মানে ডি. এফ. ও.। ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার যাকে বলে। ফরেস্ট গার্ডের উচ্চারণে, সেটাই ডিফো।

আমি হেসে বললাম, 'তুমকো খাড়া হোনে কা কোই জরুরত নহি হ্যায়, বয়ঠো।'

ফরেস্ট গার্ড অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললো, 'নহি সাব, আপকো সামনে বৈঠনে নহি সকতা।'

ইতিমধ্যেই সামান্য বাতাসে, ফরেস্ট গার্ডের নিঃশ্বাসে, মদের গন্ধ পেয়েছিলাম। তার আরক্ত চোখ আগেই তা জানিয়ে দিয়েছিল। তার ওপরে সিংজী সাহেবের মেহমান আমি, যাঁকে ওরা প্রায় অলৌকিক ব্যক্তি বলে মানে, ওকে বসাই, সাধ্য কী আমার! অতএব, নিজেকেই সরে গিয়ে, ওকে স্বস্তি দিতে হয়। সবার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুম ইধার ক্যায়া করতা?'

ফরেস্ট গার্ড বললো, 'মোহনবাবুকা কাম হোতা হ্যায়। হম ফরেস্ট গার্ড হ্যায়। হমকো দেখনে হোতা হ্যায়, ঠিক ঠিক গাছ কাটতা কি নহি।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'উ ক্যায়া হ্যায় ?'

ফরেস্ট গার্ড ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য, যে গাছের সামনে সে দাঁড়িয়েছিল, সেটা দেখিয়েই বললো, 'এ যো পেড় হ্যায়, ইসকো ছাপ মার দেতা হ্যায় মারাকিং রেঞ্জার। হম দেখতা হ্যায়, ইজারাদারবাবু ওহি মারকাবালা পেড় ছোড়কে, দুসরা নহি কাটতা হ্যায়।'

অনেকটা বোঝা গেল। মারাকিং রেঞ্জার মানে, মার্কিং রেঞ্জার। সে যে গাছে মার্ক করে দেয়, সেই গাছ ছাড়া, ইজারাদারের কাটবার অনুমতি নেই। ফরেস্ট গার্ড সেটা দেখাশোনা করে। দেখাশোনা যে কী রকম করছে, সেটা তো তার সুরাপান এবং নিদ্রা থেকেই অনুমতি। জানি না, তার এই নিদ্রার মধ্যেও, সেই 'গিভ অ্যাণ্ড টেকের' নীতি আছে কী না। এটা মোহনবাবুরই কাছে শুনেছি, অনেক লোভনীয় বৃদ্ধ বনস্পতিকেই ইজারাদারদের লোভের বলি হতে হয়। মোহনবাবুর লোভের বিষয় আমার জানা নেই। বললাম, 'ঠিক হ্যায়।'

আমি কয়েক পা যেতেই, ফরেস্ট গার্ড বলে উঠলো, 'সাব, কোই গোস্তাকি না লিজীয়ে।'

পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, সে প্রায় ফৌজী কায়দায় কপালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হেসে হাত তুলে বললাম, 'তুমকো কুছ গোস্তাকি নহি হুয়া। আরাম সে রহো।'

সে আবার বললো, 'সাব, মেরা নাম চিকো।'

বলতেই সেই সাদা দাঁত, নাক চোখ ঢাকা। বললাম, 'ঠিক হ্যায় চিকো, হম বহুত খুশি হ্যায়।'

বলে আরো উঁচু দিকে খানিকটা এগোতেই, চিকোর উচ্চস্বর শুনতে পেলাম, 'সাব, এ পাহাড়কে উস্ বগল মত যাইয়ে, মারাংহোরে রহনে সকতা।'

মারাংহোরে! সে আবার কী প্রাণী ? এক তো, কোয়েনানদীর ধারে, পাতার ঘরের আস্তানায়, একজন হোরো নামে পাহারাদারকে দেখে এসেছি। মারাংহোরোটা আবার কে ? আমি ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মারাংহোরো কৌন হ্যায় ?'

চিকো ফরেস্ট গার্ড কয়েক পা এগিয়ে বললো, 'মারাংহোরো হাথীকো কহা জাতা হ্যায়।'

হাথী। মানে হাতি ? সর্বনাশ! সেরকম সাহস আমার মোটেই নেই,

তায় আবার একলা। কিন্তু এদের কি, সবই এরকম অদ্ভুত উচ্চারণ? হাতিকে বলে মারাংহোরো! অবিশ্যি শুনলে বৃহৎ বা বিশাল কিছু বলেই মনে হয়। আমি বাধ্য হয়ে নেমে আসি। অবাক লাগে, কাছেই এতো লোক কাজকর্ম করছে, তাদের হাঁকডাক কলরব শোনা যাচ্ছে। আর এর ঠিক পাশেই বন্য হাতিরা থাকতে পারে! যদিও, কৌতূহল আর উত্তেজনা বোধ করি, ইচ্ছা করে, বন্যহাতি প্রত্যক্ষ করি, বনের মধ্যেই, কিন্তু সাহস পাই না। শত হলেও পশু, তার মেজাজ কখন কী রকম থাকে, কে বলতে পার। বদরিকাপ্রসাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী, এর মধ্যেই আমি ভুলে যাইনি। আমি চিকোর সামনে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুম ক্যায়সে জানতা, উধার মে হাতি রহনে সক্‌তা?'

চিকো বললো, 'হম জানতা হ্যায় সাব। উস্ বগল মে, কোয়েনা গাড়া হ্যায়, বহুত ঘাস জমিন হ্যায়, ভারী জঙ্গল ভি হ্যায়। উধার মে হাথী হরবখ্‌ত আনা যানা করতা হ্যায়, জঙ্গল মে সবকোই জানতা হ্যায়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ইধার নহি আতা?'

'আতা।' চিকো ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'কভি কভি আতা হ্যায়। আদমী বহুত হ্যায়। আভি নহি আয়েগা।'

'তুম কভি জঙ্গল মে হাতি দেখা হ্যায়?'

'বহুত দফে সাব।' চিকোর মুখে আবার সেই হাসি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমকো মারনে নহি আয়া?'

'কভি নহি।'

এ সময়েই মোহনবাবুর গলা শুনতে পেলাম, 'এই যে, আপনি এদিকে এসেছেন? আমরা আপনাকে অন্যদিকে খুঁজছি।'

দেখলাম মোহনবাবু, সঙ্গে বদরিকাপ্রসাদ এগিয়ে আসছেন। বললাম, 'আপনাদের ফরেস্ট গার্ডের সঙ্গে একটু আলাপ করছিলাম।'

মোহনবাবু বললেন, 'চিকো আমাদের খুব ভালো গার্ড। চলুন এবার ডেরায় ফেরা যাক।'

বললাম, 'চলুন। আমি এই পাহাড়টার ওপরের দিকে যাচ্ছিলাম। চিকো বারণ করলো, বললো, ওপাশে বুনো হাতি থাকতে পারে।'

মোহনবাবু বললেন, 'মিথ্যা বলেনি। ওদিকটায় হাতিদের চরে বেড়াবার মতো বড় বড় ঘাস আর সমতল নরম মাটি আছে। কোয়েনাও বেশ চওড়া, তাছাড়া চারদিকে জঙ্গলে ঢাকা, একটা ন্যাচারেল দীঘির মতো আছে, বেশ গভীর। হাতিরা ওখানে চান করে। সম্ভব হলে, আপনাকে দেখাবো।'

বললাম, 'তা তো দেখাবেন, কিন্তু তারা যখন আমাদের দেখতে পাবে?'

বদরিকাপ্রসাদ হেসে উঠলেন। মোহনবাবু বললেন, 'দেখতে পেলেই যে তেড়ে আসবে, এমন কোনো কথা নেই। বিপদের গন্ধ সবাই পায়। আমাদের দেখতে পেলেই যে ওরা বিপদের গন্ধ পাবে, তা নয়। ওরাও বোঝে, আমরা নিরীহ দর্শক মাত্র। বড় জোর, দু'একটা হুংকার দিতে পারে। তখন সরে গেলেই হবে। নিজেদের খেলা ছেড়ে, আমাদের পেছনে সব সময় ওরা ছুটতে চায় না।'

বদরিকা বললেন, 'তা চায় না ঠিকই। সবই নির্ভর করে ওদের মেজাজের ওপর। বিশেষ করে, দলের মধ্যে, কখন কী ঘটে, কার কখন কী মেজাজ থাকে, কিছুই বলা যায় না। হয় তো বিশেষ একটি হাতিই আপনার দিকে তেড়ে এলো।'

মোহনবাবু বললেন, 'তা আসতে পারে। ক্ষ্যাপা হাতির কথা কিছুই বলা যায় না। সে তো মারাত্মক। পালিয়ে যাবার আগেই হয় তো দেখা যাবে, সে নিঃশব্দে একেবারে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।'

আমি প্রায় কেঁপে উঠে বলি, 'নিঃশব্দে?'

'একেবারে নিঃশব্দে। অত বড় শরীরটা নিয়ে কী করে যে ওরকম তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে দৌড়ুতে পারে, জানি না।'

রীতিমতো ভয় পেয়ে যাচ্ছি। বললাম, 'তারপরেও বলছেন, হাতি দেখতে যাবো?'

মোহনবাবু আর বদরিকাপ্রসাদ, দু'জনেই হেসে উঠলেন। মোহনবাবু বললেন, 'আপনি এ কথা বলছেন? বাহাদায় একবার আমরা নদীর ধারে পাতার ঘরের আস্তানা করেছিলাম। সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। শীতের জন্যই, রাত্রিবেলা খোলা জায়গায়, খুব বড় করে, আগুন জ্বেলে বসেছিলাম আমরা কয়েকজন। বললে বিশ্বাস করবেন না, হঠাৎ মনে হলো, হোসপাইপ থেকে যেন, আমাদের গায়ে আর আগুনে জল ছিটকে এলো। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারিনি, হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তখনো সমানে জলের ধারা আসছে। হঠাৎ কয়েকজন চিৎকার করে উঠলো, মারাংহোরো, মারাংহোরো! শুনেই, ফিরে দৌড় দিলাম। মারাংহোরো বুঝতে পেরেছেন তো?'

আমি প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'একটু আগেই চিকোর মুখে শুনেছি, হাতি। তারপর?'

মোহনবাবু হেসে বললেন, 'তারপরে আর কিছুই না। কেবল দেখলাম,

সমস্ত আগুন নিভে গেল, আর কয়েকটা ছায়া, যেন আকাশের গা দিয়ে, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তারা মোটেই আমাদের আক্রমণ করতে আসেনি।'

'তবে কী করতে এসেছিল?'

'হয়তো কিছুই না। হতে পারে, নদীর ওপার দিয়ে, ওরা কোথাও যাচ্ছিল, হঠাৎ আগুন চোখে পড়তে, মেজাজ একটু খারাপ হয়ে যায়। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে জলে নেমে, শুঁড় ভরতি জল শুষে, আগুনের গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। যখন দেখেছে, আগুন একেবারে নিভে গেছে, তখন হাওয়া। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই চলে গেছলো, ক'টা ছিল, তা দেখতে পাইনি। মনে হয়, তিন চারটে ছিল।'

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা তো আপনাদের আক্রমণ করতে পারতো?'

মোহনবাবু বললেন, 'তা হয় তো পারতো। তবে, অকারণে ওরা বিশেষ আক্রমণ করে না। তা যদি করতো, তাহলে এ জঙ্গলে মানুষ থাকতে পারতো না, কাজও করতে পারতো না।'

তথাপি যেন স্বস্তি পেলাম না। পশুরা বনেই সুন্দর, যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি বোধহয় মানুষের তাদের সম্মুখীন হওয়া। অবিশ্যি মানতে হবে, তাদের জগতে মানুষ যতো বিঘ্ন ঘটিয়েছে, মানুষের জগতে তারা, তার সিকি ভাগও করেনি, করে না।

মোহনবাবু বললেন, 'চলুন, যেতে যেতে কথা হবে। ভয় পাবেন না, আমরাও তো আছি, আর জঙ্গলই আমাদের রুজি রুটি।'

সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মোহনবাবু চিকোর দিকে ফিরে বললেন, 'তুম খানা খানেকা টাইম মে, চলা আয়েগা।'

চিকো ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'হাঁ বাবুজী।'

আমরা আবার বৃক্ষমেধ যজ্ঞের এলাকায় চলে এলাম। মোহনবাবু যোশেফ নামক খৃষ্টান মুণ্ডাকে ডেকে বললেন, 'হম খানা খানে যাতা। দো ঘণ্টা বাদ আয়েগা। আজ এ লাটকা পুরা কাম হোনা চাহি। কিসীকো বৈঠনে মাত দো। হল্লা করকে কাম চালাও।'

জোশেফ বললো, 'ঠিক হ্যায় বাবুজী। ই লোক জানতা, আজ ইধারকা কাম সব পুরা করনে হোগা।'

মোহনবাবু আমাদের সঙ্গে চলতে চলতে বললেন, 'ই লোগ্ তো সব কুছ জানতা, মগর কাম ঠিক নহি হোতা।'

আমি বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে, সুরসতিয়াকে দেখলাম, ও এদিকেই তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই, ও হেসে, যেন লুকোচুরি খেলার মতো, মুখ একটু আড়াল করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা খেতে যাবে কখন?'

মোহনবাবু বললেন, 'এদের খাওয়ার নিয়মকানুন সব আলাদা। এরা সারাদিনে একবার খায়, ভোরবেলা। আর খায় রাত্রে। এখান থেকে কাজ সেরে গিয়ে, ওদের প্রথম কাজ রান্না করা। রান্না করে খায়, ভাত রেখে দেয় ভোরের জন্য, সেই ভাত খেয়ে কাজে আসে। সারাদিন এদের খাওয়ার সঙ্গে কোনো ব্যাপার থাকে না। রান্না রাত্রে একবারই করে।'

মোহনবাবুর কথা শুনতে শুনতে আমি আর একবার সুরসতিয়ার দিকে তাকালাম। ও হাত নাড়লো, আমি ঘাড় ঝাঁকালাম। ওর আশেপাশে যেসব মেয়েরা কাজ করছিল, তারা সবাই হাসাহাসি করছে। আমি নিচের দিকে নামতে লাগলাম।

মোহনবাবু মিথ্যা বলেননি, পাতার ঘরের আস্তানায় ফিরে দেখছি, সুরীনের রান্না শেষ। আসল রান্না যেটি, মুরগি-পাতুরি। তার গন্ধ কোয়েনা তীরের বনের গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে, পেঁয়াজ সম্বরা দেওয়া মুসুর ডাল। ভাত এখনো উনুনে ফুটছে, নামার অপেক্ষায়। পাত পেড়ে বসে গেলেই হয়। সুরীন তার ধুতির খোঁটায়, হাত মুছতে মুছতে, সলজ্জ হেসে বললো, 'রেঁধে তো ফেললাম, জানি না মুখে দিতে পারবেন কী না।'

নিঃসন্দেহেই সুরীনের এটি বিনয়। বললাম, 'গন্ধ যা বের করেছেন, তাতে তো জিভে জল এসে পড়ছে। রান্নার ভাল মন্দ গন্ধতেই বোঝা যায়।'

সুরীন বললো, 'আগে খেয়ে দেখুন, তারপরে বলবেন।'

মোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মুরগি পাতার মোড়ক থেকে খুলে ফ্যালোনি তো?'

সুরীন বললো, 'না। পাতার মোড়ক খুললে ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে যাবে। একেবারে খাওয়ার সময় খুলে দেব।'

মোহনবাবু বললেন, 'তা না হলে মুরগি-পাতুরি খেয়ে সুখ হয় না। সামনে পাতার মোড়ক খোলা হবে, তাতেই খাওয়ার অর্ধেক সুখ। আসল গন্ধ তো তখনই পাওয়া যাবে।'

বলে আমার দিকে তাকালেন। মোহনবাবু ভোজন-রসিক, সন্দেহ নেই।

আমার কাছে নতুন খাদ্যের অভিজ্ঞতা। সুরীন ইতিমধ্যে হোরোকে কাজে লাগিয়েছে। এখন আর সে রক্তচক্ষু মাতাল না। চক্ষু রক্তবর্ণ বটে, কিন্তু দেখছি সে কোয়েনা থেকে বালতি করে জল আনছে। এই বনবাসের ব্যঞ্জন তৈরির জন্য শিল-নোড়াও এসেছে। হোরো শিল-নোড়া ধুয়ে পরিষ্কার করছে।

মোহনবাবুর পাতার ঘরে দুটি খাটিয়ার বিছানা। এক পাশে চাল ডাল আটা তেল মসলা, যাবতীয় বস্তু রয়েছে। পুরো দুটি চটের বস্তা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এর মাধ্য কী আছে?'

মোহনবাবু বললেন, 'চাল। কুলী রেজাদের চালের ব্যবস্থা আমাকেই রাখতে হয়। বিকেলবেলা ওরা যখন কাজ থেকে আসবে, তখন সবাইকে মেপে মেপে, রোজকার চাল দিতে হবে, টাকাটা ওদের মজুরি থেকে কাটা হবে। দাম বাজার দর, দামে কিনেছি, সে দামেই দিই।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা নিজেরা নিজেদের চাল কিনতে পারে না?'

মোহনবাবু গা থেকে জামা খুলে বললেন, 'পারে, কিন্তু টাকা কোথায়? তাহলে ওদের রোজের মজুরির টাকা আগাম ধরে দিতে হয়। আর আগাম টাকা যদি দিয়ে দেন, তাহলে সব বেপাত্তা হয়ে যাবে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বেপাত্তা?'

মোহনবাবু আর বদরিকা, দু'জনেই হাসলেন। মোহনবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই! টাকা যদি হাতে থাকলো, তবে আর কাজের কী দরকার? সবাই জঙ্গলের এদিক ওদিক দিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। আর ওদের ব্যাপার হলো, ওরা কিছু মজুদ করে রাখতে জানে না। এরকম দু' বস্তা চাল যদি ওদের কাছে থাকে, তাহলে একদিনের মতো ভাত রান্না করে, বাকী সব চাল দিয়ে হাঁড়িয়া পচুই তৈরি করে, খেয়ে মাতাল হয়ে নেত্য কেত্ত শুরু করে দেবে।'

অবাক কাণ্ড! এভাবেই বোধহয় এক এক শ্রেণীর মানুষ তার বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আমরা জানি, ভবিষ্যতের জন্য মজুদ না রাখলে, দুর্দিনের দ্বারস্থ হতে হয়। এদের হলো যত্র আয়, তত্র ব্যয়। না হবার কোনো কারণ নেই বোধহয়। বন আছে, বনের পশুপক্ষী আছে, তীর ধনুক আছে। সেটাও বাঁচবার এক রাস্তা। বরং চাষবাসের আয়োজন কম।

বদরিকা বললেন, মোহনবাবুকে, 'সে কথাই বা বলছেন কেন। ভাত রান্না করার জন্য, রোজ যে চাল নেয়, সেই চালই অনেকে হাঁড়িয়া পচুই করে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাত খাবেই না?'

বদরিকা বললেন, 'না। পচুইয়ের একটা সুবিধা হলো, ওতে পেটও ভরে, নেশাও হয়।'

চমৎকার! এমন বস্তু থাকতে আর কেবল ভাত খেয়ে পেট ভরিয়ে কী হবে? তার চেয়ে পেট ভরানো, নেশা করা, এক সঙ্গেই ভাল। মোহনবাবু তেলের পাত্র নিয়ে, তৈল মর্দন করতে বসলেন। চিৎকার করে, পাতার ঘর থেকে বললেন, 'সুরীন, হোরোকে আমার চানের জলটা রোদে রাখতে বলো।'

সুরীন হোরোকে হিন্দীতে সেই নির্দেশ দিল। হোরোর জবাব শোনা গেল, সে তো অনেকক্ষণ আগেই রেখে দিয়েছে। মোহনবাবু বললেন, 'প্রসাদজী, থোড়া পিনে মাঙ্‌তা তো পি লিজীয়ে, দাদাকো ভি পিলাইয়ে।'

মোহনবাবু এই প্রথম, বদরিকার সঙ্গে, ইংরেজি ছেড়ে হিন্দী বললেন। কিন্তু কী পানের কথা বলছেন মোহনবাবু? আমি বদরিকার দিকে তাকালাম। বদরিকা হেসে, ইংরেজিতেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি পান করবেন?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী পান করবো?'

মোহনবাবু তাঁর রক্তাভ সুবর্ণ অঙ্গে তৈল মর্দন করতে করতে বললেন, 'হুইস্কি রাম, দুই-ই আছে। যা আপনার ইচ্ছা, তাই নিন।'

সর্বনাশ! বনের মধ্যেও হুইস্কি রাম! তাও কী না, এই দিনের বেলা! বললাম, 'না না, আমার কোনো দরকার নেই।'

মোহনবাবু বললেন, 'একটুখানি নিন, খিদেটা বাড়বে।'

হেসে বললাম, 'মাফ করবেন, খিদে আমার এমনিতেই যথেষ্ট বেড়ে আছে, তার জন্য সুরাপানের দরকার হবে না।'

বদরিকা বললেন, 'আমারো তাই, তাছাড়া আমাকে গাড়ি ড্রাইভ করে বড় জামদা যেতে হবে।'

মোহনবাবু যেন হতাশ হয়েই, তৈলমর্দন বন্ধ করে উঠে পড়লেন, বললেন, 'তাহলে আর কী হবে। যাই, চানটা করে আসি।'

বললাম, 'চান করে এসে, আপনি একটু নিন।'

মোহনবাবু পাতার ঘরের বাইরে যেতে যেতে বললেন, 'আমার নেওয়া অনেক আগে থেকেই হয়ে গেছে, আর দরকার হবে না।'

আমি আর বদরিকা চোখাচোখি করে হাসলাম। এ সময়ে, কাছেই কোথা থেকে যেন, অদ্ভুত, অনেকটা নারী কণ্ঠের শব্দ ভেসে এলো, কে—ক্! কে—ক্! আমি জিজ্ঞাসু চোখে বদরিকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের শব্দ বলুন তো?'

বদরিকা বললেন, 'এটা তো ময়ূরের ডাক।'

তার মানে কেকাধ্বনি! এই ধ্বনির কথা সাহিত্যে কাব্যেই পড়া ছিল। আজকের আগে, পোষা ময়ূরও দেখেছি, বন্য ময়ূর আজ প্রথম। কিন্তু কেকাধ্বনি কখনো শুনিনি। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গেলাম। চারদিকে তাকালাম। কোয়েনার এপারে ওপারে, বিশাল বনস্পতি-ছায়া ঘেরা সামনের পাহাড়ের বুকে। কোথাও ময়ূরের চিহ্ন নেই। আমার পিছনে পিছনে বদরিকাপ্রসাদও বেরিয়ে এলেন, বললেন, 'ডাক শুনলে মনে হয়, পাশ থেকে ডেকেছে। আসলে বনের আড়ালে কোথাও আছে, এখান থেকে দেখা যাবে না। তবে হতাশ হবেন না। যে কোনো সময়েই, আপনার ঘরের পাশেও দেখা দিতে পারে। দিনে রাত্রে বহুবারই ময়ূরের ডাক শুনতে পাবেন।'

আমার কাছে যেন অনেকটাই অবিশ্বাস্য। অথচ, অবিশ্বাসের কিছুই নেই। সত্যি আমি দাঁড়িয়ে আছি, এক তপোবনের মতো স্থানেই। রামায়ণ মহাভারতে মুনি ঋষিদের যে তপোবনের বর্ণনা পড়েছি, অবিকল সেইরকম। সহসা যেন আমার মন ও দেহ, এক অপরূপ কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। হয় তো হাজার বছর আগে, এখানে মুনি ঋষিরা ছিলেন। তাঁরা হয় তো এখানেই তপস্যা করতেন। শকুন্তলা, তাঁর সখী প্রিয়ম্বদার মতো ঋষি-কন্যারা, এই তপোবনেই হয় তো বিচরণ করতেন, আর তাঁদের সঙ্গে পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতো ময়ূর হরিণেরা।

আমাকে এই বন সম্মোহিত করলো, না আমি নিজে আত্মসম্মোহিত হলাম, জানি না। কোয়েনার তীর ধরে, ডানদিকে হাঁটতে হাঁটতে, আমি ছায়াছন্ন গভীর বনের মধ্যে চলে গেলাম। যতোই এগিয়ে গেলাম, মনে হলো, যেন সূর্যের আলো সেখানে কখনো প্রবেশাধিকার পায়নি। মাটি থেকে যেন ঠাণ্ডা বাষ্প উঠছে। কোয়েনের জল গভীর, তার জলের রঙ বদলে গিয়েছে। অনেকটা কালো দীঘির জলের মতো। ঝিল্লিস্বর যে এতো তীব্র হতে পারে, জানতাম না। তারপরে এক সময়ে, ঝিঁঝির ডাক স্তিমিত হয়ে গেল। সমতল ছাড়িয়ে, আমি যেন ক্রমেই একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু বন গভীর, ফাঁকা নয়। আমাকে ঘিরে অনেকগুলো কলকি ফুলের গাছ। অন্যান্য বৃক্ষও অনেক। আমি একটি অর্জুন গাছের নিচে, প্রস্তর ভূমির ওপরে বসলাম। ডুবে গেলাম, পুরাণের পুরাকালের কল্পনায়। আমাকে ঘিরে, তপোবনের জীবন সংসার, নানা রূপে ও শব্দে জেগে উঠলো।

কতক্ষণ বসেছিলাম, জানি না, মোহনবাবুর গলা শুনতে পেলাম, তিনি

আমার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছেন, আর সে ডাক, সামনের পাহড়ে, চারপাশের অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি সচকিত হয়ে, উঠে দাঁড়াবার আগেই, আমার সামনে বদরিকাপ্রসাদ এসে দাঁড়ালেন, এবং চিৎকার করে বললেন, 'মোহনবাবু, পাওয়া গেছে, এদিকে আসুন।'

বলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, 'মনে হচ্ছে ধ্যানে বসেছেন।'

আমি একটু লজ্জা পেয়ে হাসি। মোহনবাবুও ইতিমধ্যে এগিয়ে এলেন, তাঁর চোখে মুখে, এখনো একটু উৎকণ্ঠার ছায়া। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কী করছিলেন?'

বদরিকা বললেন, 'আমি এসে দেখলাম, চুপচাপ বসে আছেন।'

মোহনবাবু বললেন, 'আমি এদিকে ভয়ে মরি। অন্য কোনো ভয় না থাক, বনের মধ্যে হারিয়ে যাবার ভয় তো আছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'বনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যায় নাকি?'

মোহনবাবু বললেন 'যায় নাকি মানে? বনের মধ্যে একবার পথ হারালে, কোন্ দিক থেকে, কোথায় চলে যাবেন, তার ঠিক আছে? এখানকার মানুষরাই অনেক সময় পথ ভুল করে, সারা রাত মাথা খুঁড়ে মরে। একলা কখনোই বনের বেশি ভেতরে যাবেন না। কতো রকম বিপদ আপদ ঘটতে পারে।'

তপোবনের কল্পনায়, বিপদের কথাটা মনে ছিল না। অথচ, পদে পদে নানা বিপদের কথা অনেকবারই শুনেছি, এবং তা অবিশ্বাসও করি না। বললাম, 'ভুল হয়ে গেছে।'

মোহনবাবু বললেন, লেখক মানুষ তো ভুলেই যাবেন। কিন্তু বিপদের কথাটাও একটু মনে রাখবেন। এখন চলুন, সুরীন ভাত বেড়ে বসে আছে।'

শুনেই, মহাপ্রাণীটি যেন খুব কাতর হয়ে উঠলো। এক্ষেত্রে উদরের নামই মহাপ্রাণী। বললাম, 'হ্যাঁ চলুন, খিদের কথাটা ভুলেই গেছলাম।'

বদরিকা বললেন, 'একেবারে লেখকোচিত কথা।'

মোহনবাবু চলতে চলতে বললেন, 'আমার বাচ্চা ছেলেটি প্রায়ই তার মাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা আমি খেয়েছি? তার খেলেও মনে থাকে না, না খেলেও ভুলে যায়।'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। পাতার ঘরের আস্তানায় সুরীনও উদ্বেগে ছিল। দেখতে পেয়ে, স্বস্তির হাসি ফুটলো তার মুখে। দেখলাম, ঘরের মধ্যে, মাটির মেঝেয় শতরঞ্জি পেতে, আসন করা হয়েছে। জল দেওয়া হয়েছে

এলুমিনিয়ামের গেলাসে। খাবার পাত্র কলাইয়ের থালা। সুরীনই পরিবেশন করলো, প্রথম পাতে গরম ভাত, মুসুর ডাল আর আলুভাজা। মুখ দিয়ে মনে হলো, অমৃতবৎ। মোহনবাবু তাড়া দিলেন, 'তোমার মুরগি-পাতুরি নিয়ে এসো।'

সুরীন হেসে বললো, 'আনছি, ডাল দিয়ে খান।'

বলে সে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এলো শালপাতার একটি পুঁটলি নিয়ে। সেটি মেঝেতে রাখতে দেখা গেল, সবুজ শালপাতা পোড়া আর ঝলসানো, দুটি মোড়ক। কোনো বন্য লতা দিয়ে, পাতার মোড়ক আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। এখনো মোড়কের গা থেকে একটু ধোঁয়া উঠছে। সুরীন বন্য লতার বন্ধন খুললো নিপুণ হাতে। তার ভিতর থেকে বেরুলো, মসলা মাখানো আস্ত মুরগি। যেমন তার খোসবাই, তেমনি তার রঙ, ধোঁয়া উঠছে। মোহনবাবু ঠিকই বলেছিলেন, সামনে পাতার মোড়ক খুললে, তাতেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। দুটি মোড়ক থেকে, দুটি আস্ত মসলা মুরগি বেরুলো। জানি না, কলকাতার শহরে, এর নামই মুরগা মসল্লাম্ কী না। কিন্তু এমন পাতায় মোড়া মুরগি কখনো খাইনি। মোহনবাবুর ভাষায়, মুরগি-পাতুরি।

সুরীনের ব্যবস্থা পাকা। সে সুসিদ্ধ মুরগি, ছুরি দিয়ে কেটে কেটে আমাদের ভাগ করে দিল। মোহনবাবু বলে উঠলেন, 'তোমার জন্য আর একটু রাখো সুরীন, সবই তো আমাদের দিয়ে দিলে।'

সুরীন বললো, 'খান না। দেখুন তো নুন ঠিক হয়েছে কী না?'

সবই ঠিক আছে। আশ্চর্য, শালপাতার কোনো গন্ধ নেই; অথচ এ রান্নার স্বাদই আলাদা। বললাম, 'সুরীনবাবু, চমৎকার! কোনোদিন ভুলবো না।'

সুরীন সলজ্জ হেসে বললো, 'তাহলে, আপনার বইয়েতে একটু লিখে দেবেন।'

মোহনবাবু উচ্চস্বরে হেসে বললেন, 'বেশ বলেছ সুরীন। তোমার সঙ্গে তাহলে, আমাদের নামও ছাপা হয়ে যাবে।'

বললাম, 'এই বনের কথা যদি কখনো লিখি, তাহলে আপনাদের বাদ দিয়ে কী করে লিখবো? আপনারা ছাড়া বন নেই, বন ছাড়া আপনারা নেই।'

মোহনবাবু বললেন, 'সুরীন, এই বেলা বলে রাখো, লেখা হলে, আমরা যেন একখানা বই পাই। এই এদেলবার জঙ্গলে বসে বসেই সে বই পড়বো।'

সবাই হেসে উঠলাম। আমার চোখের সামনে একটি ছবি ভেসে উঠলো, এই বনের কথা লেখা আমার বই, এই বনে বসে সুরীন পড়ছে। হঠাৎ তৃপ্তির

মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ছোট নাগরার নার্স, তৃপ্তি ভৌমিক। তার শেষ কথা ছিল, সে এদেলবায় দেখা করতে আসবে।

হঠাৎ অনেকগুলো স্বরের কলরবে, জলের ঝাপটার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চোখ মেলতে, প্রথমে দেখলাম, আড় করা গাছের ডালের ওপরে পাতার চালা। পাশ ফিরতে, পাতার দেওয়াল। নিদ্রাভঙ্গের চকিত মুহূর্তে, ভুলে গিয়েছিলাম, কোথায় আছি? মনেও পড়ে গেল চকিতেই। অনেক কাল এরকম নিবিড় দিবানিদ্রা দিইনি। এটাও বোধহয় বনেরই। সুধীনের রান্না খেয়ে একটু গল্পগুজবের পরেই বদরিকাপ্রসাদ চলে গিয়েছিলেন। তার-পরে আমি আর মোহনবাবু খাটিয়ায় একটু গড়িয়ে নেবার জন্য শুয়েছিলাম। পাশ ফিরে দেখলাম, অন্য খাটিয়া শূন্য, মোহনবাবু নেই। উঠে বসলাম, একটু শীত বোধ হচ্ছে। পায়জামার ওপরে, একটি পাঞ্জাবি চাপিয়ে, বেরিয়ে এলাম। হট্টগোলের কারণ বোঝা গেল, কাজের লোকেরা সব ফিরে এসেছে। কোয়েনার ওপারে, বনের মাথায় আকাশ লাল, সন্ধ্যা আসন্ন। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি।

দেখলাম, বনবাসীরা কেউ কেউ হাঁটু জলে বসে মাথায় মুখে ছিটা দিচ্ছে। কেউ কেউ হাঁটু জলেই উপুড় হয়ে, জলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিচ্ছে। কাজের পরে ফিরেই স্নান। কোনো কোনো মেয়ে-পুরুষ জলে নামবার আগে, উনুনে আগুন ধরাতে ব্যস্ত। তার মধ্যে শুক্রমও আছে। বউ, শালী থাকতে, সে কেন উনোন ধরাচ্ছে? আমি আবার তাকালাম কোয়েনার স্রোতের দিকে। দেখতে পেলাম, সোমারি আর সুরসতিয়া, দু'জনেই জলে। সুরসতিয়ার সর্বাঙ্গ ভেজা। সে এদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, সে তার একটি বলিষ্ঠ হাত তুলে নাড়ালো। আমি হেসে মাথা ঝাঁকালাম। কয়েকটি মেয়ে, সুরসতিয়ার গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। একজন তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এক মুহূর্তের জন্য, সুরসতিয়ার পাথরপ্রতিমা বুক থেকে ভেজা আঁচল খসে গেল, রক্তিম আকাশের অস্পষ্ট আলোর রেখা সেই বুকে।

'এই যে উঠে পড়েছেন?' বলতে বলতে মোহনবাবু এগিয়ে এলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোথায় গেছলেন?'

মোহনবাবু বললেন, 'গাছ কাটার জায়গায়। ট্রাক বোঝাই করে, জরাই-কেলায় রওনা করিয়ে দিয়ে এলাম।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'জরাইকেলা ফিরতে তো অনেক রাত হয়ে যাবে।'

মোহনবাবু বললেন, 'আজ জরাইকেলা যাবে না। ছোট নাগরার নাকাতেই রাত্রে থাকবে। কাল ভোরবেলা জরাইকেলায় রওনা হয়ে যাবে। আবার খালি ট্রাক ফিরবে একদিন বাদে।'

তারপরেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে, আশেপাশে দেখে, ডাক দিলেন, 'সুরীন কোথায় গেল।'

জবাব এলো, ঘরের পিছন থেকে, 'এখানে। চায়ের জল বসিয়েছি।'

মোহনবাবু বললেন, 'চায়ের জন্যই বলছিলাম।'

বনের গভীরে হলে কী হবে, মোহনবাবুর ব্যবস্থা সব পাকা। অভ্যাসের বস্তু সমুদয়, প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে। হোরো কাছেই দাঁড়িয়েছিল। মোহনবাবু তাকে, বাইরে একটা খাটিয়া বের করে দিতে বললেন। হোরো বিছানাসুদ্ধ খাটিয়া বের করে নিয়ে এলো। মোহনবাবু বললেন, 'বসুন।'

পা তুলে বেশ আরাম করে বসলাম। কয়েকটা উনুনের কাঠ জ্বলে উঠেছে। ফুল গাছ পাতা কাঠপোড়ার একটি অদ্ভুত গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা বাতাসে। গাছে গাছে, ফিরে আসা পাখিরা কিচির মিচির করছে। তার সঙ্গে ঝিঁঝির ডাক। ঠিক এমনি বনবাস জীবনে কখনো ঘটেনি। চিরদিন হয়তো, আমার মতো মানুষ এরকম জায়গায় থাকতে পারে না। এখন মনে হচ্ছে, যেন চিরকালই এই বনবাসে থাকতে পারি।

যারা স্নান করতে নেমেছিল, তারা ফিরে আসছে। নতুনরা গিয়ে নামছে। দেখতে পাচ্ছি, সুরসতিয়া ফিরে এলো, পাতার ঘরে নিচু হয়ে ঢুকলো। একটু পরে একটি ডোরাকাটা শাড়ি হাতে আবার বেরিয়ে এলো, এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে, হেসে, ভেজা কাপড় জড়ানো পাথরপ্রতিমা শরীর নিয়ে চলে গেল একটু দূরে, গাছের আড়ালে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, ওদের ছোট ছোট পাতার ছাউনিতে, মাথা নিচু করে কাপড় পরা যায় না।

সোমারিকে দেখছি, সে এখনো জলে। নদীর এপার ওপার, হাতড়ে হাতড়ে যেন কিছু খুঁজছে। নিশ্চয়ই কোয়েনার জলে, এ ভাবে হাতড়ে হাতড়ে মাছ ধরা যায় না? সোমারি কি নুড়ি খোঁজে?

হোরো একটা চালের বস্তা আর পাল্লা বাটখারা, খাটিয়ার সামনে এনে রাখলো। মোহনবাবু খাটিয়ায় বসলেন। কুলী মজুরেরাও একে একে এসে লাইন দিল। কারোর হাতে মাটির মালসা, কারোর এলুমিনিয়াম বা কলাই করা লোহার বাটি। মোহনবাবুর হাতে একটি খাতা আর কলম। শুরু হলো

চাল মাপা আর দেওয়া এবং মোহনবাবু লিখে নিতে লাগলেন, নাম এবং চালের ওজন। সুরীন ধূমায়িত চা নিয়ে এলো কাঁচের গেলাসে করে। মোহনবাবু বললেন, 'সুরীন ভাই, চা খেয়ে হ্যারিকেনটা জ্বালো, তারপরে হ্যাজাকটা ধরিও।'

সুরীন মানুষটিকে আমার বড় ভাল লাগছে। সব সময়েই একটি হাসি তার মুখে লেগে আছে। অথচ তার চোখের দৃষ্টি করুণ। কখনো তাকে বসে থাকতে দেখি না, সব সময়েই কাজ করছে। কিন্তু চলাফেরার মধ্যে, তেমন ব্যস্ততা নেই। সে একটু পরেই হ্যারিকেন ধরিয়ে নিয়ে এলো, অন্য হাতে চায়ের গেলাস। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাত্রে কী খাবেন?'

বললাম, 'রাত্রের খাওয়ার কথা এখনো ভাবতেই পারছি না। পেট এখনো ভরা।'

সুরীন বললো, 'সে ঠিক হয়ে যাবে। রাত্রে যদি মুরগি খেতে চান, তাও হতে পারে। তা না হলে ডিমের ঝোল। এখানে মাছ বিশেষ পাওয়া যায় না।'

মোহনবাবু তাঁর কাজের মধ্যেই বললেন, 'সে সবও তো তোমার সুলুক সন্ধান জানা আছে, কোথায় মাছ পাওয়া যায়।'

সুরীন বললো, 'দেখবো, কাল একবার গাঁয়ের মধ্যে যাব।'

আমি বললাম, 'এ বেলা আর মুরগির দরকার নেই। রাত্রে রুটি হবে তো?'

সুরীন বললো, 'যা আপনার ইচ্ছা। ভাতও হতে পারে রুটিও হতে পারে।'

বললাম, 'আপনারা সবাই যা খাবেন, তাই করুন।'

এই সময়ে, সুরসতিয়া এসে দাঁড়ালো। একটি মাটির হাঁড়ি দু'হাতে ধরা, কোলের কাছে। ধোয়া খয়েরি ডোরাকাটা শাড়িটি পরেছে অদ্ভুতভাবে। নিচের দিকে দু' ভাঁজে জড়িয়েছে, তাতে যেমন সহবত প্রকাশিত, তেমনি ওর পরিশ্রমী দৃপ্ত কোমরে যেন, ডোরাগুলো লেপটে গিয়েছে। এক ভাঁজ শাড়ি টেনে দিয়েছে বুকের ওপর দিয়ে। ভেজা চুল মুছে আঁচড়েছে। কপালে একটি মেটে সিঁদুরের টিপ, যেন এই সারেণ্ডা অরণ্যের মৃত্তিকারই ফোঁটা। জানি না, ও মুখে তেল মেখেছে কী না, কিন্তু মুখখানি দেখাচ্ছে যেন তেলতেলে। সে এসে দাঁড়িয়েই, দৃষ্টি বিনিময় করে হাসলো। হাসির ঝিলিকটি ওর কৃষ্ণ ডাগর চোখেও। সেই কথাটাই আমার আবার মনে হলো, সুরসতিয়া যেন আমাকে অরণ্যের আদিম মন্ত্রে মুগ্ধ করে। আমি সহসা দৃষ্টি ফেরাতে ভুলে যাই। ওর আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, বিশেষ করে মেয়েরা, সবাই আমাদের দু'জনকে দেখছে, হাসাহাসি করছে, নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলিও করছে। তার মধ্যে একটি মেয়ে, সুরসতিয়ারই বয়সী প্রায় গুনগুন করে গান গেয়ে উঠলো।

কয়েকজন খিলখিল করে হেসে উঠলো। সুরসতিয়াও মুখে বাঁ হাত চাপা দিয়ে হাসি চেপে, আমাকে দেখলো। আমি সুরীনের দিকে তাকালাম।

সুরীন বললো, 'মাংরিটা সুরসতিয়ার পেছনে লেগেছে। ও গান গেয়ে বলছে, একটা সিগারেট দিয়েই যদি বাবু তোর এতোটা মন ভুলিয়ে থাকে, তা হলে দুটো মুরগি দিলে, কী হবে?'

মোহনবাবু হেসে বললেন, 'ছুঁড়ি দেখছি একেবারে মজেছে। একটু সাবধান থাকবেন।'

আমি হেসে উঠলাম। সুরীন বললো, 'গতিক সেই রকমই দেখছি।'

ইচ্ছা করে, আমিও সুরীনকে জেমার কথা জিজ্ঞেস করি। তার আর জেমার গতিকটা কী? এ সময়েই মাংরি আবার গুনগুন করে গান গেয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে, এক সঙ্গে হুঁ হুঁ শব্দ করে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে উঠলো। আমি সুরীনের দিকে তাকালাম। সুরীন হেসে বললো, 'মাংরি গান গেয়ে বলছে, বাবুর মনগুণ করা সিগারেট আমরাও খেয়ে দেখতে চাই, বাবু কী তা দেবেন?'

মোহনবাবু সঙ্গে সঙ্গে মাংরির দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বলে ওঠেন, 'কভি নহি। তুমলোগকা হম বহুত মার মারেগা।'

মোহনবাবুর ধমক শুনে, হেসে ও এর গায়ে ঢলে পড়লো। মারের ধমক শুনে যে, কর্মদাতার সামনে দাঁড়িয়ে কর্মীরা এমন করে হাসতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মোহনবাবুও ঠোঁট টিপে টিপে হাসছেন, আর হিসাব লিখছেন। আমি সুরীনকে বললাম, 'সিগারেটের স্টক আমার খুব কম নেই, কৌটো চারেক আছে। একটা কৌটো ওদের দিয়ে দিন।'

মোহনবাবু বলে উঠলেন, 'আরে না না, এতো দামী সিগারেট ওদের দেবেন না, শুধু শুধু নষ্ট। দিতে চান, বড় জামদা থেকে আপনাকে আমি সস্তার সিগারেট আনিয়ে দেব, তাই দেবেন।'

সুরীন বলে উঠলো, 'মোহনদা বাদ সাধছেন কেন। ওনার দিতে ইচ্ছা হয়েছে, দিন না। সস্তা সিগারেট না হয় পরে এনে দেওয়া যাবে।'

মোহনবাবু সুরীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তো তোমার সাধই বেশি দেখছি।'

সুরীন হাসলো। আমি পাতার ঘরে গিয়ে, আমার স্যুটকেশ খুলে, একটি আস্ত সিগারেটের টিন বের করে নিয়ে এলাম। মুখটা কেটে, টিনের পাতটা ফেলে দিয়ে, আমি সুরীনকে দিতে গেলাম।

সুমীন বললো, 'আপনি নিজের হাতে দিন, আরো খুশি হবে। তবে সুরসতিয়ার হাতে দিয়ে সবাইকে বেঁটে দিতে বলুন।'

মোহনবাবু বললেন, 'সুমীন, তুমিই ঝামেলা বাড়াচ্ছো।'

আমি সুরসতিয়াকে কৌটোটা দিয়ে বললাম, 'তুম সবকোই কো বাট দো।'

সব মেয়েরাই প্রায় এক সঙ্গে হেসে উঠলো, সেই সঙ্গে পুরুষরাও। সংখ্যায় মিলিয়ে, সবসুদ্ধ পঞ্চাশ জনের বেশি শ্রমিক হবে না। সবাই একটা করে নিশ্চয়ই পাবে। সুরসতিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'হম নহি পিয়েগা?'

বললাম, 'জরুর পিয়েগা। ইস্‌মে নাই হোগা তো, আওর দেগা।'

সুরসতিয়া বললো, 'ইস্ মে হো যায়েগা।'

সুমীন বললো, 'বাবুকো নাচ দেখায়েগা তুমলোগ।'

সোমারির বয়সী একটি মেয়ে বলে উঠলো, 'দেখায়েগা, হমলোগকো ড্রিংক পিয়ানে হোগা, সিরগেট ভি দেনে হোগা।'

লক্ষণীয়, সুরসতিয়া উচ্চারণ করে সিগ্রেট, অনেক শিক্ষিত মানুষও যেমন করে, আর এই মেয়েটি উচ্চারণ করলো সিরগেট। অনেক গ্রাম্য বাঙালীর মুখে, ছিরগেট শব্দও শুনেছি। মোহনবাবু বললেন, 'তু লোক তো অ্যায়সাই দারু পিকে নাচতা হ্যায়, বাবুকো পাস্ ড্রিংক কাঁহে মাংতা?'

মেয়েটি ঝটিতি একবার আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'বাবুকো দিল বহুত বড়া হ্যায়।'

অনেকেই হঁয় হঁয় বলে সায় দিয়ে উঠলো। মোহনবাবু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হাঁ, বাবুকো দিল আভি বহুত বড়া দেখত্যা হ্যায়। ড্রিংক নাই পিলানেসে, দিল ছোট হো যায়েগা।'

সুরসতিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'তুম নাচ দেখনে মাংতা?'

আমি ঘাড় কাত করে বললাম, 'হাঁ।'

সুরসতিয়া আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুম্ ভি হমারা সাথ্ নাচেগা?'

বললাম, 'হম নাচ নহি জানতা।'

সুরসতিয়া ওর বুকের দিকে চিবুক ঝুঁকিয়ে দেখিয়ে বললো, 'হম তুমকো শিখায়েগা।'

সুরসতিয়ার কৃষ্ণ ডাগর চোখের দিকের তাকিয়ে, মনে হয়, আমি যেন কোন্ দূরের অতলে ডুবে যাই। বললাম, 'তব হম নাচেগা।'

সুরসতিয়ার চোখের ঝিলিক যেন, ওর সারা গায়ে লেগে গেল। মোহনবাবু বললেন, 'এই সুরসতিয়া, চাল লেও পহলে, বাবুকো দিমাক মত্ খারাপ করো।'

আমি মোহনবাবুর দিকে তাকালাম, মোহনবাবু হাসলেন। হোরো চাল ওজন করে, সুরসতিয়ার হাঁড়িতে ঢেলে দিল। সুরসতিয়া যাবার আগে বললো, 'আভি আয়েগা।'

বলে প্রায় দৌড়েই চলে গেল। আমি সরে এসে সুরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ডিয়েং মানে তো হাঁড়িয়া?'

সুরীন বললো, 'হ্যাঁ।'

আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদের সকলের ডিয়েং খেতে কতো টাকা লাগতে পারে?'

সুরীন বললো, 'খাওয়াবেন নাকি?'

বললাম, 'ক্ষতি কী? এদের যদি একটু খুশি করতে পারি, আমি সুখী হবো।'

সুরীনের মুখে যেন একটি খুশির কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠলো, বললো, 'কতো আর, পনেরো বিশ টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে। এখানে সূর্যমণি বলে একটি বিধবা মেয়ে আছে এই দলে। সে তার নিজের পয়সায় মোহনদার কাছ থেকে চাল কিনে, ডিয়েং বানায়, এরা কিনে খায়। দেখুন না, একটু বাদেই সব ডিয়েং নিয়ে বসবে। আপনি সূর্যমণিকে টাকা দিলে, ও ডিয়েং তৈরি করে দেবে। ওর হাতের ডিয়েং সবাই ভালবাসে।'

সূর্যমণি নামটা, মুণ্ডাদের মধ্যে, একটু অন্যরকম। সমতলের হিন্দুদের মতো শোনাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তার হাতে কি বিশেষ গুণ আছে?'

সুরীন বললো, 'তা আছে। এক একজনের হাতের রান্না যেমন ভাল হয়, ডিয়েংও এক একজনের হাতে ভাল হয়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি সূর্যমণির ডিয়েং-এর স্বাদ জানা আছে?'

সুরীন সলজ্জ হেসে বললো, 'তা একটু আধটু আছে। আপনি কখনো হাঁড়িয়া খেয়েছেন?'

বললাম, 'না। কীরকম খেতে?'

সুরীন বললো, 'আপনারা খেতে পারবেন না। অনেকটা, কয়েকদিনের বাসি পান্তাভাতের মতো, কচলানো, ছাঁকা। দেখতে অনেকটা ঘোলের মতো লাগে, তার থেকে ভারী, স্বাদ টোকো।'

কিছুটা অনুমান করে, খুব সুবিধার মনে হলো না। জিজ্ঞেস করলাম, 'গন্ধটা কেমন?'

সুরীন বললো, 'অনেকটা পচা ভাতের মতন।'

সর্বনাশ! অমন বিদ্‌ঘুটে বস্তু গলাধঃকরণ করে কী করে? বললাম, 'কোনোদিক থেকেই তো ভাল মনে হচ্ছে না?'

সুরীন হেসে বললো, 'সবই অভ্যাসের ব্যাপার। ওরা পেট থেকে পড়েই খায়, ওদের কিছু মনে হয় না। খেতে খেতে নেশা হয়ে যায়, তখন আমারো কিছু মনে হয় না। আমি এখনো নাক টিপে, কোনরকমে এক চুমুকে্ খেয়ে ফেলি।'

বললাম, 'তা হলে আপনার হাতে আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি স্বর্ষমণিকে দিয়ে দেবেন।'

সুরীন বললো, 'দেবেন এখন। আজ তো কিছু হবে না। আজ রাত্রে ওকে টাকা দিয়ে রাখবো, ও মোহনদার কাছ থেকে চাল নিয়ে, ফুটিয়ে রাখবে। যাই, আমি হ্যাজাকটা জ্বালি গিয়ে।'

সুরীন চলে গেল। সকলের চাল নেওয়া সাঙ্গ। নিচের চরায়, ছোট ছোট পাতার চালার ধারে ধারে, প্রায় দশ বারোটা উনুন জ্বলছে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে এসেছে।. পুরোপুরি অন্ধকার নামেনি, এখনো আকাশের হালকা রঙ দেখা যায়। তারা ফুটতে আরম্ভ করেছে। মোহনবাবু খাটিয়ার কাঠের পায়ার গোল জায়গায় হ্যারিকেন রেখে, এখনো হিসাব করছেন। তাঁর বনবাস মানেই কাজ এবং জীবিকা। হোরো চালের বস্তা আর পাল্লা বাটখারা রেখে, খাটিয়ার কাছাকাছি কাঠ জড়ো করছে, আগুন জ্বালাবে।

এই বনের বুকে নেমে আসা অন্ধকারের মধ্যেও, কেকাধ্বনি প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি, দূরে অদূরে। অনেকক্ষণ কোয়েনার কুলুকুলু দুর্বোধ গান শুনতে পাইনি। অনেক লোকের নানা কলরবে, নিজের অন্যমনস্কতায় সেই নিরন্তর ধ্বনি হারিয়ে গিয়েছিল, এখন আবার শুনতে পাচ্ছি। নিরালা বনকে অনেক সময় মনে হয়, নিঃশব্দ। কিন্তু কখনোই তা না। যেখানে কোয়েনা নেই, সেখানেও এই সারেণ্ডা বন নিরন্তর বেঁচে থাকার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মতো, ঝিঁঝির ডাকে মুখর। অথচ ঝিল্লিস্বর যেন নৈঃশব্দ্যেরই আর এক অঙ্গ। তা যে নিরন্তর বাজে, আমরা মনে করে রাখি না। মনে পড়ছে, ছোট নাগরায়, তৃপ্তি বলেছিল, 'মুণ্ডারা মনে করে, ঝিঁঝি ডাকে না, কাঁদে।' মনে পড়ে যায় সেই কবিতার পঙ্‌ক্তি, 'ঝিল্লিস্বরে কাঁদায় রে/নিশার গগন।'

এখন আমার মাথার ওপরে নিশার গগন। ঝিল্লিস্বরে সে কাঁদে কী না, বুঝতে পারি না। আমার কেবলই মনে হয়, আমি যেন মর্ত্যভূমে নেই। কোন্ এক দূরকালের, দূরলোকে এসে পৌঁছেছি, যার রূপ বর্ণ গন্ধ, সবই আমার

আদুর গভীরে ঢুকে, আমাকে নিশির ঘোরে টেনে নিয়ে চলেছে। এখনো অনেক স্বর শোনা যায়, কিন্তু তা কলরব বলে মনে হয় না। মনে হয়, সবই যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে। আগুনের শিখার ধারে ধারে নারী পুরুষের ছায়া মূর্তিগুলোকে দেখে মনে হয়, যেন মন্দিরের গা থেকে প্রাচীন শিল্পীর প্রস্তর মূর্তিগুলো প্রাণ পেয়ে নেমে এসেছে।

আমি নিচের দিকে আস্তে আস্তে নেমে গেলাম। একটি উনুনের ধারে সোমারি আর শুক্রমকে চিনতে ভুল হয় না, যদিও উনুনের কাঠের আগুনের আলো ছাড়া কিছু নেই। আগুনের শিখার আলো ওদের গায়ে কাঁপছে। শুক্রম হাসলো, সোমারি ডেকে বললো, 'আও বাবুজী। তুম হমলোগ্‌কো এক টিনা সিগ্রেট দিয়া ?'

আমি হাসি, কোনো জবাব দিই না। সোমারি আবার বললো, 'সুরসতিয়া আভি সবকো সিগ্রেট বাটতা। বয়ঠো না বাবুজী।'

এ ঘরের আঙিনা না, যে আসন পেতে বসতে দেবে। এখানে ওরা কাজে এসেছে, কোনোরকমে জীবনধারণ। সকলেরই মৃত্তিকা আসন। আমি বসলাম না। ওদের উনুনে ভাতের হাঁড়িতে, ভাত রান্না হচ্ছে। সোমারির গায়ে, ছোটখাটো একটি শাড়ি জড়ানো, কোনোরকমে হাঁটুর ওপর থেকে বুকে জড়ানো। চুল খোলা, পিঠে ছড়ানো। শুক্রমকে মনে হয়, যেন একটি উলঙ্গ পুরুষ। কিন্তু আমার মনে কৌতূহল জাগে, সোমারির সামনে মাটির ওপরে কতগুলো কী চিকচিক করে ? জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কেয়া চিজ্‌ হায় ?'

সোমারি হেসে বললো, 'লোয়াক না ?'

যেন আমি একেবারেই অবুঝ অন্ধ, এমনভাবে সে বলে। কিন্তু লোয়াক আবার কী বস্তু। আমি একটু নিচু হতেই, সোমারি হাতে তুলে দেখায়। আগুনের আলোয় দেখলাম, গোলমতো ঝিনুক। জিজ্ঞেস করলাম, 'ইস্‌কো তুমলোগ লোয়াক কহতা ?'

সোমারি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হাঁ।'

আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কেয়া করেগা ?'

সোমারি যেন অবাক হয়ে বললো, 'খায়েগা তো।'

বলে, হাতের ঝিনুকটির মুখ জোর করে খুলে ফেলে, ভিতর থেকে জীবটিকে বের করে, আমাকে দেখালো। প্রায় রক্তিম একটি ছোট ড্যালা। তার থেকে খুঁটে খুঁটে কী যেন তুলে নিয়ে ফেলে দিল। তারপরে ভাতের হাঁড়ির ঢাকনা

খুলে, তার মধ্যে সেই ড্যালাটি ছেড়ে দিল। দিতে গিয়ে, ওর বুকের আঁচল সরে গিয়ে, ঈষৎ নম্র পুষ্ট একটি বুক উদাস হলো। কিন্তু ও নিজেও উদাস, ঢাকবার কোনো প্রয়োজন মনে করলো না, হেসে বললো, 'ভাতকো সাথ্ খায়েগা।'

এমন বিচিত্র খাওয়া কখনো দেখিনি। জগতের কোথায় কতোটুকুই বা দেখেছি। সবই তো, প্রকৃতি পরিবেশ আর জন্ম-নির্ভর। একজনের খাদ্য, আর একজনের অখাদ্য হতে পারে, তার জন্য ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার কিছু নেই। ইংরেজিতে যাকে বলে প্রোটিন, এও তো তা-ই। বাঙালীরা গুগ্‌লির ঝোল খায়। তা নাকি বিশেষ ব্যাধিতেও ফলপ্রদ। যার নাম চিংড়ি, সেও খোলের মধ্যে থাকে, বলা যায়, জলজ কীট বিশেষ। নাক সিঁটকে কিছু বলতে গেলে, তাবৎ পৃথিবীর লোকেরা আমাকে ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে আসবে। চিংড়ি খায় না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল।

খাওয়ার কথা বলতে গেলে, পুরো এক কেতাবের ফিরিস্তিতেও কুলোবে না। সকল জাতি তাদের খাদ্যের, রন্ধনের গৌরবে গৌরবান্বিত। পুবে পশ্চিমের বাঙলাতেই কতো তফাত! এর পাতালকোঁড়কে ওরা বলে ব্যাঙের ছাতা, ওদের শুকনো মাছের গন্ধে এরা নাকে কাপড় দিয়ে পালায়। এ আর এমন কি কথা, বাঙলাদেশের সোনা ব্যাঙের ঠ্যাং নাকি পড়তে পায় না, বিদেশে তার জবর কদর। জিজ্ঞেস করলাম, 'উসকো ক্যায়সে পাকায়েগা?'

সোমারি বললো, 'বাস্, ভাত কো সাথ পাক যাতা।'

অর্থাৎ ঝিনুকের মাংস, ভাত সেদ্ধই খাবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'অওর ক্যায়া পাকায়েগা?'

সোমারি সারা মুখে আগুনের শিখা কাঁপা হাসি মেখে বললো, 'অওর ক্যায়া? বাস্, ভাত, অওর নিমক তো হ্যায়।'

ভাত আর নুন! অবিশ্বাস্য মনে হলো। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'অওর কুছ নহি? ডাল ভাজি?'

সোমারির হাসিতে ওর উদাস বুকও যেন হাসলো, বললো, 'ডাল ভাজি? কহাঁ মিলেগা?'

জিজ্ঞেস করাটাই বোধহয় ভুল হয়েছে। বুঝতে পারিনি। নিজের জীবনে অনেক দুর্বিপাক গিয়েছে, বৃষ্টিভেজা অভুক্ত কাকের মতো, ভবিষ্যতের আশায় বেঁচে থাকতে চেয়েছি। তবু মনে হয়, মানুষের জীবনমরণের অনেক সংবাদই অজানা রয়ে গিয়েছে। তারপরে, আর কিছু না, এই ভেবে অবাক লাগে, আর

এক অনির্বচনীয় মুগ্ধতায় বোবা হয়ে থাকি, তারপরেও এমন হাসিটি ওরা হাসে কেমন করে? যেন জন্মলগ্নে, এই হাসিটি মুখে মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ, সেই বিরসা মুণ্ডার কথাও মনে পড়ে, যিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে, কামান বন্দুকের সঙ্গে, তীর ধনুক নিয়ে, দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়েছিলেন। বুঝতে পারি, এই হাসি মুখে, ঘৃণা আর ক্রোধও লেলিহান হয়ে জ্বলে উঠতে পারে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সবকোই অ্যায়সাই খাতা হ্যায়?'

সোমারি ঘাড় কাত করে যেন আমাকেই জিজ্ঞেস করলো, 'তব?'

আগুনের কম্পিত শিখার ভিতর দিয়ে, সুরসতিয়া আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, একটি সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'তুম পিও।'

আমি বললাম, 'হমকো তো হ্যায়।'

সুরসতিয়া তবু বললো, 'তুম হমকো দিয়া, তুমকো হম দেতা।'

বলে সিগারেটটি সে প্রায় আমার মুখের কাছে তুলে দিল। আমি ওর হাত থেকে সিগারেটটা নিলাম। ওর আর এক হাতে কৌটোটা ছিল। তার মধ্যে একটি সিগারেটই অবশিষ্ট ছিল। সেটি নিয়ে, কৌটোটা আমাকে দেখিয়ে বললো, 'ইটো হম রাখ দেগা।'

সামান্য একটা সিগারেটের টিন। জিজ্ঞেস করলাম, 'ইঠো লেকে ক্যায়া করেগা?'

সুরসতিয়া ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হমকো পুন্‌হার রাখেগা।'

পুন্‌হার? সেটা আবার কী বস্তু। জিজ্ঞেস করলাম 'পুন্‌হার ক্যায়া?'

সুরসতিয়া ওর গলায় হাত দিল, তারপর পাশ ফিরে, ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা, মাংরির গলার পুতির হার হাত দিয়ে ধরে দেখালো, 'এ তো পুন্‌হার।'

পুঁতির মালার নাম পুন্‌হার। সুরসতিয়ার গলায় পুঁতির মালা নেই। ওর গায়ে কোনো অলঙ্কারই নেই, কানের বড় ফুটোয় দুটো কাঠের তৈরি খড়কে ছাড়া। বললাম, 'তুমকো পুন্‌হার তো নহি হ্যায়?'

সুরসতিয়া মুখ নিচু করে মাথা নাড়লো, তারপরে মাংরির দিকে তাকিয়ে হাসলো। সোমারি হেসে উঠে কী যেন বললো। শুক্রম দূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে, আপন মনে একটা ফিকা টেনে যাচ্ছে। বিশ্ব সংসারের সঙ্গে যেন তার কোনো যোগাযোগ নেই, একটি গভীর দার্শনিকতা যেন প্রায় নগ্ন পুরুষটির মুখে।

সুরসতিয়া আমাকে ঘাড় নেড়ে, কৃষ্ণ চোখের ইশারা করে ডাকলো, পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো। আমি ওর সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলাম। বোবা

যায়, কারোরই হ্যারিকেন বা লম্প বলে কোনো বাতি নেই, যা কিছু সবই কাঠের আগুনের আলো। কে যেন সুর করে, গান গেয়ে চলেছে। মনে হয় এদের গানের সুরে কোনো বৈচিত্র নেই, একটাই সুর, অনেকটা কোয়েনার কুলকুল, ঝিঁঝির ডাকের মতো।

এদের গানে কথাই প্রধান।

আমি সুরসতিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সোমারি ক্যায়া বোলতা রহা?'

সুরসতিয়া হাসলো। মাংরি জবাব দিল, 'সোমারি বোলতা রহা কি, সুরসতিয়াকো পুন্‌হার নহি, তুমকো দুখ্‌ লাগতা।'

কথাটা একেবারে মিথ্যা না। দারিদ্র্য নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি, আমাদের নগরে গ্রামে জনপদে আর এই বনের দারিদ্র্য নিজের চোখেই দেখছি। একটি সিগারেটের কৌটো রেখে দেবে, ভবিষ্যতে কোনো একদিন যখন সে একটি পুঁতির হার পাবে, তার মধ্যে রাখবে বলে। আমি জানি না, এই পাথরপ্রতিমা সুরসতিয়ার সুগঠিত কাঁধে এবং গলায়, একটি পুঁতির মালা কতোটুকু সৌন্দর্য দান করবে, তথাপি, মনের বাসনা বলে একটি কথা আছে। নগরবাসিনী আর বনবাসিনী, যে-ই হোক, নিজেদের নিজেদের মতো করে, সাজাতে চায় সকলেই। সুরসতিয়ার গলায়, একটি পুঁতির হার দেখতে ইচ্ছা করে বৈকি। কিন্তু সোমারি আমার দুঃখের কথা বলেছে, একথা বলেনি, আমি যেন একটি পুঁতির হার সুরসতিয়াকে দিই। যেটা বলা অশোভন বা অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। হয়তো সিগারেট চেয়ে খাওয়া যায়, পুঁতির হার চাওয়া যায় না।

আমি বললাম, 'হাঁ দুখ্‌ লাগতা।'

সুরসতিয়া আমার দিকে তাকালো। আমি ওর কালো চোখের ঝিলিক দেখতে পলাম। বললো, 'হমকো সরম লাগতা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কাহে?'

সুরসতিয়া বললো, 'নাই জানতা।'

বলে হেসে উঠলো, একটি হাত তুলে দিল মাংরির কাঁধের ওপর। মাংরি গুনগুন করে, গান গেয়ে উঠলো।

সুরীন নেই যে, মানে বলে দেবে। আমি মাংরিকেই জিজ্ঞেস করি, 'তুম ক্যায়া গানা গাতা?'

সুরসতিয়া মাংরি, দু'জনেই হেসে উঠলো। মাংরি বললো, 'হম গাতা হ্যায়, তুম্ কোন্ মুলুককা হাওয়া আয়া, হমকো সাতবহিনি বোলাতা।'

তার মানে, তুমি কোন্ দেশের বাতাস এলে, আমাকে সাতবহিনি ডাকছে। কোন্ দেশের বাতাসের ব্যাপারটা বুঝতে পারি, সাতবহিনির ডাক বুঝতে পারি না। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করি, 'সাতবহিনি ক্যায়া হায় ?'

সুরসতিয়া আর মাংরিও দাঁড়িয়ে পড়লো। মাংরি বললো, 'তুম পয়রী জানতা, পয়রী ? খুবসুরত লেড়কি, উড়নে সক্তা ?'

পয়রী—মানে কি পরী ? সুন্দরী মেয়ে উড়তে পারে, বোধহয় পরীর কথাই বলে। বললাম, 'হমলোগ পরী বোল্‌তা।'

মাংরি বললো, 'ওইসা সাতবহিনি পরী হায়। উ লোগ্ ভারি জঙ্গলমে কভি কভি দর্শন দেতা, যোয়ান লেড়কা অওর লেড়কিকো। সাতবহিনিকো দর্শন হোতা তো, দিল মে মহব্বত আতা, লেকড়া লেড়কি পাগল হো যাতা, ঘর ছোড়কে চলা যাতা।'

ভীষণ ব্যাপার। সাতবহিনি সাত পরী, গভীর জঙ্গলে তারা যুবক যুবতীদের দর্শন দেয়, তাদের প্রাণে প্রেম সঞ্চারিত হয়, তারা পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে যায়। অর্থাৎ প্রেমের হাতছানি, প্রেমসম্মোহন। এবার বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিদেশী এক হাওয়া লেগে সাতবহিনির ডাক শোনা মানে, প্রেমে পাগল হওয়া। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, সুরসতিয়া আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আশে-পাশের কাঠের আগুন ওর গায়ে চোখে মুখে কাঁপছে। সেই অরণ্য-আদিম মন্ত্র ওর চোখের তারায়, মুখের হাসিতে। ও নিঃশব্দে ঘাড় দুলিয়ে, আমাকে ডাক দিয়ে, এগিয়ে গেল। আমার সাতবহিনি সাত পরী দেখছি একলা সুরসতিয়া নিজেই। প্রেম পাগল হই কী না, বুঝি না। মন্ত্রমুগ্ধ যে হয়েছি, তা বুঝি।

ও বেলা প্রথম হোরোকে, সব থেকে বড় যে পাতার ঘরের পাশে দেখেছিলাম, সুরসতিয়া আর মাংরি আমাকে সেই ঘরে নিয়ে এলো। এ ঘরের চেহারা আলাদা। সমস্ত কাঁচা মাটির মেঝের ওপরে শুকনো পাতা মোটা করে বিছানো। তার ওপরে, চট, হোগলার মাদুর বিছানো। মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁকা, সেখানে কাঠের আগুন জ্বলছে। ঢোকবার মুখের কাছেই, ওপরে শাল কাঠের চালার খুঁটির সঙ্গে, একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। ঘরের শেষ প্রান্তে, কিছু মেয়ে পুরুষ গোল হয়ে বসে আছে। তারা হাসছে, কথা বলছে, সেখানেও একটা আলো রয়েছে মনে হয়। কয়েকজন এদিকে ওদিকে বসে আছে। তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেখে হাসলো, একজন কপালে হাত ঠেকালো। আমিও ঠেকালাম।

সুরসতিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উধার মে ক্যায়া হোতা হায় ?'

সুরসতিয়া এবার অসংকোচে আমার একটি হাত ধরে বললো, 'দেখেগা, চোলো।'

বলে মাংরির দিকে তাকিয়ে হাসলো। পাতার দেওয়াল ঘেঁষে, এক এক জনের ছোট সংসারের জিনিসপত্র রাখা। থালা বাটি ঘটি হাঁড়ি মালসা পুঁটলি এমনি সব জিনিস। বোঝা যায়, এ ঘরটা এক সঙ্গে অনেকের শয়ন ঘর। সুরসতিয়ার হাত ধরা হয়ে, আমি গোল হয়ে বসা গুচ্ছের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখনই বুঝতে পারলাম, মৌতাতের জটলা জমেছে। এখানেও কাঁচা মাটি ফাঁকা, কিছু বিছানো নেই। একটি লম্ফর শিখা কাঁপছে। যাকে ঘিরে সবাই বসেছে, সে একটি যুবতী। সে ঠিক কালো না, প্রায় মাজা মাজা ফরসাই বলা যায়। বোধহয় স্নান করেছিল, খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। মুখটি অবিশ্যি পুরোপুরি বনবাসীর। কিন্তু চোখের তারা দুটি খয়েরি। দু' হাতে দুটি ঝকঝকে কাঁসার বলয়। গলায় বোধহয় রুপোর সরু হার, কানে রুপোরই মাকড়ি। বোঝা যায়, যুবতী বেশ সম্পন্না। তার সামনে একটি মাটির বড় জালা। জালার মুখ ন্যাকড়া দিয়ে ঢাকা। জালার পাশে, শালপাতার ওপরে, ঝকঝকে একটি কাঁসার জামবাটি। বাকিদের হাতে, শালপাতার দোনা, অনেকটা ছোট ছোট নৌকার মতো। তার মধ্যে, সুরীনের বলা সেই পানীয়, অনেকটা শাদা পাতলা ফ্যানের মতো।

কেউ কেউ মুখ তুলে চুমুক দিচ্ছিল, কারোর হাতে ধরা। দু' একজনের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট, একজনের কানে গোঁজা। বুঝলাম, জালার পাশে বসে থাকা যুবতী আর কেউ না, শুণ্ডিনী সূর্যমণি, বাকিরা ক্রেতা ক্রেতী। আমাকে দেখেই, সূর্যমণি মুখে বাঁ হাত চাপা দিয়ে, হেসে সুরসতিয়ার দিকে তাকালো। বাকিরাও হাসলো, কেউ সশব্দে, কেউ নিঃশব্দে। সবাই যেন একটু নড়ে চড়ে বসলো, ভাবটা যেন আমাদের সম্মান করে, জায়গা করে দিতে চাইছে। যে দু' তিন জন জোয়ান মুণ্ডা বসেছিল, তাদের দৃষ্টি সুরসতিয়া আর মাংরির দিকেই বেশি। তাদের মধ্যে একজন মাংরির দিকে তাকিয়ে কী বললো। মাংরি তার জবাবে কিছু বললো না, কেবল মাথা নাড়লো। সুরসতিয়া আমার দিকে তাকালো, ওর চোখে সেই আদিম মন্ত্র, আমাকে সম্মোহন করছে। হাতে একটু টান দিয়ে বললো, 'নহি বয়ঠেগা?'

বললাম, 'বৈঠেগা।'

এ সময়ে সূর্যমণি সুরসতিয়ার নাম ধরে কিছু বললো। মাংরি তার জবাবে কিছু বলে, ঘরের অন্য দিকে চলে গেল। সুরসতিয়া আমার হাত ধরে বসলো।

ও বসলো মাটিতে চেপে, আমিও তাই বসলাম। ও অনায়াসে আমার কোলের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'ডিয়েং পিয়েগা না?'

আমি সুরসতিয়ার চোখের দিকে তাকালাম। মাথা নেড়েও যে 'না' বলবো, তা পারলাম না। বনের ডাকে এসেছি, বনের সঙ্গে খেলতে। এই খেলাটা কী? বনের খেলার সঙ্গে, বনবালার এই খেলাটাও অঙ্গাঙ্গী? কোথায় নিয়ে যেতে চায় সে আমাকে, কতোদূরে। ওকি, ওদেরই সাতবহিনির কেউ নাকি? বললাম, 'কভি পিয়া নহি।'

সুরসতিয়ার ভুরু কাঁপলো, জিজ্ঞেস করলো, 'তুম্ দারু কভি নহি পিয়া?'

দারু যদি সুরা হয়, তা হলে, অস্বীকার করার উপায় নেই, তার স্বাদ প্রতিক্রিয়া সকলই আমার জানা আছে। কিন্তু হাঁড়িয়া নামক এ বস্তুর স্বাদ আমার জানা নেই, যার আমানি টকো গন্ধ আমার নাকে আসছে। আমানি পান্তা ভাতের গন্ধ অনেকটা এইরকমই। বর্ধমানে, বীরভূমে, মাঠে ঘাটে খেটে-খাওয়া মানুষদের দেখেছি, দু'দিনের ভিজিয়ে রাখা হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে খেতে। জলমুদ্ধ চটকে, নুন মেখে, একটু বা তেঁতুলের আচারের টাক্না দিয়ে। সম্বল থাকলে, একটু কিছু ভাজাভুজি। নিজেও যে খাইনি, তা না। বর্ধমানেই রীতিমতো সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বাড়িতে, পোরের ভাজা দিয়ে, আমানি খাওয়া একটি বিলাসিতা। গরম গরম ভাজা, তার সঙ্গে হাঁড়ির ঠাণ্ডা আমানি, অমৃততুল্য। তারপরে যে নিদ্রাটি আসে, নাক না ডাকিয়ে যায় না। সুরসতিয়াকে বললাম, 'পিয়া।'

সুরসতিয়া বললো, 'ই তো দারু হ্যায়, ডিয়েং হ্যায়, হমারা দারু। তুমকো আচ্ছা নহি লাগতা?'

আমি হেসে বললাম, 'ক্যায়সে কহেগা, আচ্ছা কি খারাপ। এ চিজ্ তো কভি নহি পিয়া।'

সুরসতিয়ার মুখ কি আমার মুখের কাছে নিবিড় হয়ে আসে? ওর নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ে গলায় লাগছে। বললো, 'আজ পিও।'

সূর্যমণি হেসে উঠে বললো, 'এ তো বামাইবুরুকা বহুত কৃপা, বাবুজী কো এক কুড়ি দারু পিলানে মাংতা।'

সূর্যমণির কথা বেশ পরিষ্কার, বলার ভঙ্গির মধ্যেও একটি স্বচ্ছতা আছে। কিন্তু বামাইবুরুর কৃপা কী, আর কুড়ি-ই বা কাকে বলে, জানি না। ইতিমধ্যে সূর্যমণির কথায়, অনেকেই ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে, হেসে বললো, 'হঁয় হঁয়।'

আমি সুরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বামাইবুরু ক্যায়া হ্যায়?'

সুরসতিয়া চোখের তারা ঘুরিয়ে, এক হাত তুলে বললো, 'দেওতা, পাহাড় কে দেওতা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'অওর কুড়ি।'

সুরসতিয়া হেসে, সূর্যমণির দিকে তাকালো। সূর্যমণি বললো, 'কুড়ি নহি জানতা বাবুজী? কুড়ি হ্যায় লেড়কি, যবান লেড়কি। কোড়া হ্যায় যবান লেড়কা, হমারা মুণ্ডা বাত অ্যায়সা হ্যায়।'

একটি মেয়ে, সূর্যমণির থেকে বোধহয় একটু বড় হবে, তার চোখ ঢুলুঢুলু, কথাও যেন জলে ভরা। বললো, 'সুরসতিয়া কুড়ি নহি, কোটুরি হ্যায়, কোটুরি।'

সকলেই যেন উল্লাসে হেসে বেজে উঠলো। আর সুরসতিয়া, আমার কোলের কাছে, জামা চেপে ধরে, আমারই কাঁধের কাছে, ওর মুখ চেপে ধরলো। আমাদের গ্রাম জনপদ শহরে, এমন ঘটনা অচিন্ত্যনীয়, অভাবনীয়। একটি ষোল সতেরো বছরের পাথরপ্রতিমা মেয়ে, অনায়াসে একটি ভিনদেশী পুরুষের কাঁধে মুখ চাপে। যার সঙ্গে তার পরিচয়ের সময়ের হিসাব করলে, সাকুল্যে কয়েক ঘণ্টা। একে কি প্রেম পিরীতি বলে? যদি বলে, আমি তার রীতি জানি না। প্রেম কি এতগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ নরনারীর সামনে হতে পারে? কিন্তু কোটুরি মানে কী? যার জন্য সবাই এমন হেসে বাজে, আর 'যবান লেড়কি' আমার কাঁধে মুখ লুকায়? আমি সূর্যমণির দিকেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। সূর্যমণির গেরুয়া ফর্সা মুখ হাসিতে লাল, যেন সারেণ্ডার রক্ত মৃত্তিকায় সূর্যের ছটা লেগেছে। আমার জিজ্ঞাসা বুঝতে পেরে বললো, 'কোটুরি কহতা হ্যায়, যো মুরগী আভিতক আণ্ডা নহি দিয়া।'

এক মধ্যবয়স্ক মুণ্ডা চিৎকার করে হাঁকলো, 'হাঁ হাঁ, যো মুরগীকা উপার আভিতক মুরগা নহি চঢ়া।'

বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে, দু' বার লাফিয়ে, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে বলে উঠলো, 'লাঝের লাঝের লাঝের।'

স্পষ্টতঃই, মুণ্ডা মহাশয়ের দ্রব্যগুণ উচ্চস্তরে পৌঁছেছে। সকলেই হেসে উঠলো, আর এদিকে সুরসতিয়া আরো জোরে, আমার কাঁধে মুখ চাপছে, চেপে ধরেছে আমার একটি ডানা। মুণ্ডার কথায় লজ্জা যে আমিও পাই না, তা না। কিন্তু আমার লজ্জা পাবার অবকাশ কম, যতটা পায় সুরসতিয়া। কারণ, সুরসতিয়ার পরিচিত নরনারী আর সমাজ ওর সামনে। তারা ঠাট্টা করলে, ও লজ্জা পাবেই। আমি বিদেশী, অনেকখানি অপরিচিত। অবাক লাগে, এদের

আশ্চর্য সরলতায়! এখানে ভাল লাগার প্রকাশ কি এমন-ই অনাবিল? আরো মুগ্ধ হই এদের ভাষায়, এবং উপযুক্ত সময়ে তার প্রয়োগে। হয় তো, পরিবেশের গুণে এই একটি কথাই, আমাদের সমাজে অশ্লীল শোনাতো। এখানে নিতান্তই ঠাট্টা। কুমারী মেয়েকে বিশেষণ দিচ্ছে 'কোট্রি'—যে মুরগী এখনো ডিম পাড়েনি।

এ সময়ে এলো মাংরি, ওর হাতে একটি ঝকঝকে কাঁসার বাটি। মধ্যবয়স্ক মুণ্ডা তখন, শালপাতার নৌকা বাড়িয়ে, সূর্যমণির কাছ থেকে ডিয়েং নিচ্ছে। মাংরি এসে, ব্যাপার দেখে একটু অবাক হয়। সুরসতিয়া আমার কাঁধ থেকে মুখ সরিয়ে, মাংরির দিকে তাকালো। মাংরি ওকে কী জিজ্ঞেস করলো, তার জবাবে, খুব দ্রুত, সূর্যমণি কিছু বললো। সকলেই এবার হেসে উঠলো, মাংরিও। মাংরির হাত থেকে কাঁসার বাটিটি সুরসতিয়া নিল, এগিয়ে দিল সূর্যমণির দিকে। সূর্যমণি তার নিজের জামবাটি দিয়ে, জালার মুখ খুলে ডিয়েং তুলে, সুরসতিয়ার বাটিতে ঢেলে দিল। সুরসতিয়া দু' হাতে বাটি ধরে, আমার সামনে ধরলো। এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করলাম। সুরসতিয়ার অরণ্য-আদিম, যেন অলৌকিক চোখের দিকে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে বাটি নিলাম।

সূর্যমণি ইতিমধ্যে দুটি শালপাতার নৌকা মাংরির হাতে তুলে দিয়েছে। মাংরি একটি নৌকা দিল সুরসতিয়ার হাতে। দু'জনেই শালপাতার নৌকায় সূর্যমণির কাছ থেকে ডিয়েং নিল। সকলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে, নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছে। বিশেষ করে, আমার দিকে তারা বারে বারে তাকিয়ে দেখছে। সুরসতিয়া আমার দিকে তাকালো। অস্বীকার করতে পারছি না, ডিয়েং-এর গন্ধ আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু সে কথা বলতে পারি না।

আমার একপাশে সুরসতিয়া, আর এক পাশে মাংরি। মাংরি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, 'হমারা দোস্তানি কো বে-ইজ্জতি মত্ করো বাবুজী। কোই লেড়কি দেনে সে পিনে হোতা।'

সুরসতিয়া কেন আমাকে এমন একটি কঠিন পরীক্ষায় ফেললো। অন্তত এই বিষয়ে, আমার স্বাধীনতা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সে কথাই বোধহয় সব না। সুরসতিয়া যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা নাই লাগতা?' তার মানে একটাই দাঁড়ায়, ওদের পানীয়কে আমি ঘৃণা করছি কী না। এ'কথা যদি কোনো শ্রেণীর মানুষের মনে হয়, তাদের ভোজ্য আর পানীয় কেউ ঘৃণা করে, তা হলে সেখানে কেবল দুঃখ পাওয়াটাই বড় না, বিদ্বেষের সঞ্চার হতে পারে।

সুরসতিয়া আমার দিকে চোখ রেখে, আস্তে আস্তে হাতের শাল পাতার নোকা, ওর ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলো। মাংরিও ওর নিজেরটা নিজের ঠোঁটের কাছে। আমি ভাবি, বিষ তো না। জীবনে তো অনেক কিছুর স্বাদই নিয়েছি। সেখানে ইজ্জতের প্রশ্ন, সেখানে তা রক্ষা করতেই হবে। আমি কাঁসার বাটি মুখে তুলে ধরলাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করে, চুমুক দিলাম। ইচ্ছা করলো, ইংরাজিতে চিৎকার করি, 'হরিব্‌ল্‌।' কিন্তু স্পর্শ যখন করেছি, স্বাদ নিয়েছি, এই টক পচা মাড়ের মতো গন্ধযুক্ত পানীয়, তখন থাম্‌বো না। সুরসতিয়ার মতো আমিও নিঃশ্বাস বন্ধ করে, এক চুমুকে বাটি শূন্য করে দিলাম। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে, মুখ মুছে, একটি সিগারেট ধরালাম। স্বীকার না করে উপায় নেই, আমার যেন বমনোদ্রেক হতে চাইছে। গলার কাছে ঠেকে থাকা স্বাদটা বারে বারে ঢোক গিলে, ভিতরে চালান করতে চাইলাম।

সকলেই আমার দিকে তাকিয়েছিল। সুরসতিয়া একবারের জন্য চোখ সারায়নি। আমি ওর দিকে তাকালাম। সুরসতিয়ার চোখের গভীর কালো দৃষ্টিতে যেন সুদূরের টান। ঠোঁটে হাসি। জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যায়সা?'

আমি বললাম, 'খাট্টা।'

সবাই আমার কথা শুনে হেসে উঠলো। সুরসতিয়া বললে, 'সবকোই বোল্‌তা রহা কি, তুম কভি হমারা ডিয়েং নহি পিয়েগা। কলকাত্তা কা দীখু বাবু ডিয়েং নহি পিতা।'

জঙ্গলের বাইরে, সমতলবাসী মাত্রেই, ওদের কাছে দীখু। কিন্তু সুরসতিয়ার কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য না। আমার অনেক বন্ধুর মুখেই শুনেছি, হাঁড়িয়া পচুইয়ের স্বাদ তাদের জানা আছে। এবার আমিও তাতে যোগ দিতে পারবো, বলতে পারবো, আমারো জানা আছে।

সুরসতিয়া আমার হাত থেকে বাটি নিয়ে, আবার স্বর্ণমণির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। স্বর্ণমণি ডিয়েং ঢাললো। আমার মুখ খুলেছে। একবার যা সহ্য করতে পেরেছি, তা আবার পারবো। সুরসতিয়া বাটি আমার হাতে তুলে দিল। ও আর মাংরি আগের মতোই শালপাতার নৌকায় ডিয়েং নিল। আবার আগের মতোই চুমুক। লক্ষণীয়, সকলেই এক চুমুকে পাত্র শূন্য করে। বোধহয় আমার মতোই, এ পানীয় মুখের মধ্যে কেউ ধরে রাখতে পারে না।

সুরসতিয়া ডিয়েং পান করে, শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে, অনায়াসে আমার হাত থেকে জলন্ত সিগারেট নিয়ে টান দিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, আমার

দিকে তাকিয়ে, নিঃশব্দে হাসলো। দ্রব্যগুণের প্রতিক্রিয়া সামান্য অনুভব করছি। সুরসতিয়ার চোখ গভীর কালো জলে সূর্যচ্ছটার মতো চিকচিক করছে। ও মাংরির দিকে তাকিয়ে কী যেন বললো। কিছু না বুঝলেও, সুরীনের নামোচ্চরণটা ধরতে পারলাম। মাংরি উঠে, ঘরের বাইরে চলে গেল। হিন্দীতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বললে ওকে?'

সুরসতিয়া হিন্দীতে বললো, 'ওকে সুরীনের কাছে পাঠালাম, তোমার জন্য কিছু ভেজে পাঠিয়ে দেবার জন্য।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

সুরসতিয়া বললো, 'আমি জানি, তোমার কষ্ট হচ্ছে। ডিয়েং পান করে, কিছু খাবার মুখে দিলে, তোমার খারাপ লাগবে না।'

কথাটা মিথ্যা না। কিন্তু বনবালার ইজ্জত রক্ষা করছি, কেন না, সেটা আমারো ইজ্জত। দেশে দেশান্তরে এমনিই তো নিয়ম। কাদের যে কিসে ইজ্জত যায় আর থাকে, নির্ভর করে তার সমাজ সামাজিকতার উপর।

কালকূট! এখন তুমি কার?

এখন আমি বনের।

তবে চলো বনের সঙ্গে, খেল বনের লীলায়। সুরসতিয়া সিগারেটটি আবার আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। ওর দৃষ্টি আমার চোখের দিকে। সম্মোহিত আমি, সিগারেট নিলাম ওর হাত থেকে, স্পর্শ করলাম ঠোঁটে। যে-মেয়েটি সুরসতিয়াকে 'কোট্‌রি' বিশেষণ দিয়েছিল, সে সরু গলায় স্পষ্ট গেয়ে উঠলো,

> 'হো হোরে কুড়ি নোরো জে নাম
> বরসিড নাংগিন
> লংদা জনর হিতি-প্রীতি।'...

একজন বলে উঠলো 'অই অই!'

আমি তাকালাম সুরসতিয়ার দিকে। সুরসতিয়া হাসলো, বললো, 'ও গাইছে, ওরে লেড়কি, বিহানবেলায় কেন তোর কুড়েমি। আর এখন যে বড় তেজি দেখছি।'

ও হিন্দীতে যা বললো, কথাগুলো এইরকম শোনায়। সেই মেয়েটি তখনও গাইছে,

> 'নে জীবন গাতিউ
> নে জীবন কাহি নামোগো।'

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি পুরুষস্বর যেন গভীর আবেগে শব্দ করে উঠল, 'আ আহ্!'

সুরসতিয়া আমার কানের কাছে যেন ফিসফিস করে বললো, 'ও গাইছে, জীবনটা পলকের রে। কুড়ি, এমন জীবন আর পাবি না।'

সেই মুহূর্তেই বনের অন্ধকার থেকে ভেসে এলো কেকাধ্বনি, কে—ক্! কে—ক্! আমি যেন কোন্ সুদূরের বুকে হারিয়ে যাই। আমার কানের কাছে বাজতে থাকে, জীবনটা পলকের। এমন জীবন আর পাবি না। মুহূর্তেই যেন এক আরণ্যক জীবন তার স্বরূপকে মেলে ধরলো, আর কেকাধ্বনি সেই স্বরূপের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। এমন মানব-জীবন কেউ বিফলে দিতে পারে না, কেন না, জন্মিলে মরিতে হইবে। অরণ্যে আবৃত ছায়া-ঘন গভীর এই পার্বত্য অঞ্চলের জীবনবোধের সঙ্গে, কোথায় তফাত, সভ্যতার আলোকের পারে জীবন-চিন্তার সঙ্গে? সব যেন মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। সুরসতিয়ার দু' হাত আমার কোলে পাতা, যেন অতীব স্বাভাবিক আর অনায়াস।

এই সময়ে সুরীনের গলা শোনা যায়, 'হাঁ, ঠিকই, এই তো এখানেই বসে আছেন।'

মোহনবাবুও সঙ্গে, মাংরি তাঁর পিছনে। কাছে এসে বললেন, 'এইমাত্র সুরীনকে বলছিলাম, আপনি কোথায় গেছেন, দেখে আসতে। তখনই মাংরি গিয়ে হাজির। আমি ভাবছি, আপনি বাইরে, নদীর ধারে এদের রান্নাবান্না দেখছেন। সুরসতিয়া আপনাকে এখানে টেনে এনেছে?'

বললাম, 'টেনে আনেনি, আমি নিজেই এসেছি ওর সঙ্গে।'

মোহনবাবু সুরসতিয়াকে একবার দেখে বললেন, 'সে তো বুঝতেই পারছি। এখন আপনাকে ফেরত নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। দীখুদের নিয়ে এরকমটা করতে তো ওদের বিশেষ দেখি না?'

বলে হেসে উঠলেন। সুরীনও হাসলো। সুরসতিয়া কিন্তু আমার কোল থেকে ওর হাত সরিয়ে নেয়নি।

মোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি নাকি হাঁড়িয়া খাচ্ছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, সুরসতিয়া আমাকে অফার করেছে।'

মোহনবাবু সত্যি অবাক, বললেন, 'মশাই, খেলেন কী করে? আমি আজ পর্যন্ত ও জিনিস নাকের কাছে আনতে পারিনি।'

সুরীন তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'এটা আবার মোহনদা আপনার বাড়াবাড়ি। আপনি না পারলে, আর কেউ বুঝি পারবে না?'

মোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, তুমি তো বলবেই। তোমাকে জেমা পচুই ধরিয়েছে, এবার ওঁকেও সুরসতিয়া ধরাক।'

সুধীন যেন হঠাৎ-ই কেমন বোকা হয়ে গেল, আর সেভাবেই হাসতে লাগলো। মোহনবাবু হেঁকে ডেকে কথা বলেন, তার মধ্যে বিষতিক্ততা নেই। আমার দিকে আবার ফিরে বললেন, 'কষ্ট করে ওগুলো খাবেন না, আমার কাছে তো সবই আছে।'

আমি বললাম, 'আমি আবশ্যিক মৌতাতের জন্য খাচ্ছি না, নিতান্তই এদের সঙ্গে, এদের মতো করে একটু মেলামেশা করবার জন্য খাচ্ছি।'

সুরসতিয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইছে, আমি কী বলছি। মোহনবাবু আমার কোলের ওপর রাখা, সুরসতিয়ার হাতের দিকে তাকিয়ে, সুধীনকে বললেন, 'ব্যাপার কী বলো তো সুধীন, আমি তো এদের ভাব-সাব বুঝি না, তুমি বোঝ। আজ পর্যন্ত একটাও মেয়ে আমার সঙ্গে এভাবে মিশলো না, আর ওঁর কোলের কাছে, এই সাপিনীর মতো মেয়েটা মাথা নামিয়ে পড়ে আছে?'

সুধীন হেসে উঠলো। আমি সুরসতিয়ার দিকে তাকালাম। সাপিনী! একবারও মনে হয়নি তো? তবে, এই পাথরপ্রতিমা, প্রয়োজনে বোধহয়, ফণা ধরা সাপিনীও হয়ে উঠতে পারে। দেখে মনে হয়, এখন যে-চোখের ভাষায় অরণ্যের আদিম মন্ত্র, তা দূরন্ত মারণে ঝলকে উঠতে পারে। এই কৃষ্ণ কালো টলটলে শরীর মুহূর্তেই যেন ফণা তোলা ভঙ্গি নিতে পারে। মুখের মিষ্টি কথা, উঠতে পারে ফুঁসিয়ে।

সুধীন আমাকে দেখিয়ে বললো, 'লেখকদাদা একটি মন্ত্র জানেন।'

মোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা আবার কী?'

সুধীন বললো, 'আপন করার মন্ত্র। আপনি কি কখনো এমন করে ওদের সঙ্গে, মাটিতে বসে হাঁড়িয়া খেতে পেরেছেন? দীখুদের ওরা সন্দেহ করে, কারণ দীখুরা ওদের দিকে কুনজরে তাকায়। লেখকদাদার দেখুন, চেহারাতেই যা ভদ্দরলোক মালুম দিচ্ছে। বসে আছেন, যেন কতকালের বন্ধু।'

মোহনবাবু ঘাড় ঝাঁকিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে একটু রহস্যের সুরে শব্দ করলেন, 'হুঁম্‌ম্‌ম্‌!'

তারপরে ঠোঁট টিপে হাসলেন। সুধীন জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার মোহনদা, কী যেন বলতে গিয়ে চেপে যাচ্ছেন?'

মোহনবাবু বললেন, 'না, চাপাচাপির কিছু নেই। তুমি বললে, লেখকদাদা

মিলেমিশে যেন কতকালের বন্ধু হয়ে গেছেন। কিন্তু ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখোনি তো। সেটাও একটা কারণ।'

এবার আমি ভুরু কোঁচকাই। আমার চোখে আবার তিনি কী আবিষ্কার করলেন? স্বরীন হেসে বললো, 'সেটা তো হাজারবার। চোখে পাপ থাকলে, ওরা বিদেশীদের সঙ্গে এমন করে মেশে না।'

মোহনবাবু ধমকে বললেন, 'ধুত্তোরি তোমার পাপ। তুমি কুনজরের কথাই খালি ভাবছো। যাক্‌ গে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

বলে তিনি ফিরতে উদ্যত হন। আমি বলে উঠলাম, 'মোহনবাবু আপনার বক্তব্যটা বলে যান।'

মোহনবাবু ফিরলেন, হেসে বললেন, 'কী আর বলবো বলুন, আপনার চোখে কী আছে, তা আপনার পাশে যে বসে আছে, সে-ই জানে। আমরা বাজারে মাল বেচে খাই, আমাদের চোখের নজর অন্যরকম হয়ে গেছে, আপনার মতো অমন মন টলানো নজর আমাদের নেই।'

বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাবার আগে, আবার বললেন, 'আমি বোতল পাঠিয়ে দিচ্ছি, না হয় ওর মনোরঞ্জনের জন্যই, ওকেও বোতল থেকেই খাওয়ান, আপনি আর ওগুলো খাবেন না, সহ্য হবে না।'

বলে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কথাগুলো ঠিক বললেন না। মাল, তা সে যেমনই হোক, কে না আপন মালা বিকিয়ে খায়। আমার জীবন কী তার থেকে বাদ, মালাগাছি বিকোতে গিয়ে, অনেক পরখের পরেও, স্নেহহীন চিত্ত নিয়ে ফিরতে হয়? কিন্তু মন টলানো নজর? সে আবার কী? যতো দূর জানি, সেটাও তো আমার মালা গাঁথা, মালা বেচা, সব কিছুর মধ্যেই জড়ানো। আর এখন? টলাই, না নিজেই টলি? বরং আমি তো দেখছি, সম্মোহনের মন্ত্র একজনের কৃষ্ণ চোখের তারায়, আমি মন্ত্রমুগ্ধ!

স্বরীন একটা ঠোঙা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এর মধ্যে চানাচুর আছে, খাবেন। মাংরি আমাকে বলতে গেছল, আপনাকে আলু বা ডিম কিছু ভেজে দেওয়া যায় কী না। দেওয়া যাবে, দেরি হবে, তার আগে এই খান।'

আমি বিব্রত লজ্জায় বললাম, 'না না, এ সবের কোনো দরকার ছিল না। আমি সব পারি, বলি না। কিন্তু ওদের ডিয়েং একবার যখন আমার গলা দিয়ে নেমেছে, তখন আর মুখ বদলাবার জন্য কিছু দরকার নেই।'

স্বরীন হেসে, স্বরসতিয়াকে মুণ্ডা ভাষাতেই কিছু বললো, স্বরসতিয়া ওর মন্ত্রভরা চোখে, খুশির ঝিলিক হেনে, আমার দিকে দেখলো। তারপর স্বরীনের

হাত থেকে চানাচুরের ঠোঙাটি নিয়ে, চানাচুর তুলে, আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, বললো, 'খাও।'

আমি বললাম, 'তুমি খাও।'

সুরসতিয়া বললো, 'আমি খাবো, আগে তুমি খাও।'

স্বরীন বললো, 'খান। দিচ্ছে, খান। দেখুন দাদা, জীবনে হয়তো আপনারা অনেক কিছু পেয়েছেন। এটাও কিন্তু একটা পাওয়ানা, সবাই পায় না।'

স্বরীনের এমন করে বলার দরকার ছিল না। পাওয়ানা তো নিশ্চয়ই। বনের ডাক শুনে যখন যাত্রা করেছিলাম, তখন কি জানতাম, এমন একজন সুরসতিয়ার সাক্ষাৎ পাবো। ভাবিনি, বনের গভীরে এক বনবালা এমনি করে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে কিছু দেবে। জীবনে যাদের আমরা কিছুই দিইনি। এখন মনে পড়ে যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর পালামৌ রচনায়, এই সুরসতিয়াদের কথাই লিখেছিলেন। আরো মনে পড়ে যায়, এঙ্গেল্‌স্‌-এর নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, সভ্য সমাজের মানুষেরা যখন, অরণ্যের আদিবাসীদের দিকে চেয়ে দেখে, তখন তাদের চোখে থাকে, স্পেকটিকল অব প্রসটিটিউশান, কারণ এদের জীবনযাত্রায়, যৌন ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। সভ্যতার দান বেশ্যাবৃত্তি, এখানকার জীবনের কাঠামো অনেকখানি ভেঙেচুরে গেলেও, এখনো আদিম সাম্যবাদের মূল সূত্রগুলো একেবারে হারিয়ে যায়নি। এদের অধিকার বোধ, সতীত্বের সংজ্ঞা একেবারে আলাদা। যারা বেশ্যাবৃত্তির স্রষ্টা, অবিশ্যিই তারা সতীত্ব বিষয়েও সেইরকম বিপরীত ব্যাখ্যা করে গিয়েছে। আরো এক কথা, অরণ্যে পাহাড়ে বহু দ্বীপে এখনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্য, নারীকে পুরুষের সমকক্ষতার জন্য সংগ্রাম করতে হয় না, তা অনিবার্য, স্বাভাবিক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আর চিন্তার ধ্যান-ধারণা তার বিপরীত।

সুরসতিয়া তার একটি অতি বাস্তব প্রমাণ। ও যার অধীনে কাজ করে জীবনধারণ করে, সেই মোহনবাবুর সামনেও আমার কোল থেকে হাত নামিয়ে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং লজ্জাটা ছিল আমারই। আমি সুরসতিয়ার হাত থেকে, চানাচুর নিয়ে খেলাম। সুরসতিয়া নিজেও মুখে দিল, মাংরিকে দিল, এবং সবাইকেই একটু একটু দিল। চানাচুরের ঠোঙা হয়ে গেল, পঞ্চ পাণ্ডবের দ্রৌপদী, যা আছে, সবাই ভাগ করে খাও, একলার জন্য কিছু না। এটা এদের কাছে কোনো শিক্ষা না, এটাই নিয়ম। আদিম সাম্যবাদের সামান্য একটি চিহ্ন। কারোকে জিজ্ঞেস করারও দরকার হলো না, বাকি সবাইকে দেবে কী না।

সুরীন বললো, 'ভাতটা বসিয়ে এসেছি, হাতে একটু সময় আছে।'

বলতে বলতে সূর্যমণির কাছে গিয়ে বসলো। সূর্যমণি হেসে একটি শালপাতার নৌকা তার দিকে বাড়িয়ে দিল। সুরীন তা নিল, সূর্যমণি তাতে ডিয়েং দিল। সুরীন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। সুরসতিয়া আবার কাঁসার বাটি বাড়িয়ে ধরলো। আবার ডিয়েং পান হলো পুরো পাঁচ দফায় পরে, দ্রব্যগুণ আমার মধ্যে রীতিমতো ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলো, আর ভারী হয়ে উঠলো আমার পেট। মনে হলো, প্রচুর পেট ভরে খেয়েছি।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন এলো, কয়েকজন সরেও গেল। সুরীন দু' পাত্র খেয়েই চলে গিয়েছে। মাংরি গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছে, আর সুরসতিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি করে হাসছে। আমি বারে বারে আর গানের অর্থ শুনতে চাইছি না। ওদের ভঙ্গি আর হাসি আর দৃষ্টি থেকেই যেন, গানগুলো একরকম অর্থ বলে দিচ্ছে।

এ সময়ে হোরো এলো, তার হাতে একটি হুইস্কির বোতল। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল আমার দিকে। মোহনবাবু জ্বালালেন দেখছি। এ আসরে আবার এসব কেন? আমি বললাম, 'এটা নিয়ে যাও, দরকার নেই।'

সুরসতিয়া বললো, 'না রাখো, ইজারাদারবাবু গোসা করবে, বেইজ্জত হবে।'

ইজ্জতের ঠেলায় অন্ধকার। অতএব খাই না খাই, বোতলটি রাখতেই হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি খাবে?'

ও বললো, 'এ জিনিস আমার ভাল লাগে না। আমার ভাল লাগে মদ্‌গম।'

মদ্‌গম, মহুয়া নিঃসৃত সুরার নাম মদ্‌গম। জরাইকেলায় প্রথম দিনই উইলসন সাহেবের বাসায় দেখেছিলাম। দেখেছিলাম বললে মিথ্যা হয়, মুণ্ডা মেয়ের বুড়া বিলাতী স্বামী, প্রাক্তন ডি. এফ. ও. পান করতেও দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে মদ্‌গম পাওয়া যায় না?'

সুরসতিয়া বললো, 'এদেলবার গাঁয়ে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এখন পাওয়া যাবে না। তুমি এই বোতলের দারু পান করো।'

বললাম, 'আমার আর পানের দরকার নেই।'

সুরসতিয়ার চোখে ঈষৎ রক্তাভা, এবং সেই মত্ত যেন তার ক্রমে উচ্চ ধাপে উঠছে। আমি সমতলের সেই এক সভ্য জগতের অধিবাসী। আমার গায়ে স্পর্শ করে বসে আছে পাথরপ্রতিমা, তার বাম বক্ষ আঁচলবিহীন উদাস। রক্তে আমার সংস্কার, দৃষ্টিতে আমার দ্বন্দ্ব, নানা ধন্দ। কিছুতেই যেন সহজ হচ্ছে

পারছি না। অথচ কতো সহজ, শুধু সুরসতিয়া না, এখানকার সকল নরনারী। কারোর অবস্থাই আমার মতো না।

এবার সূর্যমণি তার ডিয়েং-এর পাট চেকাচ্ছে। তার জালা শূন্য হয়ে গিয়েছে। সকলকেই অতএব উঠতে হয়। আমি সুরসতিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সূর্যমণিকে কতো দিতে হবে?'

সুরসতিয়া বললো, 'তোমাকে আমরা পান করিয়েছি, তুমি কিছু দেবে না।'

আমাদের কাথাবার্তা হিন্দিতেই হচ্ছে। মাংরি বললো, 'কিন্তু বাবুজী, তোমাকে খাওয়াতে হবে। ডিয়েং চানা ঘুগ্‌নি আর সিগ্রেট। আমরা নাচবো।'

বললাম, 'তোমরা ব্যবস্থা করো।'

সুরসতিয়া বললো, 'দাঁড়াও বাবুজী, তোমাকে এখন আমি নাচ শেখাবো।'

বলে ও আমার হাত তুলে দাঁড় করালো। দাঁড়িয়ে বুঝলাম, দ্রব্যগুণের ক্রিয়াটি ভালই হয়েছে। ও মাংরিকে ডাকলো। তারপর আমাকে দাঁড় করালো দু'জনের মাঝখানে। আমার একটি হাত মাংরি ওর পিঠের ওপর দিয়ে ওর বক্ষের নিচে স্থাপিত করলো। ওর এক হাত দিয়ে, আমাকেও তেমনি বেষ্টন করে ধরলো। একই ভাবে, সুরসতিয়া আমার অন্য একটি হাত টেনে, ওর পিঠের ওপর দিয়ে, ওর বক্ষের নিচে রাখলো, ওর নিজের এক হাত দিয়ে, আমাকে বেষ্টন করলো। আমাদের ঘিরে কয়েকজন নরনারী দাঁড়িয়ে, তাদের মুখে কৌতূহলের হাসি।

যে স্পর্শ আমার অচেনা না, তা আমি অনায়াসে স্পর্শে অভ্যস্ত না। ফলে আমার শরীর থাকে আড়ষ্ট হয়ে, হাতের বেষ্টনী শিথিল হয়ে পড়ে। সুরসতিয়া আমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে বললো, 'শক্ত করে ধরো, তা না হলে পড়ে যাবে।'

এক নারী মুণ্ডা ভাষায় কী গেয়ে উঠলো। সুরসতিয়া আর মাংরি সেই গানের তালে তালে, আমাকে নিয়ে এগিয়ে গেল, পেছিয়ে এলো, অথচ ডান দিকে খানিকটা সরেও গেল। আমি ওদের পায়ের আঘাত খাওয়া ছাড়া, আর কিছুই করতে পারছি না। দুটি তরুণীর একটি জীবন্ত বোঝা।

এখন সুরসতিয়ার চোখে আর সেই মত্ত নেই, গুরুর দৃঢ়তা। সে নাচতে নাচতেই আমাকে, পায়ে পা দিয়ে মেরে, বলে দিতে লাগলো, 'আগে দু' পা, পিছনে এক পা, ডাইনে এক পা। সব সময় সামনে আর ডাইনে এগোবে। ডাইনে শেষ হলে, আবার বাঁয়ে ফিরে আসবো, এক ভাবেই। হ্যাঁ—চলো—চলো, আহ্, পিছে হটো! আহ্ ডাইনে পা দাও।'

হায়, এবার ঈশ্বরকে স্মরণ করা ছাড়া, উপায় দেখি না। একদিকে, যাকে বলে, সুরসতিয়ার পায়ের লেঙ্গি খাওয়া, আর একদিকে দুটি তরুণীর সঙ্গে এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা, আমার কাছে শাঁখের করাতবৎ মনে হচ্ছে। যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। কে জানতো, এ শিক্ষাটি আমার কপালে লেখা ছিল। কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়। সেখানকার বিদেশী নাচের শিক্ষায় তবু তালিমের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ধীরে, গুণে গুণে দেখিয়ে দেওয়ার পাট আছে, হাতে ধরে আস্তে আস্তে প্রতিটি গতি ও ভঙ্গি বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে। তথাপি, দু'একটি দৃশ্যের কথা মনে হলে, আমার থেকেও ভয়ংকর কাণ্ড সেসব। প্রায় নব্বই একশো কে. জি-এর বিশালবপু ব্যক্তিকে দেখেছি, নাচ শিখতে শিখতে, মহিলা পার্টনারের হাত থেকে ছিটকে পপাত ধরণীতল। সেটা ছিল শান বাঁধানো মেঝে, আমাকে আছাড় খেতে হবে ধুলায়।

এরকম করে হয় নাকি? সুরসতিয়া একটু বুঝতে চেষ্টা করুক না। ব্যাপারটাই তো আমার মাথায় নেই। তার ওপরে আমার পেটে যা, ওর আর মাংরির পেটেও তাই আছে। ওদের থামাবার মন্ত্র তো আমার জানা নেই।

আমি বাধ্য হয়ে, হাত নামিয়ে দিয়ে, দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুরসতিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'শিখবে না?'

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'শিখবো। তুমি এক কাজ করো। তোমরা কয়েকজন নাচো, আমি ভাল করে দেখি, তারপরে আমি চেষ্টা করবো।'

সুরসতিয়া কথাটা গ্রহণযোগ্য মনে করলো। তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে, আরো দুটি মেয়েকে নিয়ে, ওরা পরস্পরকে, পিঠের দিক থেকে এক এক হাতে বেষ্টন করে, পাশাপাশি দাঁড়ালো। এবার মাংরি নিজেই গান ধরলো, যার ভাষা এইরকম,

> 'দোলাং দোলাং সবেন কুড়ি
> গাড়ায়েবু জুড়াজুড়ি
> হহোরে কুড়ি!'...

অর্থ বুঝলাম না, কিন্তু ওদের চারটি মেয়ের মুখে, হাসি দেখে বুঝলাম, গানে সবাই খুশি। আমি মনোযোগ দিয়ে ওদের পদক্ষেপ লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, কখনোই সোজাসুজি এগিয়ে আসছে না। প্রথম দু' ধাপ এগোচ্ছে, ডান পা সামনে রেখে, যখন পিছনে যাচ্ছে, তখন বাঁ পা পিছনেই থাকছে, এবং পিছনে যেতে না যেতেই, ডান পা, ডান দিকে ক্ষেপণ করছে সঙ্গে বাঁ পাও টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বলতে যা সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক দ্রুত ওদের পদক্ষেপের তাল।

লক্ষ্য করবার বিষয়, ওরা চারজন যেন একটি অবিচ্ছিন্ন শরীর, এবং আমি যা ভেবেছিলাম, ঊর্ধ্বদেহ ক্রিয়াশীল না, তা মোটেই না। নাচের সৌন্দর্য সেখানেই। বুক আর কোমরের কাছে, একটি বিচিত্র দোলায়, মনে হয়, যেন, সব দেহগুলো একভাবে সাপের মতো এঁকেবেঁকে উঠছে, উঠছে নিরন্তর। কখনো নিম্নগামী না, সব সময়েই ঊর্ধ্বগামী, আর যেন এই অবিচ্ছিন্ন দেহলতাগুলো, যান্ত্রিকভাবে ডাইনে গোল হয়ে সরে যাচ্ছে, আবার এক সময়ে বাঁয়ে গোল হয়ে ফিরে আসছে।

হঠাৎ একটি যুবক, দু' হাত মুষ্টিবদ্ধ, মাটির দিকে ছোঁড়ার ভঙ্গিতে লাফিয়ে পড়লো ওদের সামনে, হিস্‌হিস্ শব্দ করে, কোমর ভেঙে কয়েকবার ওদের সামনে শরীর নাচিয়ে, ওদের মতোই পদক্ষেপ করতে লাগলো, আর গান ধরলো,

'হহোরে কুড়ি
বানো তাম্‌মুড়ি
নেয়ালেকেন সোময় গেনোতানা
হহোরে কুড়ি।'...

তারপরেই সে তার শরীরের নিম্নভাগ, মেয়েদের নিম্নভাগের কাছে দ্রুত বেগে এগিয়ে নিয়ে, আবার চোখের পলকেই ফিরে আসতে লাগলো, মুখে শব্দ তালে তালে, হিস্ হিস্ হিস্! পুরুষের নাচের ভঙ্গি আলাদা, মনে হয় অনেকটা বীরত্বব্যঞ্জক।

এই সময়ে সুরীন এসে আমার পাশে দাঁড়ালো, বললো, 'মেতে গেছে সব?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কী নাচ?'

সুরীন বললো, 'তা বলতে পারি না, তবে ওদের নাচের ধরন-ধারণ সব প্রায় একরকমই। এই যে ছেলেটা নাচছে, ওর নাম কাণ্ডেয়র। এক ধরনের গাছের নামও কাণ্ডেয়র। ও খুব ভাল পিকা নাচতে পারে।'

'পিকা নাচটা কী?'

'এক ধরনের লড়াইয়ের নাচ। ওরা তখন মাথায় পালক গোঁজে, কোমরে পরে হাঁটুর ওপরে এক ধরনের পোশাক, তাতেও পালক থাকে। পিকা নাচের সঙ্গে, নাকাড়া বাজে। আর এই যে সব নাচ দেখছেন, এসব ওরা সব পরবেই নাচে। বিশেষ করে চাষ আবাদের সময়।'

বলে সুরীন নাচের দিকে তাকিয়ে বললো, 'দেখছেন না, যেন মেয়ে পুরুষের লীলে হচ্ছে। ওরা মনে করে, মাটির মেয়ে, পুরুষকে দেখা যায় না, কিন্তু ওদের যেমন ছেলেমেয়ে হয়, মাটিরও সেইরকম হয়। এই নাচও সেইরকম।'

স্বরীনের কথা বুঝতে পারি। সে যা বলতে চাইছে, আমি জানি তার কেতবী ব্যাখ্যা। আসলে, নারী পুরুষের দৈহিক মিলনকেই এই নাচে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাদের আচরণের মধ্যেও তা স্পষ্ট। তাদের এই ধারণা, তাদের শারীরিক মিলন হলেই, বসুমতীও ফসল দেবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'গানের কথাগুলো কী?'

স্বরীন হেসে বললো, 'গানের কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, বেশ রসের গান ধরেছে। গানটা আগেও শুনেছি। দোলাং দোলাং সবেন কুড়ি/গাড়ারেবু জুড়াজুড়ি—মানে চল চল সব মেয়েরা, নদীর জলে গিয়ে সবাই জড়াজড়ি করি। তারপরে বলছে, হহোরে কুড়ি/বানো তামুমুড়ি/নেয়ালেকেন সোময় গেনো-তানা/হহোরে কুড়ি—ওরে মেয়ে, এটুকু বোঝ না, মধুর সময় যাচ্ছে। এটা মেয়েরা নিজেদের মধ্যে সব থেকে বেশি গায়।'

যতোবারই চোখ তুলে নাচের দিকে তাকাই, সুরসতিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। ও কোনো সময়েই আমার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। মুখে হাসি, নাসারন্ধ্র স্ফীত, অপলক রক্তিম চোখ, জীবন্ত পাথরপ্রতিমার দেহ এমনভাবে সাপের মতো নিরন্তর ঢেউ দিয়ে উঠছে, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে, নিজের রক্তে নাচের দোলা লেগে যায়। যায় না, নাচের দোলাটা আমি অনুভব করছি আমার রক্তে। আমার মস্তিষ্কের সচল সীমায় যেন নাচ বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সুরসতিয়া ওর চোখে, নিজেকে দেখিয়ে, কিসের ঈশারা করছে, বুঝতে পারি না, মনে হয়, নিশ্বাস আমার বুকের কাছে ঠেকে থাকছে।

কাণ্ডেয়র আবার চেঁচিয়ে গান ধরলো, সেই সঙ্গে মাংরিও ;

> 'বিরিং আবু নীলশাড়ি
> ভাটিওড়া পিড়ি পিড়ি
> থাসিয়া চানা বুচি বোওতল
> হুকি দাংনো হেরি আঙ্গো
> হহোরে কুড়ি।'...

স্বরীন সঙ্গে সঙ্গে মানে বলে দিল, 'চল নীল শাড়ি কিনে দিই। ভাটিখানা তো আজ ঘরে ঘরে। হাতে নেব ঘুগ্‌নি আর মুখ খোলা বোতল। তুমি হাঁ করবে, আমি ঢেলে দেব, ওহে মেয়ে।'

যেন এক মন পাগল করা উৎসব, যার সঙ্গে দেহ মন জড়িয়ে থাকে। বাধাবন্ধনহীন মিলনের ডাক যেন গানে। হঠাৎ নাচ থামিয়ে, সুরসতিয়া ছুটে এলো আমার দিকে। হাত টেনে ধরে বললো, 'এবার এস, তুমি নাচবে।'

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে। আমার হলো সেই গোত্র। আমাকে আমার কাজে বসিয়ে দাও, পারবো। কিন্তু নাচ এতো সহজে আমার দ্বারা সম্ভব না। অসহায়ভাবে একবার স্বরীনের দিকে তাকালাম। তার হাসিতে কোনো সহায়তার আশা নেই। স্বরসতিয়া শুধু টেনে নিয়ে গেল না, সব থেকে মর্মান্তিক হলো, ও সকলের সামনে, অনায়াসে, ওর প্রতিমা বক্ষের ওপর আমার হাতটি চেপে ধরলো। এ রাত্রি আরণ্যক, নরনারী সকলই আরণ্যক। কিন্তু আমার আরণ্যক হয়ে ওঠার অর্থ আলাদা। কী বিষম পরীক্ষা! আমার উর্ধ্বে আমি কেমন করে যাবো? আমার প্রতিক্রিয়া যে অনিবার্য।

স্বরীনের দিকে আমার চোখ পড়লো। স্বরীনও আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার মুখে হাসি। লজ্জায় আমারই মাথা নত হয়ে যেতে চায়। অথচ সত্যি যার লজ্জা পাবার কথা, সে তখন আমাকে কঠিন বেষ্টনে আঁকড়ে ধরেছে। আগের মতোই মাংরি আমার আর এক পাশে।

স্বরীন যেন কেমন মেতে গেল, সে স্বরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে কী বললো। স্বরসতিয়া মুখ তুলে আমার দিকে একবার দেখে, মুখ টিপে হাসলো। এখন ওর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ওকি সত্যি আমাকে সাতবহিনির মায়ায় টেনে নিয়ে চলেছে? বললাম, 'তাড়াতাড়ি করো না, আস্তে আস্তে নাচো, আমি চেষ্টা করছি।'

স্বরসতিয়া বোধহয় ওর ভাষায়, সবাইকেই তা বলে দিলা। কিন্তু স্বরীন কী বললো, স্বরসতিয়া কেন হাসলো, বুঝতে পারলাম না। বোধহয় স্পষ্ট করে বোঝার কিছু নেই। মাংরি গান ধরলো, অন্য গান। নাচ শুরু হলো। স্বরীন হাততালি দিচ্ছে। আমি নাচের দিকে মনোযোগ দিলাম, কিন্তু কেবল পদক্ষেপের দিকে। এ সময়ে আরো দু'জন জোয়ান এসে, দু'দিকের অন্য মেয়েদের সঙ্গে নাচে যোগ দিল। স্বরসতিয়া আমাকে একটু ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো, 'মাইয়ং কেটে পে।'

আমি না বুঝে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও হেসে হিন্দীতে বললো, 'কোমর শক্ত করো।'

কোমর শক্ত করা কাকে বলে, আমি জানি না। এখনো আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে আছে। আমি জানি, আমার পক্ষে কখনোই, শরীরকে সাপের মতো দোলানো সম্ভব না। স্বরীন বললো, 'আপনার তো বেশ হচ্ছে দেখছি।'

আমার সমস্ত ধ্যান এখন পায়ে। সেটাই বাঁচোয়া, অন্য কোনো চিন্তা

মস্তিষ্কে নেই। কিন্তু নাচ এমনি এক শিল্প, বিশেষত এদের নাচ, তা কখনোই ধীর গতিতে বেশিক্ষণ চলতে পারে না। নাচের তাল যতোই দ্রুত হতে লাগলো, আমি ততোই বেতাল হতে লাগলাম। মিনিট পনেরো পরে, সুরসতিয়াকে বললাম, 'এবার আমাকে ছেড়ে দাও, পরে আবার করবো।'

সুরসতিয়া ছাড়লো না, বললো, 'দেখে তো তোমাকে জোয়ান বলেই মনে হয়।'

বললাম, 'আমার শক্তি কম।'

সুরসতিয়া বললো, 'না।'

মাংরি হঠাৎ নাচ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো, হেসে কিছু বললো। সকলেই নাচ শেষ করলো। সুরসতিয়া বললো, 'মাংরি বলছে, নাচের থেকে এখন কথাই ভাল চলবে।'

বলে ও নিচু হয়ে, মোহনবাবুর পাঠানো হুইস্কির বোতলটা হাতে তুলে নিল। জিজ্ঞেস করলো, 'পান করবে?'

আমি মাথা নাড়লাম। ও বললো, 'সূর্যমণির ডিয়েং ফুরিয়ে গেছে, আমার আর একটু পান করতে ইচ্ছা করছে। এ জিনিস কেমন?'

বললাম, 'ভাল। কিন্তু জল মিশিয়ে পান করতে হবে।'

সুরসতিয়া বললো, 'আমরা জল মিশিয়ে মদ্‌গম পান করি না। এটা কি মদ্‌গমের থেকেও ঝাঁঝালো হবে?'

বলে, আমার মতামতের অপেক্ষা না করেই, বোতলের মুখ খুলে গলায় খানিকটা চাললো। ঢেলেই গলায় হাত দিল, মুখ বিকৃত হলো। তাড়াতাড়ি বোতল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে, একটা কষ্টের শব্দ করলো। তথাপি, পানীয়টুকু গিলে নিল। ওর চোখ দুটো আরো লাল হয়ে উঠলো, খানিকটা থুথু ফেললো। বললো, 'ভীষণ কড়া। আমাকে একটা সিগ্রেট দাও।'

আমি ওকে একটা সিগারেট দিলাম, ধরিয়ে দিলাম দেশলাই দিয়ে। সুরীন তখন মাংরির সঙ্গে হেসে হেসে মুণ্ডা ভাষায় কী যেন বলছে, আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। সুরসতিয়া বললো, 'চলো বাইরে যাই।'

এখন ও আগের থেকেও, অনেক বেশি অনায়াস স্বাভাবিকভাবে আমার হাত ধরলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'মাংরিকে ডাকবে না?'

সুরসতিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'আমার সঙ্গে যেতে ভয় করে?'

বললাম, 'না। ও তোমার বন্ধু।'

সুরসতিয়া ঘাড় নেড়ে বললো, 'না, ও আমার বন্ধুনী, তুমি আমার বন্ধু।'

সুরসতিয়ার হাত ধরা হয়ে, বাইরে যাবার আগে, আমি একবার সুরীনের দিকে তাকালাম। সুরীন আর মাংরি, দু'জনেই আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পাতার ঘরের বাইরে এসে মনে হলো, বনের রূপ যেন বদলে গিয়েছে।

যে দিকে উনুন জ্বলছে, রান্নাবান্না হচ্ছে, সুরসতিয়া সেদিকে গেল না। দূর্বা ঘাস ছাওয়া, সমতলের ওপর দিয়ে, বিশাল মহীরুহগুলো যেখানে একটু দূরে দূরে, অন্ধকারকে নিবিড়তর করে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে এগিয়ে চললো। কিন্তু গাছের ছায়ার নিবিড়তর অন্ধকারের মধ্যে, কোথাও কোথাও অস্পষ্ট আলো পড়েছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আকাশে কোথাও পাণ্ডুবর্ণ চাঁদ রয়েছে, এই অস্পষ্ট কুহেলি আলো তারই। জেনাকি জ্বলে উঠতে দেখা যায়। বাতাস প্রায় নেই, বাইরে এমন ঠাণ্ডা। ঝিঁঝি ডাকছে। আর আমি এক অবিশ্বাস্য, অনেকটা যেন আলৌকিক ঘটনার মধ্যে, নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, ভুলে যাচ্ছি নিজের সত্তাকে। আমার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে, কোথাও এর কোনো যোগসূত্র নেই। বিস্ময়ের দুয়ার আমি পার হয়ে এসেছি, এখন আমি এক অনির্বচনীয় আলৌকিকতার দুয়ারে পা দিয়েছি।

কী একটা পাখি, বনের গভীর থেকে ডেকে উঠলো, একটু কর্কশ। ময়ূরের ডাক না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী পাখি ডাকছে?'

সুরসতিয়া বললো, 'ধনেশ।'

বড় আশ্চর্য লাগে। অনেক পাখির নাম শুনেছি, চোখেও দেখেছি, এমন নিবিড় বনের অন্ধকারে কখনো শুনিনি। আর এমন নিবিড় বনের অন্ধকারে, আমার হাত ধরে এক বনবালা, সম্পূর্ণ নিরালায়। কিন্তু স্থির জানি, সে অবলা কোনোক্রমে না। তার নিজের সমাজব্যবস্থানুযায়ী, সে স্বাধীনতা ভোগ করছে। জানি না, এই স্বাধীনতার সীমা কতো দূর। সুরসতিয়া বললো, 'এসো, আমরা এখানে বসি।'

এ সময়েই অনেকটা গাভীর মতোই, গম্ভীর ডাক শুনে চমকে উঠলাম। আমার চমকানো সুরসতিয়া টের পেলো, আমার হাতে চাপ দিয়ে, একটু হেসে বললো, 'সম্বর তো!'

সম্বর? সম্বর হরিণ! আশ্চর্য, বন যেন তার সমগ্রতার মধ্যে আমাকে আরো গভীর করে ডুবিয়ে নিচ্ছে। সম্বরের ডাক যেন, সুরসতিয়ার সান্নিধ্য কে,

অন্য এক রূপ দিচ্ছে। আমি ওর পাশে বসলাম। পাতার ঘর আর লোকজনের কাছ থেকে, এতোটা সরে, অন্ধকারে বসে যে একটু ভয়ও না লাগছে, তা না। জিজ্ঞেস করলাম, 'সম্বরটা যে ডাকলো, বাঘ যদি শুনতে পেয়ে থাকে?'

সুরসতিয়া হেসে, ওর মাথাটা আমার ডানায় একবার ঠেকালো, বললো, 'লাকরা তুমি কোথায় দেখছ?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'লাকরা কী?'

ও বললো, 'তুমিই তো বললে বাঘের কথা। লাকরা মানে তো বাঘ। এদিকে লাকরা বিশেষ নেই। বাঘ আছে, জামাইবুরুর দিকে বেশি। তবে এমন হতে পারে, সম্বরটা কোনো বিপদ টের পেয়ে, দলের সবাইকে জানিয়ে দিল।'

'ওরা বুঝি দল বেঁধে বেড়ায়?'

'হ্যাঁ।'

সুরসতিয়া সিগারেটে টান দিল। সিগারেটের উজ্জ্বল অঙ্গারে ওর বোঁচা নাক, চকচকে গাল, চিকচিকে চোখ দুটো দেখতে পেলাম। ও আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, 'তুমি যে এভাবে আমার সঙ্গে এখানে চলে এলে, তোমাদের লোকেরা কিছু মনে করবে না?'

সুরসতিয়া অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

বললাম, 'আমাদের দেশে আর সমাজে হলে, মনে করতো।'

সুরসতিয়া বললো, 'তোমরা তো দীখু, আমরা তোমাদের মতো না। তুমিও অন্য দীখুদের মতো না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে জানলে?'

সুরসতিয়া বললো, 'দেখে। দীখুরা আমাকে দেখলেই, অন্যরকম করে তাকায়। পয়সা ছুঁড়ে দেয়, হাতছানি দিয়ে ডাকে। জরাইকেলায় কয়েক মাস আগে এক দীখু, দিনের বেলা আমাকে তার গাড়ির মাধ্য জোর করে তুলে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

সুরসতিয়া বললো, 'কেন আবার? সে আমাকে যা খুশি তাই করতো, তারপরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতো। বাণ্ডামুণ্ডায় এরকম অনেক হয়েছে, রেল লাইন পাতবার সময়। অনেক মেয়ে কখনো আর ঘরে ফেরেনি। তারা বাণ্ডামুণ্ডা আর রাউরকেলায় থাকে। তাদের জীবন অন্যরকম।'

ষোল সতরো বছর বয়সের এই বনবালা কী বলে, তা কিছুটা অনুমান করতে

পারি। তবু আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ভাবে আমার সঙ্গে একলা চলে এলে, কেউ কিছু মনে করবে না?'

ও বললো আমার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে, 'কেন মনে করবে। আমি কি কোনো দোষ করেছি?'

তাও তো বটে, এখানে যে দোষের সংজ্ঞাও আলাদা। ও আবার বললো, 'তুমি তো আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসোনি, আমিই তোমাকে ডেকে এনেছি, এটা সবাই দেখেছে।'

বলে একটু হাসলো, আমার ডানায় একটু হাতের চাপ দিয়ে বললো, 'কাণ্ডেয়র একটু মনে মনে রাগ করেছে। তুমি যদি আমাকে জোর করে টেনে আনতে, আমার অনিচ্ছায়, তা হলে কাণ্ডেয়র তোমাকে কুঠার দিয়ে মারতে আসতো!'

সর্বনাশ! ইংরেজিতে যারে কয় সিভ্যাল্‌রি, আমার সেরকম কিছু নেই। আমি কোনো মুণ্ডার কুঠারে ছিন্ন ভিন্ন হতে চাই না। আবার বললো, 'হয় তো অন্ধকার থেকে, ও আমাদের লক্ষ্য রাখছে।'

চমকিত বিস্ময়ে বলে উঠি, 'তাই নাকি?'

সুরসতিয়া খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললো, 'ভয় পাচ্ছ কেন? দেখুক না। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।'

আমি নিবিড় অন্ধকারের আশেপাশে তাকালাম। এখন অন্ধকার অনেকখানি সয়ে এসেছে, কিন্তু কারোকেই দেখতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও না?'

সুরসতিয়া বললো, 'না। আমি কাকে বিয়ে করবো, এখনো ঠিক করিনি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কাকে বিয়ে করবে, সেটা কি তুমিই ঠিক করবে?'

সহজভাবে বললো, 'নাও করতে পারি, বাবা মা ঠিক করতে পারে। কিন্তু আমার দাবি মেটাতে হবে।'

'তোমার দাবি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সুরসতিয়া বললো, 'তবে কী? আমাকে না দিলে, কেমন করে বিয়ে হবে?'

'কী দিতে হবে?'

'তা কী করে বলবো? কোনো মেয়ের মা বাবা, টাকা চায়। কেউ জমি গরু ভেড়া ছাগল মোরগ চায়। মেয়েকে কিছু না দিলে বিয়ে হয় না।'

যাকে বলে, আমাদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, বরপণ না, কন্যাপণ। এই

রীতিও বোধহয় এসেছে, ওদের বীর্যশুল্কা নীতি থেকে। যে আমাকে জিতে নিতে পারো, আমি সেই বীর্যবান পুরুষের। একদা হয় তো যুদ্ধ হতো, যুদ্ধে জিতে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হতো। এখন তা পণে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই পণ টাকা পয়সা, গৃহপালিত পশুপক্ষী এবং জমিও হতে পারে। প্রকৃতির জগতে অনেকখানিই এই নিয়মে চলে বোধহয়। বিনা যুদ্ধে কিছুই মেলে না। আমাদের বরপণের নোঙরা ইতরতার থেকে, নিস্তরঙ্গ সমাজের ভদ্রতা মাখানো দুর্গন্ধ হাসির থেকে, শিক্ষা প্রগতিশীলতার কুৎসিত ভাঁড়ামি থেকে, সে যুদ্ধও অনেক ভাল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'যে সব থেকে বেশি দিতে পারবে, তার সঙ্গেই কি তোমার বিয়ে হবে?'

সুরসতিয়া হেসে উঠে বললো, 'তা কেন? আমি ইচ্ছা করলে, কিছু না নিয়েই একজনকে বিয়ে করতে পারি। কিন্তু পুরুষেরা বউকে কিছু না দিয়ে, বিয়ে করতে সরম পায়।'

নারীর অধিকারই প্রথম বিবেচ্য। সমাজের চেহারাটা এমনই, পুরুষ কিছু না দিলে, তার পৌরুষ প্রমাণিত হয় না। হয় তো সমাজের আর দশ জনের কাছেও নিজেকে হেয় মনে করে।

ইতিমধ্যে অনেকবারই ময়ূর ডেকে উঠেছে। এখনো মাঝে মাঝে ডাকছে। সম্বর ময়ূর ধনেশ পাখি ডেকে যায়, ফুল ফল পাতা জলের গন্ধ ছড়ায়। সুরসতিয়া জলন্ত সিগারেটের শেষাংশ দূরে ছুঁড়ে ফেললো। আমি আবার না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে?'

সুরসতিয়া তেমনি অনায়াসেই বললো, 'ভাল লাগছে।'

এর পরেও কী জিজ্ঞেস করা যায়, বুঝে উঠতে পারি না। অন্ধকারে আমি ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাই না, আন্দাজ করতে পারি, ও আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার খারাপ লাগছে।'

বললাম, 'না। কিন্তু আমি খুব তাজ্জব বোধ করছি।'

'কেন?'

'আমি তো তোমাকে পীড়ন করতে পারি। বেইজ্জত করতে পারি।'

আশ্চর্য জিজ্ঞাসা। এই 'কেন'-এর কী জবাব থাকতে পারে? ও নিজেই হেসে, আবার বলে উঠলো, 'তুমি কি সেই গাড়িওয়ালা দীখুর মতো আমাকে টেনে নিয়ে যাবে?'

জিজ্ঞেস করলুম, 'যদি যাই?'

'আমি যাবো না। তুমি নিয়ে যেতেও পারবে না। আমার ইচ্ছা না হলে, তুমি কিছুই করতে পারবে না।'

সুরসতিয়া স্পষ্ট বললো। সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সে প্রমাণ তো ওর এখানে উপস্থিতিই জানিয়ে দিচ্ছে। সুরসতিয়া আবার বললো, 'তোমাকে আমি যখন প্রথম দিন দেখেছি, তখনই তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল।'

'কেন?'

'তা জানি না। আমার দিদি আর তার স্বামীরও তোমাকে ভাল লেগেছে। সবাই বলেছে, তুমি লোক ভাল।'

মনে মনে ভাবি, কেন, আমি সিগারেট দিয়েছিলাম বলে? কিন্তু এভাবে জিজ্ঞেস করতে বাধে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাল লোক কী করে চেনো তোমরা?'

সুরসতিয়া বললো, 'কী করে আবার। ভাল লোককে দেখলেই তো চেনা যায়, এ লোকটা ভাল।'

এ অনেকটা অন্ধ সারল্যের মতো মনে হয়। তথাপি, আমরাও কোনো কোনো মানুষের প্রতি এরকম অনুরক্ত হয়ে পড়ি, তার পশ্চাদ্‌পট না জেনেই। কিন্তু আমি জানি, ওর চোখের ভালত্ব, হয় তো আমার মধ্যে নেই। সুরসতিয়া ওর আরণ্যক আবেগে আচরণ করছে। তারপরেই সুরসতিয়া যা বললো, তা যেন এই গোটা বনকেই আমার মতো নির্বাক আর মুগ্ধ করে দিল। ও বললো, 'আমাকে তোমার ভাল লেগেছে, আমি জানি।'

আমি সুরসতিয়ার মুখ দেখবার চেষ্টা করলাম, যা একান্তই অসম্ভব। তবু মনে হলো, অন্ধকারের মধ্যে, আমি যেন ওর চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছি। যে-চোখে সম্মোহনের মন্ত্র। আসলে কল্পনার চোখ দেখতে পাচ্ছি। কথাটা বলেছে ও অব্যর্থ, ভাষা আর ভঙ্গিটা ওদের নিজস্ব। আমার নিজের বলার অবকাশ ও রাখলো না, নিজের বিশ্বাসকে অনায়াসে ব্যক্ত করে, আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিক বলিনি?'

জবাবের প্রত্যাশা কেন। বললাম, 'তোমাকে যে দেখবে, তারই ভাল লাগবে।'

সুরসতিয়া অনায়াসেই, আমার গায়ের স্পর্শে বসেছিল, হাত রেখেছিল আমার কোলের কাছে। কনুই দিয়ে, আমার গায়ে একটু ধাক্কা দিয়ে মাথাটা প্রায় আমার কোলের কাছে নামিয়ে এনে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

কথাটা কি নিতান্ত বোকার মতো বললাম নাকি? হতে পারে। মুগ্ধ মানুষের আচরণকে অনেক সময় বোকার মতো মনে হতে পারে। কিন্তু এই বন, এই অন্ধকার, ফুল পাতা লতা গুল্মের এই গন্ধ, কেকাধ্বনি, সম্বরের গম্ভীর নাদ, আর যেন পুরাকালের কোন্ এক পাথরপ্রতিমা নায়িকা আমার দেহলগ্ন আসীন। সংসারে মুগ্ধ হওয়ার আর কী লক্ষণ থাকতে পারে।

এ সময়েই হঠাৎ, খুব কাছে থেকেই যেন কোনো মেয়ের নিচু স্বর শুনতে পেলাম, যার ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য। কেবল যে আমিই চমকে উঠলাম, তা না। সুরসতিয়াও মাথা তুলে, স্বর লক্ষ্যে ঘাড় ফেরালো। একটি পুরুষ-গলার হাসি শোনা গেল। সুরসতিয়া ওর নিজের ভাষায়, গলা তুলে কিছু বলে উঠলো। জবাবে, আমার বাঁ দিকের সামান্য দূর থেকেই, আগের মেয়ের স্বরে কথা শোনা গেল। সুরসতিয়া হেসে উঠলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

সুরসতিয়া বললো, 'চিনতে পারছ না। সোমারি তো, আমার বোন, আর ওর মরদ।'

অর্থাৎ শুক্রম। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা কখন এলো?'

সুরসতিয়া বললো, 'একটু আগে। সোমারি বলছে, আমাকে লাকরায় ধরে নিয়ে গেছে, তাই খুঁজতে বেরিয়েছে।'

অর্থাৎ বাঘে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সুরসতিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই, আমাদের কাছাকাছি দুটি অস্পষ্ট মূর্তি দেখতে পেলাম। যতোটা নিরালা মনে করেছিলাম, ততোটা না। আরো কেউ কেউ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে কী না কে জানে। কাণ্ডেয়র নামে সেই জোয়ান যে দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে পারে, তা আগেই শুনেছিলাম। সোমারির গলা শুনতে পেলাম, 'তা কী বলবো বাবুজী, বলো। আমার ভাত পাকানো হয়ে গেল। বোন আমার সারা দিন খেটেছে, কিন্তু তার ভুখ্ পিয়াস নেই। শুনলাম সে ডিয়েং পিয়ে, বনে চলে গেছে। আবার একজন বললে, তোমার বোনকে লাকরায় ধরে নিয়ে গেছে, এতক্ষণে বোধহয় খেয়ে ফেলেছে, আর খুঁজে পাবে না।'

সুরসতিয়া হাসলো, সেই সঙ্গে শুক্রম বেশ জোরে, বেখাপ্পাভাবে হেসে উঠলো। এখন আর আমাকে বলে দিতে হয় না, সোমারির মরদ মহাশয় কিঞ্চিৎ পান করেছেন। উপচে পড়া হাসি শুনলেই বোঝা যায়। সুরসতিয়া হিন্দীতে তার বোনকে বললো, 'বাবুজী লাকরা না, ওকে আমিই টেনে এনেছি।'

সোমারি তার নিজের ভাষায় কিছু বললো। সুরসতিয়া ধমকের মতো শব্দ করে, হেসে উঠলো। শুক্রম আবার তেমনি করে হাসলো। সুরসতিয়া এবার ওর নিজের ভাষায় কিছু বললো, জবাবে সোমারিও। আর শুক্রম একভাবে হেসেই চললো। আমি নিরেট অন্ধকারে। অনুমান করে নিতে পারি, তাদের কথাবার্তা হয় তো কিঞ্চিৎ রসাত্মক, তা না হলে শুক্রম হেসে ও-ভাবে তাল দিয়ে যেতো না। ভগ্নিদ্বয়ের কথোকপথন উপভোগ করতে পারছি না। দুই বোনের হাসির মাঝখানে, বললাম, 'তোমাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সুরসতিয়া বললো, 'সোমারি বলছে, আমাদের দু'জনের মাঝখান থেকে মারাংবুরু যদি করমের ডালটি তুলে নেয়, তা হলে আমার গতি কী হবে।'

রহস্যময় কথা বলে মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?'

সোমারি আর শুক্রমও তখন আমাদের সামনে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসেছে। সুরসতিয়া বললো, 'সেটা আমাদের ধর্মের কথা। তুমি শুনবে?'

কৌতূহলিত হয়ে বললাম, 'বলো।'

সুরসতিয়া বললো, 'তুমি আমাদের ঠাকুরের কথা কখনো কারোর কাছে শোননি। ঠাকুর নামে আমাদের একজন মহাদেবতা আছে। তিনি কচ্ছপকে হুকুম করেছিলেন, সমুন্দর থেকে মাটি তুলে নিয়ে আসতে। কচ্ছপ সেই মাটি তুলে আনলো, আর তাই দিয়ে এ জগৎটা তৈরি হলো। সেই জগতে হলো অনেক পাহাড় জঙ্গল, যেখানে চরে বেড়ায় কতো পশু পাখি। কিন্তু হলে কী হবে, মহাদেবতা ঠাকুরের মনে বড় দুখ্। তার বড় একলা লাগে। সুন্দর জগতে, একলা থাকতে কার ভাল লাগে?'

সোমারি যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গলায় একটি শব্দ করে। আর আমি সুরসতিয়ার সুরেলা গলায়, যেন এক আদিম রূপকথা শুনি।

সুরসতিয়া বলে যায়, 'তখন মহাদেবতা দুটো গাছ থেকে, দুটো মানুষ বানালেন, তার মধ্যে একটা কোড়া, আর একটা কুড়ি। কোড়া কুড়ি দুটো সারাদিন বনে বনে ঘোরে, পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ায়। বনের ফল খায়, ঝরণার জল পান করে। আর রাত্রে যখন শোয়, তখন তাদের দু'জনের মাঝখানে থাকে একটা গাছের ডাল। মহাদেবতা ঠাকুরই সেটা রেখে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, তোমরা এই ডালের দু'দিকে দু'জনে শোবে, কখনো পারাপার করবে না। কিন্তু হায়, মহাদেবতার মতো, ওদেরও কেমন একলা একলা লাগে। ওরা বুঝতে পারে না, ওদের প্রাণ কী চায়।'

'অঁয় অঁয়, আঁড়দি।' শুক্রম বলে উঠলো।

সোমারি তাকে থামিয়ে দিল। সুরসতিয়া বলতে লাগলো, 'ওদের প্রাণ কী কী চায়, মারাংবুরু—যিনি বড়পাহাড়, তিনি বুঝলেন। তিনি ওদের কাছে এলেন। ওরা কোনো দিন চাউল দেখেনি। উনি চাউল দিয়ে, ওদের মাণ্ডি বানানো শেখালেন। তারপর মাণ্ডি থেকে ডিয়েং। ডিয়েং বানিয়ে ওদের পান করতে দিলেন। ডিয়েং পান করে ওরা ঘুমিয়ে পড়লো। মারাংবুরু তখন ওদের মাঝখান থেকে সেই গাছের ডালটি তুলে নিয়ে গেলেন। ওদের ঘুম ভেঙে গেল, আর দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলো।...কিন্তু ওদের ভয় হলো, মন বললো, ওরা পাপ করেছে। মারাংবুরু এসে বললেন, তোমাদের পাপের দায় আমার। এবার তোমাদের ছেলেমেয়ে হবে। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

সুরসতিয়া চুপ করলো। আমি যেন আদি পাপের সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কাহিনীই, আর এক রূপে শুনলাম। নিষিদ্ধ ফলের বদলে, এখানে নিষিদ্ধ বৃক্ষকাণ্ড। পৃথিবীতে বোধহয় এমন কোনো গোষ্ঠীর মানুষ নেই, পৃথিবীর জন্মের, মানুষের আবির্ভাব আর তার জীবনলীলার কোনো কাহিনী নেই।

সুরসতিয়া একটু হেসে, কথার প্রসঙ্গে এলো, 'সেই গাছের ডালটা ছিল করমের।'

সোমারির রহস্য এবার পরিষ্কার। আমার আর সুরসতিয়ার মাঝখান থেকে যদি, সেই নিষিদ্ধ করমের ডালটি মারাংবুরু নিয়ে যান, তা হলে সুরসতিয়ার কী গতি হবে। নিতান্ত ঠাট্টা, এর কোনো জবাব নেই। মুণ্ডা উপকথার সঙ্গে, আমার জীবনের ধ্যানধারণার কোনো মিল নেই। কোনো নিষিদ্ধ গাছের ডালের অনুভূতি নেই আমার। মুগ্ধতা নিশ্চয় আছে, তার জন্য সুরসতিয়ার নতিজার কথা আসে না।

শুক্রম আবার বলে উঠলো, 'আঁড়দি হবোয়া, আঁড়দি হবোয়া।'

দুই বোন খিলখিল করে হেসে উঠলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'শুক্রম কী বলছে?'

সোমারি জবাব দিল, 'বলছে বিয়ে হবে।'

মুখ ফেরাতে দেখলাম, সুরসতিয়ার মুখ আমার দিকে। এই সময়ে, সুরীনের গলা শোনা গেল, সে আমার নাম ধরে, দাদা বলে ডাকছে। আর টর্চ লাইটের আলো, এদিকে ওদিকে ঘুরছে। আমি সাড়া দিলাম, 'এখানে।'

সুরীন কাছে এসে বললো, 'বাবা, তিন জনেই ঘিরে ধরেছে? ওদিকে মোহনদা খুব ব্যস্ত হয়েছেন, 'চলুন, খাওয়া-দাওয়া করবেন।'

আমি সুরসতিয়ার দিকে তাকলাম। টর্চের আলোয় ওর মুখ এখন স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছি। ওর মন্ত্রভরা চোখে যেন একটি আচ্ছন্নতা। আমার কোলের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বললো, 'যাও। কাল দেখা হবে।'

আমি উঠে সুরীনের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

রাত্রের কোনো হিসাব নেই। আমি আর সুরীন জেগে আছি। মোহনবাবু কেবল খাবার অপেক্ষাতে ছিলেন। খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। দুটো খাটিয়ার মাঝখানে, পাতার জাজিমের ওপরে, সুরীনের বিছানা। ঘরের এক পাশে আগুন জ্বলছে। গায়ে কম্বল চাপাতে হয়েছে। অথচ ফাল্গুন মাস।

গভীর জঙ্গলের রাত্রিবাসের মধ্যে, ছোট নাগরাও ছিল। কিন্তু সেটা ছিল, বনের একটি গ্রাম, মাটির ঘর। আর একেবারে বনের মধ্যে, এমনভাবে রাত্রি-বাস এই প্রথম। একটু আগেই, কম্বলসুদ্ধ ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিলাম, অতি কর্কশ ভৌ ভৌ চিৎকারে। সুরীন অভয় দিয়ে বলেছিল, 'ভয় পাবেন না, কোৎরা ডাকছে।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোৎরা? সেটা আবার কী ভাই?'

সুরীন হেসে বলেছিল, 'কোৎরা হরিণ। আপনাদের ইংরেজিতে যারে কয় বার্কিং ডিয়ার।'

ইংরেজি আমাদের কী না, বলতে পারবো না, বার্কিং ডিয়ার বলে, কোনো কিছু আমার জানা ছিল না। আর কোনো হরিণের ডাক যে, এমন কুকুরের ডাকের মতো বনভূমি প্রতিধ্বনিত করতে পারে, তাও আমার জানা ছিল না। কোথায় হরিণ, আর কোথায় কুকুরের ভৌ ভৌ। বনের রাজ্যে সবই আজব।

অন্ধকার ঘরে, সুরীনের বিড়ির আগুন মাঝে মাঝে জ্বলছে, আর তার নিচু স্বর শোনা যাচ্ছে, আজ পর্যন্ত এমন লোক দু' একটা ছাড়া দেখিনি, এদের দিকে ভাল চোখে তাকিয়েছে। শেয়াল যেমন হাঁস মুরগীর দিকে তাকায়, সকলের নজর সেইরকম। ওরা নজর দেখলেই চিনতে পারে।'

সুরীন একবার বিড়ি টেনে আবার বললো, 'চিনতে সবাই পারে। শেয়াল কুকুরের নজর আবার চেনে না কে। আমাদের মতন মানুষদের কথা বলছি, তারা সবাই যেন শেয়ালের মতন এদের দিকে তাকায়। অথচ আপনি ভাল মনে হেসে কুঁদে নেচে গেয়ে, হাত ধরেন, একটু যদি টানাটানিও করেন, কিছু মনে করবে না। ওরা নিজেরা ওটা ভাল জানে। ওদের খারাপ যদি কেউ করে থাকে, তবে জঙ্গলের বাইরের লোকেরা করেছে, ভিতরের লোকেরা না।'

এ বিষয়ে, সুরীনের মতামতকে মানতে আমার অনীহা নেই। সে শুধু ওদের দেখেনি, ওদের সমাজ গৃহে শুধু মেশেনি। জেমা যতো বাঙালীই হোক, তবু সে মুণ্ডা, সুরীনের সম্ভবত হৃদয়েশ্বরী। কেতাবের সাক্ষীও, সুরীনের কথার মতোই। সুরীন হঠাৎ বললো, 'তবে আপনাকে এক গল্প বলি। আপনারই বন্ধু, কলকাতার লোক, যথেষ্ট লেখাপড়া জানা, নাম বললেই চিনবেন।'

বলে সুরীন নাম বললো, না চেনবার কোনো কারণ নেই, এবং বন্ধুও বটে। সে কেবল লেখাপড়া জানা বললে ভুল হবে, সাহিত্য জগতেও তার কিছু নাম আছে। সুরীন বললো, 'ওই যে দেখলেন সুর্যমণি, সে তাকে জবর শিক্ষা দিয়েছিল। উনি একটু নেশা-টেশা করে, সুর্যমণিকে বোধহয় কোনোরকম, শহুরে ঠাট্টা করেছিলেন, শহুরে খারাপ ইঙ্গিতও বোধহয় করেছিলেন। ঘটনা ঘটেছিল ঘাটকুড়িতে, এই মোহনবাবুর ইজারাতেই, এইরকম ছাউনি পড়েছিল। সুর্যমণি রেগেছিল তখনই। ওই সব আকার-ইঙ্গিতগুলোকে ওরা খুব খারাপ চোখে দেখে। আপনি সরাসরি ঠাট্টা ইয়ারকি করেন, বন্ধুত্ব করতে চান, সেটা আলাদা। মন না চাইলে সরে যাবে, চাইলে ভাল। আসল কথা কি জানেন, আমরা মনে করি, ওদের বুঝি মান জ্ঞান নেই। দেখলে আমরা বুঝি না, মান জ্ঞান আমাদের থেকে বেশি। তা যাই হোক—।'

সুরীন বিড়িতে আর একটা টান দিয়ে বললো, 'সেই ভদ্রলোক সুর্যমণিকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছিলেন, বোধহয় টেনে নিয়ে যাবারও চেষ্টা করেছিলেন। রাত্রের ঘটনা। ভদ্রলোককে যখন আমরা দেখলাম, তখন তাঁর কপাল কাটা, চোখের নিচে নীল দাগ। উনি নিজে কিছু বলেননি। সুর্যমণি বলেছিল যোশেফকে, কুলী কামিনদের সর্দার। সে বলেছিল মোহনবাবুকে। মোহনবাবু অবশ্য সে সব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করেননি, পরদিন ভদ্রলোককে জরাই-কেলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সুর্যমণি মেরেছিল বুঝি?'

সুরীন বললো, 'হ্যাঁ। সুর্যমণির হাতে মোটা মোটা কাঁসার বালা দেখেছেন তো? তা সেই বালার এক ঘায়ে কপাল কেটেছে, আর এক ঘায়ে, একটা চোখই যেতো, বেঁচে গেছে, কেবল কালশিটা পড়ে গেছলো।'

হাসি পায়, দুঃখ হয়, কেমন একটা রাগও হয়। যে বন্ধুটির কথা শুনলাম, তার কথা মনে পড়লো। মানুষের কোন্ পরিচয় যে কোথায় কী ভাবে সহসা ফুটে ওঠে, তা একমাত্র তার অন্তরবাসী ভেকটি ছাড়া কেউ জানে না। অথচ কলকাতায়, তার কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, অমন রুচিবান, শালীন একের

অধিক মেলে না। ঠোঁটের বক্রতায় চিনতে অসুবিধা হয় না, ইংরেজিতে যাকে বলে সিনিক।

আমি বললাম, 'তা যেন হলো, এই সুরসতিয়ার ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

সুরীন হেসে বললো, 'ব্যাপার তো দাদা সোজা, আপনাকে ওর ভাল লেগে গেছে। ওদের ভাল লাগাটা ওপরের না, মুশকিল সেখানে। মনে কষ্ট পাবে, এই আর কী! আর কিছু না।'

সুরীন এমন সহজভাবে বললো, যেন ব্যাপারটা কিছুই না। আমারই মনে, কেমন ছায়া নেমে আসে, বিষণ্ণ বোধ করি। ছোট নাগরার তৃপ্তি ভৌমিক নামে, সেই নার্সটিকে বুঝি। দমদমে যার বাড়ি, অরক্ষণীয় ভাই বোন বিধবা মাকে বাঁচাবার জন্য, যে এই গভীর বনে পড়ে আছে। একজন বাঙালীকে কয়েক দিনের জন্য পেলে, তার মনের পরিবর্তন স্বাভাবিক। হয় তো, সেই বাঙালীর মনেও কোথাও একটি দাগ লেগে যায়। কিন্তু, কোনো এক বনবালাকে কষ্ট দিতে, আমি বন ভ্রমণে আসিনি। এসেছি, বনের সঙ্গে খেলতে, অনেক দিনের আশা পুরাতে। সে কেন তার সাতবহিনির হাতছানি দেয় আমাকে, শোনায় সেই উপকথার নিষিদ্ধ বৃক্ষকাণ্ডের কথা।

হয় তো, বনের সঙ্গে খেলার, এটাও একটি রীতি, কেবল মাত্র খুশির ডালি নিয়ে, এখান থেকে ফেরা যায় না। একটা কষ্ট, যা সুরসতিয়ার কানে বাজবে, তা আমাকেও নিয়ে যেতে হবে। যে কষ্ট দেবার বিষয়ে আমার হাত নেই, যে কষ্ট পাবার বিষয়েও আমার হাত নেই; তা নিয়ে ভেবেও আমি কিছু করতে পারি না। যাক বনের নিজের খেলার বিষয়, সে তার সেই নিয়মে খেলুক।

এই মুহূর্তে কোনো পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি না। সমস্ত বন যেন স্তব্ধ, ধ্যানে মগ্ন।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, কেউ নেই, সবাই গাছ কাটতে চলে গিয়েছে। মোহনবাবুও চলে গিয়েছেন। রয়েছে খালি সুরীন আর হোরো। সকালের রোদে, বন যেন গলানো সোনায় স্নান করে উঠেছে। যাকে বলে বিছানা-চা, সুরীন তা দিতে ভুল করলো না। প্রাতঃকৃত্যাদির পরে, কোয়েনার জলে স্নান করতে যাবার উদ্যোগ করতেই, সুরীন বাধা দিয়ে বললো, 'করবেন না, সহ্য হবে না হয় তো।'

কথাটা মানতে পারলাম না। নিরন্তর এই পাহাড়ী স্রোতধারা যদি সহ্য করতে না পারি, তাহলে আর কী সহ্য হবে। এমন নয় যে, পাড়াগাঁয়ের এঁদোপুকুর। অচল জল, যে সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। বদ্ধ জলকেই ভয়। সুরীনের কথা না শুনে, আমি কোয়েনায় স্নান করলাম। প্রাতরাশ খাওয়া হয়ে গেলে, সুরীন জিজ্ঞেস করলো, 'এদেলবা গ্রামটা একটু ঘুরতে যাবেন নাকি? নাকি গাছ কাটার ওখানে যাবেন?'

বললাম, 'গ্রামেই যাওয়া যাক।'

সুরীন বললো, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখি যদি কিছু মাছ-টাছ পাওয়া যায়।'

সুরীনের ভাবনা অন্য। অবিশ্যি আমার জন্যই। কিন্তু আমি বনের গ্রামই দেখতে চাই। সুরীন হোরোকে কিছু বললো, তারপরে দু'জনে বেরোলাম। যে পথ দিয়ে, গতকাল বদরিকাপ্রসাদের সঙ্গে, জীপে করে নেমে এসেছিলাম, ডান দিকে, সেই উঁচুতে আমরা উঠতে লাগলাম। বন এখানে খুব ঘন না। তবে বড় বড় গাছ অনেক, তার লম্বা ছাওয়া পড়েছে পশ্চিমে।

খানিকটা যাবার পরেই, ঝপ্ করে আমার গায়ে কিছু পড়তেই, চমকে, প্রায় একটা লাফ দিলাম। তাকিয়ে দেখি, এক থোকা সাদা সাদা ফুল, নাম না জানা। আমার গায়ে এখনো তার কয়েকটা পাপড়ি। সুরীনও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মাটির উপর ফুলগুলো দেখে, ভুরু কুঁচকে, সন্দিগ্ধ চোখে আশেপাশে দেখলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হতে পারে বলুন তো?'

সুরীন বললো, 'একটা ব্যাপারই হতে পারে। দাঁড়ান, দেখছি।'

বলে সে বাঁ দিকে পাশাপাশি কতগুলো বিশেষ গাছের দিকে এগিয়ে গেল। এদিকে ওদিকে প্রদক্ষিণ করে, হঠাৎ একটা আড়ালে সে থেমে গেল, আর সেখান থেকেই, আমাকে ডাকলো, 'পাওয়া গেছে, এদিকে আসেন।'

সুরীনের ডাকে কৌতুহলিত হয়ে, একটি গাছের আড়ালে, কাছে গিয়ে দেখলাম, ইতিমধ্যেই প্রায় যা সন্দেহ করেছিলাম, সুরসতিয়া। দাঁড়িয়ে আছে, গাছের গায়ে পিঠ চেপে। এখন ওর ধোয়া পরিষ্কার শাড়ি গায়ে নেই, ছোট-খাটো একটি পুরনো শাড়ি। কাজের পোশাক। কিন্তু চুল পিছন দিকে টেনে আঁচড়ে, শক্ত করে খোঁপা বাঁধা, সরু সাপের ফণার মতো, লম্বা ঘাসের ডগার মতো একটি অদ্ভুত ফুল গোঁজা, বাতাসে কাঁপছে। চোখে মুখে হাসি।

সুরীন বললো, 'না, লক্ষণ মোটেই ভাল না দেখছি। কাজকর্ম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, রোজের চিন্তা নেই, পেটে খাবার কথা ভুলে গেছে।'

বলে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমিই যেন সঙ্কোচ বোধ করলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'মোহনবাবু রাগ করবেন না?'

স্বরীন বললো, 'মোহনবাবুর রাগের কী আছে। তিনি ওর রোজের বেতন কেটে নেবেন। জোশেফকে ফাঁকি দিয়ে, কেউ নাম হাজিরা করাতে পারবে না।'

আমি সুরসতিয়ার দিকে তাকালাম। ও স্বরীনকে হিন্দীতে বললো, 'বাবুজীকে কী সব বলছ?'

স্বরীনও হিন্দীতেই বললো, 'বলছি, তুই মরেছিস্।'

সুরসতিয়া খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললো, 'কী করে মরলাম, আমি তো বেঁচেই আছি।'

স্বরীন সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই কি কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিস?'

সুরসতিয়া পরিষ্কার ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল, তা-ই। স্বরীন জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

সুরসতিয়া চোখের কোণে আমাকে দেখলো। ওর সাদা দাঁতের ঝিলিক দেখা গেল। স্বরীন বললো, 'তা তো বুঝলাম, রোজ না পেলে, পেটে খাবি কী?'

সুরসতিয়া বললো, 'এক রোজ সোমারি খাওয়াবে।'

স্বরীন আমার দিকে তাকিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'শোনেন মেয়ের কথা।'

তা তো শুনতেই পাচ্ছি। সুরসতিয়ার এই সহসা উপস্থিতি যে আমাকে অখুশি করেছে, তা বলতে পারবো না, বরং সত্যি বললে, স্বীকার করতে হয়, আমার খুশির মধ্যে, একটা কৃতজ্ঞতাও যেন পাশাপাশি রয়েছে। তথাপি, আবার কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে। না-ই বা রইলো তার ঘরকন্নার কাজ, কাজ তো ছিল বনে। এ বনে, আরো অনেকে রয়েছে আমাদের সঙ্গে। তাদের কথা মনে হয়। তাদের প্রতিক্রিয়া ভেবেই যেন মনে অস্বস্তি লাগে। যদিও, শেষ পর্যন্ত বলতে হয়, 'তুমি নিমিত্ত মাত্র।'

স্বরীন জিজ্ঞেস করলো সুরসতিয়াকে, 'তা এখন কী করবে?'

সুরসতিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি বাবুজীকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?'

স্বরীন বললো, 'আমি যাচ্ছি গ্রামে, মাছ পাওয়া যায় কী না দেখবো।'

সুরসতিয়া ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'চলো, আমিও যাবো।'

সুরসতিয়া আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। স্বরীন ততক্ষণে চলতে আরম্ভ

করেছে। সুরসতিয়া কিন্তু আমার পাশে না এসে, আমার দিকে ফিরে ফিরে, সুরীনের পাশে পাশে চললো। সুরীনের সঙ্গে ও কী সব কথাবার্তা বলে, ওর নিজের ভাষায়। সুরীনও সেই ভাষাতেই জবাব করে। ওরা আমার আগে আগে চলে। সুরসতিয়া ফিরে ফিরে তাকায়, হাসে।

গাছতলায় বসেছিল একটি প্রায় নগ্ন বৃদ্ধ। গায়ে একটি ময়লা পাতলা কাপড়ের টুকরো। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো, আমার দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকালো। মনে করতে পারি না, গতকাল জীপে আসবার সময়, এ বৃদ্ধকেই, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে দেখেছিলাম কী না। তার কালো মুখে, অজস্র ভাঁজ, হাসতে গিয়ে, তা আরো গভীর হলো। মনে হলো, দাঁত নেই একটিও, চোখ দুটো হলুদ বর্ণ, হাত পা ফোলা।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুরীন আর সুরসতিয়া খানিকটা গিয়ে, পিছন ফিরে থমকে দাঁড়ালো। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কী?'

বৃদ্ধ আবার কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'ক্যারকাটা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় থাকো?'

সে হাত দিয়ে গ্রামের দিকে দেখালো, ফিরে আমাকে ঘড়ঘড়ে স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুম ইজারাদার হ্যায়?'

'মাথা নেড়ে বললাম, 'না, জঙ্গল ঘুমনে আয়া।'

বৃদ্ধ হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল, সে আমার কথা বুঝেছে। তারপরে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। হাঁ মুখে হাসি, জিভ খানিকটা বেরিয়ে আছে। অতঃপর কী জিজ্ঞেস করবার আছে, বুঝতে পারছি না। বললাম, 'বয়ঠো।'

সে কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার সেলাম করলো, কিন্তু বসলো না। সুরীন আর সুরসতিয়া নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। উচিত অনুচিত বুঝতে না পেরেও, আমি পকেট থেকে পয়সা বের করলাম, ঘাড় দুলিয়ে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গি করলাম। বৃদ্ধের হাসি আর একটু বিস্তৃত হলো, এবং ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো। আমি তার হাতে পয়সা তুলে দিলাম। সে আবার কপালে হাত ঠেকালো। বললো, 'বুড্ঢা হো গয়া।'

আমি ঘাড় দুলিয়ে, এগিয়ে গেলাম। এদেলবার ক্যারকাটা নামে বুড়ো, বুড্ঢা হয়েছে নিশ্চয়, সম্ভবত অসুস্থও। তবে তার সংসারে কেউ নেই, সেটা ঠিক না বোধহয়। এগিয়ে যেতে সুরীন বললো, 'কী বলে বুড়ো ক্যারকাটা, পয়সা চাইলো।'

বললাম, 'চাওয়ার মতো করে চায়নি।'

সুরীন বললো, 'বাইরে থেকে কেউ এলে, ও সেলাম করবে। এক সময়ে ও ফরেস্ট গার্ড ছিল।'

গতকাল দেখা আর একজন ফরেস্ট গার্ডের কথা মনে পড়ে গেল। আমরা এখন গ্রামের মধ্যে। গ্রাম বলতে কিছু মাটির ঘর। এখানে ওখানে ছাগল চরছে, দূরের সবুজ মাঠে, গরু বাঁধা। কিন্তু নিঝুম, সাড়া শব্দ বিশেষ নেই। ছোট নাগরার থেকে, ছোট গ্রাম। এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটানো, বেড়া ঘেরা কিছু শাক সব্‌জীর চাষ হয়েছে। সামনে এগিয়ে পথের ধারেই, একটা পাতকুয়া।

হঠাৎ একটি বাড়ির, মাটির দেওয়ালের আড়াল থেকে, সুরসতিয়ার বয়সী একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগলো, যেন এমনটি আর কখনো দেখেনি। তার দৃষ্টি, সুরসতিয়ার দিকেই বেশি, তারপরে আমার প্রতি। সুরীন কী যেন জিজ্ঞাসা করলো। জবাবে সে বাঁদিকে হাত দেখালো। সুরসতিয়া তার কাছে গিয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করলো। দু'জনেই কয়েকটি কথা বিনিময় করলো, তারপরে, দু'জনেই হেসে উঠলো। নতুন মেয়েটি মুখে হাত চাপা দিল। আমরা আবার এগিয়ে গেলাম। বোঝা যাচ্ছে, আমরা চড়াই উঠতে উঠতে এসেছিলাম, এখন আবার নেমে চলেছি।

সুরীন বললো, 'আপনার বিষয়ে হেন কথা নাই, সুরসতিয়া জানতে চাইছে। আপনি কী করেন, কোথায় থাকেন, বিয়ে করেছেন কী না, করলে ছেলেমেয়ে ক'টি।'

বলতে বলতে সুরীন হেসে উঠলো। আমিও হাসলাম। সুরসতিয়া জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের দিকে তাকালো। একটু যেন লজ্জা পেয়েছে। সুরীনকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বলছো?'

সুরীন কোনো জবার দিল না, হাসলো। সুরসতিয়া জিজ্ঞাসু চোখে, আমার দিকে তাকালো। আমিও জানি না, কী জবাব দেবার আছে। সুরসতিয়া একটু দূরত্ব রেখে, আলাদা চলতে লাগলো, তারপরেই স্পষ্ট উচ্চারণে, গান গেয়ে উঠলো;

'ওকোও কাজী তেনা মাই
সেতঃ দোস তরস্‌ বস্‌না।'

সুরীন ঘাড় ফিরিয়ে সুরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো। সুরসতিয়াও আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আবার গাইলো,

'চিময় বংকড়া তেতা মাই
নিমতং দোমো চালী বালোনা।'

এই কটি লাইন ও বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগলো, আর সেই সঙ্গেই যেন ওর কোমর কটি আর একটা তালে তালে দুলছে, অথচ চলছে। আমি সুরীনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছে গান গেয়ে?'

সুরীন বললো, 'বলছে ওর মনেরই কথা। বলছে, সখী কার চুপিচুপি কথায় এখন তুমি ছটফট করছো? বন্ধুনী কার কানাকানিতে এমন উথালি পাথালি করছো?'

আমি সুরসতিয়ার দিকে তাকালাম। সুরসতিয়া এখনো কারাকে চলছে। ইদারা পেরিয়ে মনে হলো, আমরা যেন গ্রাম পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু বাঁ দিকে দেখা গেল, পাশাপাশি আরো কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ঘর। সুরীন সেই দিকে এগিয়ে চললো। বাঁ দিকে যেন অস্পষ্টভাবে একটি জলাশয়ের চিহ্ন দেখা যায়, যা ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। জল নেই, একটা ভেজা ভাব, আর ছোট বড় অজস্র পাথরের নুড়ি, কোথাও চওড়া মাকড়া পাথর, যার গায়ে শ্যাওলা লেগে আছে। বাঁ দিকে খানিকটা গিয়েই আবার চড়াই, গভীর বন।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের দেখে, দু'একজন বেরিয়ে এলো। এখানে কিছু লোকজন আছে। জলন্ত উনানে হাঁড়ি, দুটি মেয়ে জড়াজড়ি বসে। একজন আর একজনের উকুন বেছে দিচ্ছে। একটি ঘরের বাইরে, বাঁশের গায়ে, ছোট একটি মাছ ধরার, বাঙলাদেশের আঁটোল জালের মতো জাল শুকোচ্ছে। সুরীনের হাঁকে, নেংটি পরা, খালি গা একটি পুরুষ বেরিয়ে এলো। সুরীন তাকে কী বললো, সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে, কপালে হাত ঠেকালো। আমি প্রত্যুত্তর দিলাম। তারপরে সে সুরীনকে কী সব বললো। সুরীন মাথা ঝাঁকিয়ে শুনে, আরো কিছু বললো। তারপরে আমার দিকে ফিরে বললো, 'ও এখন আপনার জন্য মাছ ধরতে যাবে। তার মানে, মাছ পেলে, খেতেন ওবেলা।'

আমি বললাম, 'কোনো দরকার ছিল না।'

সুরীন বললো, 'দরকারের জন্য না। পেলে মন্দ কী।'

বলে সে সুরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কী করবে?'

সুরসতিয়া দ্ব্যর্থহীন জবাব দিল, 'তুমি চলে যাও, আমি বাবুজীকে নিয়ে যাবো।'

সুরীন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, সুরসতিয়াকে বললো, 'দেখিস, বাবুজীকে নিয়ে হারিয়ে যাস্ না।'

সুরসতিয়া জিজ্ঞাসার সুরে, চোখের তারা ঘুরিয়ে বললো, 'কেউ কি ইচ্ছা করে হারায়? তোমাদের নারাজ বাবুকে জিজ্ঞেস করো না।'

নারাজ বাবু! সেটা আবার কী? সুরীন জিজ্ঞেস করলো, 'বাবুকে আবার তুই নারাজ দেখলি কখন?'

সুরসতিয়া বললো, 'এক রাত্রের পর।'

আমার অবুঝ বিস্ময়ের মধ্যে সুরীন হোহো করে হেসে উঠলো, আমার দিকে ফিরে বললো, 'এক রাত্রি পরেই, আপনি নাকি ওর ওপরে নারাজ হয়ে গেছেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রকম?'

সুরীন বললো, 'ও ভাবছে, আপনি আর ওর সঙ্গে মিশতে চাইছেন না।'

আমি সুরসতিয়ার দিকে তাকালাম। বনবালা তাকিয়েছিল, অন্য দিকে মুখ ঘোরালো। মুখখানি যেন একটু ভার ভার। এইমাত্র না গান করছিল? এমন কি সুরীনকে চলে যেতে বললো। আবার এখনই মুখভার? এই একটি জায়গায়, বন আর বনের বাইরে ওরা এক। বিশেষত, এই বয়সটা। নগর জীবনে, সুরসতিয়ার পরিচয় কিশোরী। এখানে সে স্বাবলম্বী বনবালা, যে আপন শ্রমে উদরান্নের সংস্থান করে। ওর পাথর ঢালাই বলিষ্ঠ চেহারার মধ্যে, কৈশোর ছাড়িয়ে যেন যুবতী। আমি সুরীনের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সুরীন সুরসতিয়ার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হেসে, আমাকে বললো, 'আপনি ওর সঙ্গে ঘুরে আসুন, আমি যাচ্ছি।'

সুরীন সহজভাবেই কথাটা বললো। বললাম, 'ঠিক আছে।'

সুরীন সুরসতিয়াকে বললো, 'যা, বাবুজীকে নিয়ে যা। জলদি জলদি ফিরিস।'

সুরীন তার পথে চলে গেল। সুরসতিয়া আমার দিকে তাকালো, আবার তাকালো ঘর আর লোকজনের দিকে, তারপরে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করলো, সামনের চড়াইয়ের বনের দিকে। কয়েক পা গিয়ে, আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমি ইচ্ছা করেই পা বাড়াইনি। ও আমাকে সঙ্গে যেতে বলছে কী না, এখনো বুঝিনি। সুরসতিয়া স্থির চোখে তাকিয়ে, ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করলো, 'আসবে না?'

দেখছি, উলটে আমাকেই দায়ী করছে। বললাম, 'তুমি ডাকলে যাবো।'

সুরসতিয়া কয়েক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে, জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি তোমাকে ডাকিনি?'

বলেই পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো। অভিমান এর নাম। কেন না, আমি যে নারাজ হয়ে গিয়েছি। মনে মনে হেসে, ওর পিছনে পিছনে এগিয়ে যাই। চওড়া পথ শেষ, চড়াইয়ে উঠেছে সরু রাস্তা। খানিকটা উঠতেই, বন হয়ে এলো ঘন, ছায়ানিবিড়। ঠাণ্ডা বাতাস লাগলো গায়ে, ঝিঁঝিঁর ডাক স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সুরসতিয়া ওপরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, ডান দিকে এক খণ্ড পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালো, দৃষ্টি আমার দিকে। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখনো ওর চোখে সেই অভিমানের ছায়া। কিন্তু মন্ত্রের সেই নিঃশব্দ ধ্বনি আমি যেন স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি। ওর ছোটখাটো পুরোনো কিন্তু মোটা শাড়িটি, শরীরের পক্ষে, যেন কেবল একটু লজ্জা নিবারণের জন্যই। তথাপি যেন ওর পাথরপ্রতিমা শরীর এইটুকু আবরণে কুলাতে চায় না। বলতে ইচ্ছা করে। এই শাড়িতে ও অধরা। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাগ করেছ আমার ওপর?'

সুরসতিয়া কয়েক পলক, স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপরে হাত বাড়িয়ে দিল ধরবার জন্য। আমি হাত বাড়ালাম, ও ধরে আমাকে টান দিল। পাথর খণ্ডের ওপর উঠে, ওর কাছে দাঁড়ালাম। আমার গায়ে ছায়া, ওর গায়ে রোদ। ওর খোঁপায় গোঁজা, সরু পালকের মতো সেই সবুজ ফুল কণার মতো দুলছে। আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি নারাজ হয়েছ, আমি কেন রাগ করবো?'

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন করে বুঝলে, আমি নারাজ হয়েছি?'

সুরসতিয়া মুখ নামিয়ে নিয়ে বললো, 'আমার মনে হলো।'

এই মনে হওয়ার পরে, আর কোনো কথা থাকে না। মন এমন এক বস্তু, কথায় বলে, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। তার আপন গুণে সে ধনী, তুমি তাকে কী দিয়ে বোঝাবে? আমি এই প্রথম, চিবুকে হাত দিয়ে, ওর মুখ তুলে ধরলাম, বললাম, 'কিন্তু আমি নারাজ হইনি।'

সুরসতিয়া ওর ডাগর কালো চোখে, আমার চোখের দিকে তাকালো। ওর চিবুকে রাখা আমার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে, জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কাজে যাইনি বলে, তুমি রাগ করেছ?'

বললাম, 'না, রাগ করিনি। একটু দুশ্চিন্তা হলো।'

সুরসতিয়া চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

বললাম, 'তোমার রোজগার হবে না।'

স্বরসতিয়া যেন অবাক হেসে, আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'আমি কি সব সময় ইজারাদারবাবুদের কাজ করি নাকি? আমি কি রোজ রোজগার করি?'

সে কথা আমার জানা ছিল না। আমার ধারণা, ওরা বারো মাসই, ইজারাদারদের কাজ করে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে সারা বছর কী কর?'

স্বরসতিয়া এখন সহজ, হেসে বললো, 'কেন, ফড়েস্ হাতুতে থাকি। সেখানে আমাদের কিছু জমি আছে, চাষবাস করি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'ফড়েস্ হাতু কী?'

স্বরসতিয়াও অবাক হয়ে, ভুরু কোঁচকালো, বললো, 'ফড়েস্ ফড়েস্, এই যে দেখছো না, এই যে জঙ্গল, একে তো তোমরা ফড়েস্ বলো, তাই না?'

বুঝতে, তবু আমার কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল, তারপরেই বললাম, 'ফরেস্ট?'

স্বরসতিয়া হেসে, জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'হাঁ তো, ফড়েস্!'

আমারই তো দোষ। আসল কথাটা তুমি উচ্চারণ করতে পারো, আর একজন যদি না পারে, বুঝে নেবার দায় তো তোমারই। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু হাতুটা কী?'

ও হেসে বললো, 'গাঁও।'

'মুণ্ডা কথা?'

'হাঁ।'

স্বরসতিয়া খিলখিলিয়ে হাসলো। তারপরে আমার হাত ধরে, পাথর খণ্ডের বিপরীত দিকে নেমে, শুকনো পাতার উপর দিয়ে, রাস্তা ছেড়ে উঠতে লাগলো। মনে হয়, ফুল আর বনের গন্ধ যেন ওর গা থেকেই নির্গত হচ্ছে। বুঝতে পারলাম, বনের কোনো গ্রামে ওরা বাস করে, সেখানে ওদের চাষের জমি আছে। ও আবার বললো, 'সরকার আমাদের ঘর আর চাষ করবার জমি দিয়েছে, আমরা সেখানে থাকি। তার জন্য, আমরা সরকারের কাজ করি।'

'কী কাজ করো?'

'কেন, জঙ্গল পরিষ্কার রাখি। পাতা জমে জমে, জঙ্গলে আগুন লেগে যায় না? আমরা পাতা ঝাঁট দিই, আগুন নেভাই, রাস্তাঘাট খারাপ হলে, তাও ঠিক করে দিই।'

'জমিতে কী চাষ করো?'

'ঝেড়ি, মকাই, ভুট্টা।'

'ধান চাষ করো না?'

'ধান চাষের মতো জমি নেই।'

'কিন্তু চালের তে দরকার?'

সুরসতিয়া ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হাঁ, দরকার, কিন্তু কোথায় মিলবে? অনেক দাম তো। এখন ইজারাদারবাবুর কাজ করছি, এখন ভাত খাচ্ছি। তারপরে আর ভাত খাবো না।'

অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, জিজ্ঞেস করি, 'কী খাবে?'

সুরসতিয়া বললো, 'মহুয়ার ছাতু, সাঙ্গা, কান্দা, লোয়াক, ডুমরী। কিছু পয়সা পেলে চাল কিনে, ভাত খাবো, ডিয়েং বানিয়ে পান করবো।'

ডিয়েং-এর নামটি বাদ যাবার না। জিজ্ঞেস করলাম, 'ডিয়েং বুঝি তোমাদের চাই-ই।'

সুরসতিয়া আবার চোখ বড় করে বললো, 'হুঁ, চাই তো। ডিয়েং আমাদের সব কিছুতে লাগে। পুজোতেও লাগে।'

এ দেখছি, শাক্তের কারণবারি। শক্তিপূজা, তন্ত্রমতে হলেই, কারণবারি অনিবার্য। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি, আদিবাসী ধ্যান ধারণার সঙ্গে, তান্ত্রিক নানান সিদ্ধান্তের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ মিল খুঁজে পেয়েছেন। সুরসতিয়া আবার বললো, 'যখন মায়ের তোয়ায় দুধ থাকে না, তখন বাচ্চাদের পাতলা করে ডিয়েং খাওয়ায়। পেট ভরে, তাগদ হয়, বাচ্ছা বহুত ঘুম করে।'

চমৎকার। কিন্তু তোয়াটা কী? জিজ্ঞেস করলাম, 'তোয়া কী?'

'দুধ না?' ঘাড় বাঁকিয়ে কথাটা বলেই, একটি অপরূপ লজ্জায় বনবালা যেন মুহূর্তে একেবারে প্রাণমোহিনী হয়ে উঠে, বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে, নিজের দুরন্ত উদ্ধত বক্ষ দেখিয়ে দিল।

সুরসতিয়ার লজ্জা যদি অপরূপ, আমার লজ্জাটা সম্ভবত কলঙ্কজনক, কেন না, আমি ওর মতো অনায়াস সৌন্দর্যের জগতে ফিরি না। বুঝলাম, তোয়া অর্থে দুধ বোঝায়, স্তনও বোঝায়। আমি বাঙাল। ছেলেবেলায় আমরাও তাই জানতাম। ঢাকার ভদ্র শিক্ষিত পরিবারে মহিলাদের বলতে শুনেছি। আমার মা দিদির মুখে তো শুনেছিই। কিন্তু, এই যে নিঃশব্দে, অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে দেওয়া, জানিয়ে দেওয়া, এই দেহের এই নামও, এমন অভিজ্ঞতা আর কখনো হয়নি।

কয়েক মুহূর্ত সুরসতিয়ার দিকে তাকাতে পারলাম না। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আকস্মিক চমককে একটু সামলে নিতে হচ্ছে। অতঃপরও, ও আমার হাত ধরে আছে। অসমান পথ চলতে, গায়ে গা লেগে যায়। হয় তো স্বর্ণমণি বা

সোমারির মতো মেয়ে হলে, এমন অনায়াসে পারতো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুরসতিয়ার জীবনের অভিজ্ঞতা এখনো তাদের পর্যায়ে পৌঁছয়নি। কিংবা, একটু ঘনিষ্ঠতা হলে এরা বোধহয় তা পারে। তথাপি, সুরসতিয়া লজ্জা পেয়েছিল।

আমি প্রসঙ্গান্তরে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'লোয়াক কাকে বলে, তা জানি। কিন্তু সাঙ্গা কান্দা আর ডুমরী যা বললে, সেগুলো কী?'

সুরসতিয়া বললো, 'কেন, সাঙ্গা আর কান্দা তো মাটির নিচে হয়। তোমাদের যেমন আলু মূলো হয়, সেইরকম, তবে সাঙ্গা আর কান্দা এত বড় বড় হয়।'

বলে, দু' হাত দিয়ে সে যে-আকার দেখালো, তা আমাদের সাঁতরাগাছির ওলের চেয়েও বড় মনে হলো। আবার আমার হাত ধরে বললো, 'সাঙ্গা আর কান্দা আমরা রোদে শুকিয়ে ঘরে তুলে রাখি। যখন দরকার হয়, রেঁধে খাই। ওতু করে খাই।'

ওতু শব্দটা জানা ছিল, ছোট নাগরায় এক বনবাসিনীর মুখে শুনেছিলাম। ওতু মানে তরকারি। আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হতে চায় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন করে তোমরা ওতু পাকাও?'

সুরসতিয়া ঘাড় বাঁকিয়ে, ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওতু কাকে বলে, তুমি জানো?'

আমি গম্ভীরভাবে হেসে বলি, 'জানি।'

'কেমন করে? সুধীন বলেছে?'

'না। ছোট নাগরায় এক মেয়ের কাছে শুনেছি।'

'মেয়ে?'

হায় বনবালা তেমন উদার না দেখছি, দৃষ্টিতে একটু ভ্রূকুটি সন্দেহ। আমি একটু মজা দেখতে পাই, মনে মনে হাসি, বলি, 'হ্যাঁ, কিন্তু কোট্‌রি না।'

সুরসতিয়া আমার ধরে থাকা হাত জোরে চাপ দিল, হাতের পাতায় প্রায় নখ বসিয়ে। গতকাল রাত্রেই কথাটা শুনেছিলাম, কোট্‌রি মানে, ডিম না পাড়া মুরগী। একটি মেয়ে, সুরসতিয়াকেই কোট্‌রি বলেছিল। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কুড়ি কি হাপানম্।'

কুড়ি মানে কিশোরী বলা যায়, হাপনামৃটি আবার কী? জিজ্ঞেস করলাম, 'হাপনাম্ কাকে বলে?'

সুরসতিয়া বললো, 'জোয়ানী।'

অর্থাৎ, যুবতী নাকি? সম্ভবত। বললাম, 'হ্যাঁ, তোমার থেকে বড়।'

'কী নাম?'

আমি এবার হেসে ফেললাম, বললাম, 'নাম তো জানি না। ছোট নাগরার গ্রামে এসে দেখলাম, সে হামানদিস্তায় কী গুঁড়ো করছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী গুঁড়োচ্ছ? সে বললে, শুকিয়ে রাখা কচুর ডাঁটা গুঁড়োচ্ছে, ওভু বানাবে। তারপরে আর কোনো কথা হয়নি।'

সুরসতিয়া কয়েক পলক আমার চোখের দিকে দেখলো, তারপরে হেসে উঠে, আমারই হাতটা টেনে নিয়ে, নিজের চোখে চাপা দিল। আমরা এখন পাহাড়ের ওপরে, প্রায় একটা সমতল জায়গায় এসে পড়েছি, যেখানে বড় বড় শাল পিয়াল করম অর্জুন সেগুন আর স্বর্ণচাঁপার বড় বড় গাছ ছড়ানো, লাল মৃত্তিকায় শুকনো পাতা বিছানো। ঘাস তেমন নেই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ডুমরীটা কী?'

'উইপোকা তো!' সুরসতিয়া ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো।

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, সরাইকেলায় গাঙ্গুলিমশাইয়ের কন্যা তিপুর মুখে ডুমরীর কথাটা শুনেছিলাম। বর্ষায় উইপোকারা যখন বেরিয়ে পড়ে, এক জায়গায় উড়তে থাকে, তখন এরা লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা ধরে। পাখ্‌নাগুলো ফেলে দিয়ে, পোকাগুলো নাকি নুনের টাকনা দিয়ে, পরম পরিতোষ সহকারে খায়। এর জন্য গায়ে পাক দিলে, কী করবো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে, আমি আমার সীমা কতোটা আর ছাড়াতে পারি? চীনা খাদ্যের জগৎ জুড়ে নাম। চতুষ্পদ বাদ দিলে, হাঙরের পাখ্‌না অবধি যেতে পেরেছি। কিন্তু লোকপ্রচারিত, আরশোলা নামক পতঙ্গ। রক্ষা করো আমার মহাপ্রাণীকে! আজ অবধি কোনো পতঙ্গ খেয়েছি বলে মনে করতে পারি না। তবে বাঙাল হিসাবে না, একেবারে খাস এ দেশের প্রভাবেই, সরীসৃপ জাতীয় কুঁচে মাছ খেয়েছি, যার অবয়ব, অনেকটাই সাপের মতো, আঁশবিহীন। স্বীকার করতেই হবে, আলু পেঁয়াজ সহযোগে, খেতে খারাপ লাগেনি। রান্নার ব্যাপার আলাদা। আমরা তো অনেক লতাপাতাফুলও, বেশ মচমচিয়ে ভাজা খাই। খেতে খেতে মনে হয়, গুচ্ছের ঘাস তুলে এনে, ওরকম তরবিত করে ভেজে দিলে, তাও খেয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু পোকা! ঘটনাচক্রে এই সুরসতিয়ার সঙ্গেই যদি আমাকে সারাজীবন কাটাতে হয়, তথাপি পতঙ্গ কদাপি না।

সুরসতিয়া সেটা কিছুটা নিশ্চয় বোঝে, তাই বোধহয় জিজ্ঞেস করলো, 'ডুমরীর কথা শুনে তোমার খুব খারাপ লাগছে, না?'

বললাম, 'ওটা আমি ভাবতে পারি না। তুমি মন খারাপ করছ?'

সুরসতিয়া অবাক স্বরে বললো, 'কেন? না তো।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তোমাদের ওতু রান্নার কথা কিন্তু বললে না।'

সুরসতিয়া বললো, 'বলছিলাম তো। যদি তেল মরিচ আর নুন ঘরে থাকে, তবে তাই দিয়ে পাকাই। না থাকে তো, সেদ্ধ করি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তেল নুন ঘরে থাকে না?'

সুরসতিয়া বললো, 'সব সময় না। কুমডিতে হপ্তায় একদিন হাট হয়। তেল নুন আসে। তখন যদি পয়সা থাকে, তা হলে কিনে রাখি, না থাকলে কিনতে পারি না, এমনি সেদ্ধই খাই।'

'নুন ছাড়া?'

'নুন ছাড়া।'

সুরসতিয়া হেসে বললো, 'নুন ভাত, এসব কি রোজ কেউ খেতে পারে। বনের মানুষেরা কেউ-ই তা খেতে পারে না। হপ্তায় হপ্তায় কেনবার এত পয়সা কারোর নেই।'

নির্বাক থাকা ছাড়া, বাক্য খুঁজে পাই না। সাঙ্গা কান্দা ডুমরী মহুয়ার ছাতু, যা বলো, সবই প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া খাদ্য, কেবল আহরণ করে নেওয়া। যদি অন্য খাদ্য জুটতো, তা হলে আর ও সব খেয়ে জীবনধারণের দরকার হতো না।

সুরসতিয়া আবার বললো, 'আমাদের একটা গরু আছে, একজন দিয়েছে। এক বছর পরে, তার তোয়া হবে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'দুধ খাবে, না বেচবে?'

'কাকে বেচবো? কে কিনবে? যাদের দুধ কেনবার পয়সা আছে, তাদের নিজেদের ঘরেই গরু আর দুধ আছে।'

সে কথাও সত্যি। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার আর কে আছে ঘরে?'

সুরসতিয়া বললো, 'কেউ না। আমি সোমারির কাছে থাকি।'

'তোমার বাবা মা নেই?'

সুরসতিয়া মাথা নেড়ে বললো, 'না। মরে গেছে।'

কথাটা যেন সহজভাবেই বললো। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। না, তেমন কোনো ব্যথা কাতরতা, বা বিষণ্ণতা দেখতে পাচ্ছি না। যা নেই, তার জন্য মুখ ভার করার যেন কোনো অর্থ নেই। জীবনটা এমনই সরল, পাথরের বাস্তবতার মতো। আমাদের চোখ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে হয় তো, তুলনার

বিচারে, দরিদ্র আর নিষ্ঠুর বলে মনে হবে। কিন্তু আইনস্টাইন সাহেবের আপেক্ষিকতাবাদকেই বা চিন্তা থেকে বর্জন করি কী করে। তবে সেটা হলো অনেকখানিই অনুভূতির, অন্যান্য ভারসাম্যের। হয় তো জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও। কিন্তু ভারতবর্ষের এই মানুষরা, আমরা যাদের 'আদিবাসী' বলতে শিখেছি, যা বলতে আমি লজ্জা ও গ্লানি বোধ করি, যাদের কাছে প্রতিদিন দুটো নুন এবং ভাতই বিলাসিতা, তখন নিজেদের স্বদেশ চিন্তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। ওরা ভারতবাসী না, ভারতীয় আদিবাসী। আমরা কি নববাসী? চিহ্নিত করতে হলে, তা-ই তো বলা উচিত। ভাষায় ধ্যানধারণায় আমাদের বিভিন্ন প্রদেশেও অনেক তফাত আছে। তথাপি আমরা শুধু ভারতবাসী। ওরা আদিবাসী হয়, রাজনীতির খেলাটা তা না হলে বোধহয় ভাল জমে না। বিভক্তি বিভক্তি আর বিভক্তি। যতো বেশি ভাগাভাগি,ততো বেশি অপরিচয় আর সংঘর্ষ। যাদের হাততালি দেবার, তারা হাততালি দিয়ে লুটে খেয়ে যাবে।

সুরসতিয়া আমার হাত টেনে, ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'তুমি কী ভাবছ?'

একটু চমকে উঠে বললাম, 'এমন কিছু না। আচ্ছা, সুরসতিয়া, একট কথা আমাকে বলো।'

সুরসতিয়া আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। তার কৌতূহলিত গাম্ভীর্য দেখে আমার হাসি পেল। বললাম, 'সেরকম কোনো কথা না। তুমি—তুমি, মানে, তোমার কেমন লাগে?'

সুরসতিয়ার চোখে জিজ্ঞাসা তীব্র, বললো, 'কী কেমন লাগে?'

বললাম, 'এই যে তোমার এই জঙ্গলের জীবন, এই যে কাজ করো, খাও, ডিয়েং পান করো, নাচো গান করো, এ সব নিয়ে, তোমার কেমন লাগে?'

সুরসতিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলো, তারপরে সহজ স্বরে বললো, 'ভাল লাগে।'

আমি তথাপি জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাল লাগে?'

সুরসতিয়া একটু অবাক হয়ে বললো, 'হাঁ তো, ভাল লাগে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি মনে হয় না, রোজ ভাত খাবে, নুন মেখে, ওতু দিয়ে, দুধ খাবে, জঙ্গলের বাইরে বেড়াতে যাবে।'

সুরসতিয়া আমার কথার মর্ম বোধহয় ঠিক ধরতে পারে না, বলে, 'রোজ খাবো? তা হলে, কান্দা সাঙ্গাগুলো কী হবে? ওগুলো যে খেতে ইচ্ছা করে। ভাতও খুব খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমাদের নুনের খুব অভাব। মকাই

ভুট্টা হলে, তা দিয়ে, মহুয়া দিয়ে, আর জঙ্গলে যখন খুব জামফল হয়, তা দিয়ে আমরা হাটুরেদের কাছ থেকে নুন নিয়ে রাখি।'

আমি সুরসতিয়ার দিকে তাকালাম। ওর বয়সের কথা না ভেবে পারি না। হয় তো, মনের সব কথা, এখনো ওর অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির অগোচরে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কতো দিন কাজ করবে?'

সুরসতিয়া বললো, 'যতোদিন এখানে গাছ কাটা হয়, ততোদিন।'

'তারপর?'

'ফিরে যাবো গাঁয়ে। সরকারি কাজ করবো কিছুদিন। আবার কারোর ইজারায় খাটতে যাবো। তারপরে বর্ষার তিন মাস তো গাছ কাটা মানা। তখন আমরাও চাষবাস করবো।'

বলতে গেলে এই হলো সমগ্র জীবন। তা ছাড়াও আছে, কিছু পরব। শুনেছি, তার মধ্যে মাঘে পরব সব থেকে উল্লাস আর আনন্দদায়ক। সুরসতিয়া আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এখনো দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলো, 'এতো পুছ্ পাছ্ কেন করছো?'

বললাম, 'এমনি।'

সুরসতিয়া কী বলতে যাচ্ছিল, আমি ওকে ইশারায় চুপ করিয়ে দিলাম। শুকনো পাতার ওপরে, খড়খড় শব্দ আগেই পেয়েছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, প্রকাণ্ড স্বর্ণচাঁপা গাছের আড়াল থেকে, চকচকিয়ে উঠলো একটি প্রকাণ্ড ময়ূর। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে, সুরসতিয়াও তাকালো। কিন্তু ময়ূরটার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। যেন আমরা কেউ না। আমাকে অবাক করে দিয়ে, ময়ূরটা ঠিক মুরগীর মতো, পা দিয়ে, জোরে জোরে পাতা সরাতে লাগলো, আর চঞ্চু ঠুকতে লাগলো।

সুরসতিয়া আমার দিকে তাকালো। বললো, 'ময়ূর তো!'

বললাম, 'হ্যাঁ। ধরতে পারো?'

সুরসতিয়ার চোখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, 'তুমি নেবে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, শুধু একবার হাত দিয়ে ধরবো, আবার ছেড়ে দেব।'

সুরসতিয়া খিলখিলিয়ে বেজে উঠলো। ময়ূরটা সেই শব্দে দু' পা সরে গেল মাত্র, বললো, 'শুধু ধরবে আর ছেড়ে দেবে? কেন?'

বললাম, 'আমার একটু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।'

সুরসতিয়া বললো, 'ওকে তো এমনি ধরা যাবে না। ফাঁদ পাততে হয়। তা না হলে, তীর ধনুক দিয়ে মারতে হয়।'

বললাম, 'না, আমি মারতে চাই না।'

আমি ময়ূরটাকে দেখতে লাগলাম। গতকালের অভিজ্ঞতা আমার আছে, অতএব আজ আর আমি এই ময়ূর মরীচিকার পিছনে ছুটতে চাই না। ছুটে ধরা যদি সম্ভব হতো, তা হলে, সুরসতিয়া বোধ হয় এতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতো না। সুরসতিয়া যে মুখে হাত চাপা দিয়ে, নিঃশব্দ হাসিতে কাঁপছে, তা খেয়াল করিনি। খেয়াল যখন হলো, ময়ূরটা চলে গিয়েছে খানিকটা দূরে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'হাসছো কেন?'

সুরসতিয়া শব্দ করে হেসে, আমার একটা হাত টেনে ধরে বললো, 'তোমাকে দেখে। মনে হচ্ছে, তোমার নজর আর দিল, সব এই ময়ূরটা নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

কথাটা মিথ্যা না, যতোই আমার আচরণ ওর কাছে শিশুসুলভ হোক। আমি জবাব না দিয়ে হাসলাম।

সুরসতিয়া হেসে বললো, 'ময়ূর বহুত চালাক। তবে দানা ছড়িয়ে তিন চারজনে মিলে ধরা যায়। তোমার খুব দুখ্ লাগছে?'

আমি সুরসতিয়ার চোখের দিকে দেখলাম। দুঃখ না, আমার চোখের তৃষ্ণাটাকে ও ভুল করছে, আর তাই নিজেই প্রায় বিমর্ষ হয়ে উঠছে। বললাম, 'কোনো দুঃখ লাগছে না। এটা একটা শখ।'

সুরসতিয়া তথাপি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপরে চোখের পাতা নিবিড় হয়ে এলো, একটু হাসলো। যেন কিছু বলতে গিয়েও, না বলে, নিচে গ্রামে যে গান গুনগুন করছিল, সেই গানই গুনগুনিয়ে উঠলো। সখী, কার চুপি চুপি কথায় এখন তুমি ছটফট করছো? কার কানাকানি শুনে তুমি উথালি পাথালি করছো। হঠাৎ মনে হয়, ও যেন ষোল সতরো বছরের বনবালা কুড়ি না, হাপানম্। কিংবা, মনে যখন রঙের সঞ্চার হয়, তখন এমনি করেই তা প্রকাশ করে।

সুরসতিয়া গুনগুন করতে করতে, আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। তারপরে হঠাৎ গান থামিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি একটা ময়ূর হলে বেশ মজা হতো, তাই না?'

ওর কথার গতি যে একেবারে বুঝতে পারি না, তা না। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

সুরসতিয়া বললো, 'তুমি আমাকে ধরবার জন্য ছুটতে।'

বললাম, 'তুমিই তো বললে, ছুটে ওদের ধরা যায় না। ফাঁদ পেতে ধরতে হয়।'

সুরসতিয়া স্পষ্টই বললো, 'তুমি তো ফাঁদ পাততে জানো না।'

সে কথা মানতেই হবে। আমি জবাব দিতে পারলাম না, সুরসতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও আমার দিকে তাকিয়েছিল। এখন আবার ওর দৃষ্টি মগ্ননিবিড়। আমার চোখ সরিয়ে নিতে একটু দেরি হলো।

ও জিজ্ঞেস করলো, 'কী?'

আমি মাথা নাড়লাম। কেন না, যে কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, তা কাল রাত্রের অন্ধকারে, ঘন সান্নিধ্যেই জিজ্ঞেস করেছি। জবাব আমার জানা। তা ছাড়া, সুরসতিয়া কি নিজেকে খুব অস্পষ্ট রেখেছে? আমার বিস্ময় এখন অনেকখানি তীব্রতা হারিয়েছে। আমাদের সমাজ জীবনের কাছে, বনভ্রমণের এই ছবি, বিস্ময়কর।

সুরসতিয়া দাঁড়ালো, বললো, 'কিছু বলছো না কেন?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলবো?'

সুরসতিয়া বললো, 'আমি কি জানি?'

বলে মুখ নিচু করলো। আবার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথাও বসবে?'

আমি ওর কথা আর মনের যোগসূত্র ধরতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝতে পারছি, ওর মুখের কথা আর মনের কথা এক না। আমি বললাম, 'তোমার ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছে না?'

সুরসতিয়া বললো, 'আমার সবই ভাল লাগছে।'

বলে হাসলো। আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে, আকাশ খোলা, নিচের দৃশ্য একেবারে বদলে গেল। দেখলাম, পাথুরে মৃত্তিকার রাস্তা নেমে গিয়েছে নিচে, কোয়েনার ধারে। এখন আমি বুঝতে পারি, যেখানেই যাই, কোয়েনা এঁকেবেঁকে সবখানেই আছে। আমরা যে পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি, তার নিচে, বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে কোয়েনা হারিয়ে গিয়েছে। নিচে অনেকখানি অংশ সমতল, হাঁটুর থেকে লম্বা ঘাস, নানাবিধ গাছ, কিন্তু সবই ফাঁক ফাঁক, অনেকটা গ্রামের মতো, আর সেই সমতলকে প্রায় বৃত্ত করে ঘিরে আছে, গভীর অন্ধকার বন। অথচ কোয়েনার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, গভীর বনের বৃত্ত পাক দিয়ে আসছে না, বনের এক অংশে হারিয়ে গিয়েছে।

আমি পাশ ফিরে সুরসতিয়ার দিকে তাকালাম। কারণ ছিল। ও ওর দেহ স্পর্শ করে, আমার এমন ঘন সান্নিধ্যে দাঁড়িয়েছে, আমার দূর সমতলবাসী

মন ভিতরে ভিতরে সচকিত হয়ে উঠছে। সহসাই মনে হলো, চোখের মন্ত্র, এখন ওর সর্বাঙ্গে। ও বাঁ হাত দিয়ে, গতকালের নাচের মতো আমার কোমর বেষ্টন করে আছে। রৌদ্র ওর, প্রায় উদাস বাম বক্ষে। খোঁপার সেই সরু নাগের মতো ফুলটি কাঁপছে। কিন্তু ও আমার দিকে তাকিয়ে নেই, তাকিয়ে আছে, বাঁ দিকের দূরে, এই পাহাড়েরই উৎরাইয়ের জঙ্গলের দিকে। ঠোঁটে হাসি, চোখের দৃষ্টিতে যেন একটি নিবিড় কৌতূহল।

আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সুরসতিয়া যে কিছু দেখছে, তার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। ও আমার দিকে তাকালো, আশ্চর্য! ওর চোখে যেন একটা কেমন আচ্ছন্নতা, এবং ঈষৎ রক্তিম। ও প্রায় আমার বুকের কাছে মুখের এক পাশ চেপে দিয়ে, বাঁ দিকে আঙুল তর্জনী দিয়ে দেখালো।

আমি ওর তর্জনীর লক্ষ্যে তাকালাম। প্রথমটা সহসা বুঝতে পারলাম না, মনে হলো, কোনো জীবন্ত প্রাণী নড়াচড়া করছে। পরমুহূর্তেই সমস্ত দৃশ্যটা এমন অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয় মনে হলো, মস্তিষ্ক চিন্তাশূন্য বোধ হলো। বনবাসী দুটি নগ্ন যুবক যুবতীকে, এর থেকে স্পষ্ট করে দেখার কিছু নেই। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। বনের জীবন, বা তার বাস্তব অবাস্তবতা, তার সামাজিক ধ্যানধারণা, কোনো কিছু সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে, এ মুহূর্তে আর তা বলতে পারবো না। আমার একটা নাগরিক জীবন আছে। জীবন সেখানেও নানান লীলায় লীলায়িত। সেখানে অনেক দ্বন্দ্ব ধন্দের ছড়াছড়ি। নানা প্রমোদ নিকেতনের খোলা বিজ্ঞাপনেই, অনাচারের সংকেত, সভ্যতার অহংকার। নগ্নতাকে সেখানে সাজানো হয় নানান কূটকচালি বসনে, নগ্নতার থেকে যার ওজন বিরাশী সিক্কা বেশি। সেখানে মাল কাটে ওজনে। কারণ সব ব্যাপারটাই ব্যবসায়িক। আমি সেখানে কূটকচালি রঙ্গে অভ্যস্ত।

এখানে, এই গভীর জঙ্গলে, যেখানে স্বর্ণচাঁপার গন্ধ মস্তিষ্কের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে, যেখানে রঙ-বেরঙের প্রজাপতিরা, ভ্রমর সকল ওড়ে ফুলে ফুলে, বিচরণ করে ময়ূরেরা, ঝরা পাতা মর্মরিয়া ওঠে, সেখানে, মহাদেবতা ঠাকুরের সৃষ্ট সন্তানেরা, নগ্ন দেহে জীবলীলা করে। বরং বলি, মানবলীলা করে, এবং এমন সরল গভীর লীলা যেন আমার দৃষ্টি দগ্ধ করে দেয়।

সুরসতিয়া আর এদিকে ফিরে তাকালো না। আমার চোখের বিস্ময়, ওর চোখে নেই। আমার দ্বন্দ্ব, যা কিছু, তা আমারই চোখে, আমারই ভিতরে। ও অনেকটাই নির্বিকার। ও আছে ওর আপন মনে। ঘটনার মধ্যে, কোনো

আকস্মিকতার চমক ওর নেই, দিনগত জীবনের একটি চিত্র মাত্র, হয় তো যা সচরাচর দেখা যায় না। দৃশ্যটি আমাকে দেখিয়েই, ওর আনন্দ। আমাকে তেমনি করে, বেষ্টন করে রেখেই, সামনের ডান দিকের গভীর অন্ধকার বনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'ওখানে লোর।'

আমি জানি, এখন যদি সুরসতিয়াকে আমার শরীর থেকে ওর হাতের বেষ্টনী খুলে নিতে বলি, ও দুঃখিত হবে। ও আমার মুখ চেয়ে, আমাকে বুঝে, আচরণ করছে না, আচরণ করছে, নিজের হৃদয়ের নির্দেশে। কিন্তু যা ওর কাছে অস্বাভাবিক না, আমার কাছে তা রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়কর, তারও বেশি কিছু। ওর চোখের মন্ত্র, ক্রিয়া করে আমার মস্তিষ্কে, ও এই বনের সঙ্গে, নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। কিন্তু সব ইচ্ছা আর ভাল লাগাকে আমি দায়হীনতার দ্বারা প্রকাশ করতে পারি না। ইংরেজিতে যাকে বলে, রেসপনসিবিলিটি আর কমিটমেণ্ট, সে সবও আমারও রক্তে।

সুরসতিয়ার দিকে না তাকিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম, 'লোর কী ?'

সুরসতিয়া মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। আমি ওর দিকে দেখলাম। প্রশ্নাতীত এক আবেগ ওর চোখে, হেসে বললো, 'লোর জানো না ? লোর লোর চলো তোমাকে দেখিয়ে আসি।'

বললাম, 'চলো।'

সুরসতিয়ার ডান হাতের বেষ্টনী ছাড়লো না। নিচের অনেকটা খাড়াই উৎরাই নামতে নামতে, স্পর্শের কোনো বাধাও রাখলো না, গুনগুন করে উঠলো, 'অলাকন বা লেকা ডিণ্ডা সোময়।'...

গেয়ে উঠে, আমার দিকে তাকালো, তারপরে আমার বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে, ওর ঘাড়ের ওপর রেখে দিল। আবার গুনগুন করলো, 'হো কুড়ি, আপে সুসুন মে/অলাকন বা লেকা ডিণ্ডা সোময়।'...

নামতে নামতে আমরা কোয়েনার স্রোতের ধারে চলে এলাম। এখানে মাকড়া পাথরের শক্ত তল নেই, নুড়ি পাথর অজস্র, কিন্তু লাল মৃত্তিকা, কাঁকর মেশানো, শক্ত অথচ নরম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী গান করছো তুমি ?'

সুরসতিয়া কোয়েনার কুলুকুলু ধ্বনির স্বরে স্বর মিলিয়ে হেসে উঠে বললো, 'অলাকন বা লেকা ডিণ্ডা সোময়। জোয়ানী সময় যেন ফুল ফোটার মতো। হো কুড়ি, আপে সুসুন মে। হে লেড়কি, তোমরা নাচো।'

যতো শুনি, ততো অবাক লাগে। বনের বাইরে, গান কাব্য নিয়েও, আমাদের কতো অহংকার। কিন্তু দেখছি, রবীন্দ্রনাথ যে বিবিধ সময় ও সময়ের

ফল বলে প্রচারিত, এখানে তার অংশবিশেষ প্রকৃতি নিজের হাত দিয়েই করিয়ে নিয়েছে। এসব গানের কবি কে, কে জানে। কিন্তু সে অনুভব করেছিল, যৌবন সময়টি ফুল ফোটার মতো। অতএব মেয়েরা নাচো। কেন না, অরণ্যের মানুষদের কাছে, নাচ আর গানই হলো ফল ফসলের সৃষ্টি-প্রতীক।।

সুরসতিয়া কোয়েনা পার হলো না, ডান দিকের ধার দিয়ে দিয়ে চলতে লাগলো। এখানে কোয়েনার জল আর জঙ্গলের ধারে, পথ সরু, অথচ তা যেন মানুষের সৃষ্ট না। নরম মাটি, দু' পাশে বড় বড় ঘাস, মাটির ওপর চাপা পড়েছে অনেক লতা গুল্ম। যেন কোনো ভারী বস্তু চেপে গিয়েছে পথ দিয়ে। সুরসতিয়া গুনগুন করেই চলেছে, 'অলাকন বা লেকা ডিণ্ডা সোময়'···

খানিকটা এগোতেই, চোখে পড়ে, ঘন অন্ধকার বন সামনেই। পায়ের নিচে থেকে যেন ঠাণ্ডা বাতাস উঠছে, কোয়েনা ক্রমে চওড়া হয়ে যাচ্ছে, আর গভীরও বটে। সেই মুহূর্তেই, নিচের দিকে তাকিয়ে নরম মাটির পথে, স্পষ্ট পায়ের চিহ্ন আমার চোখে পড়লো। পথের সামনে তাকিয়ে দেখলাম, পদচিহ্ন-সমূহ আরো স্পষ্ট। আমি প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ে, সুরসতিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'ওগুলো কী?'

সুরসতিয়া অবাক হলো না, ভয়ও পেল না, বললো, 'মারাংহোরোর পায়ের দাগ, এ পথ দিয়ে ওরা চলাফেরা করে, লোরে যায়।'

আমার গায়ের মধ্যে প্রায় কাঁটা দিয়ে উঠলো। মারাংহোরো মানে হাতি। লোর এখনো বুঝতে পারছি না। কিন্তু সুরসতিয়া আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? বন্য হস্তীর আস্তানায়? এতো জায়গা থাকতে, এর থেকে নিরিবিলি জায়গা কি এই বনে মিলতো না? আরো কয়েক পা এগিয়েই, পথের ওপর সদ্য পরিত্যক্ত হস্তীবিষ্ঠা দেখতে পেয়ে, আমার বঙ্গীয় চিত্ত অতিমাত্রায় কাতর হয়ে উঠলো। বনবালার স্পর্শের যে মাদকতা আমার নৈতিক প্রশ্নে জটিল হয়ে উঠেছিল, তা আমার অনুভূতি থেকে হারিয়ে যেতে বসলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'সামনের জঙ্গলের মধ্যে যদি হাতি থাকে?'

সুরসতিয়া আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, ওর নিবিড় কালো চোখে সাতবহিনির মন্ত্র, জিজ্ঞেস করলো, 'ভয় লাগছে?'

কোনো বীরত্বের প্রশ্নই নেই, সরলভাবেই বলি, 'হ্যাঁ।'

সুরসতিয়া বললো, 'কোনো ভয় করো না। বদমেজাজী না হলে, ওরা কারোকে মারে না। যদি দেখতে পাও, চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ো। আর যদি তাড়া করে, তাহলে এ পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে উঠে যাবে।'

বলে, আমার পিছনের পাহাড়টা দেখালো। যার খাড়াই বেয়ে উঠতে গেলে, অন্তত হাফ মাউন্টেনিয়ার হওয়া দরকার। আমি সুরসতিয়ার চোখের দিকে তাকালাম। ওর চোখে কি আমার মরণের মন্ত্র। ডাইনীতন্ত্র আমার জানা নেই, শুনেছি, বনের জগতে, এটা আকচার ঘটে। সুরসতিয়াকে আমার ডাইনী বলে একবারও মনে হচ্ছে না। এখনো ও যে আমার কোমর বেষ্টন করে আছে। আমার আলগা হাত ওর কাঁধে। আমাদের দু'জনের গায়ে রোদ। আমার গায়ের ছায়া ওর, পাহাড় উদ্ধত বুকে। ওর খোঁপার সরু লম্বা বাঁকা ফুলটি কাঁপছে। একে কি নাগকেশর বলে? জানি না। নাগকেশর দেখিনি, এরকম ফুলও দেখিনি।

আমরা থেমে নেই। সামনের ঘন অন্ধকার নিবিড় বনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, শত সংখ্যক হস্তী যুথ যেন সেখানে গায়ে গা দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখছে, আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। একটা জীপ গাড়ি শুঁড় দিয়ে দুমড়ে পাহাড় থেকে যারা ছুঁড়ে দিতে পারে, একটা মানুষ তার তুলনায় কী?

হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, ঘাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি ময়ূর আর ময়ূরীটি। ময়ূরটা দেখতে ছোট, পিছনের পুচ্ছ বলে বিশেষ কিছু নেই, ময়ূরের যেটা সুদীর্ঘ এবং ভূমি স্পর্শ করে। ময়ূরীটির পাখার রঙের ঝলকও অনেক ম্লান। তারা বেরিয়ে এসে, একবার আমাদের দেখলো, কিন্তু মাটিতে ঠোঁট ঠুকতে ঠুকতে, অকুতোভয়ে আমাদের আগে আগে, হাতি চলা রাস্তার ওপর দিয়েই চলতে লাগলো।

দুটি পাখির অস্তিত্বে যেন নতুন করে একটু সাহস পেলাম। এবং এই আমার প্রথম মনে হলো, এইখানে দাঁড়িয়ে, আমার দ্বিধা দ্বন্দ্ব অর্থহীন। সাঙ্গা কান্দা খেয়ে জীবন ধারণের থেকে, এ অবস্থাও কম নিষ্ঠুর না, কেন না, এখানে বাঁচাটা অনেকখানিই মৃত্যুর সঙ্গে নিরন্তর হাত মিলিয়ে। আমি সুরসতিয়ার কাঁধে আলিঙ্গন করে ধরলাম। আমার আলিঙ্গনের হাত, সুরসতিয়া অনায়াসে ওর বাম বক্ষে স্থাপন করলো। ওর ডান হাতের বেষ্টনী আরো শক্ত করলো। ওর দক্ষিণ বক্ষ, কটি কোমর সকলই আমার বামে ঘনবদ্ধ। আমরা রোদ থেকে নিবিড় ছায়ায় ঢুকলাম। সেই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়লো, কালো জল টলটল করছে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে। সুরসতিয়া ওর বাঁদিক দেখিয়ে বললো, 'লোর। তোমরা কি তালাও বলো?'

মোহনবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি যেটাকে ঝিল বা দীঘি বলতে

চেয়েছিলেন, তা এই। সুরসতিয়ার ভাষায় যা লোর। বুঝতে পারছি, এ জলাশয় প্রকৃতির সৃষ্টি, কোয়েনার চলে যাওয়ার পথের মাঝখানে, এক বিস্তৃত গহীন গহ্বর, যা বারো মাস ভরে থাকে জলে। হাতিরা এখানে স্নান করে, জলখেলা করে। প্রকৃতি যেন বিশাল দেহ, প্রাগৈতিহাসিক সেই বন্য পশুদের জন্যই, এমন একটি জলাশয়, নিবিড় বন, নরম মৃত্তিকা সৃষ্টি করেছে।

ভয় পাই সত্যি, তবু আমার অপার কৌতূহলের মধ্যে একটি বিস্ময়কর আনন্দ, অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে। জানি না, সেই সব অতিকায় জীবেরা কোথাও আছে কী না, আমি সুরসতিয়ার সঙ্গে, পায়ে পায়ে জলের দিকে একটু এগিয়ে যাই। বাতাস নেই কিন্তু রীতিমতো ঠাণ্ডা, এবং এই প্রথম আমি সুরসতিয়ার শরীরের উত্তাপ অনুভব করি। যেখানেই জলাশয় আর জঙ্গল, সেখানেই তীব্র ঝিল্লিস্বর শোনা যায়। এখানে তার ব্যতিক্রম দেখছি। ঝিঁঝি ডাকছে, কিন্তু করাতকলের বান-ফাটানো শব্দ না। মাঝে মাঝে এক একটা পাখি ডেকে উঠছে। ময়ূর ময়ূরী দুটো কোথায় চলে গিয়েছে, আর দেখতে পাচ্ছি না। বনের অধিকাংশ গাছই শাল। অন্যান্য গাছও কিছু কিছু আছে। সেগুন, অর্জুন, স্বর্ণচাঁপা। স্বর্ণচাঁপা আছে টের পাই ফুলের গন্ধে।

জলাশয়ের কাছে এসে সুরসতিয়া দাঁড়ালো। ভেবেছিলাম, জলাশয়ের ধারে ধারে নরম মৃত্তিকা আছে। ভুল ভাঙলো, দেখলাম, জায়গায় জায়গায়, হাতির থেকেও বিশাল প্রস্তরখণ্ড, কোথাও মাকড়া পাথরের আস্তরণ, জলের নিচে চলে গিয়েছে। জলাশয় ঠিক গোল না, বাঙলা সংখ্যা পাঁচের মতো, একটা বাঁক নিয়ে পুব দিকে চলে গিয়েছে, সরু হয়ে, বনের বাইরে হারিয়ে যাবার আগে একটা শাণিত রেখা রোদে ঝলকাচ্ছে।

জানি না, কেমন করে, আমার সমস্ত ভয়কে দূর করে দিয়ে, এক গভীর আনন্দ মুগ্ধতা জেগে ওঠে। যদি সুরসতিয়ার ডাগর কালো চোখের, সম্মোহনের মন্ত্র, আমাকে এখানে টেনে এনে থাকে, তবে আমি সম্মোহিত। সুরসতিয়ার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যদি সত্যি সত্যি সেই সব অতিকায় প্রাণীরা এখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আমার প্রাণের মূল্যেই, সেই অনিশ্চয়তাকে গ্রহণ করতে হবে।

একবার আমার মনে হলো, যাঁর চরণচিহ্ন ধরে, এই সারেণ্ডা অরণ্যে এসেছিলাম, তিনি কি এই লোর দর্শন করেছিলেন?

সুরসতিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে বসবে?'

বললাম, 'বসবো।'

আমি বসলাম, সুরসতিয়া ওর বেষ্টনী মুক্ত করলো না, কিন্তু অনেকখানি মুখোমুখি হয়ে বসলো। আমার হাত ওর গা থেকে অনেকখানি শিথিল হলো, সেই সঙ্গেই, ওর অধরা শাড়ি, অধরা বক্ষ মুক্ত। এখন আমার পিছনের জগৎ, আমাকে চকিতত্রস্ত করছে না, আমার দৃষ্টি সংকুচিত না। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'সুরসতিয়া, আমার কাছে, তুমি কি কিছু চাও?'

সুরসতিয়া নিঃশব্দে ঘাড় ঝাঁকালো। ওর ঊর্ধ্ব মুক্ত অঙ্গে প্রকৃতির আবেগ। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী?'

সুরসতিয়া বললো, 'তোমাকে।'

আমি ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললাম, 'কেমন করে? আমার দিন শেষ হলে, আমি তো চলে যাবো।'

সুরসতিয়া বললো, 'জানি। তুমি তো কলকাতায় চলে যাবে।'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

সুরসতিয়া আবার বললো, 'জানি তো। আমি কখনো যাবো না।'

বলে, ও নিচু হয়ে, আমার কোলের ওপর মাথা পেতে দিল। দীর্ঘ ঘাসের মতো ফুলটি আমার গায়ে স্পর্শ করলো। আমি ওর খোলা পিঠে হাত স্পর্শ করলাম। আমার মনে যেমন নানান কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা, তেমনি একটা ব্যথা ধরা কষ্টে, কথা বলতেও পারছি না, কেন না, আমি বুঝতে পারছি, সুরসতিয়াকে, যে যেভাবেই বিচার করুক, ওর সমস্ত আচরণ এবং চিন্তার মধ্যে, কেবল এক প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি কাজ করছে না, মানবীর এক অনিবার্য যন্ত্রণাও সেখানে মূক হয়ে আছে। ও যা করছে, তা কিছুই পূর্বপরিকল্পিত না। যা কিছু ঘটছে, তা অনেকটা কোয়েনার গতির মতো, ভূপ্রকৃতির যেখান দিয়ে সে আপনাকে প্রবাহিত করার পথ পেয়েছে, সেখান দিয়েই নেমে গিয়েছে কলকল্ করে। ওর ভিতরের হ্লাদিনী শক্তি কোথায় কেমন করে, কল্লোলিনী হয়ে উঠবে, আমি জানি না।

আমি সুরসতিয়ার মুখ তুলে ধরলাম। না, চোখে জল নেই, যেন আপন মনের জিজ্ঞাসায়, বনবালা কুঁড়ি, কাতর। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাবছো?'

সুরসতিয়া উচ্চারণ করলো, 'এনাচি অবেনেবেন উড়কুতনা।'

বলেই উঠে বসে, ও আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো, বললো, 'আমি তো এই বন বুরুর মেয়ে। তুমি এখানে থাকবে না, আমি জানি। আমি কখনো তোমার সঙ্গে যাবো না, তাও জানি। তোমার সঙ্গে মিশলাম, আমাকে সবাই খারাপ বলবে। তুমি কেন মুণ্ডা হলে না?'

বলে ও হাসলো, কিন্তু হাসিটা ঝরঝরানো না। আমি কী জবাব দেব, জানি না। ও আবার বললো, 'তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে তাহলে আমরা দু'জনে খ্রীষ্টান হয়ে যেতাম। সবাই তাই করে। কিন্তু আমি বন ছেড়ে যাবো না।'

আমি যে চিরদিন বনে থাকতে পারবো না, তা ও নিজেই বলেছে। আমার বলতে হয় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি একটু আগে মুণ্ডা ভাষায় কী বললে?'

সুরসতিয়া হেসে বললো, 'এনাচি অবেনেবেন উড়ক্তনা। এ বয়সটা গাছে জড়ানো লতার মতো। এমন কোনো করমের ডাল আমি পাইনি, যাকে জড়াতে পারি। তুমি অনেক বড় মুণ্ডা।'

বলে সুরসতিয়া আমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, 'লোয়ে চান করবে? এসো করি।'

সুরসতিয়া ওর গা থেকে, খাটো শাড়িটা খুলে, মাটিতে নিক্ষেপ করলো। ডাকলো, 'এসো।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সুরসতিয়া কাছে এসে বললো, 'জামা-কাপড় রেখে দাও।'

বলে নিজেই আমাকে পোশাক মুক্ত করলো। হাত ধরে নিয়ে গেল, জলে ডোবা পাথরের ওপর। তারপরে আরো একটু গভীরে। অঞ্জলিভরে জল তুলে, আমার বুকে কাঁধে ছড়িয়ে দিল। ঠাণ্ডা শীতল, কবেকার সেই দূরকালে বহমান আদিম জলের স্পর্শ আমার গায়ে। মাতৃপূজার ছবি আমার চোখে। শক্তিস্বরূপিণী মহামায়া তোমার সামনে। আদিম আরণ্যক জলাশয়ে, এখন পূজার লগ্ন।

পাতার আস্তানায় যখন ফিরে এলাম, তখন আমার সঙ্গে সুরসতিয়া আসেনি। আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে, চলে গিয়েছে, বলেছে, 'তুমি যাও, আমি পরে আসবো।'

সুধীন তো যেন হারানো মানিক ফিরে পেলো। সে আর হোরো আমাকে চারদিকে খুঁজছে। এমনকি, যেখানে গাছ কাটা হচ্ছে, সেখানেও গিয়েছিল, যার অর্থ, মোহনবাবুও আমার হারানোর খবর পেয়েছেন। তারপরেই চোখে পড়ে, একটি ঝকঝকে নতুন জীপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সুধীনের মুখে শুনলাম, সিংজী সাহেব আমাকে নিতে এসেছেন, যেতে হবে খলকোবাদ। পাতার ঘরে

গিয়ে দেখলাম সিংজী খাটের ওপর বসে আছেন, তাঁর সামনে অন্য খাটিয়ায় সুরার বোতল, গেলাসে ঢালা। ডেকে বললো, 'আসুন। শুনলাম এক সুমুন কুড়ি আপনাকে তুরু করেছে। শুনে খুব খুশি হয়েছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

সিংজী বললেন, 'কিছুক্ষণ। দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে, আমরা বেরিয়ে পড়বো। সুমুন কুড়ির জন্য, নিশ্চয়ই আপনার মন কেমন করবে?'

সিংজীর রক্তিম চোখ, তার ঝলক ওঁর ফরসা মুখেও। ওঁর সমস্ত চেহারার মধ্যেই, একটা শাণিত আভিজাত্য। সুমুন কুড়ির অর্থ এখন আমি জানি। নাচের মেয়ে। কিন্তু সেকথা ওঁকে বলার কোনো অর্থ বোধহয় নেই। গভীর অবগাহনের স্নিগ্ধতা আমার সমস্ত অনুভূতি জুড়ে। বললাম, 'যাবার আগে একবার দেখা করে যাবো।'

বলেই, সিংজী অনুমতি নিয়ে, তাড়াতাড়ি সুরীনের সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলাম। রান্না শেষ, সুরীন কোয়েনার জলে স্নান করে উঠে আসছে। কাছে গিয়ে বললাম, 'সুরীনবাবু, আপনাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যাচ্ছি, আপনি ওদের খাসিয়া চানা আর ডিয়েং-এর ব্যবস্থা করে দেবেন। ওরা নাচবে, গাইবে।'

সুরীনের হাসিটা হঠাৎ করুণ হয়ে উঠলো, বললো, 'আপনি থাকবেন না, ওরা আপনার টাকায় খানাপিনা করে নাচবে? তা কখনোই করবে না।'

আমি অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে?'

সুরীন বললো, 'আবার সুযোগ সুবিধা এলে হবে।'

আমি জানি, 'কারেবেন নামেয়ারে সিদা সোময়।' পুরনো দিনগুলো যে আর ফিরবে না। কিন্তু এও জানি, সিংজী আজ আমাকে নিয়ে যাবেনই। সুরীনও ভালই জানে, কোনো সুযোগসুবিধাই আর কখনো আসবে না।

সুরীন আবার বললো, 'ওরা এমনিতে বেশ আছে। বেশি দয়াটয়া দেখাতে গেলে, গোলমাল করে ফেলে।'

আমি আহত বোধ করলাম, বললাম, 'আমি দয়া দেখাবার জন্য, টাকাটা দিতে চাইনি। আমি ওদের কথা দিয়েছিলাম।'

সুরীন তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললো, 'আহা হা, আমি সে কথা তুলিনি, আমাকে ভুল বুঝবেন না দাদা। আপনি থাকবেন, দেখবেন, ওদের সঙ্গে আনন্দ করবেন, সেটাই ওদের ইচ্ছা। আপনাকে বাদ দিয়ে, ওরা কিছু করতে চাইবে না।'

সে কথাও অস্বীকার করতে পারি না। ভারী মন নিয়ে পাতার ঘরে ফিরে আসি। সিংজী সাহেব পকেট থেকে, একটি খাম বন্ধ চিঠি বের করে, এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার চিঠি।'

এই বনে, আমার চিঠি? খাম খুলে, ছোট রুলটানা কাগজে, আগে, চিঠির নিচে নাম দেখলাম, 'ইতি, প্রণতা, তৃপ্তি ভৌমিক।'

সিংজী বললেন, 'ছোট নাগরা হয়ে এলাম। আমি এদেলবায় আসছি শুনে, এ চিঠিটা দিল।'

আমি পড়লাম, 'শ্রীচরণেষু, বলেছিলাম, দু'একদিনের মধ্যে এদেলবায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু আজ সিংজী যাচ্ছেন, আপনাকে নিয়ে থলকোবাদ যাবেন। এখন আপনি আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছেন। সিংজী থাকলে, সেখানে আমরা বেমানান। তবু খোঁজ নেব, থলকোবাদে কতোদিন থাকবেন। কপালে দর্শন থাকলে, কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যাবে। আমাকে মনে আছে তো?'—

সিংজী বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার রাইটার সাহেব, আপনার যেন মন খাপাপ হয়ে গেল?'

হেসে বললাম, 'না, তেমন কিছু না।'

'জগৎটা আলাদা। মনও তাই। আমরা সব বুঝবো না।'

তথাপি জানি, এই শাণিত অভিজাত ব্যক্তিটির প্রাণে কী গভীর অন্ধকারের যাতনা।

সিংজী সাহেবের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত। মোহনবাবু নাকি পরে থলকোবাদ গিয়ে দেখা করবেন। কিন্তু সুরসতিয়াকে না জানিয়ে, না দেখা করে যাবো কেমন করে? সুরীনকে ডেকে সে কথা বললাম। সুরীন একটু হাসলো। হাতছানি দিয়ে ডেকে বললো, 'আসেন।'

অবাক হয়ে সুরীনের পিছনে পিছনে, ছোট একটি পাতার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তার ইঙ্গিতে, নিচু হয়ে দেখলাম সুরসতিয়া ঘুমোচ্ছে। গায়ে তার সেই খাটো শাড়িটি জড়ানো। এক হাত মাথার নিচে, আর একটি হাত বুকের ওপর।

সুরীন ঠোঁটে তর্জনী রেখে, নিচু স্বরে বললো, 'ডাকার দরকার নেই, ঘুমাক।'

সুরীনের চোখের দিকে তাকিয়ে, বুকের কাছটা কেমন খচ্ করে উঠলো। আমি মুখ নামিয়ে, জীপের দিকে এগিয়ে গেলাম। সুরসতিয়া ঘুমোক। ঘুম ভাঙিয়ে বিদায় নেবার থেকে, নিঃশব্দ বিদায় ভাল। কারণ, জাগ্রত, চাক্ষুষ বিদায়, অনেক সময়, বিদায়ের স্বরূপকে চিনতে দেয় না।

বিদায় সুরসতিয়া! আমার প্রণাম তোমার কালো শীতল দুটি পায়ে।